আইন
আইনসর্বস্বতা এবং সংস্কার

মূল্যবোধমুখী ইসলামী চিন্তাধারা

ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

আইন, আইনসর্বস্বতা এবং সংস্কার

মূল্যবোধমুখী ইসলামী চিন্তাধারা

মূল

Toward Our Reformation

From Legalism to Value-oriented Islamic Law and Jurisprudence

ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

Academia Publishing House Ltd

আইন, আইনসর্বস্বতা এবং সংস্কার
মূল্যবোধমুখী ইসলামী চিন্তাধারা

ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৪০০৪০৩৯৫৪, ০১৪০০৪০৩৯৫৮
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২৩

মূল্য
টাকা ৬০০.০০, US$ 10

ISBN
978-984-35-4747-7

Ayin, Ayinsarboshota Abong Sangskar (Toward our Reformation from Legalism to Value-oriented Islamic Law and Jurisprudence Written by Dr. Mohammad Omar Farooq, Published by Academia Publishing House Limited, 253/254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dhaka-1205, Phone: +88 0258954256 01400403954, 01400403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com

উৎসর্গ

এই বিনীত কাজটি আমি উৎসর্গ করছি আমার মরহুমা মা মমতাজ বেগম এবং মরহুম বাবা লে. কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ শামছুজ্জোহার প্রতি, যাদের স্নেহ-মমতা জড়ানো ত্যাগ এবং সহযোগিতা আমার জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অমূল্য অনুপ্রেরণা ছিল।

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা

[কুরআন ১৭ (আল-ইসরা) : ২৪]

‘ইয়া রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।’

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(মূল ইংরেজি বই থেকে)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

শুরুতে ২০০৫-২০০৬ সালের দিকে আমি পাঁচটি আলাদা আলাদা নিবন্ধ রচনা করেছিলাম শরিয়া, হাদিস, ইজমা, কিয়াস এবং এম্পিরিক্যাল ফাউন্ডেশনের ওপর এবং সেগুলো আমার কিছু ঘনিষ্ঠজনের সাথে শেয়ার করেছিলাম। এই নিবন্ধগুলো ইন্টারনেটে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে অনেকের মন্তব্য পেতে থাকি মুসলিম এবং অমুসলিমদের কাছ থেকে, যা ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক। এরপর থেকে এই রচনাগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ বই আকারে সাজাতে আমার কিছু সুহৃদ উৎসাহ দিতে থাকেন। আমার ঐ সুহৃদদের মধ্যে ছিলেন এম সাইফুল ইসলাম (যুক্তরাষ্ট্র), যাকে আমি জেনেছি বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। আরো মূল্যবান ভূমিকা রেখেছিলেন ড. স্টিভ কনোলী (একজন ব্রিটিশ মুসলিম) এবং ড. কবির হাসান (যুক্তরাষ্ট্র)। এই বইকে প্রকাশনা পর্যন্ত পৌঁছাতে ড. হাসানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আরো উল্লেখ্য ড. সাইয়েদ এম সাঈদ, ইসলামীক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল, যিনি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামীক থট থেকে বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

ড. কনোলী উৎসাহের সাথে সম্পাদনায় সহায়তা করতে নিজেই এগিয়ে আসেন। তাঁর সুদক্ষ সম্পাদনায় একদিকে যেমন বইটির সাবলীলতা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি কিছু অধ্যায়ে তাঁর মূল্যবান সমালোচনা ও সংযোজন

বইকে সমৃদ্ধ করে। এর আগে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছিল সাঈদ এম ইসলাম, যার আসলে পেশাগতভাবে সম্পাদক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে অন্য ক্ষেত্রে তার মেধাকে কাজে লাগায়। সাইয়েদা আহমদ কপি-সম্পাদনা পর্যায়ে দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করে।

অন্যদের মধ্যে যাঁদের মন্তব্য-পরামর্শে উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ড. ওমর আফজাল (যুক্তরাষ্ট্র) এবং শাহ আবদুল হান্নান (বাংলাদেশ)। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ড. মো: নেজাতউল্লাহ সিদ্দিকীর প্রতি, একজন পথিকৃৎ ইসলামী অর্থনীতিবিদ, যিনি পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে এটির মুখবন্ধ লিখতে রাজি হন।

প্রকাশনার আগেই যারা এই পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে তাদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন শেয়ার করেছেন তাদের মধ্যে আছেন: ড. সেলিম রশীদ (যুক্তরাষ্ট্র), ড. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীক (সংযুক্ত আরব আমিরাত), ড. আহরার আহমদ (যুক্তরাষ্ট্র) এবং ড. এম আব্দুল আউয়াল (যুক্তরাষ্ট্র)।

আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে আমার জীবনসঙ্গীনী নাহিদ নাহার-এর প্রতি, যার ধৈর্য এবং সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ শেষ করা সহজ হতো না।

যাদের উৎসাহ, সহযোগিতা, অবদান এবং পরামর্শে এই বই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবনে অপরিসীম রহমত এবং বরকত দান করুন। তবে এই বইয়ে যা কিছু পেশ করা হয়েছে তার দায়দায়িত্ব আমার। এই কাজে যেকোনো ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহ তায়ালার মাগফিরাত কামনা করি এবং কাজটি যদি প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক
আগস্ট ২৫, ২০০৯

প্রাক-প্রকাশনা পর্যবেক্ষণ
(Preview Comments)

ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্রের জন্য একটি সুচিন্তিত এবং প্রামাণ্য পরিচিতির চেয়েও বেশি এই বইটি নৈতিক এবং মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি জরুরি আহ্বান। ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্রের ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে তাদের জন্য এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

Prof. Khaled Abou El Fadl
UCLA School of Law
University of California, Los Angeles, USA

আল্লাহ তায়ালা থেকে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত হিসেবে ইসলামের পরিধি নিছক হালাল-হারাম প্রসঙ্গ নিয়ে নয়। যেকোনো সমাজে আইন তো অপরিহার্য, কিন্তু আইনসর্বস্বতার (**legalism**) বাড়াবাড়িতে তা আক্রান্ত হওয়া ইতিবাচক নয়। দুঃখজনক, অনেক শতাব্দীর ধারাবাহিকতায় ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বুঝ শরিয়ার সংকীর্ণ ধারণাকেন্দ্রিক হয়েছে, যেখানে প্রায় সব কিছুই আইন-বিধান-কানুনের কাঠামোতে দেখা হয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে এই গ্রন্থকার ইসলাম সংক্রান্ত সামগ্রিক আলোচনায় এবং মুসলিম চিন্তা ও সমাজে আইনসর্বস্ব প্রবণতার একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মূল্যায়ন পেশ করেছেন এই বইতে। ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মূল্যবোধমুখিতার দিকে লেখকের আহ্বান সময়ের দাবি এবং প্রশংসনীয়। লেখকের চিন্তাভাবনার কিছু কিছু দিক নিয়ে হয়তো আলোচনা-সমালোচনতার অবকাশ আছে, কিন্তু বিবেকবান পাঠকরা শরিয়ার নামে অত্যুৎসাহী আইনসর্বস্বতার প্রেক্ষাপটে এই বইতে যে মূল্যায়ন পেশ করা হয়েছে তা অবশ্যই স্বাগত জানাবে। বিশেষজ্ঞ অথবা সাধারণ পাঠক, সবার জন্যই এই কাজটি পাঠ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

Prof. Mohammad Hashim Kamali
Founding CEO
International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)
Malaysia

ইসলামী আইনের বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক ফিকহ প্রসঙ্গে, বিশেষ করে হাদিসের অবস্থান এবং ফুকাহাদের ইজমা ও কিয়াস প্রয়োগে, বেশ কিছু পূর্বকল্প (assumptions) নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু মৌলিক প্রশ্ন উঠিয়েছেন। তিনি হাদিসের শ্রেণিবিন্যাস এবং হাদিস প্রয়োগের প্রচলিত বিবিধ পদ্ধতির ব্যাপারেও কথা উঠিয়েছেন। ড. ফারুকের এই লেখনী সমসাময়িক ইসলামী স্কলার এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হবে। তিনি একদিকে অনড় রক্ষণশীলতা আর অন্যদিকে আধুনিকতা ও সংস্কারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারার মধ্যে যে চলমান অস্থিরতা তাঁর চিত্র কার্যকরভাবে তুলে ধরেছেন। অনেক বিবেকবান মুসলিমই স্বীকার করে যে, আমাদের জমে ওঠা ইসলামী আইনের ভান্ডার ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং প্রায়শই সমসাময়িক বিবিধ চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিকও। তথাকথিত 'মুসলিম' দেশগুলো যেখানে সামাজিক এবং বাণিজ্যিক বিবিধ পরিসরে ইসলামের ট্র্যাডিশনাল আইনের আংশিক প্রচলন করেছে বা রেখেছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অনড় এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যাভিত্তিক, যা প্রায়শই লজ্জাকর এবং অবাস্তব ও অকার্যকর। ঐতিহ্যবাদী পাঠকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের সাথে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু সেইসব সচেতন পাঠক, যারা সমসাময়িক সমাজে ইসলামের আইনি ব্যবস্থা এবং কাঠামো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে আগ্রহী, আমি আশা করব যে, তাঁরা এই লেখাকে গুরুত্বের সাথে পড়বেন এবং বিবেচনায় নেবেন। নিপুণ লেখা, বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যুক্তিযুক্ত। সবারই পড়া উচিত।

Omar Afzal
PhD, Cornell University, New York
Islamic scholar and former librarian
Cornell University, Ithaca, New York

ড. ফারুকের বইটি ইসলামের কিছু কেন্দ্রীয় ইস্যুর একটি সতর্ক এবং জ্ঞানগর্ভ আলেখ্য। যখন ইসলাম নিয়ে ভুল ধারণা এবং বিভ্রান্তি অত্যন্ত ব্যাপক, এমন সময়ের প্রেক্ষাপটে বইটি স্বাগতম এর স্বচ্ছতা এবং বিন্যাসের জন্য। চিন্তাভাবনাগুলো প্রকাশিত হয়েছে পরিষ্কারভাবে, প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত, আর সিদ্ধান্তগুলো আহরিত হয়েছে যুক্তিযুক্তভাবে। বর্তমান

সময়ের অনেক লেখা যা প্রাসঙ্গিক বিষয়াদিকে ঘোলাটে এবং জটিল করে ফেলে, সেই প্রেক্ষাপটে বইটি মুসলিমদের অবশ্যই পড়া উচিত। আর অমুসলিমরা যারা সমসাময়িক আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামকে বুঝতে চান, বিশেষ করে ইসলামের নৈতিক আঙ্গিক, তাঁদের জন্যও এ বই খুবই উপযোগী। লেখক কোনো সাফাই গাননি, কোনো বদ্ধমূল ধারণা বা মতবাদপন্থি নন, বরং তিনি অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের যে দুরবস্থা এবং বিকৃতি সে সম্পর্কে বিবেকসম্মতভাবে আলোকপাত করেছেন। এই সুষম যুক্তিযুক্ততাই এ বইকে আকর্ষণীয় করেছে, আর এর তুলনামূলক ধারা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আইনি কাঠামো যার আলোকে চিন্তাভাবনা পেশ করা হয়েছে, তা বিশ্লেষণকে বিশ্বাসযোগ্য এবং শাণিত করেছে।

Ahrar Ahmad
PhD, Southern Illinois University at Carbondale
Professor of Political Science, Black Hills State University
South Dakota, USA

ড. ফারুকের মূল্যায়ন যথেষ্ট সারগর্ভ এবং উদ্দীপক (provocative)। ইসলামী আইনশাস্ত্রিক চর্চা এবং অনুশীলন বর্তমান বিশ্বে যেভাবে হয় বইটি পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন তাতে আমার নিজস্ব মূল্যায়নেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে যে, বেশ কিছু বিষয়ে এমন কিছু দিক লেখক তুলে ধরেছেন যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অথবা আগে মাথায় আসেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেকোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational) ব্যক্তি যখন এই বই পড়বেন তাঁর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা আমার অনুরূপই হবে। লেখক সঙ্গতভাবে এবং কার্যকরভাবে আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিছু মৌলিক সমস্যার দিকে, যার সম্মুখীন মুসলিম ব্যক্তি এবং সমাজ, অথচ এই বিষয়গুলোর পর্যাপ্ত এবং কার্যকর ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ আমাদের অনেক ইসলামী স্কলারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বইটি ইসলাম নিয়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি অবদান।

Mohammad A. Auwal
PhD, Ohio University
Associate Professor of Communications
California State University, Los Angeles

ড. ফারুকের লেখা বইটি ইসলামী আইনের মূল উৎসগুলো (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস) নিয়ে একটি প্রশংসনীয় কাজ। এই উৎসগুলোর প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা, ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা নিয়ে হয়রান হওয়ার মতো (vexing) বহুবিধ প্রশ্নাদি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। অতীতের আইনসম্ভারের স্থবিরতা, আক্ষরিকতা এবং ভবিষ্যতে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধমুখিতার ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। অনেক ইস্যুতে তিনি আগের অনেক ফুকাহাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অতীত এবং বর্তমানের খ্যাতনামা ইসলামী স্কলারদের রেফারেন্স দিয়েছেন তাঁর মত এবং বিশ্লেষণের সপক্ষে। ইসলামী আইন এবং উসূলে ফিকহ সাহিত্যে এ বইটি একটি মূল্যবান সংযোজন। তাঁর কোনো কোনো মতের সাথে একমত না হলেও পাঠকরা অবশ্যই এ বইটি পাঠে উপকৃত হবেন।

Shah Abdul Hannan
Former Chairman, Islami Bank Bangladesh
Former Deputy Governor, Bangladesh Bank

ইসলামকে যথাযথ এবং গভীরভাবে বুঝতে হলে প্রচলিত (prevalent) অর্থোডক্সির বাইরে দুটো পথ আছে: ইসলামের ঐতিহাসিক সূত্রগুলোকে পরিষ্কার করার মাধ্যমে মুসলিম world-view-কে প্রভাবিত করা, অথবা মুসলিমদের ইসলামী মূল্যবোধের অগ্রাধিকারগুলোকে পুনর্বিন্যাস করা, যা মুসলিম জীবনকে প্রভাবিত করবে। ওমর ফারুক দ্বিতীয় ধারার আলোকে দৃষ্টান্তমূলক বিশ্লেষণ রেখেছে। যদিও সে ঐতিহাসিক সূত্রগুলোর রেফারেন্স টেনেছে প্রয়োজনমাফিক, বিশেষ করে রিবার মতো বিষয়গুলো আলোচনার সময়, তাঁর মূল ফোকাস মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধগুলোর ওপর এবং কেমন করে গত পাঁচ শতাব্দীর আইনসর্বস্বতা (লিগ্যালিজম) এই মূল্যবোধগুলোকে নিষ্প্রভ করে ফেলেছে তার ওপর। এই প্রেক্ষাপটে সে একটি অনেক প্রতীক্ষিত কাজ করেছে, নিষ্ঠার সাথে এবং জ্ঞানগর্ভভাবে। ইসলাম এবং মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ভাবেন তাঁরা ফারুকের এই পথিকৃৎসম (pioneering) কাজ থেকে নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

Salim Rashid
PhD, Yale University
Professor of Economics
University of Illinois, Urbana Champaign

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশমান ফিল্ডে, যেখানে নিয়মিতভাবেই উল্লেখযোগ্য অ্যাকাডেমিক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা চলছে, এটি খুবই ইন্টারেস্টিং বই। সমসাময়িক প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে বইটির বিশেষ মূল্য রয়েছে। বইটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি বিষয় আলোচিত হয়েছে, যেমন হুদুদ, রিবা, নারীর অধিকার ইত্যাদি, যেগুলো মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ড. ফারুক গভীর শ্রমের সাথে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বেশ কিছু জীবন্ত ইস্যুর ওপর আলোকপাত করেছেন। এরকম আন্তরিকতা এবং জীবনমুখী চেতনায় উদ্ভাসিত কাজ বিরল, আর এজন্য তাঁর এই কাজের যথাযথ স্বীকৃতি এবং কদর পাওয়া উচিত। বইটি আসলেই একটি পরিশীলিত এবং বাস্তবধর্মী গবেষণা, যা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোতে আরো ভালোভাবে চিন্তা করতে আলোকবর্তিকা হবে। বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য ইসলামী ফিকহের ওপর এরকম চমৎকার একটি বই উপহার দেয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করছি।

Mohammad Yusuf Siddiq
PhD, Shariah and Islamic Studies
Umm al-Qura University, Saudi Arabia.
Dept. of History & Islamic Civilization
University of Sharjah, United Arab Emirates

কদাচিৎ এমন কিছু জোরালো যুক্তিযুক্ত (cogent) লেখনী আসে যা একটি বিশেষ ফিল্ডে অন্যদের চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র, আর এ কারণেই এটি একটি বিশেষ বই। এটা মূলত ইসলামী দর্শন বা ধর্মতাত্ত্বিক নয়, এমনকি নিছক আইনশাস্ত্রিক কোনো কাজও নয়। তবু বইটিতে মুসলিম উম্মাহ বর্তমান সময় যে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার পেছনে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ রয়েছে সেগুলোর (একটি বিশেষ দিক, আইনি দিক) বিশ্লেষণই মূল লক্ষ্য। আমাদের এসব চ্যালেঞ্জের পরিষ্কার ডায়াগনোসিস থাকতে পারে, এটাই হতবাক করার মতো, আর সেই সাথে তা বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত - এসব দিকই বইটির গুরুত্বের নির্দেশক। আর এখানে যে নিরাময়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাও অনেকটাই অকাট্য।

যেমন বলা হয়েছে ‘ইসলাম ছিল আগন্তুকের মতো (অচেনা-অপরিচিত) এবং আবার সে অবস্থাতেই তা ফিরে যাবে’, যারাই ইসলামের নামে প্রচলিত বিকৃত বুঝ (understanding) এবং চর্চার এই অবস্থা থেকে উত্তরণ চান এবং ইসলামের আদি এবং খাঁটি রূপটির প্রত্যাবর্তন চান তাঁদের সবারই বইটি পড়া উচিত।

Steve (Soleiman) Connolly
PhD, Synthetic Organic Chemistry, University of London
Senior Lecturer in Organic Chemistry
School of Science & Technology, University of Teesside, UK

স্বচ্ছ লেখনী এবং সুচিন্তিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থকার পাঠকদের ইসলামের মূল বিশ্বাস এবং সমসাময়িক কেন্দ্রীয় ইস্যুগুলোর ওপর অনবদ্যভাবে আলোকপাত করেছেন। তারপর সে এসব ইস্যুর নিষ্পত্তির ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনা রেখেছেন। তাছাড়া, অতীতের প্রামাণ্য সূত্রগুলোর আলোকে আজকের ইস্যুগুলো কীভাবে মূল্যায়ন করা যায় সে ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। বস্তুত, বইটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের মূল আবেদনের ব্যাপারে কোনো রকম আপোষ না করেই সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইসলাম কী ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে এবং দিকনির্দেশনা দিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা।

Professor Charles E. Butterworth
PhD, Political Science, University of Chicago
Emeritus Professor of Government and Politics
University of Maryland, USA

এটি একটি সুপাঠ্য বই, যেখানে ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্রে মূল্যবোধমুখী সংস্কারের জন্য মজবুত যুক্তি ও অবস্থান তুলে ধরেছেন লেখক। প্রাসঙ্গিক ফিল্ডে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

Abdullah Saeed
Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies and
Redmond Barry Distinguished Professor
University of Melbourne

লেখকের কথা

(মূল ইংরেজি বই থেকে)

এই বইটি ইসলাম নিয়ে একজন আজীবন শিক্ষার্থী হিসেবে আমার জানা ও বোঝার প্রয়াসের ফসল। একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামের ব্যাপারে আমার আগ্রহ এবং সাধারণভাবে মানবতা এবং বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক। তবে মুসলিম উম্মাহ, আমি যার একটি অংশ, তার অবস্থা আমাকে গভীরভাবে পীড়িত করে। ইসলামে এবং এ জীবনে সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল জীবনযাপনে পথনির্দেশনায় ইসলামের সক্ষমতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা আছে যে, আমাদের অবস্থার উন্নয়নে, মানবতাকে উভয়জগতের সাফল্যের পথে চলতে এবং উত্তম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানবতার সেবায় ইসলামের বাণী এবং আদর্শ অপরিহার্য।

আমাদের শ্রেয়তর একটি ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এরকম একটি স্বপ্ন (vision) দাবি করে যে আমরা আমাদের অতীতকে ভালোভাবে অধ্যয়ন এবং অনুধাবন করি। ইব্রাহীমি চেতনায় (যা এ বইয়ে পরে আলোচিত হয়েছে) উদ্বুদ্ধ একজন স্বাধীনমনা মুসলিম হিসেবে আমি কখনো অন্ধের মতো প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামের নামে সব 'আইন-বিধান' গ্রহণ করতে স্বস্তিবোধ করিনি, কারণ কিছু স্পষ্ট এবং অকাট্য আদেশ এবং নিষেধ ব্যতিরেকে, বিস্তারিত পর্যায়ে এই আইন-বিধানের ভান্ডার মূলত প্রমাদপ্রবণ (falllible) মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

মুসলিমরা বিশ্বাস করে আল-কুরআনকে চূড়ান্ত আসমানি (divine) হেদায়েত হিসেবে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে নবিজির (স.) জীবন ও সুন্নাহর সামগ্রিকতাকে। অতীতের ওলামা এবং ধর্মপরায়ণ প্রজন্মের যাঁরা অবদান রেখেছেন মুসলিমরা অবশ্যই তাঁদের সম্মান করে এবং করবে, তবে সে সম্মান অতীত অবদানপুষ্ট এই ভান্ডার কুরআন, নবিজির (স.) সুন্নাহ, ঐতিহ্য এবং বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে হতে হবে।

মুসলিমদের মৌলিক আনুগত্য কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহর প্রতি; আর কোনো কিছুই প্রাথমিকভাবে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নয়। তবে কুরআন এবং নবিজির (স.) জীবন ও ঐতিহ্য অনুধাবন এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক এখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে ওঠা জ্ঞানসম্ভার এবং আলোচনার (discourse)

মেঘাবরণের মধ্যস্থতায় হয়ে থাকে। আমাদের প্রকৃত অবস্থা আরো শোচনীয়, কেননা এই মধ্যস্থতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এবং প্রতিষ্ঠিত আইনসর্বস্বতা (legalism; বাংলায় এই পরিভাষাটি বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে) মুসলিম মন-মানস এবং সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কুরআন এবং নবিজির (স.) জীবন ও আদর্শের সাথে আরো সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপামর মুসলিমদের জন্য প্রয়োজন ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র ভালো করে জানা এবং অনুধাবনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন (empowerment) করা। কুরআন যেমন করে আমার মনকে খুলে দিয়েছে এবং নবিজির (স.) সুন্নাহ ও ঐতিহ্য যেমন ইব্রাহিমী ধারায় 'উসওয়াতুন হাসানা' হিসেবে আমাদের জন্য আদর্শস্থানীয় (normative) হয়ে আছে, তার আলোকে আইন-বিধান হিসেবে যা কিছু 'ইসলামী' অথবা 'শরয়ি' হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তা ভালোভাবে অধ্যয়ন এবং মূল্যায়ন করার বিকল্প নেই।

এই বই আমার সেই চলমান অধ্যয়নের ফসল। আল্লাহ তায়ালা এই প্রয়াসে যা কিছু ভুল তা ক্ষমা করবেন এবং যা কিছু সঠিক সেজন্য তার রহমত, মাগফিরাত এবং বরকতের ভাগিদার হিসেবে কবুল করবেন এটাই আমার আন্তরিক দোয়া।

এ বইয়ে চিন্তাভাবনার যে খোরাক পেশ করা হয়েছে তা দুর্বলচিত্ত পাঠকদের জন্য উপাদেয় নাও হতে পারে, যদিও সবকিছুই এখানে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র আলোকেই করা হয়েছে। তারপরেও যেহেতু এ বইটি ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র নিয়ে, আর আমার মূল পারদর্শিতা সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, তাই ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী ছাড়া (যেটা এই লেখকের আমন্ত্রণে লেখা), স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে IIIT কয়েকটি মুখবন্ধ যোগ করেছে। বইটি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমার জানা ছিল না যে, IIIT'র পক্ষ থেকে ড. জামাল বারজিনযী কিছু কথা লিখেছেন এবং IIIT'র উদ্যোগে একজন সুপরিচিত স্কলার ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানীও বেশ লম্বা একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ড. বারজিনযী ২০১৫ সালে এবং ড. আল-আলওয়ানী ২০১৬ সালে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন। ফি আমানিল্লাহ। - এ অংশটি এই বাংলা সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে]।

প্রকাশকের কথা

(মূল ইংরেজি বই থেকে)

Toward Our Reformation: From Legalism to Value-oriented Islamic Law and Jurisprudence, ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক রচিত এই গ্রন্থটি একটি চ্যালেঞ্জিং এবং সূক্ষ্ম কাজ, যা পাঠকদের চিন্তা করতে এবং এমন অনেক বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে বা উপকারী হবে, যে বিষয়গুলো সাধারণত বিশেষজ্ঞদের আওতাভুক্ত, বিশেষ করে শরিয়া, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস প্রসঙ্গে, যেমনটি আমাদের সমসাময়িক সময়ে প্রচলিতভাবে বোঝা এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

বর্তমান সমাজে হুদুদ আইন এবং শরিয়া বিধানের অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে পাঠকরা লেখকের জোর সমালোচনার সাথে একমত হবেন। তবে যেক্ষেত্রে কাজটি পড়া বিশেষ করে কঠিন হবে, তা হচ্ছে হাদিস এবং অনেক ক্ষেত্রে উসূলে ফিকহের বিভিন্ন উপকরণের ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ নিয়ে তার বিশ্লেষণ। কাজটির আধেয় (content) এবং তার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনার আগে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লেখকের সব মত বা অবস্থানের সাথে প্রকাশক আবশ্যিকভাবে একমত নয়।

IIIT-র একটি প্রাসঙ্গিক অবস্থান এই যে, যেমনটি কুরআন এবং সুন্নাহতে বিধৃত, শরিয়া মূলত (essentially) আসমানি (divine) বিধান (দেখুন আল কুরআন ৪২:১৩; ৪৫:১৮; এবং ৫৯:৭), আর ফিকহ হলো বিভিন্ন অবরোহী পদ্ধতিতে ইজমা, কিয়াস ইত্যাদি ব্যবহার করে উসূলে ফিকহের ভিত্তিতে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে ফুকাহা কর্তৃক আহরিত বিধানাদি। আসমানি হওয়ার ব্যাপারে আমাদের পার্থক্য করতে হবে যা কিছু আসলেই আসমানি আর যা কিছু স্কলাররা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে (অনেক ক্ষেত্রে) অগ্রহণযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ করেছেন তার মধ্যে। সম্প্রসারণ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ (scholastic) বিভিন্ন মত এবং অবস্থানের বিশাল ভাণ্ডারের অযথা ব্যাপকতা। শরিয়ার সেই সমস্ত দিক যা কুদসী, মুতাওয়াতির এবং প্রকৃতপক্ষে সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা আসমানি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সহিহ বলতে বোঝানো হচ্ছে সেইসব হাদিস যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যা নবিজির (স.) চরিত্র এবং বাণীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং, অবশ্যই যার রেওয়ায়েত অবিতর্কিত এবং মজবুত। ফিকহের সিংহভাগ যা অবরোহী যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে

আহরিত তা অবশ্যই আসমানি নয়। বস্তুত সম্মানিত ফুকাহা সতর্ক ছিলেন তাদের ভুল করার সম্ভাবনার (fallibility) ব্যাপারে এবং এ ব্যাপারে জোর দিতে যে তাদের আহরিত বিধানগুলো সর্বকালের জন্য নয়। তবে, সময়ের সাথে সাথে পুরনো বিধানগুলোর অব্যাহত প্রয়োগে এসব বিধান অবশ্যম্ভাবী কারণে অবশেষে সুরক্ষিত ও অনড় হয়ে যায়, যেখানে ইজতিহাদ ও মাকাসিদ আল-শরিয়ার বিশেষজ্ঞদের বৈধ হাতিয়ার হিসেবে কোণঠাসা (marginalized) হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমরা আমাদের মহান ফুকাহার আহরিত বিধানসম্ভারকে পবিত্র, অলঙ্ঘনীয় এবং শরিয়ার আসমানি অংশ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে, যার মাধ্যমে এই বিধানসম্ভার এমন মর্যাদা পায়, যা হয়তো ফুকাহা নিজেরাও অভিপ্রেত গণ্য করেননি।

তদুপরি, যেকোনো ব্যাপারে 'আসমানি' জাতীয় পরিভাষা ব্যবহারে আমাদের অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, এবং যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে কী অর্থে এবং কিসের ব্যাপারে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকার সঠিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুসলিমদের কাছে কুরআনের যে অবিসংবাদিত প্রামাণ্যতা (authenticity) হাদিসকে কোনোভাবেই সেই মর্যাদায় নেয়া যাবে না।

আমাদের জন্য অবশ্যই বিবেচ্য যে নবিজি (স.) থেকে কুদসী, মুতাওয়াতির এবং অকাট্য শ্রেণির হাদিস সংখ্যায় কেন অনেক নয়। এখানেই শরিয়ার বিশাল ব্যাপ্তি এবং শক্তি, কেননা এই অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ততাই (conciseness) আইনি এবং সামাজিক জড়তা থেকে বাঁচার এক ধরনের বর্ম, যাতে করে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অতীতের সাথে শিকলবদ্ধ হয়ে না যায় এবং ওলামা-ফুকাহা সময় এবং পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তনের কারণে মানুষের অবস্থার যে পরিবর্তন হয় বা হতে পারে তা প্রাসঙ্গিকভাবে বিবেচনায় নিতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিশ্বের সব সমস্যার দায় সনাতন ফিকহ অথবা দুর্বল, অ-সহিহ হাদিসের ওপর চাপানো সঠিক হবে না; মুসলিম বিশ্বের সমস্যা আরও অনেক জটিল। এরকম দায় চাপানো হবে অতিসরলীকরণ এবং তা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তবু আমরা আস্থাবান যে, অধিকাংশ পাঠকই একমত হবেন যে, ইসলামের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক সুন্নাহর ধারায় আমাদের ঘরের অবস্থার খতিয়ান নেয়ার দরকার আছে। সেখানেই এই গ্রন্থের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা।

যেসব মূল ইসলামী মূল্যবোধগুলো একসময় ইসলাম এবং মুসলিম জীবন এবং আদর্শকে সংজ্ঞায়িত করত, গ্রন্থকারের মতে মুসলিমদের বর্তমান কঠিন

দুরবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সেইসব মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা তা ধারণে ব্যর্থতা কিংবা সে ব্যাপারে উদাসীনতা। সেজন্যই এই গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে সে তুলে ধরেছে 'মূল্যবোধমুখিতা'র দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। গ্রন্থকারের মতে যখন আমরা অতীতের অন্ধ এবং অসার অনুকরণ বাদ দেবো এবং মূল্যবোধগুলোর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব মেনে নেব এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়াসী হব, তখন অনুধাবন এবং পুনর্জাগরণের দুয়ার খুলতে শুরু করবে, মুসলিম বিশ্বের সম্মান, প্রাণচাঞ্চল্য এবং ঐকতান পুনরুদ্ধার হবে, যার সাথে সমসাময়িক বিভিন্ন যেসব সমস্যা বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন মুসলিমরা তা উৎরাতে পারবে।

এই প্রসঙ্গটি সামনে রেখেই গ্রন্থকার আহ্বান জানিয়েছেন, কুরআন এবং নবিজির (স.) জীবনাদর্শের ভিত্তিতে মূল্যবোধমুখী ধারা অবলম্বন ও বাস্তবায়নের এবং প্রাসঙ্গিকভাবে শরিয়া ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে। কুরআনই চূড়ান্ত উৎস এবং নিষ্পত্তিকারী। নবিজি মুহাম্মদ (স.) যেমন সমগ্র মানবতার জন্য আল্লাহ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবি ছিলেন, গ্রন্থকারের মতে কুরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা কোনো সময় এবং স্থানের গণ্ডিতে বাঁধা পড়তে পারে না। বরং প্রতি যুগের সমসাময়িক প্রয়োজন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নির্দেশনা পেতে স্থান-কাল বিবেচনায় নিয়ে কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহ বা জীবন ও সুন্নাহর সতর্ক অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যা করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই মাকাসিদ আল-শরিয়ার বিজ্ঞান, অর্থাৎ ইসলামী আইনের বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী আইনের দর্শন ও প্রাণ হিসেবে সামনে আসে।

আসলে শরিয়া, যা সময়ের সাথে সাথে শরিয়ার নামে আমরা যা কিছু দেখি এবং জানি তা মুসলিমদের জীবন এবং তাদের উভয়জগতের জন্য পুঞ্জীভূত জ্ঞানসম্ভার এবং এ সংক্রান্ত বিবিধ অবরোহী চিন্তাভাবনার গোলকধাঁধাসম আবরণে বাঁধা পড়েছে। সে কারণেই অগ্রহণযোগ্য কোনো কোনো হাদিসের ভিত্তিতে হুদুদ আইনের ভ্রান্ত বাস্তবায়ন শুধু কুরআন এবং নবিজির (স.) বাণীর প্রতিই অসম্মান দেখানো নয়, বরং তা আসলেই একটি বিপজ্জনক কাজ। এর ফলেই শরিয়ার নামে আসলে একধরনের কৃত্রিম শরিয়ার প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের নামে মুসলিমদেরই ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা হচ্ছে। এই অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগের বিভিন্ন দিকের ওপর সমগ্র বইটি জুড়েই গ্রন্থকার আলোকপাত করেছে।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের আলোচনার দিগন্ত প্রসারিত করার লক্ষ্যে, ওলামা এবং চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনাকে নতুন উচ্চতায় নেয়ার জন্য, যা আরও

গবেষণালব্ধ জ্ঞানচর্চার অবকাশ তৈরি করবে। যেহেতু বইটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, নিঃসন্দেহে পাঠকরা পারবেন অনেক কিছুর সাথে সহজেই একমত হতে এবং আবার কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করতে। কিন্তু এটাই প্রত্যাশিত যে, সামগ্রিকভাবে সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ পাঠকরা এই গ্রন্থে যে চিন্তার খোরাক এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে তা থেকে উপকৃত হবেন।

যেখানে যেখানে তারিখগুলো ইসলামী (হিজরি) ক্যালেন্ডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তা দেয়া হয়েছে AH হিসেবে। আর যেখানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে তা উল্লিখিত হয়েছে CE হিসেবে। আরবি শব্দগুলো italicize করা হয়েছে, তবে যেগুলো এখন বহুল পরিচিত সেই শব্দগুলো ছাড়া। বৈশিষ্ট্যসূচক (Diacritical) চিহ্ন যোগ করা হয়েছে শুধু প্রাচীন আরবি নামগুলোর ক্ষেত্রে। যেখানে যেখানে কোনো কিছুর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে (বোল্ড, ইটালিক্স অথবা দুটোই, তা অন্য কিছু লেখা না থাকলে ধরে নিতে হবে যে তা গ্রন্থকারের নিজের সংযোজন)।

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে IIIT ইসলামী লক্ষ্য (vision), মূল্যবোধ এবং নীতিমালার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

গত ত্রিশ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, সেমিনার এবং কনফারেন্স কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে এসেছে ইংরেজি এবং আরবিতে চার শতাধিক মৌলিক প্রকাশনা, যা বিভিন্ন ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থকারের সহযোগিতা ও ধৈর্যশীলতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থটির সম্পাদনা প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ কিছুটা দীর্ঘ, যেখানে এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গ্রন্থকারকে অনেকবার বলতে হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে, কোথাও আরো পরিষ্কার করতে, এবং বেশ কিছু বিষয়ে প্রকাশক-সম্পাদকের পরামর্শগুলোকে বিবেচনায় নিতে। সব সম্পাদকীয় প্রস্তাবনা গৃহীত হয়নি, কিন্তু সম্পাদক এবং গ্রন্থকারের মধ্যে যে পরামর্শভিত্তিক পারস্পরিক মতবিনিময় হয়েছে তা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উদ্দীপক ছিল, যা আমরা আশা করি গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

IIIT লন্ডন কার্যালয়
আগস্ট ২০১১

মুখবন্ধ-১

ড. মোহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী[১]

হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (স.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কারও নিজেকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।" লোকেরা জিজ্ঞেস করল: 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, কেউ নিজেকে অবমূল্যায়ন করবে কেন?' তিনি বললেন: "তোমাদের কেউ এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যেখানে তোমাদের মুখ খোলা উচিত, কিন্তু সে তা করে না।" আল্লাহ তায়ালা বিচারের দিন তাকে জিজ্ঞেস করবেন: "অমুক সময়/অবস্থায় কে তোমাকে মুখ খুলতে বাধা দিয়েছিল?" সে জবাব দেবে: 'মানুষের ভয়।' আল্লাহ তায়ালা বলবেন: "আমাকে ছাড়া আর কাউকে তোমার ভয় করার কথা ছিল না।"[২]

ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক তার মুখ খুলেছেন। তার ফল, পাঠকদের সামনে এই গ্রন্থ, যা হয়তো অনেককে সন্তুষ্ট করবে না। কিন্তু যদি নিরাবেগভাবে এই কাজটি পড়া হয়, বিশেষ করে উপর্যুক্ত হাদিসের আলোকে, তা থেকে অনেকেই উপকৃত হবেন। গ্রন্থকার ইসলামী ফিকহের কোনো বিশেষজ্ঞ নন, যেখানে ফিকহই এ গ্রন্থের মূল বিষয়। তবে তিনি যে বিশেষজ্ঞ নন, তা তিনি দাবিও করেন না। কিন্তু ইসলামী আইনের নামে বিধিবিধানের যে ভান্ডার তা যে অনেক ক্ষেত্রেই আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ আল-শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে লেখকের উদ্বেগ এবং পর্যবেক্ষণ আরও অনেকের মতোই।

---

১ ইংরেজি পাণ্ডুলিপি ২০০৭ সালেই প্রস্তুত হয়ে যায় এবং ড. সিদ্দিকী তার মুখবন্ধ সে সময়ই লেখেন, কিন্তু বই প্রকাশ হতে হতে ২০১১ সাল হয়ে যায়। ড. সিদ্দিকী একজন পথিকৃত ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের অন্যতম। ড. সিদ্দিকী নভেম্বর ২০২২-এ ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়লা তার সব অবদান কবুল করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নসীব করুন। (গ্রন্থকার)

২ সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাব আল-ফিতান, #৪০০৮, https://sunnah.com/ibnmajah:4008। হাদিসটি কিছু তাখরিজ অনুযায়ী জঈফ, আর কিছু অনুযায়ী সহিহ।

এর পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যামূলক বিভিন্ন বিধিবিধান এবং সেগুলো পুনর্মূল্যায়ন সেই পরিবর্তনের দিকে একটি পদক্ষেপ। এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ শুধু গতানুগতিক ফিকহের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে চলবে না। অনেক ক্ষেত্রেই যে সমস্ত বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন তাতে মাদ্রাসা-শিক্ষিত আলেমদের বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও অংশগ্রহণ প্রয়োজন, যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের যার একজন এই গ্রন্থকার। এই ব্যাপকতর অংশগ্রহণের বিষয়টিতে ভ্রূকুঞ্চিত করার কোনো কারণ নেই। কোনো কোনো মহলে এই প্রবণতা রয়েছে যে, যারা অনারব অথবা অবিশেষজ্ঞ তাদের এসব আলোচনায় অযোগ্য গণ্য করা। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল-শাতেবী (মৃ: ১৩৮৮ খ্রি:)-র মতে:

> যখন ইজতিহাদ বলতে বোঝায় কোনো টেক্সট থেকে সিদ্ধান্ত আহরণ, সেখানে আরবি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু যেখানে লক্ষ্য মাসালিহ (কল্যাণ) এবং মাফাসিদ (ক্ষতি)-র নিরূপণ, সেখানে আরবি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য নাও হতে পারে। একই বিষয় প্রযোজ্য যেখানে মাসালিহ এবং মাফাসিদ সম্পর্কে কেউ যোগ্যতা সহকারে টেক্সটের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে। সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত পর্যায়ে শরিয়া অধ্যয়ন ও গবেষণার ভিত্তিতে মাকাসিদ আল-শরিয়ার অনুধাবনের ক্ষেত্রে একই বিষয় প্রযোজ্য।
>
> যে কেউই শরিয়ার বিধিবিধান দেওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেছে এবং এ ব্যাপারে তার পর্যাপ্ত যোগ্যতা রয়েছে, তার জন্য সে এই জ্ঞান এবং পারদর্শিতা যদি অনারব ভাষা থেকেও আহরণ করে থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। সে এবং যে আরবি ভাষায় এই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে তাদের মধ্যে বৈষম্য করার কিছু নেই।[৩]

আমি এই শীর্ষস্থানীয় অথরিটি থেকে উদ্ধৃত করেছি, গ্রন্থকারের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য নয়, কারণ তার সে প্রয়োজন নেই। বরং, তা করছি পাঠকদের

৩ Al-Shatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah (Cairo, Egypt: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003), vol. 3, pp.162-63."

উৎসাহিত করার জন্য যাতে করে গ্রন্থকার ব্যাপক পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক যে আলোচনা-গবেষণার প্রসার দেখতে চান তাতে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন। আমার কাছে উদ্যোগটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তার মানে এই নয় যে, এই বইয়ের সারবস্তু এবং গুরুত্বকে আমি খাটো করে দেখছি। গ্রন্থকারের সব মতের সাথে একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি নিজেও নই। এই বইয়ের মুখ্য বাণী হচ্ছে: চিন্তা করো, মাকাসিদ আল-শরিয়ার আলোকে আমাদের বর্তমান অবস্থা অধ্যয়ন-গবেষণা করো, এবং নিজেদের মনের কথা ও ভাব প্রকাশ করো।

গ্রন্থটির কিছু কিছু অধ্যায় পড়াটা পাঠকের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তাই রয়েছে। গ্রন্থকার নিছক আমাদের সামনে আয়না তুলে ধরেছেন। এমনই হয় যেখানে এমন মেথডোলজি যা মাকাসিদ আল-শরিয়াকে উপেক্ষা করে, এবং শুধু শত শত বছর আগে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেয়া বা আহরিত ফিকহি বিধিবিধানের ওপর নির্ভর করে। প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন অত্যন্ত বিলম্বিত হয়ে আছে আর তাই তা অনেক প্রতীক্ষিত।

আলীগড়, ২৭ জুন ২০০৭

mnsiddiqi@hotmail.com

মুখবন্ধ-২

নবিজির সুন্নাহঃ একটি পদ্ধতিগত লক্ষ্য (Methodological vision)

ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী[৪]

আল্লাহ তায়ালা যখন ২৩ বছর ধরে নবিজি মোহাম্মদের (স.) ওপর হুদা এবং সিরাতুল মুস্তাকিম হিসেবে কুরআন নাজিল করলেন, তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল মানুষের কাছে এই ওহি পাঠ করতে এবং তা থেকে প্রজ্ঞা (হিকমা) এবং শুদ্ধি (তাযকিয়া) আহরণ করতে। তাঁর সমগ্র জীবনে কখনো মানুষকে বলেননি যে, কুরআনে যে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বিধৃত তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি তাদের জন্য এনেছেন। তাই যখন আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ কেউ দাবি করে যে কুরআনে যা ইল্‌ম এবং হিকমা আছে তাছাড়াও আরো কিছু নবিজি (স.) তাঁর পরিবারকে দিয়ে গেছেন কি না, তিনি জবাব দেন: "তার শপথ যিনি একটি শস্যকনা থেকে বীজ অংকুরিত করেন এবং যিনি সজীব রুহ সৃষ্টি করেছেন, আমি যা-কিছু জানি তা শুধু তারই ভিত্তিতে যা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন সেই কুরআনের মাধ্যমে"।

> আমরা শুনেছি আহমদ ইবনে মা'আনী থেকে, যিনি শুনেছেন হুশায়েম থেকে, যিনি শুনেছেন মুতার্‌রিফ থেকে, তিনি শুনেছেন আল-শা'বী থেকে যে আবু হুযায়ফা বলেছেন: "একবার আমি আলীকে বললাম, 'হে আমিরুল মু'মিনীন, আপনার তত্ত্বাবধানে কিতাবুল্লাহর বাইরে আর কোনো [পবিত্র] বার্তা (বা বাণী) আছে?' তিনি বললেন: 'না', তার শপথ যিনি একটি শস্যকণা থেকে বীজ

৪ ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাজুয়েট এবং ইসলামী আইনশাস্ত্র, ফিক্‌হ এবং উসুলে ফিক্‌হের ক্ষেত্রে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্কলার এবং বিশেষজ্ঞ। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক এবং ওআইসি ইসলামীক ফিকহ অ্যাকাডেমির একজন সদস্য ছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

> অংকুরিত করেন এবং যিনি সজীব রুহ সৃষ্টি করেছেন, আমি যা কিছু জানি তা শুধু তারই ভিত্তিতে যা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে।”[৫]

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের দীনের অনুধাবনের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। কুরআনে রয়েছে নবিজির (স.) মৌলিক সুন্নাহ, যার ভিত্তিতে নবিজিকে (স.) দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মানবতাকে আয়াত (চিহ্ন বা ইশারা) শিক্ষা দেয়া যাতে তারা পরিশুদ্ধ এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে করা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, যাতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসেবে এই দুনিয়াতে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং জীবনে তাদের যা-কিছু সংগ্রাম-পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে তাতে সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে।

কুরআনের আয়াতসম্ভার, যা স্পষ্ট আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে এবং আরও সাধারণভাবে আরবি ভাষায় যা বোঝায়, দুটোই সাক্ষ্য দেয় যে, সুন্নাহ আসলে কুরআনের বাণীরই বাস্তব রূপায়ণ বা প্রয়োগ। তাই কুরআনকে গণ্য করা যায় তাত্ত্বিক আর সুন্নাহকে বাস্তব প্রয়োগ। ওহির মৌখিক ভাষ্য মেলে কুরআনে, আর তারই আলোকে নবিজি (স.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ এবং প্রচলন করেন। যেহেতু এই প্রয়োগগুলো বিভিন্ন অবস্থায় বার বার হয়েছে, তাই তা নজির হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং ধীরে ধীরে উম্মাহর সংস্কৃতি এবং জীবনধারার অংশ হয়ে যায়। যদিও সেই মহান প্রথম প্রজন্ম বিগত হয়েছেন অনেক আগেই, যাদের পরে আসে তাবেয়িদের প্রজন্ম, তাদের ভিশন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার; তাঁরা জানতেন কুরআন এবং নবিজি (স.) যেভাবে কুরআনকে বুঝেছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় তা অনুশীলন করেছেন তা আঁকড়ে ধরে থাকা তাদের মৌলিক দায়িত্ব ছিল। কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র মধ্যে পরিষ্কার এবং

---

৫ At-Tirmidhi, Kitab ad-Diyat, #1412, https://sunnah.com/tirmidhi:1412 এই হাদিসের পুরোটা শেখ তাহা জাবির উল্লেখ করেননি। হাদিসটির শেষার্ধে এই অংশটুকুও রয়েছে: “এবং এই কাগজটিতে (সহিফাতে) যা লেখা রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ‘এটাতে কী আছে?’ তিনি বললেন, তাতে রক্তপণ এবং দাসমুক্তি সম্পর্কিত বিধান আছে” তবে এই অংশটুকুতে দু’একটি বিধান তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এর বাইরে মূলত এটাই নিশ্চিত হয় যে, তার জ্ঞানের উৎস মৌলিকভাবে কুরআনই। (গ্রন্থকার)

অচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম নবিজির (স.) জীবদ্দশায় অথবা তার পর এমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হননি, যা পরবর্তীকালে হয়েছে বিভিন্ন ফিরকা এবং মাযহাবের আবির্ভাবের ফলে এবং স্পষ্টত অথবা প্রচ্ছন্নভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে নানাবিধ মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়াতে।

সাহাবাদের প্রজন্ম যখন সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি দিত, সেটা তারা দিত কেমন করে রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআনে বিধৃত হিদায়াত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োগ করতেন সেটা জানতে। যদি নবিজির (স.) নামে বা সংশ্লিষ্টতায় তাঁরা এমন কোনো কোনো বর্ণনা পেতেন, যা কুরআনের অর্থ অথবা এর মৌলিক নীতিমালার বিরোধী হতো, সেরকম বর্ণনা তাঁরা গ্রহণ করতেন না। বরং, তাঁরা কুরআনে যা পেতেন সেটাকেই আঁকড়ে ধরতেন এবং মনে করতেন যে, বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোনো পর্যায়ে ঐ ভাষ্য কোনোভাবে বিকৃত হয়েছে। তাঁদের পরের প্রজন্মও মোটামুটিভাবে একই অবস্থান নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা, দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হাদিস প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও তার সনদ সহিহ। হাদিসটিতে এসেছে: "ওলি (অভিভাবক)-এর সম্মতি ছাড়া কোনো নারী বিয়ে করবে না"। তাঁর বিবেচনায় এই হাদিস কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন:

> আমি কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার অনুবর্তী, যা একজন নারীকে তার বিয়েতে নিজের সম্মতির (পূর্ণ) অধিকার দেয়, যেমন:
>
> فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ
>
> "তারপর যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়" (আল-বাকারা ২:২৩০)।

তদুপরি, কুরআন নারীর সাবেক স্বামীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা দেয়,

> وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ
>
> "তারা যদি বিধিমতো পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না"। (আল-বাকারা ২:২৩২)

নারীদের জন্য অনুমতি রয়েছে কোনো ওলি ছাড়াই নিজেদের বিয়ের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারার। এই আয়াতগুলোকে আবু হানিফা (র.) তার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অন্য মাযহাবে, যেগুলো ভিন্ন পরিবেশ এবং অবস্থায় এসেছে, তারা আবু হানিফার উল্লিখিত আয়াতগুলোর ওপর ঐ হাদিসটিকে অগ্রাধিকার দেয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর আল-রিসালার উপক্রমণিকায় বলেন, "আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যেকোনো বিষয় (বা অবস্থা)-র সম্মুখীন হোক, সে ব্যাপারে কী করণীয় তা তারা কুরআন থেকে পাবেই,"[৬] স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে।

নবিজির (স.) জীবনে ঘটনাবলির মাধ্যমে কীভাবে কুরআনের বিধানগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে তা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সুন্নাহ্র মধ্যে। তথাপি, পরবর্তী যুগে অনেকেই এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, যা এখনো চলছে। যে কেউ যদি একটি শুদ্ধ সনদের হাদিস গ্রহণ না করে তাহলে সে যেন সমগ্র সুন্নাহ এবং তার প্রাধিকার (অথরিটি)-ই অস্বীকার করল। মুসলিমদের মধ্যে এবং বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক পরে আরো চরম এবং অতিরঞ্জিত অবস্থান নেয়। বাস্তবতা এই যে, সব মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাই এই দাবি খণ্ডন করেছেন যে, কোনো বিশেষ হাদিস যদি গ্রহণ না করা হয়ে থাকে (ক) সনদের বিশুদ্ধতার অভাব হলে, (খ) আসলে বর্ণনাটি নবিজি (স.) থেকে কি না এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কারণ থাকলে, অথবা (গ) হাদিসের কাঠামো অথবা মতন-এ যদি কোনো অনিয়ম অথবা মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তা গ্রহণ না করা সঠিক হবে। তাই এই স্কলারদের মতানুযায়ী, উল্লিখিত যেকোনো একটি কারণে প্রত্যাখ্যাত হলে তা বৈধ এবং ইজতিহাদ যারা করেন তাদের অবিতর্কিত অধিকার।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) এবং তাঁর আগে তাঁর পিতা একটি ডিক্রি জারি করেন, যেসব হাদিস (বর্ণনা) নবিজি (স.) অথবা কোনো সাহাবার প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে সেসব সংগৃহীত হোক এবং মানুষের কাছে তা পেশ করা হোক। এই পদক্ষেপ নেয়া হয় ফিক্হের স্কলারদের লেখনী থেকে যাতে

---

৬ দেখুন, Ar-Risala (Cairo, Dar an-Nafais, 1979). [লেখক: ড. তাহা জাবিরের এই রেফারেন্সটা মনে হয় অসম্পূর্ণ। বিকল্প সূত্র: al-Shafi'I's Risala: Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence, Trans. Majid Khadduri, 1987, Islamic Text Society, Cambridge, UK, p. 66.]

মানুষ পার্থক্য করতে পারে এমনভাবে যাতে করে তারা কুরআনকে বোঝার জন্য সরাসরি সুন্নাহ্‌র ওপর নির্ভর করতে পারে, যাতে করে তারা সচেতন হয় যে, সুন্নাহ্‌র মধ্যে পুরাপুরি সত্যায়িত হাদিস রয়েছে যা নবিজি (স.) পর্যন্ত পৌঁছে, আর তার সাথে অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে যা তার সান্নিধ্যে যারা জীবন কাটিয়েছেন সেই সাহাবাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এসব হাদিসের সংকলন করতে গিয়ে তারা কেউই এটা চাননি, সুন্নাহই টেক্সটে পরিণত হবে এমন প্রাধিকারসহ যে তা কুরআনের কোনো কিছুকে রহিত করবে বা সীমিত বা বর্ধিত (qualify) করবে। কিন্তু দুঃখজনক যে, পরে কিছু স্কলার ঠিক এটিই করেছেন।

যখন আমি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার জন্য যাই, আমি বিস্মিত হয়েছি যে, অনেক মুসলিম স্কলার যারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দুঃখজনকভাবে তাদের অনেকেই ইসলামী ইতিহাসের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মতাত্ত্বিক, বিচারিক (juristic) এবং আরো অন্যান্য সমস্যার বোঝা বহন করেই চলেছেন। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপের জনগণের সামনে এমন এক ইসলাম পেশ করা হচ্ছে, যা রাসুল (স.) বা সাহাবিদের যামানার সেই আদি-অকৃত্রিম ইসলাম নয়, বরং যা উমাইয়া, আব্বাসী, শিয়া, আলাভী এবং অন্য বিভিন্ন সংঘাতমুখী সাম্রাজ্যে যেমনটি ছিল তেমনটি। এটা এমন একটি সময়ে হয় যখন পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা খুঁজছিল, তাদের জীবনের ব্যাপক ধরনের সমস্যার নিষ্পত্তিতে, বিভিন্ন সংকট উৎরাতে এবং নিছক জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিরূপণের জন্য। কিন্তু তাদের কাছে অধিকাংশ অভিবাসী ইসলামের সেই রূপ পেশ করে যা কুরআনের আলোকে নয়, বরং যা ইসলামের ঐতিহাসিক রূপ প্রতিবিম্বিত করে তার আলোকে। এ কারণে আমেরিকার মূল অধিবাসীরা অতিরিক্ত সমস্যা এবং সংকটের সম্মুখীন হয় সেই ইসলামী সুন্নাহর আমদানি যা তার বিশুদ্ধতা হারিয়েছে শত্রুদের অনুপ্রবেশ, স্বার্থিক প্রবণতা অথবা অজ্ঞ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে। এটা মুসলিমদের এবং কুরআন ও তার শিক্ষার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। এটা সেই প্রবণতার ফসল, যেখানে কুরআনের মূল্যবোধ এবং হিদায়েতকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার অনুবর্তী করা হয়েছে, যার মধ্যে বিশেষ শাসকবংশ এবং গোত্র, ঐতিহ্য এবং রীতি, ইসলামী আইনশাস্ত্রের অপব্যবহার এবং বিকৃতিকরণ, এমনকি নবিজি (স.) এবং তাঁর মহান সাহাবিদের নামে

এমনসব বর্ণনার প্রচলন যার ভিত্তিতে আন্তঃমুসলিম বিবিধ দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিদ্বেষ ছড়ানোতে নতুন শক্তি জোগায়। ইসলামের এই বিভ্রান্তিকর এবং বিতর্কিত ইমেজ, যা ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা এবং রীতি, যেগুলো প্রচার পায় অর্ধ-শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে, এবং এর কারণে যা আগেই সমস্যা এবং সংকট ছিল তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, পাশ্চাত্যের অনেকেই যারা ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে (বা তার সম্ভাবনা ছিল), তারা অন্যদিকে ঝুঁকে পড়েছে। অনেকেই যারা ইসলাম কবুল করেছে তারা দেখেছে যে, তাদের কাছে যে ইসলাম পেশ করা হয়েছে তা একটি বিভ্রান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন আইনি নীতিমালা, অসঙ্গতিপূর্ণ, বিচিত্র এবং সাংঘর্ষিক ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাসংবলিত হাদিসের মধ্যে এমন কিছু যা কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, অন্তহীন ধর্মীয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের ধারাবাহিকতা। দুঃখজনকভাবে, এসব সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি এবং অনাগ্রহের। পাশ্চাত্যের অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞ এই বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation)-এর কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। একজন ব্যতিক্রম ছিলেন ড. মরিস বুকাইল, যিনি প্রাসঙ্গিক কিছু কারণ নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। বুকাইল যখন কুরআন অধ্যয়ন করেন, তিনি দেখতে পান যে, আসমানি বাণী মানুষকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম এবং কুরআনে তিনি কোনো রকমের ত্রুটি অথবা অসঙ্গতি খুঁজে পাননি। কিন্তু যখন হাদিস অধ্যয়ন শুরু করেন, তাতে ইহুদিবাদ এবং খ্রিষ্টবাদের যেরকম অভিজ্ঞতা তার অনুরূপ সমস্যা তিনি দেখতে পান। তার কিছু কিছু লেখাতে বুকাইল প্রাসঙ্গিক আটটি প্রশ্ন আলোচনা করেন যা হাদিস অধ্যয়ন থেকে তার মনে জাগ্রত হয়, যার একটিও কুরআন অধ্যয়নের সময় হয়নি।

মরিস বুকাইল এবং আরো অনেক মুসলিম যাঁরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছেন ইহুদিবাদ অথবা খ্রিষ্টবাদ থেকে তারা যে ধরনের ইস্যুর সম্মুখীন হয়েছেন Toward Our Reformation বইটি অনুরূপ প্রশ্নরাজির ওপর আলোকপাত করেছে। বুকাইল তার প্রশ্নগুলো উত্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন গভীর সম্মান এবং সংবেদনশীলতাসহ, এটা জেনেই যে এ ধরনের প্রশ্ন তারা সহ্য করে না যারা কুরআন এবং নবিজির (স.) অভ্রান্ততা

মুসলিম ফুকাহা এবং হাদিস বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে কয়েক প্রজন্ম ধরে আসা হাদিসের ওপরেও আরোপ করে। যাদের এরকম মানসিকতা আছে তারা তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল ধারণার বিপরীতে কিছু শুনতে বা বিবেচনা করতে চায় না। কারণ তারা ভীত যে, যারা হাদিস নিয়ে বিতর্কিত বিষয়াদি ওঠায় তারা আসলে হয়তো সুন্নাহ এবং তার মর্যাদা পুরোপুরিই অস্বীকার করে। কিন্তু তারা এটা অনুধাবণ করতে পারে না যে, এ ধরনের অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ এবং তার মর্যাদা সমুন্নত রাখা, এর প্রয়োগের যথার্থতা বজায় রাখা এবং যেসব মুসলিম অনুসন্ধানী চেতনা ধারণ করে এবং সর্বজনীন বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিমালা স্বীকার করে তাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য।

সমসাময়িক সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং সেসবের জন্য উপযুক্ত পথনির্দেশনা দিতে একমাত্র কুরআনই সক্ষম। তবু সঠিক খাতে জীবন পরিচালনার জন্য মানুষকে কুরআন শিক্ষার যে ধারা নবিজি (স.) থেকে এসেছে তার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

ইমাম আবু হানিফা, আল-শাফেয়ী অথবা উমর ইবন আল-খাত্তাব যখন তালাকপ্রাপ্ত নারীর বাসস্থান এবং খোরপোষের ব্যাপারে[৭] ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা.) মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেননি তার মানে এই নয় যে, তারা সামগ্রিকভাবে সুন্নাহকেই অস্বীকার করেছেন। আল-দিয়াত বা রক্তমূল্য সম্পর্কিত হাদিসটি[৮] তাদের গ্রহণ না করাটাও সুন্নাহ্‌র অস্বীকার ছিল না।

---

৭ আল-শা'বী বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেছেন: 'আমার স্বামী আমাকে চূড়ান্ত তালাক দেন এবং আমি খোরপোষের দাবি জানাই। তাই আমি নবিজির (স.) কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, তুমি কোনো খোরপোষ বা বাসস্থানের দাবিদার নও।' যখন এটি উমর ইবন আল-খাত্তাবের নজরে আনা হয় তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা সুন্নাহর খেলাপ করতে পারি না একজন নারীর বর্ণনার ভিত্তিতে যে, হয়তো বর্ণনার সঠিক ভাষ্য বিস্মৃত হয়েছে।' তারপর তিনি কুরআনের আয়াত থেকে পাঠ করলেন, 'তোমরা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে তাদের বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করো না' (সূরা তালাক ৬৫/১)। উমর স্বামী কর্তৃক খোরপোষ এবং বাসস্থান প্রদানকে আবশ্যিক করেন।

৮ সুনান আবু দাউদ, কিতাব আদ-দিয়াত, 'ইমাম কর্তৃক হত্যার ব্যাপারে ক্ষমা' অধ্যায়।

"আবু হানিফাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

> তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী যারা বলে, 'যে বিশ্বাসী জিনা করে তার মন থেকে ইমান তেমনটাই অপসারিত হয় যেমন একটি দেহ থেকে জামা খুলে ফেলা হয়, যদি সে তাওবা করে তার ইমান কি পুনর্বাসিত হয়?'[৯] তারা যা বলে তার সত্যতা সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহ আছে, বা তাদের আপনি বিশ্বাস করেন? তারা যা বলে তা যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি তো খারেজিদের মতের সমর্থন করেন, আর যদি সন্দেহ করেন, তাহলে আপনি খারেজিদের অবস্থানের ওপর সন্দেহ আরোপ করেন এবং এটার মাধ্যমে সুবিচারের যে নীতি আপনি নিজেই সমুন্নত করেছেন তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হবে। অন্যদিকে, আপনি যদি তাদের মতামতকে ভুল ঘোষণা করেন, তাহলে তারা বলবে যে, এটা করার মাধ্যমে আপনি নবিজির (স.) বাণী অবিশ্বাস করেছেন, কেননা তারা এই রেওয়ায়েত এমন সনদের মাধ্যমে পেয়েছেন যা একেবারে নবিজি (স.) পর্যন্ত পৌঁছে।"

এর জবাবে আবু হানিফা বলেন:

> আমি অবশ্যই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এসব লোক যা বলে তা মিথ্যে। তবে এটা বলার মাধ্যমে আমি নবিজির (স.) কথা অবিশ্বাস করছি না। বরং, নবিজির (স.) কথা অস্বীকার করার মানে দাঁড়ায় যেন একজন বলছে: 'আমি নবিজির (স.) কথাকে মিথ্যে ঘোষণা দিচ্ছি।' তবে, কেউ যদি বলে নবিজি (স.) যা কিছু বলেছেন তাতে আমি বিশ্বাস করি এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, তিনি কখনো অসত্য বলেননি অথবা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কিছু বলেননি, 'তাহলে এই অবস্থান আসলে নবিজির (স.) এবং কুরআনের সত্যবাদিতার ঘোষণা, কেননা নবিজি (স.) কখনোই কুরআনের বিপরীতে কিছু বলতে পারতেন না। যদি তিনি কখনো এরকম করতেন বা অসত্য উচ্চারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা

৯ এই হাদিস গৃহীতও নয় প্রত্যাখ্যাতও নয়। তবে এটিতে কুরআন এবং সুন্নাহর স্পষ্ট অর্থের আলোকে সমস্যা আছে।

তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে এই দুনিয়াতেই ধরতেন এবং শাস্তি দিতেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন: 'সে যদি আমার নামে কোনো (অসত্য) কথা রচনা করত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তারপর তার গ্রীবা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না!' (সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯: ৪৪-৪৭) বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, রাসুলুল্লাহ কখনোই কুরআনের বাণীর বিপরীত কিছু বলতে পারতেন না এবং এমনটি যে করবে তিনি আল্লাহর নবি হতে পারেন না।"

প্রকৃতপক্ষে খারেজিরা যা বলে তা কুরআনের পরিপন্থি, কারণ কুরআনে সূরা আন-নূর-এ (২৪:২):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন জিনাকারীদের ব্যাপারে, তিনি এটা বলেন না যে তারা অবিশ্বাসী। একইভাবে সুরা আন-নিসা (৪:১৬)-তে তিনি বলেন:

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

'দোষী হিসেবে উভয়কেই শাস্তি দাও'। এই দু'টি আয়াতে যাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা বিশ্বাসী মুসলিম, অবিশ্বাসী নয়।

তাই নবিজির (স.) নামে বর্ণিত এমন কোনো হাদিস যা কুরআনের বিপরীত তা প্রত্যাখ্যান করা, না কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক আর না তা নবিজিকে (স.) প্রত্যাখ্যান অথবা তার সত্যবাদিতার অস্বীকার। বরং এটা নিছক যারা ঐ বর্ণনা করেছেন তাদের সত্যবাদিতা অথবা বিভ্রান্তির স্বীকৃতি। যা কিছু নবিজি (স.) আসলেই বলেছেন, তা যদি আমরা তার থেকে সরাসরি নাও শুনে থাকি, তা আমরা অমূল্য সম্পদ হিসেবে চাই এবং ধারণ করি, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌র নবি (স.) কখনো এমন কিছু করতে কোনো নির্দেশ দেননি যা আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন, না তিনি এমন কিছু অবৈধ করেছেন যা আল্লাহ তায়ালা বৈধ করেছেন, না তিনি কখনো

এমন কিছু বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার থেকে ভিন্নতর। আল্লাহ বলেন:

> مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
>
> যে লোক রসুলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (সুরা আন-নিসা ৪:৮০)

নবিজির (স.) জীবন এবং নবিজি (স.) থেকে যা কিছু সত্যিই বর্ণিত হয়েছে তা অব্যর্থভাবে এবং অপরিহার্যভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী এবং হিদায়েতের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই সত্য বা বাস্তবতাটি বিকৃত করার পরিবর্তে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

লেখকের কথা

(মূল ইংরেজি বইটির বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে)

২০০৬ সালে আমি এই বইটির কাজ শুরু করি এবং ২০১১ সালে 'Toward Our Reformation From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence' নামে বইটি প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই আমার বাংলাভাষী শুভানুধ্যায়ীরা আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন, দাবিও করেছেন, বইটি যাতে বাংলায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে আমার নিজের হাতেই কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিই। কিছুটা সাহসী সিদ্ধান্ত, কারণ বাংলায় বড় কিছু লেখার চর্চা অনেক দিন নেই। তাই প্রথমে সাহস পাচ্ছিলাম না, আর বাংলায় কম্পিউটারে টাইপ করাটাও ইংরেজির চাইতে কিছুটা জটিল। যাহোক, আল্লাহ তায়ালার রহমতে সে কাজটা অনেক দেরিতে হলেও সম্পন্ন হয়েছে।

মূল ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশনার প্রায় ১১ বছর পর এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে অনেকের কাছে থেকে মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ পেয়েছি। এমনকি এই বইয়ের মুখ্য বিষয়ঃ 'মূল্যবোধমুখী ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র' এখন অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমনটি হয়েছে ইসলামিক ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে।[১০]

বইটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সন্ধান করে দেখলাম মালয়েশিয়ার আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর একটি লেখায় বইটির রেফারেন্স দিয়েছেন।[১১] ২০১৭ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলেস-এর আইন বিভাগের অধ্যাপক খালেদ আবু এল-ফাদল-এর সাথে যোগাযোগ করে বইটির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর ফিডব্যাক চেয়েছিলাম। অধ্যাপক এল-ফাদল সমসাময়িক মুসলিম অ্যাকাডেমিক এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আমার ই-মেইলের জবাবে দু'টি পৃথক ইমেইলে যা লিখলেন তা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে পেশ করা হলো।

---

১০ Hasan, 2016.

১১ Ibrahim, 2013.

> ‘আপনার মেসেজটি পাওয়ার অনেক আগেই আমি বইটি অর্ডার করেছিলাম, পড়েও ফেলেছি এবং আপনার যুক্তিধারা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনার বইটি আমার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের পড়ার তালিকায় যোগ করেছি এবং আমার বিবেচনায় এটি একটি বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী অবদান। যদি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়, আমি আনন্দিত হব সমর্থনমূলক পর্যবেক্ষণ (endorsement) যোগ করতে। আমি নিশ্চিত করেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, সংগ্রহে বইটি সংযোজিত করতে। আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে, তাদের গবেষণাসংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ছাত্ররা নিয়মিতই বইটি ধার করছে এবং আমার কপিটি আমি তাদের ধার দেবো না।’

অ্যাকাডেমিক পরিসরে বইটির কয়েকটি পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের জন্য সেগুলোর রেফারেন্স যোগ করা হয়েছে।[১২]

বইটির অনুবাদ হচ্ছে যেহেতু ১১ বছর পর। এই সময়ের ব্যবধানে আমার নিজেরই আরো অনেক প্রাসঙ্গিক একাডেমিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যার রেফারেন্সগুলো এই বইয়ে যোগ করা হয়েছে।

আসলে অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই আক্ষরিক অর্থে করতে গেলে মূলের ভাবটা খর্ব হতে পারে। আবার একই সাথে অনুবাদে মূলের প্রতি বিশ্বস্তও থাকতে হয়। লেখক যেহেতু আমি নিজেই, তাই লেখক হিসেবে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি যাতে মাতৃভাষায় চিন্তা ও ভাব প্রকাশে মৌলিকত্ব থাকে। অরিজিন্যাল ইংরেজিতে বইটি মিলিয়ে পড়লে এই বাংলা সংস্করণে আক্ষরিকতার প্রত্যাশা করলে সঠিক হবে না।

ইংরেজিতে অনেক পরিভাষা এবং শব্দ আছে যা অনুবাদ করতে গেলে বিদঘুটে লাগতে পারে। তাই যেখানে আমার মনে হয়েছে যে, ইংরেজিতে ব্যবহৃত শব্দ বা পরিভাষাটি তুলনার জন্য থাকা দরকার, সেখানে ইংরেজি শব্দ যোগ করা হয়েছে। এতে পড়ার সাবলীলতায় কিছুটা আপোষ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মূল বইতে যে চিন্তা এবং ভাবগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা নিয়ে পাঠকরা যাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন না হন, সেজন্য এই আপোষটা হয়তো উপযোগী হতে পারে।

---

১২ Johnston, 2013; Wani, 2016.

পাদটীকা বা ফুটনোটে বাংলা এবং ইংরেজির সংমিশ্রণ রয়েছে, কারণ অনেকগুলো ইংরেজি রেফারেন্স বাংলায় লিখলে বা অক্ষরান্তরিত করলে, আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা যারা এ রেফারেন্স সূত্রগুলো নিয়ে আরো নাড়াচাড়া করতে চান, তাঁদের জন্য অসুবিধা হবে। তাই যেখানে যেখানে বাংলায় পাদটীকা উপযোগী সেই জায়গাগুলো ছাড়া বাকি স্থানগুলোতে ইংরেজিতেই দেওয়া হয়েছে।

মূল ইংরেজি বইতে কুরআনের আয়াতগুলোর অনুবাদ ছিল, কিন্তু আরবি টেক্সট ছিল না। প্রকাশকের সিদ্ধান্তে আরবি টেক্সটও যোগ করা হয়েছে, পাঠকদের জন্য বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

উল্লেখ্য, এ বইয়ে উপস্থাপিত সকল যুক্তি ও বক্তব্য একান্ত আমার নিজের, এর সাথে প্রকাশকসহ অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নাও হতে পারে।

পরিশেষে, আমি একজন আজীবন শিক্ষার্থী। আর তাই আমি খোলা মন নিয়ে অধ্যয়ন করি এবং নিজের চিন্তাভাবনাকে সবসময় আত্মসমালোচনামূলক (self-critical) কাঠামোতে মূল্যায়ন করে থাকি। সেজন্যই পাঠকদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ পাঠানোর আমন্ত্রণ জানাই। আল্লাহ তায়ালার কাছে খাস দোয়া যে, তিনি যেন আমার ভুলত্রুটি মাফ করেন এবং যদি এ কাজের মধ্যে ভালো এবং কল্যাণকর কিছু থাকে তাতে যেন বরকত দেন এবং আখিরাতে আমার নাজাতের ওসিলা বানান।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

জুন ২০২৩

(farooqm59@yahoo.com).

সূচি

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়া, আইন এবং কুরআন: আইনসর্বস্বতা বনাম মূল্যবোধমুখিতা ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আইন এবং হাদিসের ব্যবহার ও অপব্যবহার ২০১

চতুর্থ অধ্যায়

ইজমা-সংক্রান্ত আকিদা: ইজমা (ঐকমত্য) নিয়ে কোনো ইজমা আছে কি? ২৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিধারা) এবং ইসলামী আইনের কিছু সমস্যাপূর্ণ দিক ৩০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ফিকহ (আইন) এবং তার উপেক্ষিত অভিজ্ঞতাজনিত (Empirical) ভিত্তি ৩৮১

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার: আমাদের সংস্কারের পথে ৪৩৫

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) ৪৫৫

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

সেবা, ধারণা (আইডিয়া) অথবা ব্যবস্থা (সিস্টেম), যেকোনো জিনিসের ফলপ্রসূ ব্যবহারকারী হয় তারাই যারা সে ব্যাপারে অবহিত, শিক্ষিত এবং দক্ষ। তাদের থাকে কৌতূহলী মন, যা অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাদির ব্যাপারে জবাব খোঁজে। এরকমটি ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবহিত ও শিক্ষিত নাগরিকদের মানের ব্যাপারে যেমন একটি সমাজের বিশেষ প্রত্যাশা, এমনকি দাবিও থাকতে পারে যা ভিন্ন সমাজে ভিন্ন হতে পারে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও নিজস্ব অনুসারীদের অবহিতি, শিক্ষা ও সচেতনতার ব্যাপারেও বিভিন্ন ধর্মের স্বকীয় প্রত্যাশা বা দাবি থাকতে পারে।

নিজের অনুসারীদের অবহিত, শিক্ষিত, কৌতূহলী, সজাগ ও আলোকিত মানসের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেয়। কুরআন আমাদের পরিষ্কারভাবে শেখায় যে প্রকৃত ইমান জ্ঞান ও অনুধাবনের ভিত্তিতে হতে হবে।

> তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট; সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন:
>
> وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ
>
> আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া আর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।[১৩]

---

১৩ আল-কুরআন (আল ইমরান) ৩:৭

ইসলাম দাবি করে যে, অনুসারী হিসেবে ইমানদাররা যেন নির্বোধ না হয়। জ্ঞান এবং অনুধাবন ছাড়াই যারা নিছক পূর্বপুরুষদের অনুসরণ-অনুকরণ করে তাদের ব্যাপারে ইসলাম আমাদের সতর্ক করে:

> وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ
>
> আর যখন তাদের কেউ বলে যে, সেটারই আনুগত্য করো যা আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনো না; আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যা আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের করতে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।[১৪]

> اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
>
> তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে (আহ্বারাহুম) ও সংসার-বিরাগীগণকে (রুহবানুহুম) তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়াম-তনয় মসিহ্কেও। কিন্তু ওরা এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্[১৫] নেই। তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র![১৬]

জ্ঞানার্জন ও অন্বেষণের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহর (স.) শিক্ষাও সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যেসব বিষয় ফরজ বা অবশ্যকরণীয় হিসেবে গণ্য, তার মধ্যে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষিত হওয়ার সাধনাকে বিশেষ করে ফরজ শব্দটা ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ (তলাবুল ইলম ফারিদাতুন 'আলা কুল্লি মুসলিম)।[১৭]

---

১৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৭০

১৫ মানুষের উপাসনা ও আত্মসমর্পণের যোগ্য।

১৬ আল-কুরআন (আল-তাওবা) ৯:৩১

১৭ Ibn Majah, Kitab al-Muqaddimah/Sunnah, #224, https://www.abuaminaelias.com/ dailyhadithonline/2012/08/30/talab-ilm-wajib-faridah/

তথাপি এটা গভীরভাবে দুঃখজনক যে, মুসলিম সমাজে নিরক্ষরতার হার এত বেশি। তদুপরি, ব্যাপকতর শিক্ষার কথা না হয় বাদই দেয়া হলো। যে দীন ইসলাম অনুসরণ করা এবং যার প্রতি সমগ্র মানবতাকে আহ্বান জানানো মুসলিমদের দায়িত্ব, সেই দীনকে জানা ও বোঝার জন্য যে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রয়োজন তার পরিসরও হয়ে পড়েছে মারাত্মকভাবে সংকীর্ণ। আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্যতম একটি দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, সাধারণত তাদের মধ্যে কৌতূহলী এবং অনুসন্ধানী মানসিকতার বড়ই অভাব। যদিও হক্ব বা প্রকৃত সত্যের সন্ধানে মুসলিমদের মন-মানসিকতা হওয়া উচিত সত্য-সন্ধানী ও কৌতূহলী, অন্ধ অনুকরণের যে সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে এবং সেই যে সংস্কৃতি আমাদের অনেক সনাতনী (traditional) আলেম-ওলামারা আরো শক্তিশালী করেছেন, তা আমাদের অনুসন্ধানী প্রকৃতিকে গভীরভাবে সংকুচিত করেছে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে কুরআন হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর অভিজ্ঞতা থেকে একটি চক্ষু-উন্মীলনকারী দৃষ্টান্ত পেশ করে। একজন নবি হওয়া মানে এ নয় যে, সে আল্লাহর কাছে জানার আগ্রহে কোনো কৌতূহলী প্রশ্ন করতে পারে না, আর যখন ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কেউ যদি আল্লাহর সামনে সেরকম কোনো প্রশ্ন রাখে, আল্লাহও সে প্রশ্নের ব্যাপারে নারাজ হন না। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে নবি হওয়ার পর হযরত ইব্রাহীমের (আ.) সাথে আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ সংলাপ পেশ করা হয়েছে:

> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> দেখ, ইব্রাহিম বলল, 'আমার রব্ব! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবন দান করো।' তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কি বিশ্বাস করো না?' সে বলল, 'হ্যাঁ (আমি অবশ্যই করি), তবে এটা আমার অনুধাবনের জন্য, বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করার

১৮ Farooq, 2000; AbuSulayman, 1993; Hathout, 1995.

> জন্য।' তিনি বললেন, 'তাহলে চারটি পাখি নাও, তাদের পোষ মানাও তোমার কাছে ফিরে আসতে; তাদের একেকটি অংশ একেক পাহাড়ে রেখে এসো; তারপর তাদের ডাক দাও তোমার কাছে ফিরে আসতে। দেখবে যে কেমন করে (উড়ে) দ্রুতগতিতে সেগুলো তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তবে জানো যে আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, জ্ঞানী।"[১৯]

লক্ষণীয়, আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের কৌতূহলে নারাজ হননি, বরং তিনি ইব্রাহিমকে (আ.) তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়তা করেন। সত্যের সন্ধানে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের প্রয়াসে এটাই অনুসন্ধিৎসার ইসলামী বুনিয়াদ। সত্যের যথার্থ অনুসন্ধান কোনো কিছুকে নিছক মেনে নেয়ার মাধ্যমে হয় না। বরং সেজন্য প্রয়োজন জানা, বোঝা ও যেখানে প্রযোজ্য সেখানে যাচাই বা প্রতিপন্ন (verify) করা- এটাই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারও সারকথা। এ পথে বা প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহের উদয় হওয়াটা স্বাভাবিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রত্যয় (ইয়াকীন)-এর ওপর এমনভাবে একচেটিয়া বা অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে সত্যসন্ধানী মুসলিম মানসেও যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদয় হতে পারে এ কথাটা না অনেকে বোঝেন; না স্বীকার করেন। সাধারণত 'সন্দেহ' শব্দটিকে দেখা হয় একেবারেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে। কিন্তু এরকম ধারণা নবিজির (স.) শিক্ষার পরিপন্থি, যে ব্যাপারে তার নিজের বাণীই প্রমাণস্বরূপ ।

> রাসুলাল্লাহ (স.) বলেছেন: "সন্দেহের (শাক্ক) শিকার হওয়ার ব্যাপারে আমাদের অধিকার ইব্রাহীমের চেয়েও বেশি, যিনি বলেছিলেন: 'আমার রব্ব! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবন দান করবে।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কি বিশ্বাস করো না?' সে বলল, 'হ্যাঁ (আমি অবশ্যই করি), তবে এটা আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করার জন্য।"[২০]

ইসলামী সভ্যতা তার তুঙ্গে উঠেছিল অন্যদের অন্ধ অনুকরণ অথবা নিজেদের জানা ও বোঝার দায়-দায়িত্ব কিছু বিশেষ মহিমান্বিত ব্যক্তিদের কাঁধে তুলে

---

১৯ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৬০।

২০ Al-Bukhari, Vol. 6, Kitab at-Tafsir, #61, https://sunnah.com/bukhari:4537.

দেবার মাধ্যমে নয়। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণোজ্জ্বল শতাব্দীগুলোতে ওলামা, ফুকাহা, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তারা নিছক অন্ধ অনুকরণকারীর ভূমিকা পালন করেননি। বরং সাধারণভাবে ইসলামী চেতনা ও জাগরণী ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাদের অধিকাংশেরই ছিল অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল মন। সেজন্যই আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখি, ইমাম মালিকের (মৃ. ৭৯৫ খৃ:) কাছে ইমাম শাফেয়ী (মৃ. ৮২০ খৃ:) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ভালো ও স্নেহভাজন ছাত্র, আর ইমাম শাফেয়ীর কাছে ইমাম মালিক ছিলেন সবচেয়ে ভালো ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক।[২১] তবু ইমাম শাফেয়ী ইসলামী আইন ও উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে নতুন ধারা খুঁজতে ও প্রতিষ্ঠা করতে আদৌ দ্বিধাবোধ করেননি।

তারপরেও দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যদিও আমাদের সম্মানিত ওলামা ও ফুকাহা অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন তুলতে নিজেদের বাধাগ্রস্ত অনুভব করেননি, সময়ের ব্যবধানে তারা ক্রমাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-ভাবনার গণ্ডির মধ্যে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকেন, যে প্রবণতা সীমাবদ্ধ পদ্ধতিগত (methodological) কাঠামোর কারণে আরো প্রকট হয়। শিক্ষিত মুসলিমদের অনেকেই জানে যে ইসলামী আইনের বুনিয়াদি উৎস হচ্ছে চারটি: কুরআন, সুন্নাহ/হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি)। এই বুনিয়াদি উৎসগুলোর ওপর ভিত্তি করে যে পদ্ধতিগত উপকরণ সম্ভারের (toolbox) সীমাবদ্ধতা, বিশেষ করে যেমনভাবে তা ঐতিহ্যগতভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা নিয়ে বিশদ পর্যায়ে পর্যালোচনা করা এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য।

সুবিচার, আইনের অনুশাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ, তাছাড়া অন্যান্য আরো কিছু নিয়ামকের ভিত্তিতে, ইসলামী সভ্যতা মানবতাকে জীবনের প্রায় সামগ্রিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয় ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময় ধরে। তারপর বিবিধ কারণে, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের দুটোই রয়েছে, ইসলামী সভ্যতার অবনতি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এক কঠিন প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি সংঘর্ষের পরিবেশে, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাধান্য অর্জন করে। ইতিহাসের এ

---

২১ https://muslimcentral.com/abdullah-hakim-quick-miracles-quran-al-andalus/.

পর্যায়ে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো বাকি দুনিয়াকে উপনিবেশ বানানোর নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে, যখন পশ্চিমা আইন ও বিধিমালা (codes) ইসলামী আইন-বিধিমালাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর স্থলাভিষিক্ত হয়। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটে ও আন্দোলনের সূচনা হয়, মুসলিম আত্ম-পরিচিতি ও পুনর্জাগরণের স্পৃহা দানা বেঁধে ওঠে যাতে ইসলাম আবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। দুঃখজনক যে, এই পুনর্জাগরণী স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে অপ্রতুল প্রমাণিত হয় এবং একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সেকুলার অংশের মধ্যে, তেমনি অন্যদিকে ধর্মীয় অংশের সংস্কারবাদী ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান ও বিবাদ সৃষ্টি করে।

আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামীক ইউনির্ভাসিটি মালয়েশিয়ার সাবেক রেক্টর এবং বেশ কয়েকটি মূল্যবান ও বহুল-প্রশংসিত গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁর গ্রন্থ Crisis of the Muslim Mind-তে মুসলিম বিশ্বের দুঃখজনক অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন:

> এ ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে উম্মাহ একটি মারাত্মকভাবে কঠিন দুর্যোগের অধ্যায় অতিক্রম করছে; এ অধ্যায়টি হচ্ছে বিভেদ-প্রবণতা ও বিভক্তির, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ব্যর্থতার এবং বর্তমান হতভম্ব অবস্থা (state of bewilderment) থেকে উত্তরণে অক্ষমতার।[২২]

শরিয়া, যা 'ইসলামী আইন' হিসেবে সাধারণভাবে ভুল বোঝা ও ব্যাখ্যার শিকার, সেই শরিয়ার প্রতিষ্ঠা, প্রচলন বা বাস্তবায়নের জোশ এই হতভম্ব অবস্থাকে আরো প্রকট করেছে। এমনকি যে সমস্ত দেশে ধর্মীয় আইন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নেই, সে দেশগুলোতেও সাধারণ সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশ আপামর জনসাধারণের মন-মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব রেখেছে।

তবে এটা এখন বহুল-স্বীকৃত, মুসলিমদের মাঝেও, যে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা (চ্যালেঞ্জ)-এর সম্মুখীন এই উম্মাহ, সেগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যবাহী (traditional) ইসলামী আইনের ভান্ডার, অনেক ক্ষেত্রেই না একইভাবে প্রাসঙ্গিক আর না প্রয়োগযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্বকে দারুল ইসলাম (ইসলামের আবাস) আর দারুল কুফর (কুফরের আবাস) হিসেবে দুই প্রান্তিক ভাগে ভাগ করার ধারণা ও প্রবণতা যেসব সমাজ এখন নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর

---

২২ AbuSulayman, 1993, p. ix.

বৈচিত্র্যময় বহুত্বের অধিকারী (multicultural) সেসব সমাজে প্রয়োগযোগ্য নয়। তাছাড়া, যা এখন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় এস্টাব্লিশমেন্ট-ও বহুলাংশে মেনে নিয়েছে, সেই নাগরিকত্বের ধারণা প্রচলিত ইসলামী আইনে ইসলামী সমাজে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে অমুসলিমদের অধিকারের সাথে সংঘাতপূর্ণ। আরো রয়েছে প্রচলিত ইসলামী আইনের অনেক দিক, যেমন মুরতাদের শাস্তি অথবা একসাথে তিন তালাক – যা শুধু আধুনিক সময়ের সাথেই সংঘাতপূর্ণ নয়, বরং ইসলামের মহান মূল্যবোধসমূহেরও বিরোধী। এ ধরনের অনেক আইন এবং তার সাথে আইনি বা আইনসর্বস্ব (legalistic) প্রবণতা ইসলামের মুক্তিদায়ক (liberating) ভাবধারাকে মৌলিকভাবে খর্ব করেছে।

> এটা সত্য, ইসলাম তার সুমহান ধারায় রাসুলুল্লাহ (স.) ও তার সাহাবিরা যেভাবে প্রচার ও অনুশীলন করেছেন তা নিঃসন্দেহে ছিল মুক্তিদায়ক। কিন্তু সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ অথবা শ্রেণি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা (চ্যালেঞ্জ)-এর সমাধান বা দিকনির্দেশনা দিতে আজকের 'ইসলাম' অপারগ।[২৩]

মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও জানা-বোঝা যত বাড়ছে, তাদের অনেকের মাঝেই আত্মসমালোচনার চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবার ক্ষেত্রেই নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য আত্মসমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। এটা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও সত্য। তাওবার মহান ধারণার পেছনেও ইসলাম ধরে নেয় আত্মসমালোচনামুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার উপস্থিতির কথা:

> التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
>
> তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা, অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদের তুমি শুভ সংবাদ দাও।[২৪]

---

২৩ Mumisa, p. 44.

২৪ আল-কুরআন (আত-তাওবা) ৯:১১২।

সমাজে ক্রমাগতভাবে অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতা ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যমুখিতা যত বাড়ে, তত বাড়ে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নেই। তার প্রিয় উম্মাহ্‌র মধ্যে অনুকরণ-প্রবণতার ব্যাপারে নবিজি (স.) সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে গেছেন:

> আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ও সম্প্রদায়ের রীতিনীতিকে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে (হুবহু) অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কথা বলছেন? তিনি বললেন: তবে আর কারা?[২৫]

এজন্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, অধিকাংশ মুসলিম যা করে এবং যা বিশ্বাস করে তা ইসলামের দু'টি বুনিয়াদি উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) - এমনকি সংশ্লিষ্ট অপর দু'টি উৎস (ইজমা ও কিয়াস) থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন ও অনুধাবনের ভিত্তিতে নয়, বরং তারা বংশপরম্পরায় অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। এ সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে কারণ, ইসলাম যদিও অনুসন্ধিৎসু ও অবহিত (informed) মন-মানসিকতার ওপর জোর দেয়, রক্ষণশীল পরিবেশ ও ভাবধারা গুরুত্ব দিয়ে এসেছে প্রশ্নহীন আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর।[২৬]

---

২৫ Muslim, Vol. 4,Kitab al-Ilm, #6448, https://sunnah.com/muslim:2669a; Al-Bukhari, Vol. 4, #662 and Vol. 6, Kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, #422, https://sunnah.com/bukhari:7320.

২৬ প্রশ্নহীনভাবে আনুগত্য-অনুসরণের ব্যাপারে উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ শুধু সঠিক জ্ঞানের আলোকে আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, সামাজিক বিষয়াদি বা মুয়ামালাত-এর ব্যাপারে নয়। ইমান এনে মুসলিম হওয়ার পর কেন একজন মুসলিমকে চার বা ছয় বার নয়, বরং পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে, অথবা কেন সিজদা করতে হবে রুকুতে যাবার পর, আগে নয়, অথবা কেন ফজর ওয়াক্তের ফরজ নামাজ শুধু দুই রাকাত, অথচ আসরের ফরজ নামাজ চার রাকাত ইত্যাদি প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কেননা আল্লাহ তায়ালা এসব বিস্তারিত অথবা নির্দিষ্ট কোনো হিকমত সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি আর সেজন্যই আল্লাহ্‌র নামে বা তার পক্ষ থেকে কোনো হিকমত (কারণ বা ব্যাখ্যা) সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার অবকাশ নেই। আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং সামাজিক বিষয়াদির পেছনে আসমানি কোনো হিকমত নির্ধারণের ব্যাপারে আল-শাতিবীর দৃষ্টিতে:

স্বাধীন চিত্তের মুসলিম সব প্রজন্মেই কিছু কিছু ছিল, এবং বর্তমান প্রজন্মে আমাদের তরুণ বয়স থেকেই অনেকে সেই স্বাধীন চিত্তের মর্ম ও মর্যাদা উপলব্ধি করে যখনই তাদের মধ্যে ইব্রাহীমি চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, তখন থেকে তাদের মধ্যে নিছক মুখস্ত করার মাধ্যমে অথবা অনুকরণমুখী জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে উন্মুক্ত ও গতিশীল ইসলামী মন-মানসিকতাসমৃদ্ধ জ্ঞানার্জন ও অনুধাবনের চেতনা ও প্রয়াস বেড়েছে। যাতে করে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, স্বাধীনচেতা হওয়ার মানে এই নয় যে, অতীতের যা-কিছু অবদান অথবা অতীতের মনীষীদের ব্যাপারে অসম্মানের মনোভাব রাখা।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আইনি, ধর্মশাস্ত্রীয়, বৈজ্ঞানিক– জীবনের বিবিধ দিকগুলোকে ভালোভাবে অধ্যয়ন (explore) ও অনুধাবনের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের সাথে অনলাইন-সংলাপ ও মতবিনিময় বেশ উপকারি। বিভিন্ন স্তরের মুসলিমদের সাথে এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময়ে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের বুনিয়াদি উৎসগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ও মৌলিক ধারণা ছাড়া ইসলামকে যেভাবে বোঝা প্রয়োজন তা সম্ভব নয়। যেহেতু শরিয়ার

'আসমানি প্রজ্ঞা' নিরুপণ করা হয় সেসব জিনিসের ব্যাখ্যা করার জন্য যার অর্থ বা উদ্দেশ্য অনুধাবনযোগ্য নয়, বিশেষ করে উপাসনাসংক্রান্ত কার্যাদি – যেমন, অজু করার সময় দেহের বিশেষ কিছু অংশই ধুতে হয়, কিন্তু অন্যগুলো নয়; নামাজ আদায় করতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে (যেমন, হাত ওপরে ওঠানো, কিছুক্ষণ দাঁড়ানো, রুকু ও সিজদা করা ইত্যাদি) এবং ইচ্ছামাফিক বা অন্য পদ্ধতিতে নয়; রোজা রাখতে হয় দিনে, রাতে নয়, এবং অন্য সময়ে নয়; ফরজ নামাজ দিনরাত্রির বিশেষ ওয়াক্তে আদায় করতে হয়, এবং অন্য সময় নয়; হজের সময় বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া আবশ্যিকভাবে সমাপন করতে হয় এবং অন্য কিছু নয়; সেই সাথে হজের সমাপ্তি বিশেষ মসজিদে গমনের সাথে জড়িত এবং অন্য মসজিদের সাথে নয়। ইবাদত-উপাসনার এ রকম আরো অনেক দিক আছে যেগুলোর অন্তর্নিহিত কারণ বা উদ্দেশ্য না বোঝা যায় আর না নিরুপণ করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট আসমানি প্রজ্ঞা আরোপ করে দাবি করে আবশ্যিক বিষয়াদির ব্যাপারে যেন তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। প্রকৃতপক্ষে, এসব দাবি নিছক আন্দাজ-অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার সাথে বাস্তবতার কোনো যোগ নেই এবং যার কোনো ভিত্তি নেই ..." [Al-Raysuni, pp. 173-174, D×...Z Al-Shatibi, Muwafaqat (১), পৃঃ ৮০]

তবে সামাজিক বিষয়াদি একেবারেই ভিন্ন, কেননা সেগুলো আমাদের বুঝতে হবে এবং এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে উচ্চতর লক্ষ্য (মাকাসিদ)-এর দিক থেকে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা আমাদের উপলব্ধি উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন করার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি মুসলিম সমাজে বিভক্তি আরো প্রকট করেছে এবং যেহেতু শরিয়াকে সাধারণত ইসলামী আইনের পূর্ণ সমার্থক হিসেবে ভুল বোঝাবুঝি ব্যাপকভাবে রয়েছে, প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য ইসলামের বুনিয়াদি উৎসগুলো সম্পর্কে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা অধিকতর জরুরি হয়ে পড়েছে।

দুঃখজনক যে, এই বিষয়বস্তুর ওপর যেসব গবেষণামূলক বা পাণ্ডিত্যময় (scholarly) গ্রন্থাদি আছে তার অধিকাংশই সুদীর্ঘ এবং উচ্চতর পর্যায়ের, যেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়ে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ বেশির ভাগ মুসলিমেরই নেই। এসব রেফারেন্স পর্যায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মুহাম্মদ হাশিম কামালীর Principles of Islamic Jurisprudence। গ্রন্থকার হচ্ছেন মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামীক ইউনিভার্সিটির বর্তমানের একজন নামকরা পণ্ডিত ও অ্যাকাডেমিক।[২৭] সিরিয়াস পাঠকদের জন্য তার গ্রন্থটি বেশ ব্যাপক (comprehensive) ও গবেষণাসমৃদ্ধ। তবে সেইসব পাঠক যাদের অ্যাকাডেমিক আগ্রহ রয়েছে তাদের ছাড়া বেশির ভাগ মুসলিমই হয়তো এরকম মূল্যবান অথচ উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে উদ্যোগী হবে না বা ধৈর্য রাখে না।

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ আকরাম লালদীনের Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence[28], কিন্তু গ্রন্থ হিসেবে তা খুব গভীর নয়। মুহাম্মদ ইউসুফ গুরায়ার Islamic Jurisprudence in the Modern World বেশ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, কিন্তু অন্য মাযহাবের ব্যাপারে কোনো রকম স্বীকৃতি বা ব্যাখ্যা ছাড়াই শুধুমাত্র মালিকী ফিক্‌হ নিয়ে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে ভরপুর।[২৯] আনোয়ার আহমদ কাদরীর Islamic Jurisprudence in the Modern World আরেকটি বর্ণনাত্মক (descriptive) কাজ।[৩০]

ইমরান আহসান খান নিয়াজী একজন প্রথিতযশা সমসাময়িক পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থ Islamic Jurisprudence (উসূল আল-ফিক্‌হ) একটি উল্লেখযোগ্য

২৭ Kamali, 2003.

২৮ Laldin, 2006.

২৯ Guraya, 1993.

৩০ Qadri, 1963.

পাঠ্যপুস্তক।[৩১] তবে দুঃখজনক যে এটাও একটি বর্ণনাত্মক গ্রন্থ, বিশ্লেষণধর্মী নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবেও মূল্যায়নের দৃষ্টিতে কোনো সমালোচনামূলক দিক অনুপস্থিত, সাধারণ পাঠকদের জন্য তো নয়ই, এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যও নয়। উসূলে ফিক্‌হ-এর বিভিন্ন সমস্যা এবং ইসলামী আইনের সাথে সমসাময়িক বাস্তবতার সংযোগ সামগ্রিকভাবে কেমন করে বিচ্যুত হয়ে পড়ল সে ব্যাপারে যথাযথ কোনো আলোকপাত বা আভাস সেখানে অনুপস্থিত।

মাইকেল মুমিসার Islamic Law: Theory and Interpretation[৩২] একটি সুলিখিত গ্রন্থ, যাতে ইসলামী আইন ও উসূল প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক অনেক মূল্যায়নমুখী (evaluative) দিক রয়েছে। সেজন্য এ গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকদের তালিকায় থাকা উচিত। তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকটা হঠাৎ করেই পুরো জিনিসটা লিবারেশন থিওলজির কাঠামোতে পেশ করাটা অনেক পাঠকের কাছেই অসংলগ্ন মনে হতে পারে। এটা স্পষ্ট নয় যে লিবারেশন থিওলজির[৩৩] প্রবক্তা হিসেবে তার কাঠামো ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে তার গ্রন্থের ব্যাপারে পাঠকদের জন্য প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়েছে না তা পাঠকদের জন্য বিভ্রান্তির উদ্রেক করবে। সার্বিকভাবে কামালীর গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক পাঠ্যপুস্তক, এটা বহুলস্বীকৃত। তবে কামালীর গ্রন্থটিতে মূল্যায়নী বিশ্লেষণ থাকলেও, তা অপ্রতুল। মুমিসার গ্রন্থ ছাড়া বাকি আর কোনো গ্রন্থেই ইসলামী আইনের পর্যাপ্ত মূল্যায়নী বিশ্লেষণ, বিশেষ করে যে বিশ্লেষণ কোনো সমস্যামূলক দিক বা দুর্বলতা তুলে ধরতে পারে, তা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। তাছাড়া, কামালী ও মুমিসার গ্রন্থ দু'টিসহ যে গ্রন্থগুলো এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলোই পাঠমুখী বা পাঠনির্ভর (text-oriented), যা একটা বড় সমস্যা– এ বিষয় নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে পাঁচটি মূল অধ্যায় রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি শরিয়া নিয়ে। এ অধ্যায়ে শরিয়া নিয়ে ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তি এবং তা নিয়ে আইনসর্বস্বতা (legalism)

---

৩১ Nyazee, 2000.

৩২ Mumisa, 2002.

৩৩ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উদ্ভূত প্রগতিশীল খ্রিষ্টান মতবাদ যেটার মূল লক্ষ্য সমাজের সকলকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত করা। দেখুন, Berryman, 2014.

বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়টির শেষে মূল্যবোধমুখিতা (value-orientation) এবং তার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়টির উপজীব্য হচ্ছে হাদিস, যেখানে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ও প্রমাণাদি সহকারে ইসলামী আইন নিরূপণ (derivation) ও রচনায় হাদিসের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইজমা, যেখানে আলোচিত হয়েছে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইজমার দাবি প্রশ্নসাপেক্ষ, অথবা অপ্রযোজ্য। এর অন্যতম কারণ এই যে, ইজমা সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়েই কোনো ইজমা বা মতৈক্যের অভাব। পঞ্চম অধ্যায় কিয়াসের ওপর, যেখানে বেশ কিছু ধারণাগত (conceptual) সমস্যা এবং ইসলামী আইনে এই বুনিয়াদি প্রক্রিয়া (tool)-এর ভুল অথবা অপপ্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগ জাগ্রত করার মতো দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের একটি মৌলিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে– এ দিকটি হচ্ছে নিরীক্ষণমূলক (empirical) ভিত্তির অভাব, একটি মৌলিক সমস্যা বা দুর্বলতা যা এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে অনেক মুসলিম লেখক বা স্কলারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

এ গ্রন্থটি ইসলামী ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের একজন অবিশেষজ্ঞের নিজস্ব অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। তবে একজন সমাজবিজ্ঞানী এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইসলামী ফিকহ ও উসূলের ফিকহের সাথে গভীর অধ্যয়ন থেকেই এই গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন এবং তাগিদ এই লেখক অনুভব করে। আর এখানে যা কিছুই পেশ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ এবং বিশারদদের লেখনী থেকে যথাযথ ও ব্যাপকভাবে প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদিসহই করা হয়েছে। নিজেদের জ্ঞানের ও অনুধাবনের দিগন্তের প্রসারে অবিশেষজ্ঞরাও যে কতদূর অগ্রসর হতে পারেন এ গ্রন্থ হয়তো সে সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত। অনুসন্ধিৎসু চেতনা ও ধারা (approach) কেমন করে গঠনমূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় এ গ্রন্থ তারও দৃষ্টান্তস্বরূপ। এটি অতীত-সমৃদ্ধ (past-enriched) একটি দৃষ্টিভঙ্গি (perspective) যা অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে যেমন সম্মানসুলভ মনোভাব রাখে, তেমনি আমাদের আরো শ্রেয়তর ভবিষ্যৎ রচনার লক্ষ্যে নতুন সংলাপ-আলোচনার সূচনা করতেও প্রয়াসী।

এ বইটি মুখ্যত সাধারণ, অবিশেষজ্ঞ মুসলিমদের ক্ষমতায়নের জন্য যাতে করে বিবিধ সমস্যা ও বিষয় যা তাদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা যাতে যথাযথ ও ভালোভাবে বুঝতে পারে। সেইসাথে কেমন করে মানবতার সেবায় মুসলিম উম্মাহ্‌র উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে আমরা কুরআনসহ নবিজির (স.) সুন্নাহর সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারি তাও এ গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য দিক। এ রকম আগ্রহী পাঠকদের জন্য যেমন করে আবুসুলায়মান বলেছেন: "কোনো কিছুরই পরিবর্তন হবে না, যদি না সবকিছুর আগে আমরা আমাদের চিন্তার ধারাকে পরিবর্তন না করি।"[৩৪] তার মন্তব্যের সুরেই এই লেখক বিনীতভাবে মনে করে যে উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ততক্ষণ আশা করা দুরুহ যতক্ষণ না প্রথমে ইসলামের বুনিয়াদি উৎসগুলোর ব্যাপারে আমাদের ধারণা ও অনুধাবনের পরিবর্তন ঘটে।

এই গ্রন্থকার দৃঢ়বিশ্বাসী যে, পাঠকরা যদি ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত মন নিয়ে এবং ধৈর্য সহকারে এ গ্রন্থ পড়েন তাহলে তা তাদের চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করতে, আরো অনুসন্ধিৎসা জাগাতে এবং তার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে। এই গ্রন্থের পেছনে একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা (theme) এই যে, ইসলামের মৌলিক উৎস দু'টি: কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহ (জীবন ও ঐতিহ্য)। আমাদের মহান ও সুযোগ্য ধার্মিক মনীষীদের মতামত, চিন্তাভাবনা এবং তাদের অবদানের ব্যাপারে মুসলিমরা অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাঁদের মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক অবদান থেকে উপকৃত হবে। কিন্তু যদি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এবং অনুশীলনে নতুন (fresh) চিন্তা-ভাবনা ও সমাধানের সত্যিই প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের আগের প্রজন্মের মনীষীদের আক্ষরিক অনুকরণ না করে ইসলামের কালোত্তীর্ণ শিক্ষা ও বাণীকে সমসাময়িক সময়ে বাস্তবায়ন যেভাবে কার্যকর হবে সেভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত। এটা সঠিক ও প্রযোজ্য যতক্ষণ আমরা কুরআন ও নবিজির সুন্নাহ থেকে সরাসরি পথ নির্দেশনা খুঁজি।

ড. মোহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, একজন পথিকৃৎ, সব্যসাচী ইসলামী অর্থনীতিবিদ, যিনি এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে

---

৩৪ AbuSulayman, 1993, p. xvi.

প্রাসঙ্গিক এই একই ইসলামী ভাবধারা পোষণ করেন। প্রায় কয়েক দশক ধরে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর ক্ষেত্রে অবদান রাখার পর, তার উপলব্ধিও অভিন্ন যে আমাদের পুঞ্জীভূত আইনভাণ্ডারের ক্ষেত্রে ইসলামের মাকাসিদ বা উচ্চতর লক্ষ্য থেকে মারাত্মকভাবে বিচ্যুতি হয়েছে। তাই তিনিও ইসলামের মূল দু'টি উৎস, কুরআন ও নবিজির (স.) সুন্নাহর সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে এবং মাকাসিদ-এর সাথে আমাদের যোগসূত্র নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে উদাত্ত আহ্বান রেখে আসছেন। তার এবং এই লেখকের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সসংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু মৌলিক মতদ্বৈধতা থাকলেও, কুরআন ও নবিজির সুন্নাহর সাথে সরাসরি যোগসূত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আলোকিত হওয়ার জন্য মূল্যবান। নতুন প্রজন্মের প্রতি তার আমন্ত্রণ অবশ্যই সম্মানার্হ:

> মৌলিক উৎসগুলো থেকে সরাসরি হেদায়েত খুঁজতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে উৎসাহিত করা, আমরা নতুন যে অবস্থার সম্মুখীন এটা তার দাবি। ইতিহাসে আমরা এমন এক অধ্যায়ে আছি অতীতে যার সাথে কোনো তুলনা নেই। মানবীয় যোগ্যতার মুক্তচর্চা সময়ের দাবি। পবিত্র গ্রন্থগুলোর মুক্ত অধ্যয়নও অপরিহার্য। নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক পথনির্দেশনার জন্য এ দু'টি জিনিসই মৌলিকভাবে প্রয়োজন: আল্লাহর কিতাব এবং চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও মননে মানুষ হিসেবে আমাদের সক্ষমতা। ... আমাদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দানকারীদের যারা আপামর জনসাধারণকে এ দু'টি উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে বা করে রাখতে চান এবং এ দু'টি সূত্রের ওপর নিজেদের একচ্ছত্র দাবি করতে চান, এতে তারা যে ভুল করেন তা গুরুতর। আল্লাহর ব্যাখ্যাকারী মুখপাত্র হওয়ার ভূমিকাটি একচেটিয়া বানিয়ে নেবার কোনো আসমানি সনদপত্র তাদের নেই।[৩৫]

৩৫ Siddiqi, 2005. "Relevance And Need For Understanding The Essence Of Religious Traditions In The Contemporary World," Paper presented at the International Seminar on Inter-Civilizational Dialogue in a Globalizing World, Institute of Objective Studies, New Delhi, 8-10 April 2005, Retrieved May 8, 2006, from Siddiqi Web site: http://www.siddiqi.com/mns/Relevance_April2005_Delhi.htm.

এই মুক্ত কিন্তু গঠনমূলক ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সম্মানিত পাঠকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌সংক্রান্ত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানে যোগ দিতে। এ বিষয়গুলো মানবতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কুরআন অনুযায়ী এই উম্মাহ্‌র উদ্ভবই বিশ্বমানবতার জন্য।[৩৬] পাঠকদের কাছে এটাও সবিশেষ অনুরোধ যে কোনো কোনো অংশ পীড়াদায়ক (painful) হলেও, এ বইটি শেষ না করা পর্যন্ত এবং এটাকে আবেগমুক্ত হয়ে একবার পঠনের আগে কোনো রায় দেয়া থেকে বিরত থাকা কাম্য হবে।

যেমনটি সিদ্দীকী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এ গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ কষ্টকর (painful) হতে পারে, আর তাই দুর্বলচিত্তদের জন্য উপযোগী নাও হতে পারে। তবে সেই অংশগুলোর কারণ এটা নয় যে, এই গ্রন্থকার তার নির্দয় কল্পনার তুলিতে একটি নেতিবাচক চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। বরং এ গ্রন্থের একটি লক্ষ্য আমাদের বাস্তবতার যে বিশ্ব তার আয়না হিসেবে ভূমিকা পালন করা এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলো গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা যেগুলোর সম্মুখীন আমরা এবং যেগুলোর সমাধান আমাদের করতে হবে। এটা এই গ্রন্থকারের বিশেষ প্রত্যাশা যে, এ গ্রন্থকে নিছক সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ অথবা অপবাদমুখী হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না, কারণ এটি লেখা আত্মসমালোচনার চেতনায়। আমাদের উম্মাহ্‌র একজন সজীব ও সক্রিয় অংশ হিসেবে উম্মাহ্‌র আনন্দ, স্বপ্ন, সাফল্য ও আশাবাদিতায় এই গ্রন্থকারের যেমন ভাগ রয়েছে, তেমনি ভাগ রয়েছে এই উম্মাহ্‌র দুঃখ-দুর্দশা, ব্যর্থতা ও স্থবিরতা (stagnation)-এও। বিচারমুখিতা (judgmentalism) এড়ানোর জন্য এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা সমীচীন হবে না। তবে, কোনো ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা অথবা ব্যর্থতা আমাদের শিক্ষা অর্জনের চেতনা নিয়ে দেখতে হবে এবং জ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের সামগ্রিক অবদান ও তাদের মহান ও দৃষ্টান্তমূলক ধার্মিক জীবন বিবেচনা না করে কাউকে নিছক তাদের কোন কোন দুর্বলতা অথবা ব্যর্থতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করাটা সুবিচারের কাজ হবে না।

---

৩৬ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৩:১১০।

আমাদের ওলামা ও ফুকাহা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মহান উম্মাহ ও তার বিবেকের সাহসী রক্ষী ছিলেন।

> অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় আলেম, বিশেষ করে চারটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার ভাগ্যে ছিল নিপীড়ন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সমসাময়িক শাসক যে ইসলামের প্রতি যথার্থভাবে নিষ্ঠ ছিল না তার শাসনাধীনে কাজী হতে অস্বীকার করায় ইমাম আবু হানিফাকে (মৃ. ৭৬৭ খ্রিঃ) কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। চাপের মুখে দেয়া তালাক বৈধ নয়, এই রায় দেয়ার কারণে ইমাম মালিক (মৃ. ৭৯৫ খ্রিঃ) এমন নির্মমভাবে প্রহৃত হন যে তাঁর হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর অপকর্ম ও রাজনৈতিক দূরাকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করার জন্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে (মৃ. ৮৫৫ খ্রিঃ) অনেক প্রতিকূলতা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আর বাগদাদের ক্ষমতাসীনদের থেকে বাঁচতে ইমাম শাফেয়ীকে (মৃ. ৮২০ খ্রিঃ) মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, মিসরে আশ্রয় নিতে হয়।[৩৭]

এ গ্রন্থটিতে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তা ঐ তর্কবিতর্ক (polemics)-এর দিক থেকে বিষয়গুলোর গুরুত্বের জন্য নয়। বরং, মুসলিম বিশ্ব যেসব বাস্তব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন– দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিরক্ষরতা, অস্থিতিশীলতা, স্বৈরাচার, শোষণ, অবিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সহিংসতা, মানবাধিকারের লঙ্ঘন, নারী অধিকারের দৈন্য, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, পাশ্চাত্য-নির্ভরতা ইত্যাদি সমস্যারাজি একটি সুখপ্রদ সমাজের জন্য অনুকূল নয়। মু'মিনরা যে একে অপরের জন্য আয়নাস্বরূপ সেটা মুসলিম হিসেবে আমাদের জানার কথা। এই গ্রন্থকার আশা পোষণ করে যে, সেই চেতনা নিয়েই পাঠকরা সামনের অধ্যায়গুলো পড়তে অগ্রসর হবেন।

প্রসঙ্গত এ গ্রন্থের শুরুর দিকেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহ্‌র ইসলাহ (সংস্কার)-কে সামনে রেখে এই বইয়ের মূল ফোকাস হচ্ছে ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্র। তাঁর মানে এই নয় যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান

৩৭ AbuSulayman, 1993, pp. 25-26 [পূর্বোক্ত, সঙ্গতিপূর্ণতার জন্য, তারিখ উল্লেখের রীতি পরিবর্তন করা হয়েছে]।

অবস্থার জন্য শুধুমাত্র আইন আর আইনশাস্ত্রই দায়ী আর আমাদের সংস্কারের জন্য এই একটি দিকেই সংস্কার প্রয়োজন। বরং, আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ বা নিয়ামক বহুবিধ এবং জটিল, আর তাঁর সংস্কারের জন্যও প্রয়োজন সব প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণ। তবে আইন এবং আইনশাস্ত্র আমাদের মন-মানসিকতার প্রতিফলনই নয়, বরং তা আমাদের মন-মানসিকতা গড়তে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। আর সে কারণেই অনেক দিক নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হলেও, এই বইতে ফোকাসটি আইন এবং আইনশাস্ত্রের ওপর।

> রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "মুমিনরা একে অপরের জন্য আয়নাস্বরূপ, এবং একজন মুমিন আরেক মুমিনের ভ্রাতা, যে তার ভাইয়ের কোনো ক্ষতির ব্যাপারে পাহারা দেয় এবং তার অনুপস্থিতিতে তার হয়ে হেফাজত করে।"[৩৮]

Toward Our Reformation, এই বইটিতে আয়না হিসেবে আমাদের মুখের সামনে যা-ই প্রতিফলিত হয়, সে প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন:

ক) আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে মানুষ হিসেবে আমাদের গভীর সম্ভাবনা রয়েছে এবং কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে পরিবর্তনের জন্য আমাদের নিজেদের জীবন থেকে শুরু করে আমাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হবে:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[৩৯]

খ) কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহ-তে যে সুষম পথনির্দেশনা আছে তাতে সমৃদ্ধ হয়ে, যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা তার মোকাবেলা করতে হবে।

---

৩৮ Abu Dawud, Vol. 3, Kitab al-Adab, #4900, https://sunnah.com/abudawud:4918.

৩৯ আল-কুরআন (আর-রা'দ) ১৩:১১।

গ) এই বিশ্বে ইতিবাচক অবদানের লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে, সেই ইসলাহ (উন্নতি, সংস্কার)-এর চেতনা নিয়ে যেমন করে নবি শোয়াইব (আ:) তার কওম-কে বলেছিলেন:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"ও আমার কওম! ... আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের ইসলাহ্-ই শুধু আমার কাম্য; আর আমার সাফল্য তো আসতে পারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে; আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই ফিরি।"[৪০]

---

৪০ আল-কুরআন (হুদ) ১১:৮৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়া, আইন এবং কুরআন: আইনসর্বস্বতা বনাম মূল্যবোধমুখিতা

১. অবতরণিকা

একটি নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলাম ও নবিজি মোহাম্মদ (স.)-এর অসামান্য সাফল্যে ঐতিহাসিকরা প্রায়শই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ঐ নতুন সমাজটি অসম্ভব দ্রুত গতিতে সংহতি লাভ করে এবং ইতিহাসের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসেবে বিকশিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্যটি একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক এভাবে মূল্যায়ন করেছেন।[৪১]

> ইসলামের উত্থান মানব ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। এমন একটি অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠী যা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ছিল নগণ্য তাদের মাধ্যমে ইসলাম মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের হাতে সমসাময়িক সাম্রাজ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়, দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো পেছনে পড়ে যায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী (race)-তাদের আত্মাকে নতুন ধাঁচে সাজায় এবং নতুন এক বিশ্ব গড়ে তোলে - ইসলামী বিশ্ব।
>
> আমরা ইসলামের উন্মেষ নিয়ে যত অধ্যয়ন করি তা ততই বিস্ময়কর প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলো ধীরে ধীরে ছড়ায়, অনেক বেদনাদায়ক সংগ্রাম-সাধনার মধ্য দিয়ে এবং অবশেষে সেগুলোর উঁচুতে ওঠে কোনো ক্ষমতাধর রাজাধিরাজ ঐ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে।

---

৪১ A. M. Lothrop Stoddard (১৮৮৩-১৯৫০) ছিলেন একজন হার্ভার্ড-শিক্ষিত ঐতিহাসিক। তার চিন্তা-ভাবনায় কিছুটা বর্ণবাদিতার প্রবণতা ছিল এবং সে ছিল খোলাখুলিভাবেই অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) বিরোধী। তা সত্ত্বেও তাঁর এই ঐতিহাসিক সত্যটি তুলে ধরাটা উল্লেখযোগ্য। আরো জানার জন্য দেখুন: https://en.wikipedia.org/wiki/Lothrop_Stoddard, retrieved May 21, 2007.

> খ্রিষ্টধর্মের ছিল কন্সট্যানটিন, বৌদ্ধবাদের ছিল অশোক এবং যরথ্রুস্তবাদের ছিল সাইরাস, তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দের ধর্মমতের পেছনে তাদের প্রচণ্ড পার্থিব (secular) শক্তি দিয়ে সহায়তা করেন।
>
> ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয়নি। মরুর বুকের একটি বেদুঈন জাতি যা মানব ইতিহাসে ছিল অনুল্লেখযোগ্য, তাদের বিশাল অভিযানের পাল তুলে দিলো ন্যূনতম মানবিক সহায়তা নিয়ে এবং বস্তুগত দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থান নিয়ে। তারপরও যেন অনেকটা অলৌকিকভাবে ইসলাম তুলনামূলকভাবে সহজেই বিজয়ী হলো এবং দু'এক প্রজন্মের মধ্যেই প্রোজ্জ্বল নতুন চাঁদ দেখা গেল পিরেনিস থেকে হিমালয় এবং মধ্য এশিয়া থেকে আফ্রিকার মরুভূমিগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪২]

প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলো থেকে সংঘাতমুখী প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ এই নতুন সমাজকে ভূখণ্ডগত দিক থেকে প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ব্যাপ্তি ও প্রভাবের দিক থেকে দুটো বিশেষ কারণে এই উম্মাহ সাংঘাতিক গতিতে অগ্রসর হয়। প্রথমত, ইসলামের সর্বজনীন বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মুসলিম প্রতিনিধিরা দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের সবদিক ছড়িয়ে পড়াটা আরো সহজ হয় কারণ, রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) আগে এবং তাঁর সময় আরব জাতি মূলত বণিক সম্প্রদায় ছিল এবং সৎ বাণিজ্যকে ইসলাম একটি ভালো সওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করে গুরুত্বারোপ করে। স্থলপথে ও অনেক সাগর পেরিয়ে মুসলিমরা দুনিয়ার অন্যান্য অংশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সব জায়গায় বসতি স্থাপন করে। তাই বাণিজ্য ও ইসলামের দাওয়াত একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা (polity)-র প্রতিষ্ঠা, সংহতি লাভ এবং প্রাধান্য অর্জনের সমান্তরালে বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে নব্য মুসলিমরা এই বহুজাতিক উম্মাহ্‌র অংশ হিসেবে হিজরত করে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সুফল ভোগ করার জন্য। এই বিশ্বজনীন জনগোষ্ঠী, যা জাতিগত দিক থেকে আর আরব ছিল না, তাঁরা দুনিয়ার বিভিন্ন দিক থেকে লোকজনদের আকৃষ্ট করতে থাকে: যেমন, আবিসিনিয়া (বর্তমানে ইথিওপিয়া) থেকে ক্রীতদাস বেলাল, পারস্য থেকে সালমান এবং রোম থেকে শোয়েব।

---

৪২ Lothrop Stoddard, 1921, p. 3.

তারপর অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিভিন্ন কারণে উত্থান-পতনের সিঁড়ি বেয়ে সামনে এগোতে হলেও, ইসলামী রাষ্ট্র (polity) তার বহুজাতিক (pluralistic) চরিত্র বজায় রাখে। স্পেনে মুসলিম শাসনকাল ইসলামের বহুত্ব ও প্রগতিশীল পরিবেশ ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। তিনটি ইব্রাহীমি ধর্মের তিন অন্যতম মনীষী স্পেনের এই মুসলিম শাসনকাল ও পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত: ইবনে রুশদ (ইসলাম), মায়মোনাইড্স (ইহুদিবাদ) এবং টমাস একুইনাস (খ্রিষ্টবাদ)।

> ইবনে রুশ্দ, মায়মোনাইড্স এবং একুইনাস ছিলেন ইসলাম, ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব এবং পারস্পরিক আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যুগে, বিশেষ করে যে সময়টাকে বলা হয় 'মুসলিম স্পেনের স্বর্ণ-যুগ', সভ্যতার মান এবং তার সহিষ্ণু চরিত্রের দিক থেকে তা আজো প্রেরণাদায়ক।[৪৩]

অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামী স্পেন ইউরোপকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ইউরোপিয়ান বিদ্বান ও শিক্ষার্থীরা স্পেনের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আসত, যা পরে রেনেসাঁতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্রমাগতভাবে, সমগ্র ইসলামী সভ্যতার ভাগ্যই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাধান্য লাভ করে। এর ফলে পরবর্তীকালে মুসলিমদের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে সংঘাত বাধে, তাতে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সভ্যতা পতনের পথ ধরে; অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ী হয় এবং আধিপত্য অর্জন করে।

বস্তুত ততক্ষণে মানব সভ্যতার কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এটা এখন আর অস্বাভাবিক নয় যে, সারা দুনিয়া থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিমরা সেখানে অভিবাসী হয় এবং হয়ে চলেছে নতুন জীবনের সন্ধানে, আর তার সমান্তরালে মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অভিবাসন একটি বিরল বিষয়।

---

৪৩ Bender, J. (n.d.), 'Jewish Muslim Christian Symbioses', retrieved October 10, 2006, from AJMA Web site: http://www.ajma.org/Symbiosis/Symbosis.htm. Bender is the President of Reason and Revelation, author of 'Three Wise Men', and a filmmaker. মূল ইংরেজি বইতে দেয়া ওয়েবলিংক আর পাওয়া যাচ্ছে না। একটি বিকল্প লিংক: https://www.twf.org/News/Y2003/1220-WiseMen.html.

ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মুসলিম-অধ্যুষিত বা মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ[৪৪] দেশগুলো শরিয়া প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় যতই রক্ষণশীল ধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, পাশ্চাত্যের দুশ্চিন্তাও ততই বেড়ে চলেছে। তদুপরি, এ দেশগুলোর মুসলিমদের অনেকে নিজেরাই ক্রমাগতভাবে রক্ষণশীলতার ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছে, আবার অনেকে মোহমুক্ত, অস্থির অথবা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে।

> শরিয়ার কথা উঠলেই পাশ্চাত্যে ইসলামের অন্ধকারময় এক চিত্র জেগে ওঠে: নারী নির্যাতন, দৈহিক শাস্তি/নিপীড়ন (যেমন, হাত-কাটা), রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। এ বিষয়গুলো এতটাই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে যে, অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও এসব বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা থেকে বিরত থাকে। কারণ, এসবের নিছক উল্লেখও তাদের লেখনীর ব্যাপারে অন্যদের মাঝে ভীতি সঞ্চার অথবা সন্দেহ-সংশয় জাগ্রত করতে পারে।[৪৫]

তাহলে কি শরিয়া তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে? সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব, কি তাহলে শরিয়া বর্জন করলে বা বিসর্জন দিলেই ভালো হবে? অবস্থা কি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কেউ কেউ যেমন আবদার করছেন মুসলিম শব্দকোষ থেকে 'জিহাদ' শব্দটিকে বাদ দেয়ার জন্য,[৪৬] সেদিনই বা কত দূরে যখন শব্দকোষ থেকে 'ইসলামকেও নির্বাসনে পাঠানোর জন্য আবদার করা হবে? এ রকম প্রস্তাবনা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো ধারণাই ভুলভ্রান্তি, অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের শিকার হতে পারে এবং সেজন্যই কোনো শব্দ, পরিভাষা বা ধারণাকে বাদ দেয়ার মাঝেই সমাধান লুকিয়ে নেই। বরং প্রয়োজন বিভ্রান্তির অপনোদন, অপব্যবহার সম্পর্কে খোলাসা করা এবং নিশ্চিত করা যেন যে আদর্শের দাবি

---

৪৪ রাসুলুল্লাহ্‌র নেতৃত্বাধীনে রচিত মদিনার চার্টারে প্রতিফলিত ইসলামের বহুত্বমুখী আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কোনো রাষ্ট্রকে 'মুসলিম দেশ' না বলে 'মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ' বলা উচিত। উল্লেখ্য, মুসলিমরা 'মুসলিম দেশ' হিসেবে তাদের দেশ বিবেচনা বা আখ্যায়িত করলে হিন্দুরা 'হিন্দু দেশ' বা 'হিন্দু রাষ্ট্র', ইহুদীরা 'ইহুদী দেশ' বা 'ইহুদী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতি চাইলে, মুসলিমদের বলার কিছু থাকে না।

৪৫ Ramadan, p. 31.

৪৬ Ayoob, 2006.

করা হয় তার সাথে বিশ্বাসভিত্তিক আমল যেন বিবেকসম্মতভাবে ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

> এটা সত্যি যে ফুকাহা এর (অর্থাৎ শরিয়ার) অর্থ স্বাভাবিকভাবেই সীমিত করে রেখেছেন তাদের ক্ষেত্র (ফিল্ড)-এর মধ্যে, স্বৈরাচারী শাসকেরা এর অপব্যবহার করেছে তাদের খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবং মুসলিমরা নিজেরাই শরিয়ার আদর্শের সংরক্ষণ করতে পারেনি (এমনকি, কখনো কখনো খেয়ানতও করেছে), কিন্তু তবু ইসলামী পরিসরের এই কেন্দ্রীয় ধারণাটিকে অধ্যয়ন করতে এবং মুসলিমদের ইতিহাসে যেভাবে এটি একটি মৌলিক ধারণা হিসেবে সজীব হয়ে আছে তা অনুধাবন থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ নেই।[৪৭]

যদিও রাসুলুল্লাহ্‌র নেতৃত্বাধীন সমাজে মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য থেকে তিনি মুক্তির পথ দেখান, যা একটি গতিশীল সমাজের অংশ হিসেবে নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রবল ধারা বয়ে আনে, এখন যেভাবে শরিয়াকে অনুধাবন বা পেশ করা হয় তাতে তার উল্টোটাই যেন ফুটে ওঠে। তা কেন? এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে ইসলাম ও শরিয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে এবং শরিয়ার ধারণা আমাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি, তবে যেহেতু বিভ্রান্তি ও বিকৃতির বেড়াজালে শরিয়ার ধারণাটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাই এ বিষয়ে আলোকপাত করা এবং আমাদের চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা আনা বিশেষ প্রয়োজন।

২. শরিয়া এবং ফিক্‌হ: সমসাময়িক 'প্রতিষ্ঠাকরণ' উদ্যোগগুলো

শরিয়া পরিভাষাটি নিয়ে যে সমস্যা আছে সেটা যথাযথভাবে বুঝতে হলে এবং সে সমস্যাগুলো কী তা নিরূপণ করতে হলে, বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ে শরিয়া প্রতিষ্ঠা (establishment) বা বাস্তবায়নের (implementation) কিছু উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিকোত্তর প্রেক্ষাপটে শরিয়াভিত্তিক আইন-কানুনের প্রয়োগে সবচেয়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক রেকর্ড সৌদি আরবের। সে রাজ্যটি রূপ নিতে শুরু করে ১৭৫০

৪৭ Ramadan, p. 31.

সালে মুহাম্মদ ইবনে সউদ-এর অধীনে। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে সংহতি ও প্রসার লাভ করার মাধ্যমে এই রাজ্যটি বর্তমান রূপ লাভ করে ১৯৩২ সালে রাজা আব্দুল আজিজের সময়। যেখানে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও সবচেয়ে পবিত্র দু'টি জায়গা (মক্কায় অবস্থিত কা'বা শরীফ এবং মদিনায় অবস্থিত মসজিদে নববী), সেই রাজ্যটি দুটো বিশেষ ধারার মোহনায় (confluence) রূপ লাভ করে: (ক) তুরস্ক-ভিত্তিক ওসমানীয়া সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জনে স্থানীয় আরবদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম; এবং (খ) চরম রক্ষণশীল বা গোঁড়া শুদ্ধিবাদী (puritanical) ওয়াহাবী আন্দোলন[৪৮] যা ছিল অনমনীয় এই দাবিতে যে সেখানকার আইন-কানুন অবশ্যই শরিয়াভিত্তিক হতে হবে। ফলে সেই রাজতন্ত্র ও শুদ্ধিবাদী ধারা ক্ষমতার ভাগাভাগিতে এক আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছে: যা সাধারণত ধর্মীয় আইন হিসেবে গণ্য করা হয়, সেই শরিয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি থাকবে সরকারিভাবে সংগঠিত এবং পরিপোষিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর আওতায়, আর রাজনৈতিক বিষয়াদি থাকবে রাজতন্ত্রের অধীনে যে ব্যাপারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। কিছু কিছু গৌণ ঘটনা বাদ দিয়ে, অতিসাম্প্রতিক সময়ের আগ পর্যন্ত এই ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থাটা বেশ স্থিতিশীলই প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করা থেকে, পাকিস্তানের একটি দ্ব্যর্থবোধক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র হওয়া। দেশটি ইতোমধ্যেই পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হলেও একটি স্থিতিশীল, প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি। মাঝেমধ্যে বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় এলেও, প্রায়শই ছিল অদক্ষ আর বিভক্ত এবং প্রায় নিয়মিতভাবেই সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ন্যায্য দাবি ও আন্দোলনকে নস্যাৎ ও দমন করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যায় লিপ্ত হয় বাঙালিদের বিরুদ্ধে, যাদের মধ্যে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। আর এ সবই ঘটে ইসলামেরই নামে।[৪৯] জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে

৪৮ Farooq, 2020b.

৪৯ International Commission of Jurists (1972). The Events in East Pakistan, 1971: A Legal Studz (Geneva, Switzerland). আরো বিস্তারিত জানার জন্য ১৯৭১ সালের গণহত্যা সংক্রান্ত একটি গবেষণাধর্মী অনলাইন তথ্যভান্ডার দেখুন, visit http://genocide1971.net/oldsite/, retrieved July 12, 2007.

ক্ষমতায় আসে। তার সামরিক শাসনামলে শরিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার উৎসাহ এবং উদ্যম অনেক বেড়ে যায় এবং অনতিবিলম্বে সে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উদ্যমে দেশটিকে মহৌষধির মতো 'শরিয়া' উপহার দেয়।

১৯৮৩ সালে সামরিক একনায়ক জাফর নুমেইরীর অধীনে সুদানে শরিয়া এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। এই শরিয়া প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো একনায়কের সাথে হাত মেলায়। তখন থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে অস্থিতিশীলতার শিকার হয়েছে সুদান। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সেখানে ব্যাপক। গত কয়েক বছর ধরে দেশটির একটি অংশে গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধ চলছে, যেখানে দারফুর অঞ্চলে মূলত মুসলিমদের হাতেই মুসলিমরা নিগৃহীত হয়েছে। সরকার এই অবস্থার নিরসন করতে এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, তবু এই সংকট নিরসনে বাইরের কোনো পক্ষকে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রেখেছে।[৫০]

সোভিয়েত দখলের অবসানের পর আফগানিস্তান ইসলামী আমিরাত হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৬ সালে তালেবানরা ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। ২০০১ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে আগ্রাসনের মাধ্যমে তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত, তালেবানরা শরিয়ার এক অত্যন্ত সংকীর্ণ ও চরম রক্ষণশীল সংস্করণ বাস্তবায়িত করে, যা সারা বিশ্বের নজর আর অনেকের নিন্দা কাড়ে। বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে পড়ে আফগান জনগণও যেন তালেবানদের হাতে পণবন্দিদের মতো শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত হয়।[৫১] লক্ষণীয়, আগ্রাসি সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করতে, তালেবান এবং আপামর আফগান জনগণ ঐতিহাসিক এবং বীরোচিত ভূমিকা রাখে এবং পরবর্তীতে তালেবান সরকার খণ্ড-বিখণ্ড, বিভক্ত আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়ভাবে দেশটিকে সংহত করে। কিন্তু এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সমান্তরালে ইসলামী শাসনের নামে 'শরিয়া'র যে সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত পেশ করে, তা আফগান জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং আবার বাইরের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়।

---

৫০ উল্লেখ্য, সাধারণত যেমনটি হয়ে থাকে, সুদানের দারফুরের বিষয়টি পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ নাও হতে পারে। 'খুব খারাপ হচ্ছে, খুব খারাপ হচ্ছে' পাশ্চাত্যের এ জাতীয় চিৎকার হয়তো সুবিচার ও মানবাধিকারের ধ্বজাবাহী হিসেবে নয়, যতটা হয়তো সুদানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্যাপক তেল সম্ভারে নজর পড়ার কারণে। দেখুন, এরফষবু, ২০০৫. সুদানের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে এ মূল বইটি প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে।

৫১ Hakimi, 2019.

আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নাইজেরিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামী পুনর্জাগরণের উচ্ছ্বাস এসেছে এবং কিছু কিছু প্রাদেশিক সরকার তাদের শরিয়ার নিজস্ব সংস্করণ চালু করার প্রয়াস চালিয়েছে।

এই শরিয়া প্রকল্পগুলোর কিছু অভিন্ন নকশা (pattern) আছে। প্রথমত উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে চারটিতেই শরিয়ার প্রবর্তনের সাথে স্বৈরাচারী, একনায়কত্ব অথবা উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রী কোনো স্বারোপিত ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং সুদানের ক্ষেত্রে শরিয়ার প্রবর্তন ছিল নিছক হুদুদ নিয়ে। হুদুদ হচ্ছে দেওয়ানি (সিভিল) ও ধর্মীয় অপরাধসংক্রান্ত ইসলামী শাস্তিবিধান। এসবও এমন পরিবেশে হয় বা হয়েছে যেখানে যথার্থ আইনের অনুশাসন এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থার একটি অথবা উভয়টিই অনুপস্থিত, অন্যথায় সেখানে বিচারব্যবস্থা ও আইনি কাঠামো থাকলেও রয়েছে অবাধ দুর্নীতি এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার। পাকিস্তানে সংস্কারের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের পরিসরে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করে সামগ্রিকভাবে শরিয়াসম্মত করার জন্য ঢালাও পরিবর্তন। তবে এসব সংস্কার নিছক কাঠামোর পরিবর্তন ছিল, সারবস্তুর নয় যে কারণে এ সংস্কারে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি পর্যায়ে কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক উন্নতি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে পাকিস্তানের ফেডারেল শরিয়া কোর্ট রায় দেয়, যে সমস্ত আইন বা পলিসি 'রিবা'কে বৈধ বিবেচনা করে লেনদেন করে তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপিল হলে আদালতি দীর্ঘসূত্রতায় তা নিরসন করতে অনেক সময় লাগে এবং প্রায় এক যুগ পর ২০০১ সালে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করে চূড়ান্ত রায় দেয় এবং ক্রমানুক্রমিকভাবে দেশের অর্থনীতি থেকে সুদকে বিলুপ্ত করার নির্দেশনা দেয়।[৫২] বাস্তবতা আসলে এটার

৫২ Khurshed Khan Associates (2000. “Pakistan: Supreme Court Rules Riba (Interest) Un-Islami: Interest Free System from 2001 Ordered,” Mondaq, January 4, https://www.mondaq.com/antitrust-eu-competition-/8121/supreme-court-rules-riba-interest-un-islamic-interest-free-system-from-2001-ordered; Khan, Mohammad Mansoor and Bhatti, Muhammad Ishaq (2008). “The Impact of the Supreme Court Judgments of 1999 and 2002 on Riba (Interest) on the IBF Movement in Pakistan (1999-2007),” in Development in Islamic Banking (Palgrave Macmillan), pp. 158-180

অনুকূল ছিল না। তাই বিবিধ কারণে এই রায় কার্যকরী করা যায়নি এবং ২০২২ সালে পাকিস্তানের ফেডারেল শরিয়া কোর্ট আবার নতুন করে চূড়ান্ত রায় দিয়েছে সুদ হারাম এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সুদ থেকে মুক্ত করার জন্য সকল প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। তবে এবারও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপিল করেছে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়ার বিরুদ্ধে।[৫৩] তাছাড়া এই রায় এবং নীতি এমন সময় পাকিস্তানের সামনে, যখন এর অর্থনীতির অবস্থা একেবারেই নাজুক এবং বড় রকমের সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতই বলে দিতে পারবে সুপ্রিম কোর্টের এই দ্বিতীয়বার সুদ নিয়ে রায়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হবে কি না।

সৌদি আরব দাবি করে যে, তার আইনব্যবস্থা শরিয়াভিত্তিক, অথচ দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে মানবাধিকার, এমনকি ইসলামী অধিকারেরও অন্যতম নিকৃষ্ট লঙ্ঘনকারী হিসেবে পরিচিত। সেখানে না আছে স্বাধীন বিচারব্যবস্থা আর না আছে আইনের যথার্থ অনুশাসন; সেখানে কোনো সর্বজনীন মানবাধিকারের কোনো সাংবিধানিক নিশ্চয়তাও নেই। নারীরা সেখানে কোনো মাহ্‌রাম পুরুষের অনুপস্থিতিতে নিজেরা একা গাড়ি চালাতে পারে না,[৫৪] যদিও ইসলামে এরকম কোনো বিধিনিষেধ একেবারেই নেই। এটা বিশেষভাবে দুঃখজনক এবং শ্লেষপূর্ণ (ironic), কেননা নারীদের একা গাড়ি চালানোর ব্যাপারে এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা এমন একটি দেশে, যার প্রাণকেন্দ্র মক্কা - সেই শহর যেখানে ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, কা'বা শরীফ অবস্থিত, আর এই শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল নির্জনে পরিত্যক্ত একাকী এক নারীর হাতে।[৫৫]

সমাজ ও অর্থনীতিতে কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে সম্পদের পুঞ্জিভবনের বিরুদ্ধে কুরআন সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে:

---

৫৩ Malik, Hasnat (2022). “SBP challenges FSC Riba verdict in SC,” The Express Tribune, June 26, https://tribune.com.pk/story/2363405/sbp-challenges-fsc-riba-verdict-in-sc.

৫৪ রাজপুত্র মোহাম্মদ বিন সালমান ২০১৭ সালে দেশটির কার্যকরী ক্ষমতা নেয়ার পর এ ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তবে ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতামত এখনো সাধারণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর তেমন কোনো প্রমাণ নেই। আর কিছু সরকারি আলেমদের ফতোয়া এলেও প্রশ্ন থেকেই যায় যে এতদিন কেমন করে ইসলামের নামে নারীদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে অথবা তাঁদের সাধারণ অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

৫৫ Farooq, 2004a.

> مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ
>
> আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসুলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।[৫৬]

কুরআনের এই মহান নির্দেশনার বিপরীতে আরো অনেক দেশের মতোই ঐ দেশটির সম্পদরাজি একটি বিশেষ রাজপরিবার এবং তার বর্ধিত বলয়ের সীমিত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের হাতে পুঞ্জীভূত, যা ইসলামের একটি মৌলিক নীতির পরিপন্থি। ইসলামের আরেকটি মৌলিক নীতি হচ্ছে যে কেউই - কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া - আইনের ঊর্ধ্বে নয়। অথচ, এই তথাকথিত শরিয়াভিত্তিক দেশে সবাই শরিয়ার আওতাভুক্ত, কিন্তু রাজপরিবার নয়। তাই, কিছু কিছু দিক ছাড়া সৌদি আরবের শরিয়াটা এমন এক ইসলাম মূলত যার মাথাটা পায়ের দিকে, আর পা আকাশের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবিজির (স.) পর উম্মাহ্র দায়িত্ব হচ্ছে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ বা মডেল অবলম্বন করা।

> রাসুলুল্লাহ (স.) একদিন ফজরের নামাজের পর আমাদের উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, যাতে সকলের চোখে পানি এলো এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোনো একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহতের মতো। হে আল্লাহর রাসুল (স.) এখন আপনি আমাদের কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: আমি তোমাদের আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার এবং (নেতৃআদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তাঁরা বহু বিভেদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে এবং সৎপথপ্রাপ্ত

---

৫৬ আল-কুরআন (আল-হাশর) ৫৯:৭।

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা সে সুন্নাতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।[৫৭]

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে দৃষ্টান্তমূলক খুলাফায়ে রাশেদীনের পর একটি প্রতিবিপ্লবের ধারাবাহিকতা আসে, যা ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বিপরীত এবং সেই প্রতিবিপ্লবের ঐতিহ্যই মুসলিম উম্মাহ্‌র ধারাবাহিকতায় পরিণত হয় এবং আমরা সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের শাসন এবং রাষ্ট্রীয় সুন্নাহর যে সিলসিলা দেখি তা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত নয়, বরং আমির মুয়াবিয়ার প্রতিবিপ্লবের ঐতিহ্যকেই আমরা ধারণ করেছি।[৫৮]

ঔপনিবেশিক দখলদার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে তালেবানরা প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত রাখে, কিন্তু তারই সমান্তরালে আফগানিস্তানে তালেবানদের কঠোর (draconian) শাসনাধীনে শরিয়ার এক চরম রক্ষণশীল সংস্করণ প্রবর্তন করা হয়। এটি এমন সব কাণ্ড-কারখানায় পর্যবসিত হয়, যা ইসলামকেই হেয় প্রতিপন্ন করে: যেমন- দাড়ি চেঁছে ফেলার জন্য পুরুষদের এবং পায়ের গোড়ালি না ঢাকার জন্য নারীদের শাস্তি দেয়া। আইনের যথাযথ প্রয়োগকে নির্বাসনে পাঠানো হয়; পবিত্রতা (virtue)-রক্ষাকারী পুলিশের দৈহিক আঘাত অথবা হয়রানি থেকে কারো রেহাই ছিল না। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে তালেবানদের আবির্ভাবসহ সামগ্রিক আফগান অভিজ্ঞতাটাই ঘটেছে একটি বিশেষ শূন্যতার প্রেক্ষাপটে, যেখানে সেই শূন্যতা অ-আফগানি মুসলিমদের আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে তাদের চরমপন্থী কার্যক্রমের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেতে সহায়তা করে। এই কার্যক্রম ধীরে ধীরে রূপ নেয়, একদিকে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের কারণে, যার সাথে আধিপত্যবাদী আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাত জড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফগানিস্তানে বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে যেমন অভ্যন্তরীণ দিক ছিল, তেমনি স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত আগ্রাসন ও আফগানিস্তান দখল এবং পরবর্তীকালে আগ্রাসি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিতাড়িত করার জন্য আমেরিকার হস্তক্ষেপ বাইরের (external) দিক ছিল।

---

৫৭ At-Tirmidhi, Kitab al-Ilm, #2676, https://sunnah.com/tirmidhi:2676; Sunan Ibn Majah, Kitab al-Muqaddima, #43, https://sunnah.com/ibnmajah/introduction/43.

৫৮ Farooq, 2020c.

ইরানের ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন। নিখুঁত না হলেও, দেশটি সাধারণভাবে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনধারা বেছে নিয়েছে। বস্তুত ইরানি বিপ্লব সম্ভব হয় আপামর জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণে এবং দৃষ্টান্তমূলক ত্যাগ-তিতিক্ষায়। তবে দু'টি ব্যাপারে ইরান এখনো এর পরিবেশের শিকার হয়ে আছে। প্রথমত চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ধর্মীয় কর্ণধারদের কুক্ষিগত হয়ে আছে, যা যেকোনো প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থার জন্যই মারাত্মক ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক। ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত আছে কতিপয় ধর্মীয় 'অভিভাবক'-এর হাতে যাদের অপরিবর্তনীয় (without resource) ভেটো দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এটা হয়তো ইমামত বা শিয়াবাদভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটি ইরানি সমাজের ওপর গ্যাঁড়াকলের মতো। যাদের হাতে ক্ষমতা এখনো ভারসাম্যহীনভাবে রয়েছে তারা হয়ত এখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি যে, বিপ্লবী জোশ কোনো স্থায়ী অবস্থা হতে পারে না। স্বাভাবিক সমাজ পর্যায়ে উত্তরণ সময়ের অপরিহার্য দাবি। স্লোগানমুখী আর বিপ্লবী বুলি কপচানো সমাজের মৌলিক চাহিদা ও পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ী বিকল্প হতে পারে না। তার পরেও, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে চরম সংকটের মধ্যে পড়েও অন্যদের তুলনায় ইরানের সম্ভাবনা অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ ও বাইরের কারণে গুণগত দিক থেকে যথেষ্ট ভালো।[৫৯]

---

৫৯ অভ্যন্তরীণভাবে, প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিপ্লবোত্তর পর্যায় থেকেই বজায় আছে এবং প্রতিনিধিত্বের সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হয়েছে। তাছাড়া বিপ্লবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, বিপ্লবের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ এবং নারীরা অভূতপূর্বভাবে অংশগ্রহণ করে এসেছে। রাজনৈতিক পর্যায়ে নারীদের মধ্যে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে (ড. মাসুমেক এবতেকার, ১৯৯৭-২০০৫; ফাতেমে জাভাদী, ২০০৫-বর্তমান); ধর্মীয় পর্যায়ে, এ পর্যন্ত শুধু একজনই, তবু মহিলা আয়াতুল্লাহ হয়েছে (যেমন, যাহ্‌রা সেফাতি); অবশ্য সংবাদ মাধ্যমে এ ব্যাপারে তেমন করে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা বা স্বীকৃতি আসেনি। মহিলারা এখন ট্যাক্সি চালাচ্ছে, যদিও তারা শুধু মহিলা যাত্রীদেরই বহন করতে পারে। তবে দূরপাল্লায় বাসচালক হিসেবে মহিলারা এখন নিয়োগ পাচ্ছে, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যাত্রী বহন করতে পারে। বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে কারিগরি (টেকনিক্যাল) ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদা পূরণের দাবিতে এবং শান্তিপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে ইরান তার পারমাণবিক প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানে ইরানের সাফল্য ঈর্ষণীয় কিছু নয়, তবু কারিগরি

দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু আইন, বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক বা ধর্মীয়ভাবে ভিন্নমতাবলম্বীদের ব্যাপারে, অতিমাত্রায় কঠোর এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুবই সংকীর্ণ। তবু এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও, যেহেতু ইরান প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থার ধারায় রয়েছে, এটা আশা করা যায় যে দেশটির অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা (dynamics) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মুখ্য বিষয়ে নিজেদের সমস্যা নিরসনে এবং সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে, বিশেষ করে যখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিরসন হয়।

উল্লেখযোগ্য, অন্য দেশগুলোর মধ্যে আছে মালয়েশিয়া, যা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অনন্য। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এটি একমাত্র দেশ, যা ঐতিহ্যগত ধরন থেকে সফলভাবে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। দেশটি আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণে দেশটি এখন কার রফতানি করে। অনেক বছর ধরেই ইরান-কর্তৃক, মরিচা ধরছে এমন সামরিক ও বেসামরিক বিমান বহরের জন্য প্রতিস্থাপনের (রিপ্লেসমেন্ট) যন্ত্রাংশ (পার্টস), আমদানির ওপর আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে আছে। বহিঃশক্তির এ জাতীয় বিদ্বেষমূলক প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বেসামরিক এবং সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই ইরান নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতেই সমর্থ হয়নি, বরং তার স্বনির্ভরতা বেড়েই চলেছে।

বাইরের থেকে এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং অন্যান্য মুখ্য ইউরোপীয় শক্তি থেকে ইরান প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইরানের নেতিবাচক মনোভাব এত গভীর কেন তা ভালোভাবে বুঝতে হলে স্মরণ করতে হবে আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে অবৈধ এবং নীতিগত দিক থেকে দেউলিয়াসম একটি পদক্ষেপ নেয় আমেরিকা ১৯৫৩ সালে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি সরকারকে উৎখাত করে, আমেরিকা তার স্থলে নিজের ক্রীড়নক শাসক হিসেবে রেজা শাহ পাহ্লভীকে ইরানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। অতীতের এই অবৈধ ও ন্যক্কারজনক অপকর্মের ব্যাপারে কখনো স্বীকার অথবা অনুতাপ প্রকাশ না করে, বিপ্লব হওয়ার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে ইরানের বিরোধিতা করেই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এরকম প্রতিটি বিদ্বেষমূলক প্রয়াস ইরানকে শক্তিশালী করেছে এবং আঞ্চলিকভাবে প্রাধান্য অর্জন করতে ইরানের জন্য সহায়ক হয়েছে, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও দখল। এই আগ্রাসন ইরানের প্রভাব বলয়কে প্রসারিত করেছে। কিন্তু এটাও উল্লেখযোগ্য যে শিয়াবাদের অতিমাত্রিক প্রভাব সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের সাথে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি করছে এবং রক্ষণশীলদের বাইরে যারা তাদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে ইরানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, যা তাঁদের জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগতভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে।

উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে, নিজেদের ইসলামী পরিচিতি ও সুন্নাহর ব্যাপারে কোনো আপোষ না করেই। মালয়েশিয়া মুসলিম বিশ্বে বহুত্ববাদের (pluralism) একটি দৃষ্টান্ত। দেশটি নিজেদের ইসলামী সুন্নাহর ব্যাপারে গৌরবান্বিত, যদিও শরিয়া-প্রবর্তন প্রয়াসী দেশগুলোর মতো ইসলামের নামে গলা উঁচিয়ে হৈ চৈ করে না। বস্তুত ইসলামী বিধি বা আদর্শ মালয়েশিয়ায় গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়, বহুত্ববাদ অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে দেশটির নিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো আপোষ না করেই।

এটা দুঃখজনক যে, ইসলামের পুনর্জাগরণবাদীরা যে ধরনের শরিয়ার প্রবর্তনের দাবির পুরোভাগে এবং যে ধরনের ব্যাপারে পাশ্চাত্য বিশ্ব সমালোচনা করে ও গভীর সন্দেহ বা উদ্বেগের দৃষ্টিতে দেখে, তা মালয়েশিয়ার মডেলের কাছাকাছি নয়, বরং সেই ধরনের সাথে চিহ্নিত যা শরিয়াভিত্তিক দেশ– যেমন, সৌদি আরব, পাকিস্তান, সুদান ও আফগানিস্তান (তালেবান শাসনামলের) - যেখানে কঠোর শাস্তির বিধান প্রচলিত ছিল বা আছে এবং যেখানে মানবাধিকারের অবস্থা খুবই দুর্বল বা করুণ। বস্তুত এ দেশগুলোতে শরিয়া সমার্থক হয়ে পড়েছে ইসলামের মূল্যবোধ, আদর্শ বা নীতিমালার সাথে নয়, বরং হুদুদ বা কিছু কঠোর শাস্তি বিধানের সাথে, যার সাধারণ শিকার হচ্ছে সমাজের দুর্বল অংশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তানের হুদুদ অর্ডিন্যান্স যা শত শত ধর্ষণের শিকার নারীকে কারাগারে পাঠিয়েছে, যেখানে অভিযুক্ত হওয়া সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির সম্ভাবনাও তাদের অনেকের মাথার ওপর ঝুলতে থাকে।[৬০] এ অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে এ গ্রন্থে পরে আরো আলোচনা করা হয়েছে।

এ ধরনের অবস্থা শরিয়াকে গুণগত দিক থেকে আরো ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য উপসর্গ (symptomatic) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আরো বিশেষ করে এ জন্য যে কুরআন ও হাদিসে শরিয়া বলে যে শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করে হয়েছে তা সাধারণত যে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়, তার চেয়ে আরো ব্যাপক।

> ‘আইন প্রণিধান’-এর ধারণা যদি সত্যিই (ধাতু শা-রা-‘আ থেকে আসা) শরিয়ার ধারণার ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে এই অনুবাদ

৬০ এই অইসলামী ও অমানুষিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Farooq, 2006e; Quraishi, 1997; Jahangir and Jilani, 2003.

> আসলে এর ব্যাপক অর্থ ধারণ করে না, যদি না এটাকে বোঝানো হয় এর নিম্নলিখিত আরো সাধারণ ও মৌলিক অর্থে: 'সে পথ যা ঝর্ণার দিকে নিয়ে যায়'।[৬১]

শরিয়া নামক পরিভাষাটি অনুধাবন আগের চেয়েও আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে, কারণ এটার ঐতিহ্যগত ধারণাটি মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে, তাদের পথনির্দেশনা জোগাতে এবং তাদের সমস্যাবলির সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া, এটা প্রান্তিক প্রবণতার চরমে গিয়ে মুসলিম সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে।

> সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণে শরিয়া ধারণাটির ঐতিহ্যগত কাঠামোর দুর্বলতা আমাদের আদর্শিক নীতিমালার ভিত্তির ব্যাপারে সজীব চিন্তার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শরিয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মতামত চরমভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে– সেক্যুলারিস্ট এবং ঐতিহ্যগত – এ দুই ভাগে।[৬২]

৩. শরিয়া কি? ধারণা এবং বিভ্রান্তি

শরিয়ার ধারণাটি কেন ঐতিহ্যমুখী এবং পুনর্জাগরণবাদী মুসলিমদের ওপর, বিশেষ করে তাদের ওলামা, প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনগুলোর ওপর, এতটা প্রভাবশালী? ঐতিহাসিকভাবে, ইসলাম এবং আইনের সম্পর্ক নিয়ে মুসলিমরা যা বোঝে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শরিয়া।

> ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোর মধ্যে মুখ্য হচ্ছে আইন। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই, একজন বিশ্বাসীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা বা প্রশ্ন হচ্ছে: 'আমাকে কী করতে হবে; এ ব্যাপারে আল্লাহর আইন বা বিধান কী?' আইন-বিধানই হচ্ছে মানবতার জন্য খোদায়ী পথ নির্দেশনা (শরিয়া, পথ বা আইন)-এর প্রকৃত ধর্মীয় বহিঃপ্রকাশ। ইতিহাসে ক্রমাগতভাবে ইসলামী আইন মুসলিম পরিচিতি ও চর্চার কেন্দ্রতে রয়েছে, কারণ এর মাঝেই আছে 'উত্তম সমাজ'-এর আদর্শ সামাজিক নকশা। শরিয়া আমাদের আইন ও নৈতিক পথনির্দেশনার

৬১ Ramadan, p. 31.
৬২ Masud, 2001.

উৎস, আমাদের বিধিবিধান ও ভালোমন্দ নিরূপণের ভিত্তি। ব্যাপক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইসলামী আইন আমাদের মুসলিম সমাজের জন্য দিয়েছে স্বতন্ত্র একটি পরিচিতি, আচার-আচরণের এক অভিন্ন বিধিমালা। তাই মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে সমাজে ইসলামী আইনের ভূমিকা সব সময়ই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়েছিল এবং এখনো আছে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সূচনা যুগে, আল্লাহর শরিয়া অনুসরণ করা মানে ছিল আল্লাহর অব্যাহত আসমানি হেদায়েত এবং তার মনোনীত নবির প্রতি আনুগত্য। ইবাদত-বন্দেগী, পারিবারিক সম্পর্ক, অপরাধ আইন অথবা যুদ্ধ, যে ব্যাপারেই হোক, সবাই পথনির্দেশনা এবং বিচার/রায়ের ব্যাপারে মুহম্মদের (স.) শরণাপন্ন হতে পারত। কুরআনি শিক্ষা এবং নবুয়তী দৃষ্টান্ত, দুটোই নতুন (early) ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দেশনা এবং পরিচালনায় ভূমিকা রাখত। মুহম্মদের (স.) ইন্তেকালের পর আসমানি বাণীর ধারা শেষ হয়; তবে খোদায়ী ইচ্ছার প্রতি অনুগত থাকায় মুসলিমদের কর্তব্য শেষ হয়নি। আল্লাহর আইনের জ্ঞান ও তার বাস্তবায়ন অব্যাহতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে।[৬৩]

উপরে পেশ করা মন্তব্যটি সাধারণ ধরনের। বাস্তব অভিজ্ঞতা অবশ্য অনেক জটিল। কারণ, আইন-বিধিমালার আকারে আল্লাহর হেদায়েত মেনে চলা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তার হেদায়েত, যেমনটি শরিয়ার কাঠামোতে বিধৃত তা পূর্ণাঙ্গতা ও সুনির্দিষ্টতার দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সেরকম স্পষ্ট নয়। খোদায়ী পথনির্দেশনা, যেমনটি কুরআনে রয়েছে, তা একটি বিধিবদ্ধ আইন-কানুনের ম্যানুয়াল হিসেবে আসেনি। বরং শরিয়া বলতে যেসব আইন-বিধিমালা বোঝানো হয়, তা নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয়েছে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণভিত্তিক ইজতিহাদের।

শরিয়ার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'পানির গর্তের দিকে পথ,' 'অনুসরণীয় স্পষ্ট, সঠিক বা সোজা পথ'। ইসলামে এতে যা বোঝা হয় তা হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত পথ, ইসলামের সোজা পথ, বা আল্লাহর ইচ্ছা বা আইন, মুসলিমরা যার আনুগত্য করবে। তবে কুরআন আইনকানুনের

---

৬৩ Esposito, pp. 74-75.

> কোনো পূর্ণাঙ্গ ভান্ডার পেশ করে না বলেই ইসলামী আইনকে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে আবিষ্কার ও প্রণয়নের লক্ষ্যই আইনশাস্ত্র বা উসূলে ফিকহের বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়। ফিকহ (শাব্দিক অর্থে, অনুধাবন) সেই শাস্ত্র যা আল্লাহর আসমানি অভিপ্রায় বা হেদায়েত (শরিয়া) নিরূপণ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের জন্য, যেমনটি কুরআনে রয়েছে সমগ্র জীবনের জন্য।[৬৪]

যদিও আল্লাহর পথনির্দেশনা সমাজকে সুবিচারপূর্ণ, সম্প্রীতিময় ও সুষম করার কথা, এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটা এড়ানোর উপায় নেই তা হচ্ছে, যে দেশগুলো শরিয়া প্রবর্তন করার প্রকল্প নিয়েছে তাদের এখন পর্যন্ত এমন দুরবস্থা কেন? আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সুদান– এ চারটি দেশের শরিয়া প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ প্রকল্পের জন্য আপামর জনসাধারণের কোনো ভোট বা মতামত নেয়া হয়নি।[৬৫] বরং এগুলোর সবটিতেই কোনো স্বৈরাচারী রাজশক্তি বা শাসকের ক্ষমতা ও শক্তিবলে এটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই জনগণের সমর্থন নিয়ে এই শরিয়া প্রতিষ্ঠার প্রয়াসগুলো রূপ নিয়েছে তা বলার অবকাশ নেই।

বাস্তবে আপামর জনসাধারণ খুবই ঐতিহ্যবাহী এবং সে জন্যই ইসলামের সাথে তাদের জীবন ও হৃদয়ের যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। তবে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, শান্তি, সুবিচার এবং

---

৬৪ Esposito, p. 78.

৬৫ এখানে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার বিষয়টির ওপর আরেকটু আলোকপাত না করলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে। পাকিস্তানে ১৯৮৪ সালে শরিয়া প্রবর্তন বা ইসলামায়নের (Islamization) অংশ হিসেবে হুদুদ অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গে সামরিক জান্তা (যিনি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়) একটি রেফারেন্ডাম দেয় এবং ভোটারদের ৯৮.৫% ভোটে সেই ইসলামায়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। খুবই ভালো কথা, কিন্তু এই রেফারেন্ডামের পক্ষে যারা ভোট দেবে তাদের ভোটে অটোমেটিক্যালি সামরিক জান্তা জিয়াউল হক পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি থাকবে। অনেক দেশেই, মুসলিম বিশ্বে এবং বাইরেও, এমনি কায়দা-কানুন, ফন্দি-ফিকির করে বিশেষ মতাদর্শের (ideology) নামে নিজেদের ক্ষমতা গুছিয়ে নেয়া হয়। এ রকম পন্থা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। “1984 Pakistani Islamisation programme referendum,” https://en.wikipedia.org/wiki/1984_Pakistani_Islamisation_programme_referendum”

সমৃদ্ধি। মুসলিমরাও এগুলো আশা করে, কিন্তু এ নিয়ে তাদের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই, কারণ ইসলাম তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গতিশীল, প্রগতিশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ। মুসলিম হওয়া মানেই ইসলামকে ভালোবাসা এবং জীবনকে ইসলামের আলোকে সাজানোর আকাঙ্ক্ষা থাকা। কিন্তু মুসলিমরা আশা করে না যে, তাদের ধর্ম তাদের জীবনের স্বাভাবিকতায় প্রতিবন্ধক হবে। তারা বিশেষ করে জানে যে, ইসলাম না মানব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আর না তা তাদের বৃহত্তর স্বার্থ ও স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। ইসলাম তো উভয় জাহানের কল্যাণের জন্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফগান জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে গভীর ধর্মপরায়ণ। তবু তালেবানদের ইসলাম তাদের অধিকাংশের কাছে ছিল মৌলিক মানবাধিকার ও সম্মানের প্রতি এক বিরাট আঘাতস্বরূপ। পাকিস্তান তার সূচনালগ্ন থেকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হয়েছে এবং সে দেশের জনগণ তাদের ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তবু পাকিস্তান ক্রমাগতভাবে সেকুলার হয়েছে– সমাজের কোনো অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি সেক্যুলার হয়েছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশের স্বঘোষিত ধর্মীয় অভিভাবক ও কর্তৃস্থানীয়দের অনেক ক্ষেত্রে চরম গোঁড়ামি। এটা প্রশ্নাতীত যে, সেই ধরনের শরিয়া যা দুর্নীতিপরায়ণ, পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচারী অথবা স্বার্থপরায়ণ রাজশক্তিদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া, তার ব্যাপারে মুসলিম জনগণ তেমন পিপাসার্ত নয়।

তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে মুসলিমরা গভীরভাবে সংবেদনশীল, তাদের কাছে আসমানি (divine) হেদায়েতের নামে বাধ্যবাধকতামূলক হিসেবে কিছু পেশ করা হলে তারা সহজেই ছলাকলা (manipulation)-এর শিকার হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে শরিয়া তার সমগ্রতায় আসমানি এবং অপরিবর্তনীয় এ ধারণাটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যদি আসমানি হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত হিসেবে শরিয়াকে পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় (immutable) হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং সেজন্য তার বান্দাদের ওপর এটা আবশ্যিক হিসেবে প্রযোজ্য। হেদায়েতসংক্রান্ত যা কিছু আসমানিভাবে আমাদের কাছে এসেছে, সেটাকে এভাবে দেখার আর কোনো বিকল্প নেই। তবে আসমানি বলতে আসলে কী বোঝায় এবং শরিয়া নামক পরিভাষাটিই বা কী সে সম্পর্কে

আমাদের ভালো করে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো নিয়ে যখন বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন অনেক অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যের সম্মুখীন হই আমরা।

প্রকৃতপক্ষে, শরিয়া আসমানি এবং অপরিবর্তনীয়, এটা সচরাচর মনে করা হয়, যার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো:

> শরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ইমান ও আমল দুটোই। এর মধ্যে রয়েছে ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, সামাজিক আদর্শ ও আইন, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ফৌজদারি কিংবা দেওয়ানি সব ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।
>
> কখনো কখনো এটা উচিত এবং অনুচিত বা আচার-আচরণের নিয়ম-কানুনের সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সবশেষে, এটাকে ইসলামী আইনের সমার্থক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।
>
> তাই শরিয়া মানুষের জন্য আসমানি, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। খোদায়ী ইচ্ছা পূরণ করতে হলে, মানুষকে শরিয়ার আনুগত্য করতে হবে। ইসলাম অনুযায়ী চলা মানেই শরিয়া অনুযায়ী চলা। জেনেশুনে বা স্বেচ্ছায় শরিয়া বা তার কোনো অংশ পরিত্যাগ করার মানে ইসলামকেই পরিত্যাগ করা। তাই যেখানেই হোক, যে অবস্থাতেই হোক, মুসলিমদের একনিষ্ঠভাবে শরিয়াকে মানা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস চালাতে হবে। সেজন্যই শরিয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের গুরুত্বারোপ, অটল থাকা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং প্রবল অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়।[৬৬]
>
> "চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়: শরিয়া সব সময়ের জন্য, সব ধরনের অবস্থায় প্রযোজ্য। শরিয়া অপরিবর্তনীয় এ ব্যাপারে মুসলিমদের

---

৬৬ Khurram Murad. Shariah – The Way to God, excerpted from http://www.youngmuslims.ca/online_library/books/shariah_the_way_to_god/p2.htm, retrieved September 2, 2006. আগের লিংকটি আর কার্যকরী নয়। বিকল্প দেখুনঃ Murad (2007, pdf p. 5). লেখক জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি দীর্ঘদিন পাশ্চাত্যে বসবাস করেছেন এবং পাশ্চাত্যের মুসলিমদের মাঝে ইসলামকে পেশ এবং সংহত করতে আজীবন প্রয়াস চালান।

অটলতা অনেককেই হতভম্ব করে, কিন্তু এ থেকে ভিন্নতর কোনো চিন্তা এই মৌলিক ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। এটা যদি আসমানি হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের দ্বারা এর পরিবর্তন তখনি গ্রহণযোগ্য, যখন সে পরিবর্তন হয় আল্লাহ অথবা তার রাসুলের অনুমোদিত। যারা শরিয়াকে সমসাময়িক চিন্তাভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার কথা ভাবে তারা এই সমস্যার কথায় বিচলিত হয়ে যুক্তি দেখায় কুরআনে যা বিধিবিধান আছে এবং রাসুলের আইনপ্রণেতা হওয়ার ধারণাকে দুর্বল করতে। কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক হিসেবে, মানুষের পরিবর্তনীয় মূল্যবোধ বা মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য শরিয়ার সংশোধন করা যেতে পারে না। বরং এটা চূড়ান্ত (absolute) মানদণ্ড যার সাথে সব মানবীয় মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে; এটাই সেই কাঠামো যার প্রতি সবকিছুর মীমাংসার জন্য মানুষের ফিরতে হবে; এটা সেই মানদণ্ড যার নিরিখে সবকিছুর পরিমাপ হতে হবে।”[৬৭]

“আইন তাই শরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এটা কোনো অংশের মধ্যেই গুরুত্বের দিক থেকে তারতম্য করে না: নামাজ পড়া যেমন সঠিক, কার্যকর, অবশ্যকর্তব্য এবং পবিত্র, তেমনি ‘সামগ্রিক বিষয়ে পরামর্শ করা’ অথবা ‘সুদ হারাম হওয়া’ অথবা ‘কোনো জেনাকারীকে পাথর মারাটাও একই রকম।”[৬৮]

“আরবিতে শরিয়া মানে হচ্ছে স্পষ্ট, বহু জনের চলা, পানির দিকে যাবার পথ। ইসলাম অনুযায়ী এটা বোঝায় ধর্মীয় সেসব ব্যাপারে যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। শরিয়ার ভাষাগত অর্থ তার পারিভাষিক অর্থের সাথে সম্পৃক্ত। মানবজীবনের জন্য যেমন পানি অপরিহার্য, তেমনি শরিয়ার স্বচ্ছতা এবং সত্যনিষ্ঠাও জীবনে আত্মা ও মনের জন্য অপরিহার্য।”[৬৯]

---

৬৭ Ibid.

৬৮ Ibid.

৬৯ Shaykh Faraz Rabbani. Shariah: The Clear Path, retrieved September 15, 2006: https://seekersguidance.org/articles/general-artices/what-is-the-shariah-a-path-to-god-a-path-to-good-faraz-rabbani/

“সবশেষে, মানবতা যখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতার পর্যায়ে পৌঁছে এবং আল্লাহর শেষ বাণী পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন ইসলাম আসে সমগ্র মানবতার জন্য তার পূর্ণ, সমগ্র এবং চিরন্তন শরিয়া (আইন) নিয়ে।”[৭০]

“তাই, যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর আইন, শরিয়া দেন, তিনি তা সকল সময় এবং সকল গোষ্ঠীর জন্য যথোপযুক্ত করে বানিয়েছেন। তা না হলে, তিনি জানিয়েই দিতেন যে এই বিধিমালা পরিবর্তনীয়, এবং সেই সাথে জানাতেন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। তা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো সংসদ, শাসক বা বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা নেই আল্লাহর আইনকে সংশোধন করার; সে আইন পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত ও প্রয়োগ করতে হবে।”[৭১]

“শরিয়া হচ্ছে আচার-আচরণে আসমানি বিধিমালা যা মানব জীবনযাপনের পথ নির্দেশনা দেয়।”[৭২]

“(সৌদি) রাজতন্ত্র ইসলামকে অবলম্বন করেছে, কথায়, কাজে এবং বিশ্বাসে তার জীবনধারা হিসেবে, তার সমাজ আসমানি বাণীর ভিত্তিতে প্রণীত নীতিমালার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা এখনো ইসলামী সভ্যতার প্রতিফলক। এর শাসন পদ্ধতি সুবিচার, পরামর্শ, সমতা এবং ইসলামী শরিয়াকে তার সমগ্রতায় প্রয়োগ করার অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।”[৭৩]

“শরিয়া হচ্ছে পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয়, আর ফিকহ হচ্ছে তার মানবিয় পর্যায়ের শাস্ত্র বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।”[৭৪]

---

৭০ Al-Qaradawi (1999), p. 5. শেখ আল-কারাদাভী আমাদের সমসাময়িক সময়ের শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং ফকীহ। তার গবেষণা সম্ভার বহুল পঠিত এবং সম্মানিত মুসলিম বিশ্বজুড়েই। তিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া অ্যান্ড রিসার্চ-এর অন্যতম উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক। তিনি ২০২২ সালে ইন্তেকাল করেন।

৭১ Salahi, 2006.

৭২ Saad, 2015, p. 18.

73 Saudi Embassy document, “Human Rights in Judicial System, 2000,” retrieved September 20, 2006, from Saudi Embassy Web site: http://www.saudiembassy.net/Issues/HRights/hr-judicial-2-intro.html.

৭৪ Sistersinislam.org. “Reforming Family Law in the Muslim World,” retrieved August 21, 2006, from Sisterinislam Web site: http://www.sistersinislam.org.my/baraza/reforming.htm.

> "শরিয়া নিছক ইসলামেরই আরেক নাম এবং ইসলাম প্রদত্ত চিন্তা ও কার্যক্রমের কাঠামো এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে ইসলামের বিভিন্ন সংস্করণ নেই। এটা আল্লাহপ্রদত্ত দীন এবং নবির প্রদর্শিত পথ। এটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানবজীবনের সব বিষয় ও সমস্যার সমাধান দেয়, ইসলাম মানব জীবনের জন্য স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।"[৭৫]
>
> "শরিয়া = ইসলামী আইন"[৭৬]

শরিয়াকে আইনের সমার্থক হিসেবে দেখা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক বা তত্ত্ববাগীশদের মধ্যেই সীমিত নয়। এটা যে মারাত্মকভাবে ব্যাপক তার প্রমাণ পাওয়া যায় অত্যন্ত নামকরা বিদ্বানদের কথা ও লেখনীতে– এমনকি সেসব বিদ্বান যারা মুসলিমদের চিন্তাভাবনার ধারাতেও মৌলিক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law, গ্রন্থটি যাতে ইমাম শাতেবীর মতো একজন পথিকৃৎ বিদ্বানের বীজগর্ভ (seminal) অবদানের পরিচিতি ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এই মূল্যবান কাজটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি নেতৃস্থানীয় ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের দু'টি মহৎ এবং বড় লক্ষ্য হচ্ছে:

(১) মুসলিমদের চিন্তাভাবনার ধারায় সংস্কার আনা এবং তাদের অগ্রাধিকারগুলোকে নতুন করে নিরূপণ ও বিন্যাস করা।

(২) ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামোকে পুনর্নির্মাণ করা এবং ইসলামী আঙ্গিক থেকে আধুনিক মানবতাবাদী ও সামাজিক জ্ঞান-সম্ভারকে নতুন করে পেশ করা।[৭৭]

একজন প্রথিতযশা সমসাময়িক স্কলার উপর্যুক্ত গ্রন্থটির পরিচিতিতে লিখেছেন:

> সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য যে উপায়ে বিদ্বানরা এ লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস চালিয়েছেন তা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোকে,

---

৭৫ Ahmad, 1998. খূরশীদ আহমাদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বুদ্ধিজীবী।

৭৬ Shariah in Islamic Banking Glossary, Islamicity.com; retrieved August 22, 2006 from islamicity Web Site: http://www.islamicity.com/finance/IslamicBanking_Glossary.asp.

৭৭ Al-Raysuni, p. xii.

> ইসলামী বিধানগুলোর পেছনে কারণগুলোকে এবং শরিয়া বা ইসলামী আইনের পেছনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যগুলোকে সুস্পষ্ট করে তোলা।[৭৮]

মাসুদুল আলম চৌধুরী একজন উল্লেখযোগ্য বিদ্বান এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে বেশ উৎপাদনশীল (prolific) লেখক। তাওহিদী পদ্ধতিশাস্ত্র (methodology)-সহ Universal Paradigm[79]-এর প্রবক্তা এবং সমসাময়িক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের একজন ঘোর সমালোচক; চৌধুরীও শরিয়াকে ইসলামী আইনের সমার্থক হিসেবে গুলিয়ে ফেলার ভুলে আক্রান্ত।

> আল্লাহর একত্বই চূড়ান্ত জ্ঞান, এ ভিত্তির ওপর ইসলামী আইন, অর্থাৎ শরিয়ার প্রণয়ন ও উন্নয়নে যারা অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তাদের শ্রেণিতে পরে মুজতাহিদগণ।[৮০]

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় নিয়াজীর লেখা ইসলামী আইনশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় একটি পাঠ্যগ্রন্থ থেকে। 'শরিয়া এবং ফিকহের মধ্যে পার্থক্য'-শীর্ষক শিরোনামের অধীনে উপর্যুক্ত দু'টি পরিভাষার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বিষয়টা গুলিয়ে ফেলেন এবং শরিয়াকে নিছক আইনের সমার্থক বানান।

> শরিয়া এবং ফিক্‌হের অর্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবু, এ দু'টি পরিভাষা প্রায়শই সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই পার্থক্যটি শরিয়া যে ফিকহের চেয়ে আরো ব্যাপকতার নির্দেশক। শরিয়ার অন্তর্ভুক্ত আইন এবং বিশ্বাসের বিভিন্ন দিকগুলো, অর্থাৎ আকায়েদ। তবে শরিয়া এবং ফিক্‌হের আসল পার্থক্য এই যে, শরিয়াটাই আইন, আর ফিকহ হচ্ছে তার সেই আইনসংক্রান্ত জ্ঞান বা উসূলশাস্ত্র।[৮১]

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো গভীরভাবে প্রোথিত আইনসর্বস্ব (legalistic) মানসিকতার পরিচায়ক, যা মুসলিমদের আইনকানুনের সংকীর্ণ চশমা দিয়ে ইসলাম এবং শরিয়াকে দেখতে উৎসাহ যোগায়, যেখানে জীবনে ইসলামের সব কিছুকে আইনি কাঠামোতে দেখা হয়।

---

৭৮ Ibid. p. xi.

৭৯ Choudhury, M. A. and Shakespeare, R. (2007). The Universal Paradigm and Islamic World-systems: Economy, So-ciety, Ethics and Science (World Scientific Publishing Company, 2007)

৮০ Choudhury, M. A. in Hassan and Lewis, 2007, p. 22.

৮১ Nyazee, 2000, p. 24

এই উদ্ধৃতিগুলো সমসাময়িক। এগুলো বাছাই করা হয়েছে এ জন্য যে, অতীতে যাই হয়ে থাক, মানুষের প্রায়োগিক প্রয়াস সাধারণত তারা সমসাময়িককালে যা বোঝে এবং যেভাবে বোঝে তার প্রতিফলন হয়ে থাকে। আরেকটি এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে ক্লাসিক্যাল ইসলামের শেষের দিকের জ্ঞানসম্ভারে শরিয়া পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে কোনো রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই, হয়তো এ কারণে যে এটা সবার কাছে পরিচিত ছিল এবং সবাই এর অর্থ বুঝত।

> শরিয়াকে যদিও বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, কোনো সংজ্ঞাই মধ্যযুগীয় ইসলামী চিন্তার প্রতি সুবিচারের পরিচায়ক হবে না একটি মৌলিক ধারণা আহ্কাম বা বিধি বিন্যাসের ধারা (categorization) ব্যতিরেকে। শরিয়া, প্রথমত: এবং মুখ্যত মানব ব্যবহার ও আচার-আচরণের আসমানি শ্রেণিবিন্যাসের সমগ্রতা (আল-আহ্কাম ফিল আফ'য়াল, আল-আহ্কাম আল-'আমালিয়্যাহ)। মধ্যযুগীয় জ্ঞানীরা শরিয়া বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে ততটা ব্যস্ত ছিলেন না, যতটা ছিলেন প্রত্যেকটি কাজ বা বিষয়কে আসমানি হেদায়েতের আলোকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায় তা নিয়ে। বস্তুত পরবর্তী যুগের অধিকাংশ গ্রন্থে যেখানে এই আহ্কাম নিয়ে অনেক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, সেখানে শরিয়া কী তা নিয়ে ব্যাখ্যা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। প্রায়শই মুসলিম মনীষীরা নিছক 'শরিয়া'র পরিবর্তে 'শরিয়া শ্রেণিবিন্যাস' (আল-আহ্কাম আল-শরিয়া) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।[৮২]

আগেকার মুসলিম লেখকদের মধ্যে শরিয়া পরিভাষাটি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই, Weiss-এর এই মন্তব্য একজন ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী ফকীহ্ সায়েফ আল-দীন আল-আমীদী (মৃ: ১২৩৩ খ্রি:)-র কাজের ওপর ভিত্তি করে।[৮৩] শরিয়ার সংজ্ঞাবিষয়ক আলোচনা (discourse) ক্ল্যাসিক্যাল যুগে

---

৮২ Weiss, 1992, pp. 1-2.

৮৩ আল-জুয়াইনীর উত্তরসূরীতায়, "আমিদীর অবস্থান একটি উচ্চ স্তম্ভের মতো, জুয়াইনীর নিকটতম শিষ্য আবু হামিদ আল-গাজ্জালীর অনস্বীকার্য গুরুত্ব সত্ত্বেও। আমিদীর এই শীর্ষস্থানীয় স্থান তার শ্রেষ্ঠতম কাজ আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকামের ভিত্তিতে। ইহ্কাম-এ আমিদী তাত্ত্বিক এবং আইনশাস্ত্রসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় (মাসায়েল) বাদ দেননি। ইবনে খালদুনের মতে, এটা আমিদী এবং রাজীর বড় অবদান যে তাদের কাজ পরবর্তী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মূল উৎস হিসেবে ভূমিকা

অনুপস্থিত থাকলেও, বিশেষ করে সাহাবা ও তাবেয়ীদের প্রজন্মে প্রচলিত না থাকলেও, এটি একটি কুরআনি পরিভাষা। তবে শরিয়া শব্দটি আইনসর্বস্ব ধারায় বহুল প্রচলিত হতে থাকে এবং তা ধীরে ধীরে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে আধুনিক যুগে।[৮৪] শরিয়ার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিষয় এই পরিভাষার ব্যবহারকারীরা চিহ্নিত করে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলোর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) শরিয়া আসমানি (divine)

খ) শরিয়া অপরিবর্তনীয় (immutable)

গ) শরিয়া আর ইসলাম অভিন্ন এবং এটা জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান (complete code of life)

ঘ) শরিয়া আর আইন একই জিনিস

ঙ) (নামাজ অথবা অপরাধ, এজাতীয় কোনো পার্থক্য ব্যতিরেকেই) শরিয়া আইনের প্রয়োগের আওতাভুক্ত (enforceable)

চ) শরিয়া জীবনের জন্য 'স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট' (clear and unambiguous) নির্দেশনা দেয়।

শরিয়ার ব্যাপারে এগুলো কী বোঝায় এবং এতে কী বিভ্রান্তি এ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত তালিকাটি বিস্তারিত আলোচনা করতে সহায়ক হবে।

ক. শরিয়া কি 'আসমানি'?

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি অনুযায়ী, আসমানি (divine) শব্দটির অর্থ: 'যা সরাসরি খোদার কাছে থেকে আসা অথবা তা সংক্রান্ত'।[৮৫] শরিয়া কি

রাখে: বায়যাবীর (মৃঃ ১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) মিনহাজ আল-উসূল এবং ইবন আল-হাজিব-এর (মৃঃ ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুখতাসার আল-মুনতাহা আল-উসূলি। শেষোক্ত কাজের ওপর পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম শাস্ত্রবিদদের মডেলস্বরূপ ইযি (মৃঃ ১৩৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) ব্যাখ্যাকার ছিলেন (Weiss, 1992, pp. 20-22; সামঞ্জস্যের জন্য তারিখের কাঠামো সম্পাদনা করা হয়েছে।] উল্লেখ্য যে, মুসলিমরা সাধারণত আহকাম-কে শ্রেণিবিন্যাস (categorizations) হিসেবে দেখে না, বরং বিধান (rulings) হিসেবে দেখে।

৮৪ Farooq and El-Ghattis, 2018.

৮৫ Retrieved November 29, 2006, https://www.merriam-webster.com/dictionary/divine.

তাহলে সরাসরি আল্লাহ থেকে এসেছে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে শরিয়ার আওতায় কী পড়ে তার ওপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শরিয়া যদি ইসলামী আইন বা ফিকহের সমার্থক হয়, তাহলে তা পুরোপুরি আসমানি হতে পারে না। এটা অনস্বীকার্য: ফিকহ বা ইসলামী আইন মূলত মানবীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণনির্ভর কাঠামো। যদিও ফিকহের একটি উৎস বা উসূল হিসেবে কুরআনকে মুসলিমরা অবশ্যই আসমানি হিসেবে গণ্য করে, এর বাকি উৎসগুলো হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস– সাধারণভাবে বলতে গেলে আসমানি নয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যটির প্রাসঙ্গিকতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হলে, কুরআন ছাড়া অপর তিনটি সূত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে। ইজমার ক্ষেত্রে, ইজমা অর্থাৎ ব্যতিক্রমহীন, সর্বসম্মত মতৈক্য (consensus) যদি অর্জিতও হয়, এটা নিরূপণও মূলত মানবপ্রয়াসভিত্তিক। তাছাড়া, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, কোনো কিছুর ওপর ইজমা আছে এটা সত্যিই বিরল; লক্ষণীয় যে ইজমা কী তার সংজ্ঞা নিয়েও কোনো ইজমা নেই। অনেক মনীষীই এটা স্বীকার করেন যে, বেশির ভাগ বিষয়েই যেখানে ইজমার দাবি করা হয়, আসলে সেসব ক্ষেত্রে ইজমা নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ: ১৩২৮ খ্রি:)-র মতে "অনেক বিষয়েই যেখানে মানুষ মনে করে যে, সেই বিষয়গুলোতে ইজমা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, সে ব্যাপারে কোনো ইজমা নেই। বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে এমনও আছে যে, বিপরীত মতটাই সঠিক এবং প্রযোজ্য।"[৮৬]

ইজমা আসলে আইন নির্ণয় বা নিরূপণের (derivation) কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়। বরং এটার মুখ্য ব্যবহারিক উপযোগিতা হচ্ছে ইতোমধ্যেই নিরুপিত বা রচিত আইনের বৈধায়নের (validation) জন্য। কোনো কোনো মনীষী ইজমার মর্যাদা বা আসনকে হাদিসের ওপরে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার ইজমার মর্যাদাকে ওঠাতে ওঠাতে একেবারে কুরআনের ওপরে নিয়ে গেছেন, যে সম্পর্কে বিস্তারিত ইজমা-শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে। তবে আরো অনেক প্রখ্যাত ফকীহ আছেন, যেমন আল-আমিদী (উসূলে ফিক্‌হের একজন নেতৃস্থানীয় মনীষী), যিনি ইজমা যে আসলে 'সম্ভাব্যতা' (probability)-ভিত্তিক তা স্বীকার করেছেন।

---

৮৬ Mawdudi, 1983, p. 92, quoting Ibn Taymiyah, Fatawa, Vol. I, (Matba Kurdistan-al-Ilmiya, Cairo, 1326 AH), p. 406.

> সব আলোচনা-বিশ্লেষণের শেষে, এটা প্রতীয়মান যে আমিদী সেই শিবিরে আছেন যিনি ইজমাকে আইনের একটি সম্ভাব্য অনুসূচক (indicator) হিসেবে দেখেছেন, যা নিছক একটি বিশিষ্ট মত ছাড়া আর কিছুরই জন্ম দেয় না। সত্য এই যে, ইজমার ব্যাপারে তার অবস্থান দুই শিবিরের মাঝামাঝি মনে হয়, কেননা তিনি কুরআন এবং বিশেষ করে সুন্নাহ-সংশ্লিষ্ট উৎসগুলোকে সমার্থক ভিত্তি হিসেবে প্রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য করেন। কিন্তু প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) দিক থেকে প্রায় চূড়ান্ত আর চূড়ান্ত এক নয় এবং সব বিচারের পর তিনি ইজমার চূড়ান্ত প্রামাণ্যতার বিষয়টি সম্ভাব্যতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না; তাঁকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, ইজমা প্রকৃতপক্ষে একেকজন মুজতাহিদের ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্ভাব্য (probable) সূচক (indicator)।[৮৭]

চতুর্থ অধ্যায় পুরোটাই ইজমার ওপর, যেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইসলামী আইনের বেশির ভাগের জন্যই কিয়াসকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ফুকাহা এবং ওলামারাও সহজেই স্বীকার করেছেন যে, কিয়াস অপরিহার্যভাবেই (essentially) মানবযুক্তিরই একটি রূপ। সাদৃশ্যমূলক যুক্তি (কিয়াস) ব্যবহৃত হয়ে থাকে দু'টি মুখ্য উৎস– কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র -সংশ্লিষ্টতায়। তা সত্ত্বেও দিনের শেষে কিয়াস একটি মানুষের প্রয়াসভিত্তিক কাঠামো। তাই কিয়াসের ভিত্তিতে যা আমরা পাই তা কোনোভাবেই আসমানি গণ্য করা যেতে পারে না। কিয়াস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

হাদিস যদিও ইসলামের দু'টি মুখ্য উৎসের একটি, এ প্রসঙ্গে কোনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তবে বিবেকের দিক থেকে প্রত্যেক মুসলিমেরই এটা দায়িত্ব যে সব বিষয়ে সে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখবে বা বিচার-বিশ্লেষণ করবে কুরআন এবং সুন্নাহতে বিধৃত হেদায়াতের আলোকে। তবে কুরআন অবশ্যই আসমানি, কারণ এটা যেখানে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে

৮৭ Weiss, 1992, p. 254.

সরাসরি, আক্ষরিক (verbatim) এবং অবিমিশ্র (unadulterated) হিসেবে নাজিল হওয়া, হাদিস একটি ভান্ডার হিসেবে একই আসনের বা মর্যাদার অধিকারী নয়। এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সুরা ফাতিহার পর আল-কুরআনের পরবর্তী সুরাই আল-বাকারা এবং তাঁর শুরুতেই (২য় আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন "এই সেই কিতাব যাতে কোনো 'রাইব' (সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা) নেই"। আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা শুধুমাত্র কুরআনের ব্যাপারেই প্রযোজ্য আর কোনো কিতাব বা উৎসের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। অনেক মুসলিমই একথা শুধু বিস্মৃতই হয়নি, বরং অন্য উৎস বা কিতাবকে কুরআনের সমকক্ষ বানিয়েছে। এই কুরআনি সত্য এবং বাস্তবতা হাদিসের গ্রন্থগুলোর ব্যাপারেও আমাদের মুসলিমদের বুঝতে হবে।

যদিও সহিহ আল-বুখারিকে হাদিসের সর্বাগ্রগণ্য সংগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং তা সঙ্গত কারণেই, তার সংকলনকারী কিন্তু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে বলে যাননি যে, কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনি হাদিসকে মূল্যায়ন করেছেন এবং একেকটি হাদিসকে যাচাই-বাছাই করে তার বিশেষ মানদণ্ডের ভিত্তিতে নিজের সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুত ছয়টি প্রথম কাতারের সংকলন, যেগুলোকে সিহাহ্ সিত্তা[৮৮] বলা হয়, সাধারণভাবে সেগুলোর সংকলকগণ তাদের যাচাই-বাছাই-এর মানদণ্ড প্রকাশ করেননি। তাদের মানদণ্ড কি ছিল তা পরবর্তীকালে অন্য মনীষীরা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন।

> ছয়টি প্রধান হাদিস সংগ্রহের সংকলকদের অধিকাংশই তাদের সংগ্রহের জন্য হাদিস মনোনয়নের মানদণ্ড কি ছিল, তা এখানে সেখানে দু'একটি বাক্যের বেশি উল্লেখ করেননি। তবে তাদের লেখনী থেকে এ ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। হাজিমী এবং মাকদিসী এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেসব বর্ণনাকারীর হাদিস এসব সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা দু'জন হাদিসগুলোর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন, যা থেকে সাধারণ

৮৮ কোন্ ছয়টি গ্রন্থ এই সিহাহ সিত্তার অংশ তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম নিয়ে বিতর্ক নেই। সাধারণত অন্যগুলোর মধ্যে যেগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলো হলো: আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ।

> কিছু পদ্ধতিগত কাঠামো বা নীতিমালা চিহ্নিত করা যায়। হাজিমীর মতে, বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে কিছু মানদণ্ড সংকলকদের মনে নিশ্চয়ই ছিল।[৮৯]

হাদিস সংগ্রহ এবং সংকলনের পরিকল্পিত উদ্যোগ বা প্রকল্প শুরু হয় রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) কয়েক শতাব্দী পরে এবং এতে হাজার হাজার মানুষ জড়িত ছিল। সংকলকরা যে তাদের মানদণ্ড স্পষ্ট বা প্রকাশ করেননি, এটা তো পরিষ্কার। কিন্তু সেই সাথে তাদের ব্যবহৃত মানদণ্ড – তারা যা-ই ব্যবহার করে থাকুন না কেন – তার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য বা তারতম্য ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, সবচেয়ে সম্মানিত দু'টি সংকলনে (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম) অনেক হাদিসই একটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু উভয়টিতেই নয়। এ ব্যাপারটি অন্যান্য হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রেও সত্য।

তদুপরি, বিভিন্ন হাদিসকে গুণগত মানের দিক থেকে ভাগ করা হয় সহিহ (বিশুদ্ধ), হাসান (ভালো), যঈফ (দুর্বল) এবং মাউজু (জাল) ইত্যাদি শ্রেণিতে। যদিও সহিহ বলে যে সমস্ত হাদিসকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলোর ব্যাপারে বেশ মতৈক্য আছে, তেমনি অনেক হাদিস আছে যেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো মতৈক্য নেই। কিছু হাদিসকে কোনো মনীষী সহিহ বলে গণ্য করেন, আবার ঐ একই হাদিসের ব্যাপারে অন্য মনীষীরা ভিন্নমত পোষণ করেন। আবার এটাও সত্য যে, সাধারণভাবে বুখারি এবং মুসলিম এই সংকলন দু'টি সংকলন হিসেবেই সহিহ নামে পরিচিত এবং সহিহ হওয়ার মানদণ্ডে তাঁর সবগুলোই উন্নীত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ দু'টিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি হাদিসই কোনো রকম বাড়তি মূল্যায়ন ছাড়াই গ্রহণযোগ্য বা সঠিক। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের যে পদ্ধতি সংকলকরা প্রয়োগ করেছেন সাধারণভাবে বা systematically তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না হাদিসের ভাষ্য (মতন) কুরআনের সাথে, অন্যান্য হাদিসের সাথে কিংবা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি।

তাই একদিকে যেমন হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ এবং কিছু কিছু মনীষীর রায় সামগ্রিকভাবে হাদিস যে পর্যায়ের নয়, সেই পর্যায়ে উন্নীত করেছে, তারই সমান্তরালে অন্য মনীষীরা এ রায় দিয়েছেন যে, যদি কোনো হাদিস মুতাওয়াতির–

---

৮৯ Azami, p. 90.

এমন হাদিস যা অসংখ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছে– তা না হয়, তাহলে সে হাদিস সহিহ হলেও তা এমন পর্যায়ের জ্ঞান বা তথ্য দেয় যা পরিপূর্ণভাবে সন্দেহাতীত নয়। সেই সাথে হাদিস ভান্ডার ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান ও পথনির্দেশনার জন্য যতই মূল্যবান হোক না কেন, এতে মানুষের অবদান (input) এতটা যে সামগ্রিকভাবে এটাকে আসমানি বিবেচনা করা যেতে পারে কী? এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলো হাদিস সংক্রান্ত (তৃতীয়) অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ইসলামী আইনের বিশাল ভান্ডারের প্রেক্ষাপটে মনে রাখতে হবে যে কুরআনে বিধিবিধান বা আইনি বিষয় খুবই সীমিত এবং সেগুলোও খুবই সাধারণভাবে উল্লিখিত। তাই শরিয়ার অধিকাংশ দিক (এবং যে সমস্ত আইন-বিধি-বিধান শরিয়ার প্রতি আরোপ করা হয়) তার বিস্তারিত দিকের জন্য হাদিসের শরণাপন্ন হতে হয়। অবশ্যই কুরআন যেভাবে আসমানি সেভাবে হাদিস সম্পর্কে দাবি করা যেতে পারে না, কারণ কুরআনের নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী একমাত্র কুরআনই উৎস এবং কিতাব হিসেবে সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে ("যালিকাল কিতাব, লা রাইবা ফিহি", ২/আল-বাকারা/২) এবং সেজন্যই এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে শরিয়া যেহেতু জীবনের সমগ্র দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে যার প্রতিটি দিকের বা বিস্তারিত যা সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে কুরআনের বাইরের উৎসের ওপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে বিস্তারিতের পর্যায়ে পবিত্র (sacred) এবং বাধ্যবাধকতামূলক আইন বা বিধি-বিধান সন্নিবেশিত আছে এ রকম ধারণার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

> শরিয়া হচ্ছে ... মানব কর্মের আসমানি শ্রেণিবিন্যাসে বা আহকামের সমগ্রতা। তবে এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে এই শ্রেণিবিন্যাস বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়নি মানবতার কল্যাণে। সেটা ঠিক। আল্লাহ তার চিরন্তন বাণী (কালাম) - যার গুণ আল্লাহর নিজস্ব সিফাতের সাথে জড়িত– তা মানুষের কাছে নাজিল করেছেন নবিদের মাধ্যমে। যখন কেউ আসমানি জ্ঞানের ভাণ্ডারে সন্ধান করে, সেখানে 'ক বাধ্যতামূলক' (বা সুপারিশকৃত, অননুমোদিত, নিষিদ্ধ ইত্যাদি)– এ ধরনের বাক্য বা নির্দেশনা তেমন একটা পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে, যেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেলে তা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট ভাষ্য যার ভিত্তিতে ইসলামী বিশারদদের নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী নিরুপণ

> করতে হয় যথাযথ শ্রেণিবিন্যাস এবং তার আলোকে সেগুলোর ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হয়। 'বাধ্যতামূলক' এ-জাতীয় বিধি-নির্দেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের গবেষণার ফসল; সেগুলো আসমানিভাবে প্রাপ্ত নয়, যা প্রাপ্ত তা সাধারণভাবে আসমানি শ্রেণিবিন্যাসের জন্য গভীরভাবে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ সূচক (indicator, আদিল্লা)। আল্লাহ তার প্রজ্ঞার আলোকে বেছে নিয়েছেন যে মানুষ এসব সূচকের আলোকে সাধনা করে অনুসন্ধান করবে এবং শ্রেণিবিন্যাসের ভান্ডার সাজাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজে যা সুস্পষ্ট করেননি মানুষ তার সুস্পষ্ট রূপ দেবে (আরটিকুলেট)। এভাবে তিনি মানুষকে অধিকতর সুযোগ দিয়েছেন তাঁর প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শনের এবং তাঁর অনুগ্রহ বা নৈকট্য অর্জনের।[৯০]

তাহলে শরিয়াকে কি সঠিক অর্থে আসমানি বলে গণ্য করা যায়? হতে পারে, যদি শরিয়াকে আল্লাহর আসমানি ইচ্ছা (divine will) হিসেবে দেখা হয়। একজন অন্যতম সমসাময়িক মুসলিম বিদ্বানের ভাষায়: 'চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় বিধান যেমনটা আছে আল্লাহর মনে'।[৯১] এই আঙ্গিকে দেখলে শরিয়াকে অবশ্যই দেখা যেতে পারে 'চিরন্তন' (eternal), 'অপরিবর্তনীয়' (immutable), আসমানি (divine) এবং অভ্রান্ত (infallible) হিসেবে। তবে এটাও তাহলে আমাদের স্মরণ করতে হবে যে আমাদের পক্ষে 'আল্লাহর মন' পড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ অবশ্যই চিরন্তন ও অভ্রান্ত, আর তাই তার মনে যেসব বিধান রয়েছে তাও অপরিবর্তনীয়ই হবে। কিন্তু সেই অভ্রান্ততা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমনকি কুরআন – সর্বশেষ বা চূড়ান্তভাবে নাজিল হওয়া বাণীসংবলিত আসমানি এবং অপরিবর্তনীয় কিতাব – হলেও মানুষ হিসেবে কুরআন নিয়ে আমাদের বোঝা এবং আমাদের ব্যাখ্যা কোনোভাবেই আসমানি বা অপরিবর্তনীয় নয়।

ঐতিহ্যবাদীরা (tradionalists) যদিও আল্লাহ তায়ালার অভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করে, কিন্তু নিজেদের ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি তাঁরা সচরাচর স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না, বা অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেন না।

> ঐতিহ্যবাদের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, যেহেতু তা নিজের অভ্রান্ত হওয়ার পূর্বকল্প (assumption) থেকে যাত্রা শুরু

---

৯০ Weiss, 1992, p. 13.

৯১ El Fadl, 2004.

করে, যারাই তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে (তা কোনো গোষ্ঠী বা পথ বা প্রেক্ষাপট হোক, তার ব্যাপারে তারা প্রায়শই অসহনশীল। যেক্ষেত্রে ভিন্নমতাবলম্বীদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এ ধরনের মানসিকতা তো একেবারেই অবাস্তব। তবু এটা উম্মাহ্‌র অবস্থার উপসর্গস্বরূপ । বস্তুত যে ধারা এত দীর্ঘ সময় ধরে উম্মাহ্‌র চিন্তাভাবনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তা ইসলামের স্বর্ণযুগের ধারণাকে জিইয়ে রাখার এক জোর-জবরদস্তিমূলক তাগিদ। ঐতিহ্যবাদী চেতনা ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং বস্তুগত উন্নতির ধারার সম্পর্ককে উপেক্ষা করে। তাই ইসলামে বিশ্বাস থ াকা সত্ত্বেও, মুসলিম উম্মাহ ক্রমাগতভাবে ব্যর্থতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে।[৯২]

মুসলিম ওলামা এবং ফুকাহা কদাচিত তাদের চিন্তাভাবনা এবং রায়কে প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা (disclaimer)-সহ পেশ করেন। মুহাম্মদ তকী উসমানি, ইসলামী ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে শরিয়া বিশারদ হিসেবে যার চাহিদা সর্বোচ্চ, তিনিও সাধারণত ব্যতিক্রম নন। তবু মানুষ যে আসলেই ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে এক বিরল স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।

... এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যেসব বিধিবিধান পবিত্র হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এবং তার নবির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। অথচ সেই আইনগুলো যখন বিধিবদ্ধ হয় তা মানবিক প্রয়াসের প্রতিফলক, যা অভ্রান্ত নয়, বরং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাময়। এ প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য সব অবস্থাই বিবেচনায় রাখতে হবে এবং ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। মানব বুদ্ধিমত্তা যেহেতু সীমাবদ্ধ, আর তাই আগামভাবে সব সম্ভাব্য অবস্থা আগে থেকেই চিন্তা করতে পারে না, যেকোনো বিশেষ আইন বা বিধিতেই ভুলভ্রান্তি বা দুর্বলতার সম্ভাবনা থেকেই যায়। হুদুদ অর্ডিন্যান্সও এর ব্যতিক্রম নয়। তার খসড়াতেও দুর্বলতা থাকতে পারে। সেখানে এমন কিছু দিক থাকতে পারে যার পর্যালোচনা এবং সংশোধন প্রয়োজন।[৯৩]

---

৯২ AbuSulayman, 1993, p. 5.

৯৩ Usmani, 2006, p. 289.

বাকি রয়ে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কুরআন। কুরআন যে অপরিবর্তনীয় তার অর্থ হচ্ছে, সেখানে এমন কোনো আয়াত নেই যা পরিত্যাগ বা বাদ দেওয়া যেতে পারে।[৯৪] তাই কুরআনে কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধ সাধারণভাবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে।

যেমন, রোজা রাখা প্রতিটি সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর ফরজ। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াতে আমরা এই ফরজের ব্যাপারে বিশদভাবে তেমন কিছুই জানতে পারি না। বিশদ জানতে হলে পরম্পরায় পাওয়া সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হতে হয়, ঐতিহ্যগতভাবে যার মূল ভিত্তি বা উৎস হচ্ছে হাদিস। তাই এ প্রসঙ্গে যত গভীর বা বিস্তারিত পর্যায়ে গবেষণা করা হয় ততই দেখা যায়, কত ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মত, এমনকি অনেক পরস্পরবিরোধী বর্ণনা, যার আলোকে ইজমা অথবা কিয়াস (যেটা যেখানে প্রযোজ্য) প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট বিধান বা মাসয়ালা প্রণীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে যে ধরনের ব্যাপক মতপার্থক্য তা এ জন্যই যে এসব বিধিবিধান নির্ণয় বা প্রণীত হয়েছে মানুষের প্রয়াসের ফসল হিসেবে। এক্ষেত্রে রোজা রাখা যে ফরজ এ বিধানটি অপরিবর্তনীয়। সক্ষম মুসলিমদের ওপর যে রোজা রাখা ফরজ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা আলোচনার অবকাশ নেই। তবে বাকি অনেক বিস্তারিত নিয়মকানুন, যা সরাসরি কুরআন অথবা মুতাওয়াতির হাদিস থেকে সুনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট নয়, সে ব্যাপারে জ্ঞানের অকাট্যতা বা নিশ্চয়তা প্রশ্নাতীত নয়। তার মানে এই নয়, যে নিশ্চয়তার অভাব এ-জাতীয় বিধিবিধানকে সম্পূর্ণ অচল বা অপ্রযোজ্য করে দেয়। তা আদৌ সঠিক নয়। কিন্তু যেখানে শরিয়ার বেশির ভাগ অংশটুকুই মানুষের প্রয়াসের ভিত্তিতে প্রণীত, সেখানে এটা দাবি করা যে শরিয়া আসমানি (আসলে যেখানে বোঝানো হয় ইসলামী আইন), তা সুস্পষ্টতই ভ্রান্ত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, যে অর্থে শরিয়া শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় – অর্থাৎ আইনের ব্যাপ্তি ও সমার্থকতা যা জীবনের সমগ্র দিক অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে আইনের খুঁটিনাটি কোনো আসমানি সূত্র থেকে নির্ণীত নয়, বরং আসমানির মতো (কিন্তু আসমানি নয়, বরং অনেকের মতে সেমি-ডিভাইন)

৯৪ সেই সাথে, কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যা আমরা বিবেচনা করতে পারি রহিত (মানসুখ), এই অর্থে যে মূলত ঐ রহিত আয়াত ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ীভাবে অপ্রাসঙ্গিক অথবা অকার্যকরী হয়ে গেছে। বিষয়টি এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

হাদিস[৯৫] এবং মানব প্রয়াসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎস (ইজমা ও কিয়াস) থেকে নিরূপিত - তা সমগ্রতার দিক থেকে স্পষ্টতই আসমানি নয়।

শরিয়াকে সামগ্রিকভাবে আসমানি হিসেবে দেখার আরো কিছু মারাত্মকভাবে নেতিবাচক দিক আছে যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক আইনসর্বস্ব প্রবণতায়। একজন বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল মনীষী আল-আমিদীর মতে, ইজতিহাদ, যা ইসলামী আইনের অধিকাংশ খুঁটিনাটি দিকের ভিত্তি, তা থেকে পাওয়া যায় অনিশ্চিত (uncertain) জ্ঞান (এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ৩য় অধ্যায়ে)। ইবনে খালদুন, যাকে আধুনিক সমাজতত্ত্বের জনক এবং প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়, স্বীকার করেন যে, সাধারণভাবে তার গবেষণাকর্ম অনুপ্রাণিত হয় ইসলাম দিয়ে, যদিও তা ছিল মূলত আরোহী (inductive) পদ্ধতির ভিত্তিতে। এর তাৎপর্য এই যে, একটি বিশেষ পর্যায়ে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানান্বেষণ পদ্ধতিগত দিক থেকে নিছক অবরোহী (deductive) পদ্ধতি এবং পবিত্র গ্রন্থগুলো নিয়ে অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আরেকজন উল্লেখযোগ্য মনীষী, আল-শাতেবী (মৃঃ ১২৮৮ খ্রিঃ), আরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করেন শরিয়ার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (মাকাসিদ)-কে ভালো করে বোঝার জন্য। তবু পরবর্তীকালে ক্রমাগতভাবে পবিত্র গ্রন্থগুলো থেকে গ্রন্থমুখী (text-oriented) অবরোহন (deduction)-এর ওপর জোর দেওয়াটাই প্রায় একচ্ছত্র ধারায় পরিণত হয় এবং হ্রাসকরণমুখী (reductionist) আইনসর্বস্ব প্রবণতায় পর্যবসিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে।

খ. শরিয়া কি অপরিবর্তনীয়?

আবারও এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য প্রথমে আমাদের নিরূপণ করতে হবে শরিয়ার সংজ্ঞা কী। যে অর্থে সাধারণত ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামী আন্দোলনগুলো যেভাবে তা প্রচার করে, সেই সাথে যেসব দেশ শরিয়া প্রতিষ্ঠার প্রকল্প চালিয়েছে বা চালানোর প্রয়াসে নিয়োজিত তারা যেভাবে শরিয়াকে

৯৫ আসলে আধা-আসমানি বলে কিছু নেই। হয় আসমানি আর না হয় তা নয়। এই দিক থেকে, হাদিস মূলত কোনো আসমানি উৎস নয়। তবে মুতাওয়াতির হাদিস যেহেতু কুরআনের আয়াতের সমতুল্য, তাই সেগুলোর প্রাসঙ্গিক আসমানিত্ব বিবেচনা হতে পারে। মুতাওয়াতির-এর ধারণার প্রাসঙ্গিকতা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

দেখে, সে অর্থে নিলে শরিয়া কোনোভাবেই অপরিবর্তনীয় নয়। তবে ঐতিহ্যবাদীদের দাবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেক মুসলিম ফুকাহা শরিয়াকে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহ (হাদিস)-এর সাথে সমার্থক হিসেবে দেখেন, এ ব্যাপারে এক মনীষী নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেন:

> কুরআনে কিছু আয়াতসহ নবির কিছু হাদিস আছে যা প্রমাণ করে যে উপর্যুক্ত দু'টি উৎসই (কুরআন এবং হাদিস) সর্বজনীন, চিরন্তন, নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয় ... পবিত্র কুরআন এবং রাসুলের সুন্নাহ দুনিয়ার সকল দেশের মানুষের জন্য সর্বজনীন, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় পথনির্দেশনা দেয়। সে হেদায়েত ভৌগোলিক সীমা অথবা ধর্মীয়, বর্ণগত অথবা আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে।[৯৬]

এর বিপরীতে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মাওলানা মাওদুদীর মতে দীন (আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণের সাধারণ অর্থে) অপরিবর্তনীয়, যেমনটি ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায়ে একই ছিল। তবে দীন অপরিবর্তনীয় হলেও, শরিয়া অপরিবর্তনীয় নয়, তার কারণ বিভিন্ন রাসুল - যেমন, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (স.)-এর সময়ে তাদের শরিয়া বদলে গেছে।

> শরিয়ার অর্থ হচ্ছে ধারা বা পথ। যখন তুমি আল্লাহকে সার্বভৌম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছ এবং তার দাসত্ব গ্রহণ করেছ, এবং সেই সাথে রাসুলুল্লাহকে (স.) আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী ক্ষমতাসীন (authority) হিসেবে এবং আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবকে মেনে নিয়েছ, তার মানে হচ্ছে যে তুমি দীনে শামিল হয়েছ। ... তার পর যেভাবে বা পদ্ধতিতে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর আনুগত্যের যে পথে তুমি চলবে তাই হচ্ছে শরিয়া। এই ধারা ও পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ তাঁর রাসুলের মাধ্যমে এবং শুধুমাত্র রাসুলই আল্লাহর মনোনীত এ পথে কীভাবে আমাদের প্রভুর ইবাদত করতে হয় এবং কীভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয় তা শেখানোর দায়িত্বে রয়েছেন। রাসুল আমাদের সৎ এবং ভালো পথে চলা দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আমাদের অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হয়, কীভাবে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়, কীভাবে অন্য মানুষদের প্রতি আচরণ করতে হয় এবং

---

৯৬ Guraya, pp. 2, 9.

সামগ্রিকভাবে কীভাবে আমাদের জীবনযাপন করতে হয়। পার্থক্য হচ্ছে এই যে, দীন যেখানে সবসময়ই এক এবং অভিন্ন ছিল, আছে এবং থাকবে, শরিয়া সেখানে বেশ কয়েকটি এসেছে, বদলেছে এবং রদ হয়েছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন দীনকে অপরিবর্তিতই রেখেছে; নতুন কোনো দীনের অবতারণা করেনি। তবে কিছুটা হলেও বিভিন্ন নবির মাধ্যমে আসা শরিয়া বার বার বদলেছে। নামাজ পড়া অথবা রোজা রাখার বিশদ নিয়মাবলি হয়তো ভিন্ন নবির শরিয়াতে কিছুটা ভিন্ন ছিল। হারাম-হালালের বিধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলি, বিয়ে-তালাক-উত্তরাধিকারসংক্রান্ত আইনকানুনও বিভিন্ন শরিয়াতে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। তাহলেও সবাই ছিল মুসলিম - হযরত নূহের অনুসারীরা, হযরত ইব্রাহীমের অনুসারীরা, হযরত ঈসার অনুসারীরা এবং হযরত মুসার অনুসারীরা – এবং আমরা (হযরত মুহাম্মদের অনুসারীরা)ও সবাই মুসলিম, কারণ দীন সবার জন্যই এক এবং অভিন্ন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে শরিয়ার আহকামের বৈচিত্র্য-তারতম্য দীন অভিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব ফেলে না। দীন একই থাকে, যদিও তা পালন করার ধারা বা রীতি ভিন্ন হতে পারে।[৯৭]

উপর্যুক্ত মত কুরআনের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

তিনি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমি ওহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীন কায়েম করো এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদের যার

---

৯৭ “Let us be Muslims,” online document, retrieved May 15, 2007 from Young Muslims Web Site: http://www.youngmuslims.ca/online_library/books/let_ us_be_muslims/ch2top11.html.

> প্রতি আহ্বান করছ তা ওদের কাছে দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর দিকে অভিমুখি তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।[৯৮]

উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে সব নবিই অভিন্ন দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, শরিয়ার অভিন্নতা নিয়ে নয়। কিন্তু শরিয়া যদি এক একজন নবির উম্মতের জন্য, আমাদের ক্ষেত্রে নবিজি (স.) উম্মতের জন্য অভিন্ন হয়, তাহলে উপর্যুক্ত একই আয়াতে বলা হয়েছে মতভেদ না করতে। আর শরিয়া যদি ইসলামী আইনের অর্থে বিস্তারিত পর্যায়ে হয়, তাহলে একই নবির উম্মতের মধ্যে এত মতভেদ কেন? তাই যারা দাবি বা মনে করে যে শরিয়া, বিশেষ করে বিস্তারিত বিধিবিধানের পর্যায়ে, অপরিবর্তনীয় অথবা চিরন্তন, এই সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে তাদের দাবি নিছক শূন্যগর্ভ, আবেগপূর্ণ, অবিবেচনাপ্রসূত (unscrupulous) এবং অসমর্থনীয় (indefensible)। এই জাতীয় ধারণাই ধর্মীয় শাস্ত্র ও বিধি-বিধানের একটি অনমনীয় ও স্থবির ভান্ডার হিসেবে শরিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশের পেছনে কার্যকর ছিল।

> দশম শতাব্দীতে ইসলামী আইনের বিকাশ পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে। মুসলিম ফকীহদের সাধারণ ঐকমত্য (ইজমা) ইসলামী আইন (ইসলামী জীবনবিধান) সন্তোষজনক এবং সামগ্রিক রূপ পেয়েছে এবং সংরক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন মাযহাবের প্রণীত আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি এবং শাস্ত্রীয় ম্যানুয়ালগুলোতে। এই ঐকমত্যের প্রভাবে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাধীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থাৎ ইজতিহাদ না প্রয়োজনীয় আর না আকাঙ্ক্ষিত। বরং মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে খোদায়ী আইন ভান্ডার যা আগের প্রজন্মের ফকীহ্রা রূপ দিয়েছেন নিছক সেই অতীতের অনুসরণ বা অনুকরণ (তাকলীদ) করা। ফকীহ্দেরও আর নতুন সমাধান সন্ধান, নতুন বিধিবিধান প্রণয়ন অথবা ফিকাহর গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজন নেই। বরং তাদের কাজ হচ্ছে পূর্বরচিত আইন গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন এবং তার বিশদ ব্যাখ্যাদান ও টীকা-টিপ্পনী লেখা। ইসলামী আইন, যা মূলত একটি গতিশীল ও সৃজনশীল ধারার ফসল, তা ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে

৯৮ আল-কুরআন (আশ-শুরা) ৪২:১৩।

> একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। কিছু কিছু মনীষী, যেমন ইবনে তাইমিয়া (মৃ: ১৩২৮ খ্রি:) এবং আস-সূয়ূতী (মৃ: ১৫০৫ খ্রি:), এ ব্যাপারে মতদ্বৈধতা পোষণ করলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ মত পরিণত হয় ঐতিহ্যবাদী ধারণায় যা বড় কোনো আইনসংক্রান্ত উন্নয়নকে নিষিদ্ধ মনে করে। মাযহাবগুলোর অবদানের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে শরিয়ার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়েছে সমাজের জন্য একটি আইনি নকশায় (blueprint), এ ধারণা ঐতিহ্যবাদকে ধর্মীয় দিক থেকে অলঙ্ঘনীয় হিসেবে দেখার বিষয়টিকে আরো দৃঢ় করে; পরিবর্তন অথবা উদ্ভাবন (innovation)-কে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড থেকে শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি বা বিকৃতি হিসেবে দেখা শুরু হয়। উম্মাহ্‌র আইনকানুন এবং অনুশীলনের ধারার পরিবর্তে উদ্ভাবন অথবা বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া খ্রিষ্টবাদে যেমন ধর্মচ্যুতি (heresy) তার সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়।[৯৯]

যদিও ঐতিহ্যবাদী চিন্তাধারায় শরিয়াকে অলঙ্ঘনীয়তার মর্যাদায় আসীন এবং কার্যত: এটাকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হয়, এর বিপরীতে ফুকাহা বা ওলামা আছেন যারা স্বীকার করেন যে, শরিয়ার ব্যাপক অংশ পরিবর্তনীয়, প্রেক্ষাপটের আলোকে এবং নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে: "বিধান পরিবর্তন হয় সময় এবং স্থান সাপেক্ষে।"[১০০] তকলীদপন্থিদের সমান্তরালে, অন্যান্য ফুকাহা ও ওলামা আইনকানুন, বিধিবিধানের ভান্ডার সমসাময়িক রাখার সাধনার অংশ হিসেবে ইজতিহাদের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। তাদেরই ধারায় আমাদের সমকালীন ফুকাহা, যারা আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তত্ত্ব-জগতের আইন আর বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যে প্রয়াস শরিয়ার অপরিবর্তনীয় হওয়ার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি নবিজির (স.) সাহাবিদের সময়েও গতিশীলতা ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই, ইবাদত-উপাসনা সংক্রান্ত বিষয়াদির বাইরে, প্রায়োগিক পর্যায়ে বিস্তারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে, সুন্নাহ অপরিবর্তনীয়তার

৯৯ Esposito, p. 84. উল্লিখিত সাল খ্রিষ্টাব্দের হিসেবে।

100 Zahraa, "taghaiyur al-Ahkam bitaghaiyur al-zaman wa al-makan". 2000, quoting Ibn Qayyim al-Jawzi, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'alamin, Al-Maktabah al-Asriyyah, Beirut, 1987, Vol. 3, pp. 14-70.

ধারণার বিপরীত। এ ব্যাপারে ইবনে কাইয়েম (মৃ: ১৩৫৬ খ্রি:) একটি উদ্ভাসনকারী দিক তুলে ধরেছেন:

> ওমর ইবনে খাত্তাব রায় দেন একটি ক্ষেত্রে যেখানে একজন মহিলা মৃত্যুবরণ করে এবং তার স্বামী, মাতা, দুই পূর্ণ ভ্রাতা এবং দুই বৈপিত্রেয় ভ্রাতা রেখে যায়, এরকম একটি ক্ষেত্রে ওমর ইবনে খাত্তাব রায় দেন যে, উত্তরাধিকারের এক-তৃতীয়াংশ বণ্টন হবে পূর্ণ এবং অর্ধভ্রাতা সবার মাঝে সমানভাবে। একজন লোক ওমরকে বলল 'আপনি অমুক বছর কিন্তু এরকম করেননি।' ওমর জবাব দিলেন: 'সেই রায় ছিল তখন যেভাবে আমরা বিচার-বিবেচনা করেছি, আর এই রায় আমাদের এখনকার বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।'[১০১]

তাই ইসলামের মৌলিক নীতি ও আদর্শ অপরিবর্তনীয় হলেও, সেসব নীতিমালা ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত আইন বা বিধান অনড় বা স্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় এরকম ধারণা ভ্রান্ত।

> মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মকাণ্ডের জন্য স্থান-কাল নির্বিশেষে একটি কঠোরভাবে অনড় কাঠামো পেশ করা নবিজির (স.) মিশন ছিল না। বরং তিনি তাঁর সাহাবাদের পথনির্দেশনার সাধারণ নকশা দিয়েছেন যা তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার পরিমার্জিত কাঠামো গড়ে নিতে সহায়তা করবে। সাহাবিদের কর্মকাণ্ডে এ জাতীয় নমনীয়তা (ফ্লেক্সিবিলিটি) দেখা যায়। তাঁরা একই বিষয়ে মিসরে যা করেছেন, তা হয়তো ভিন্ন ছিল সিরিয়াতে এবং আরো ভিন্ন হয়তো ইরাকে।[১০২]

গ. শরিয়া আর ইসলাম কি সমার্থক এবং শরিয়া কি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান?

এ পর্যন্ত পেশ করা আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, শরিয়া আর ইসলাম পুরোপুরি সমার্থক নয়। মজার বিষয়, "শরিয়া নিছক ইসলামেরই অপর নাম"– এ মন্তব্যটি করেছেন খুরশীদ আহমদ, মাওলানা মওদূদীর

101 Ibid., p. 184, quoting Ibn Qayyim al-Jawziya. Op. Cit., Vol. 1, pp. 110-111.

১০২ Guraya, p. 58. শরিয়ার অভ্রান্ততার ধারণা আমাদের চেতনার এত গভীরে গাঁথা যে তাঁর বইয়েরই অন্য এক জায়গায় গুরায়া স্ববিরোধিতা দেখিয়ে বলেন: "পবিত্র কুরআন এবং নবিজির (সা.) সুন্নাত বিশ্বের সব দেশের জন্য সর্বজনীন, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়" [p. 9; গুরুত্ব দেখানো এই লেখকের পক্ষ থেকে]

অন্যতম ভাবশিষ্য। মওদূদীর চিন্তা যে এর বিপরীত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর মত অনুযায়ী দীন (অর্থাৎ ইসলাম) সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অপরিবর্তিত আছে, যা শরিয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। স্পষ্টতই হয় খুরশীদ আহমদ তাঁর ভাবগুরু (মেন্টর)-এর সাথে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন, আর তা না হলে এটা নিশ্চয়ই তার আবেগতাড়িত বাগাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি (rhetoric) যা হয়তো লেখার সময় একজন লেখকের পর্যাপ্ত সতর্কতার অভাবের পরিচায়ক।

শরিয়া কি "পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান"-এর কাঠামো? আবারও এ বিষয়টি বুঝতে হলে আগে আমাদের নিরূপণ করতে হবে "পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান" এই কথার মানে কী? এ ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদীরা কি মনে করেন আগে তা তুলে ধরা যাক।

> "উপাসনা, নাগরিক আইন, বিবাহ-তালাকের বিধান, উত্তরাধিকার আইন, আচার-আচরণের মানদণ্ড, কী পান করা মানা, কী পরিধান করা যেতে পারে বা পারে না, কেমন করে ইবাদত-বন্দেগী করতে হয়, শাসন-পরিচালনার নীতিমালা, কখন যুদ্ধ করা যেতে পারে, কখন শান্তিমুখী হওয়া আবশ্যিক, অর্থনৈতিক বিধিবিধান এবং বেচাকেনা বা লেনদেনের পথনির্দেশনা - এ সবের জন্যই ইসলাম সুস্পষ্ট একটি ব্যবস্থা বা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।"[১০৩]

> "অন্য ধর্মগুলোর তুলনায় ইসলাম কেন সহজেই পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের শিকারে পরিণত হয় তার দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, ইসলাম জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে এবং এ কারণেই একজন মুসলিমের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব এই ধর্মের ওপর আরোপ করা হয়।"[১০৪]

> "৭০'-এর দশকের দিকে, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এবং বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব স্বাগতিক দেশে ইসলামী গোষ্ঠীগুলো

১০৩ "A Complete Code of Life," from Muhammad Al Alkhuli. "The Need for Islam", retrieved May 25, 2007, https://en.islamway.net/article/8169/a-complete-code-of-life.

১০৪ Luni, 2006.

নিজ নিজ দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছিল।" [১০৫]

"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং সমগ্র জীবনটাই এর আওতাভুক্ত। এটি একটি বিশ্বাস, ব্যবস্থা, একটি ঐতিহ্য, উপাসনার রীতি এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য শান্তি ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করে। [১০৬]

"মুসলিমদের প্রেক্ষাপটে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হচ্ছে: (ক) ধারণা যে ধর্ম সঠিক এবং সুনিশ্চিত ভিত্তি (premise) দেয়, মুসলিমরা নিয়মিতভাবে যার শরণাপন্ন হয়, অথচ যার ভিত্তিতে নিরূপিত আইন প্রায়শই হয় বৈষম্যপূর্ণ; এবং (খ) একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামের সাথে উসূলে ফিকহের ওতপ্রোত (symbiotic) সম্পর্ক। এই সম্পর্কটির প্রতিফলন পাওয়া যায় মুসলিমদের সাধারণ দাবি ও ভাষ্য যে 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' – এটা বোঝাতে যে ধর্মে যাবতীয় বিধিবিধান ইতোমধ্যেই নিরূপিত বা প্রণীত হয়েছে। স্পষ্টতই ইসলামের মুখ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে কুরআন তো নয়ই, এমনকি হাদিসও (নবির কর্মকাণ্ড এবং ভাষ্য) কোনো কানুনী ভাণ্ডার নয়, যদিও দুটো উৎসেই মানুষের জীবনের জন্য প্রচুর বিধিবিধান রয়েছে। তথাপি ইসলামী পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত হয়ে, উসূলে ফিকহ মুসলিম মনীষার অঙ্গনে এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, একজন প্রথিতযশা মুসলিম পণ্ডিত, সাইয়েদ হোসেইন নাসর, এভাবে বলতে পারেন: 'শরিয়া হচ্ছে সেই আসমানি আইন যা গ্রহণ করার মাধ্যমে একজন মুসলিম হয়। শুধু সে ব্যক্তিই মুসলিম যে শরিয়ার বিধিবিধানগুলোকে নিজের ওপর আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করে।[১০৭]

---

১০৫ Sarker, 1999.

১০৬ Qazi Hussain Ahmed, "Islam & Politics," retrieved July 2, 2006, from Jamaat Web site: http://www.jamaat.org/qa/politics.html. তিনি জামায়াতে ইসলাম, পাকিস্তান-এর আমীর ছিলেন।

১০৭ Shaheed, 1994.

ইসলাম একটি 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' এ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত ভাষ্যগুলোতে এটা প্রস্তাবিত যে, জীবনের সমগ্রতায় ইসলামের পথনির্দেশনা রয়েছে এবং তার একটি প্রাসঙ্গিক নিহিতার্থ (implication) হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক বিষয়, অবস্থা বা সমস্যার জন্য ইসলামে সমাধান তৈরি রয়েছে। এতে আরো একটি নিহিতার্থ হচ্ছে যে, যেহেতু ইসলাম এমনই একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন চলার পথ, যে ব্যাপারে পথনির্দেশনা বা সমাধানের জন্য মুসলিমরা যেন অন্য আর কোনো উৎসের দিকে হাত না বাড়ায়।

> যেহেতু ইসলামী আইন একটি বিস্তীর্ণ (comprehenstive) এবং পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত একটি একক (unit), এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার প্রয়োগ অভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে হতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের সমাহার প্রয়োগ করা ইসলাম স্বীকার করে না।[১০৮]

ইসলাম অনুযায়ী জীবন একটি অবিভাজ্য সমগ্র; তাই মুসলিমদের বিশ্বাসে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান'-এর ধারণাটা খুবই স্বাভাবিক। অর্থনীতি চালানোর জন্য মুসলিমরা নিছক পুঁজিবাদ ধার করতে পারে না, অথবা রাজনীতির জন্য নিছক গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতির জন্য জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি যা আন্তঃপরিবর্তনযোগ্য (interchangeable) অংশ হিসেবে একটি ককটেল মতবাদ অথবা ব্যবস্থার রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে না।[১০৯] জীবন একটি অখণ্ড সমগ্রতা বিবেচনা করে তার সঙ্গতি ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইসলাম মৌলিক পথনির্দেশনা দেয়। তবে জীবনে মুসলিমরা যত বিষয়ের বা সমস্যার সম্মুখীন হবে ইসলাম তার বিশদ এবং সুনির্দিষ্ট, তৈরি (ready made) সমাধান-কোষ (ম্যানুয়াল) এরকম ধারণা সঠিক নয়।

---

১০৮ Zahraa, p. 170

১০৯ এই ধরনের ককটেলের দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে: (ক) লিবিয়ার মরহুম সাবেক একনায়ক মুয়াম্মার গাদ্দাফীর 'সবুজ বই' যা তাঁর মতাদর্শের প্রতিফলক ছিল। এই মতাদর্শ ছিল 'জনগণের ক্ষমতা, সমাজতন্ত্র এবং তৃতীয় সর্বজনীন তত্ত্বের সামাজিক ভিত্তি'। কখনো কখনো তার ককটেল মতাদর্শকে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' (Islamic socialism) বলা হয়। (খ) আরেকটি উদাহ্রণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় মরহুম সুকর্নোর পঞ্চশীলা: জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ (সমান সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে একটি), প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র (সব গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব), সামাজিক সুবিচার (মার্কস্-এর প্রভাবিত), এবং এক আসমানি অস্থিত্ব যা পরম অদ্বিতীয় (ধারণাটিতে সেক্যুলার প্রভাব রয়েছে)।

আরেকটি নিহিতার্থ, যা সচরাচর স্পষ্ট করে বলা হয় না, তা হচ্ছে যে, যত সমস্যা বা প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে তা ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যার সমাধান হয় পবিত্র গ্রন্থগুলোতে নির্দিষ্ট আছে অথবা আমাদের ইসলামী বিশারদরা তা বের করে ফেলেছেন। এই আঙ্গিক থেকে অন্যদের থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বা আহরণ করার মতো কিছু নেই। যত সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক শাসন-সংক্রান্ত সমস্যা আছে বা (বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত দিক ছাড়া) যত রকমের সমস্যার কথা চিন্তা করা যেতে পারে, সেগুলোর সমাধানের জন্য প্রয়োজন নিছক প্রধান ইসলামী গ্রন্থ/উৎস দু'টি (কুরআন এবং হাদিস) অথবা আমাদের মনীষীদের লেখনী ভান্ডার ঘেঁটে দেখা, অথবা ফতোয়া কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট টেলিফোন হটলাইনের সাথে যোগাযোগ করলেই হলো – এর কোনো না কোনোটিতে সমাধান ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবতা আসলে আদৌ তা নয়। এটা বলা বাহুল্য যে, সব সমস্যা যদি ইতোমধ্যেই জানা থাকত আর তার সমাধানও থাকত, আর সে সমাধানগুলো সব ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকরী হতো, তাহলে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এমন করুণ ও শোচনীয় হতো না। গতানুগতিক মুসলিম চিন্তাধারার একটি অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে বিবিধ গ্রন্থাদির ওপর অতিমাত্রার নির্ভরতায় কিতাবের জগতে সীমাবদ্ধ থাকা, যে বিষয়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কেমন করে এই সৃষ্টজগতের সূচনা করেছেন তা বোঝা সম্ভব নয় নিছক গ্রন্থজগতে মাথা গুঁজে রাখার মাধ্যমে। বিশেষ করে যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন:

> قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
>
> "বল, তোমরা দুনিয়াজুড়ে ঘুরে দেখ কেমন করে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন; তেমনি তিনি পরবর্তীকালে আরেক সৃষ্টি করবেন, আর আল্লাহ তো অবশ্যই সব কিছুর ওপর শক্তিমান।"[১১০]

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে এই আদেশ করেননি যে "তোমরা আসমানি, পবিত্র বা সঠিক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করো"; বরং তার আদেশ: "দুনিয়াময় ভ্রমণ করো

১১০ আল-কুরআন (আল-আনকাবুত) ২৯:২০।

... এবং দেখ"। তথাপি, বিজ্ঞানের জগত যেখানে এগিয়ে চলল মুসলিমদের মৌলিকভাবে পেছনে ফেলে, ওলামা-ফুকাহা এবং অন্যান্য শরিয়াপন্থি মুসলিম মনীষীরা সাধারণভাবে আপামর মুসলিম জনগণকে পবিত্র গ্রন্থাদির সাথে আঁঠার মতো সংযুক্ত রাখলেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার ভূমিকা শ্রেয়তর হতো যদি তারা গ্রন্থাদির ভিত্তিতেই গ্রন্থগুলোর সমান্তরালে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও মহিমা যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই প্রকৃতি জগতের মহত্ত্ব বুঝত এবং সে লক্ষ্যে বিশ্বজগতকে অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ করত:

> الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِير
>
> [মহামহিমান্বিত] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করে দেখার জন্য – কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
>
> যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?
>
> অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[১১১]

কুরআন যেখানে আমাদের মহাশূন্য দেখা বা অনুসন্ধানের আহ্বান জানালো, সেখানে আমরা কিতাবের তিলাওয়াত আর তার মধ্যে মাথা গুঁজে চললাম। সমস্যার প্রেক্ষাপটটা আসলে ইসলাম সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত স্থবির ধারণা, যেখানে গ্রন্থভাণ্ডার আর সংশ্লিষ্ট বিশারদ এবং বিদ্বানদেরহ সব প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধানের জন্য শব্দকোষ (dictionary) হিসেবে দেখা হয়। শব্দকোষে যেমন প্রয়োজনীয় শব্দের জন্য যথাযথ পৃষ্ঠা বের করে সে শব্দ খুঁজে নিতে হয়, তেমনি এটা ধরে নেয়া হয় যে, যেসব শব্দ খোঁজা হচ্ছে সেগুলো সেখানে ইতোমধ্যেই রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইসলাম শব্দকোষের সমতুল্য নয়; বরং বর্ণমালার (alphabet) সমতুল্য। খুঁজে পাবার জন্য শব্দকোষে একটি ভাণ্ডার তো

---

১১১ আল-কুরআন (আল-মুল্‌ক) ৬৭:৩-৪

রয়েছে, আর যা নেই তা বর্ণমালার ভিত্তিতে গড়ে নিতে হয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, এ ধারণা পোষণ করাটা অনেকটা ইসলামকে শব্দকোষ হিসেবে দেখা ও ব্যবহার করার সমতুল্য, যার পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড জীবাশ্মের মতো হয়ে অতীতমুখিতার শিকার হয়েছে। এর বিপরীতে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান এ বিষয়টি যদি বর্ণমালা (মৌলিক নীতি বা নির্মাণ-ব্লক) হিসেবে দেখা হয় তাহলে জীবনের সামগ্রিক পর্যায়ে বিবিধ সমস্যা বা বিষয় নিয়ে সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সংস্কার আসবে। এই পরিবর্তিত ধারা ক্রমশ গতিশীলতা ও কার্যকারিতা আনবে। এই আঙ্গিক থেকে কুরআন আবারো অধিষ্ঠিত হবে মৌলিক পথ নির্দেশনার উৎসের মর্যাদায় যার আলোকে বিশদ পর্যায়ের সমাধান বের করে নিতে হবে। যেমন শাতেবী বলেছেন:

> ... অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে কোনো আলেম কুরআনের শরণাপন্ন হয়েছে কোনো সমস্যা সমাধানের সন্ধানে, সে কুরআনে কোনো না কোনো প্রাসঙ্গিক নীতি (principle) পেয়েছে যা তাকে যে বিষয়ে সে সন্ধান করছে সে ব্যাপারে কিছু না কিছু নির্দেশনা যোগাবে।[১১২]

ঘ. শরিয়া আর আইন কি সমার্থক?

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, শরিয়াকে প্রায়শই 'আইন'-এর সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। যে কারণে শরিয়া আর ফিকহের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান থাকে না। বস্তুত "শরিয়া=ইসলামী আইন", এই সমীকরণটি ব্যাপক ভ্রান্তির পরিচায়ক। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে কেমন করে শরিয়া এবং আইনকে পাশাপাশি সমার্থক হিসেবে রাখা হয়েছে তা লক্ষণীয়।

> "ইসলামী আইন (শরিয়া)-র নিয়মাধীনে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দু'টি মূল শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: ..."[১১৩]

> "HSBC-তে আমরা সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান পেশ করতে।

---

১১২ Kamali, p. 37, quoting Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, III, 219.

১১৩ "Companies in Islamic (Shariah) Law," Gulf-Law.com, http://www.gulf-law.com/uaecolaw_shariah.html.

HSBC Amanah ইসলামী ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সমাধান সরবরাহ করে থাকে, যার পেছনে রয়েছে আপনার স্থায়ী মূল্যবোধ আর আমাদের আর্থিক পারদর্শিতার সমন্বয়। এখন আমাদের গ্রাহকরা HSBC-র সাথে পেতে পারেন বিশ্বজুড়ে ব্যাঙ্কিং সুযোগ-সুবিধা, যেখানে শরিয়া (ইসলামী আইন)-এর ব্যাপারে কোনো আপোষ করতে হবে না।"[১১৪]

"শরিয়া পরিভাষাটি বোঝায় ইসলামী আইন যেমনটি নাজিল হয়েছে কুরআনে এবং হযরত মুহাম্মাদের জীবন-দৃষ্টান্তে।[১১৫]

"শেখ তাকি উসমানিকে এই ক্ষেত্রের একজন অগ্রদূত গণ্য করা হয় এবং তিনি HSBC এবং CitiBank-এর মতো ব্যাংকের শরিয়া (ইসলামী আইন) বোর্ডের প্রধান।"[১১৬]

"ফিক্হ: আক্ষরিক অর্থে অনুধাবন বা উপলব্ধি; আসমানি আইনশাস্ত্র, শরিয়া সম্পর্কে মানব জ্ঞানের সমগ্রতা; ইসলামী আইন বা উসূল শাস্ত্র।"[১১৭]

শরিয়া এবং ইসলামী আইনকে এরকম সমীকরণের কাঠামোতে দেখা ইসলাম নিয়ে একটি গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তির পরিচায়ক। ধর্ম বা দীনকে যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই বিভ্রান্তির সৌধের ওপর তারা এ বিষয়টিকে আরো জটিল করে ফেলেছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি শরিয়া জীবনের সমগ্রতার জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, তা পুরোপুরি আইনের বা আইনের জগতের ব্যাপার নয়। যেমন– অজু, নামাজ, রোজা, ইত্যাদি কোনো আইনের বিষয় নয়। ইসলামী পথনির্দেশনার সব কিছুকেই আইনের ছকে ফেলা বা আইনের দৃষ্টিতে দেখা ইসলামের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

---

১১8 FAQs about Islamic Banking, retrieved August 5, 2006, from HSBC-Amanah Web site: http://www.hsbcamanah.com/hsbc/amanah_banking/faqs.

115 Lender's Shariah Advisors. Retrieved August 16, 2006, from Islamicmortgages Web site: http://www.islamicmortgages.co.uk/lendersshariahadvisors.html.

১১৬ "Islamic solution to ending third world debt." Event announcement introducing Mufti Muhammad Taqi Usmani, re-trieved August 22, 2006, from MakePovertyHistory Web site: http://www.makepovertyhistory.org/mph/ event/view/details.do?id=1112063.

১১৭ Jackson, (n. d.).

> সাধারণত যখন ইসলামী পণ্ডিতরা 'ইসলামী আইন'-এর কথা বলে, ধরে নিতে হয় যে তারা বলছে সেই জিনিসের কথা যা আরবিতে বলে আল-শরিয়া বা আশ-শার'। বস্তুত তারা প্রায়শই শরিয়া এবং ইসলামী আইনকে সমার্থক হিসেবে একটির জায়গায় অন্যটি ব্যবহার করে। তবে শরিয়া ও ইসলামী আইনকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা এক ধরনের অতিসরলীকরণ। শরিয়ার সমগ্রতার মাঝে অবশ্যই আইনকানুন আছে, কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, শরিয়ার এমন অনেক দিক আছে যা সত্যিকার অর্থে আইনের পর্যায়ে পড়ে না।[১১৮]

বস্তুত ইসলাম যে আরো ব্যাপক এবং শরিয়ার গণ্ডি যে আইনের চেয়ে আরো ব্যাপ্ত তা কুরআন থেকেই জানা যায়:

> ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
>
> এমনিভাবে আমরা তোমাকে সঠিক পথে [আরবিতে: শরিয়াতিম মিনাল আম্‌র]-এ প্রতিষ্ঠিত করেছি: সে পথই অনুসরণ কর; যারা অজ্ঞ তাদের খাহেশমতো চলবে না।[১১৯]

উল্লেখ্য যে, কুরআনে শুধুমাত্র এই একটি জায়গাতেই শরিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এটাকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে অর্থটি নিছক আইনের চেয়ে অবশ্যই অনেক ব্যাপক। তাছাড়া এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কী পর্যায়ে, যখন রাসুলুল্লাহ (স.) তখনো কোনো আইন, বিধান, অথবা ফরজ কোনো উপাসনা অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে আবশ্যিক কিছুর প্রবর্তন করেননি। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ব্যাখ্যা করেছেন:

> শরিয়ার যথার্থ অনুবাদ হচ্ছে 'সঠিক ধর্মপথ', যা নিছক মদিনার পর্যায়ে প্রবর্তিত আনুষ্ঠানিক ইবাদত-উপাসনা এবং আইনকানুনের চাইতে অনেক ব্যাপক যেগুলোর ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে কুরআনে এই মক্কী আয়াত নাজিল হওয়ার অনেক পর।[১২০]

---

১১৮ Weiss, p. 1.

১১৯ আল-কুরআন (আল-জাসিয়া) ৪৫:১৮।

১২০ Ali, A. Y., n #4756.

আদী ইবনে আদীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (যিনি দ্বিতীয় উমর নামেও পরিচিত; মৃ: ৭২০ খ্রি:)-এর ব্যাখ্যাটি এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে, কারণ তিনি শরয়ী-কে ফারাইজ, হুদুদ এবং সুন্নাহ থেকে আলাদা করে দেখেছেন। তাই খলিফা হিসেবে তিনি এসব বিষয়কে শরিয়ার অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করেননি।

> উমর ইবনে আবদুল আজিজ আদী ইবনে আদী-কে লেখেন: 'বিশ্বাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ফারাইজ (অবশ্যকরণীয়), শরয়ী (বিধান), হুদুদ এবং সুন্নাহ, এবং যে-ই এসব মেনে চলবে তার বিশ্বাস পরিপূর্ণ এবং যে তা করবে না তার বিশ্বাস অপরিপূর্ণ।'[১২১]

উল্লেখ্য যে, সহিহ বুখারির স্বীকৃত অনুবাদে শরয়ী-র ভাষান্তর করা হয়েছে 'আইন' হিসেবে; কিন্তু তা উমর ইবনে আবদুল আজিজের ভাষ্যকে অসঙ্গতিপূর্ণ করে; কারণ, তিনি স্পষ্টতই ফারায়েজ আর হুদুদ থেকে শরয়ীকে আলাদা করে দেখেছেন। কেমন করে পরবর্তী প্রজন্মের প্রবণতা এবং সংস্কার পূর্বকালীন চিন্তা ও উৎসগুলোর ওপরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এটা তার দৃষ্টান্ত। তেমনি, ইমাম শাতেবীও শরিয়াকে ইসলামী আইনের সমার্থক হিসেবে গণ্য করেননি।

> ইমাম শাতেবী, একজন মালিকী ফকীহ, তার সর্বাগ্রগণ্য গ্রন্থ, আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূল আল-শরিয়া-তে শরিয়ার সাধারণ কাঠামোর ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে শরিয়ার মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে যেগুলোকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে: আইন (যা শরিয়ার মুখ্য লক্ষ্য), গ্রন্থভিত্তিক সত্যতা প্রতিপাদনকারী যুক্তি প্রমাণ (দলিল) এবং ইজতিহাদ। এর অর্থ এই যে শরিয়াকে নিছক আইন হিসেবে দেখা উচিত নয় ...[১২২]

বস্তুত, লিলি জাকিয়া মুনীর, একজন নেতৃস্থানীয়া ইন্দোনেশিয়ান মানবাধিকার কর্মী এবং ইসলামী চিন্তাবিদ-এর মতে কুরআন নিজে আইনের কোনো ম্যানুয়াল নয়।

---

১২১ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-Iman, Bab al-Iman wa qawlinnabi 'bunyal islam al-khams', p. 57.

১২২ Munir, (n.d.), p. 4.

কুরআন নিজেকে আল-হুদা বা পথ-নির্দেশনা হিসেবে অভিহিত করে, একটি আইন-বিধানকোষ হিসেবে নয়। সর্বমোট ৬,২০০ আয়াতের মধ্যে, এক-দশমাংশ বা তারও কম আইন বা আইনশাস্ত্র সংক্রান্ত; বাকিটা বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিশ্বাসের পাঁচটি বুনিয়াদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে। এর আইন-কানুনসংক্রান্ত আধেয় (content)-সহ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিচারের ধারণা, সে সবই কুরআনের ধর্মীয় আহ্বানের অধীনস্থ। কুরআনে ৩৫০টির মতো আহকামসংক্রান্ত আয়াত রয়েছে, যার অধিকাংশই নাজিল হয়েছে বাস্তব সমস্যার প্রেক্ষাপটে সমাধান হিসেবে। আহ্কামসংক্রান্ত কোনো কোনো আয়াত এসেছে বিশেষভাবে আপত্তিজনক কিছু প্রথা, যেমন শিশুহত্যা, রিবা, জুয়া এবং অবাধ বহুবিবাহ ইত্যাদি বাতিলের লক্ষ্যে। অন্য কিছু আয়াত কুরআন যেসব সংস্কার এনেছে সেগুলো লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান হিসেবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আরব সমাজের বেশির ভাগ প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান কুরআন বজায় রাখে এবং শুধু কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কার আনে।[১২৩]

যদিও আইন-কানুনসংক্রান্ত আয়াতগুলো সমগ্র কুরআনের মাত্র অল্প কিছু অংশ, তবু আইনি প্রবণতা কুরআনকে পর্যবসিত করে ফেলেছে যেন আইনের একটা সমাহার হিসেবে।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ফিকহকে প্রায়শই দেখা হয় ধর্মের নিজের প্রতিফলন হিসেবে। তাই ফিকহের ভূমিকা সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত হতে থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মের ভূমিকার বাড়া এবং কমার সাথে। যেসব দেশে শরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে, সেখানে সমাজের অংশ হিসেবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের নিয়ন্ত্রণে ফিকহ একটি প্রধান শক্তি (অথরিটি)র আসনে অধিষ্ঠিত। অন্যদিকে, সেক্যুলার দেশগুলোতে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক হিসেবে ফিকহ একটি অভ্যন্তরস্থ (ইন্টারনালাইজ্ড) শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১২৩ Munir, p. 8.

> ফিকহকে প্রায়শই শরিয়ার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। শরিয়া সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ হিসেবে আরো ব্যাপক, যার অন্তর্ভুক্ত সব কিছুই: নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা থেকে আনুষ্ঠানিক উপাসনা ... এ থেকে স্পষ্ট যে ফিকহ আসলে শরিয়ার একটি অংশ।[১২৪]

যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা আর-রাহমান এবং আর-রাহিম এবং তিনি মানবতার জন্য পথনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, সেই ব্যক্তি তো সে হেদায়েত থেকে সর্বোচ্চ-সম্ভব উপকারিতা আহরণ করতে চাইবে। কিন্তু সবকিছুকেই আইন-বিধানে পরিণত করা মানুষের জীবনে একটি অসমীচীন কঠোরতা আরোপ করে, যা ফিতরা বা সহজাত মানব প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কুরআন বিশ্বাসীদের তাগিদ দেয় কবিরা বা বড় গুনাহ্গুলোকে পরিহার করে চলার জন্য। তার মানে এই নয় যে আল্লাহ তায়ালার বান্দারা অন্য গুনাহগুলোকে হালকা করে দেখবে, কিন্তু সবকিছুকে আইনের দৃষ্টিতে দেখা অবশ্যই কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি।

> إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا
>
> তোমাদের যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর (কবিরা) তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।[১২৫]
>
> আবু হুরায়রা (রা.) নবি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা নবিদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবিদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোনো বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমতো পালন করো।[১২৬]

---

১২৪ Munir, p. 11.

১২৫ আল-কুরআন ৪/আন-নিসা/৩১।

১২৬ Al-Bukhari, Vol. 9, #391, https://sunnah.com/bukhari:7288.

এই আদেশ-নিষেধগুলো থেকে কি প্রতীয়মান হয় যে জীবনের সবকিছুই আইনের পরিসরের মধ্যে পড়ে? ইসলামের আক্ষরিক ধারণা যা জীবনের প্রতিটি বিষয়কে আইনের কাঠামোতে দেখে তা কি মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা প্রয়াস চালানোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? নিম্নলিখিত হাদিসটি এ বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে দেয়।

> আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (স.) ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার ওপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত থাক এবং রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।[১২৭]

তদুপরি, কুরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর পথনির্দেশনাকে বিকৃত করার পর বনি ইসরাইল-এর পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য।

> ইহুদি জাতি আইনসর্বস্বতা এবং আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদের নিয়মকানুনের আতিশয্য, কুরআনের ভাষায়, জীবনের নৈতিক ও বাস্তব দিকের সুস্থ বিকাশে শিকল অথবা ফাঁসির দড়ির মতো প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।[১২৮]

বস্তুত ইসলাম অথবা শরিয়াকে ফিক্হ বা ইসলামী আইনের গণ্ডির মধ্যে সংকুচিত করে ফেলার কিছু মারাত্মক কুফল আছে, যার বেশ কিছু পরিলক্ষিত হয় সেসব দেশে যেগুলো সংকীর্ণ, আইনসর্বস্ব কাঠামোর মধ্যে শরিয়াকে 'বাস্তবায়ন'-এর প্রয়াস চালিয়েছে।

> ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্যময় শরিয়াকে প্রায়শই ফিকহের সংকীর্ণ অর্থে ভুল করে দেখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরুপ, বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন ইন্দোনেশিয়াতে, আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) শরিয়া প্রবর্তনের দাবি বাস্তবে নিছক ফিকহের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। এই আনুষ্ঠানিক শরিয়া যেখানে প্রবর্তন করা হয়েছে, সেখানেই সর্বপ্রথম আরোপ করা হয়েছে নারীদের মাথায় স্কার্ফ (জিলবাব) পরা, চাবুক মেরে শাস্তি, হাত কাটা এবং অন্যান্য কিছু বিধান, যা গ্রন্থগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

---

১২৭ Al-Bukhari, Vol. 2, Kitab al-Iman, #38, https://sunnah.com/bukhari:39.
১২৮ Hakim, (n.d.)

> কিন্তু অন্য আরো গুরুতর যে সমস্যাগুলো অধিকাংশ মানুষের জীবনে বৃহত্তর পর্যায়ে প্রভাব রাখছে, যেমন দুর্নীতি, নারী পাচার অথবা একচেটিয়া ব্যবসা (মনোপলি), এগুলোকে শরিয়ার অংশ হিসেবে সামনে আনা হয় না, কারণ এগুলো ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।
>
> এই ভ্রান্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে মুসলিমরা কীভাবে ধর্মকে আত্মস্থ করে তার মধ্যে। যেখানে ইসলামকে দেখা হয় শরিয়ার সমার্থক হিসেবে এবং শরিয়াকে বোঝা হয় আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানের ভান্ডার হিসেবে, তার ফল এই যে ইসলাম সেখানে আত্মস্থ হয় নিছক গোঁড়া ধর্মমতের কাঠামো হিসেবে। সেখানে ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের ওপর বাহ্যিক দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নামাজ, রোজা, জাকাত অথবা হজ ইসলামের এই বুনিয়াদগুলো নিছক আনুষ্ঠানিক উপাসনাতে পর্যবসিত হয়। নবিজির (স.) জীবনে এই শিক্ষাগুলো সামাজিক আন্দোলন হিসেবে মৌলিক সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ইসলামের ক্ষেত্রে গ্রন্থমুখিতার প্রাধান্য ধর্মের শক্তি ও ব্যাপ্তিকে সীমিত করেছে, কারণ গ্রন্থগুলো মুসলিমরা যেসব প্রচলিত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন, যেমন অত্যাধুনিক অপরাধ এবং দুর্নীতি, সেগুলোর জবাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না।
>
> ফিক্হ অথবা শরিয়াকে নিছক ফিক্হ হিসেবে দেখা ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার প্রতিফলন নয়।[১২৯]

বিভ্রান্তির একটি উৎস দুঃখজনকভাবে মুসলিমরা নিজেরাই যোগ করেছে। সেটা হচ্ছে জীবন এবং ইসলামী পথনির্দেশনার সমগ্রতার ব্যাপারে বোঝার ব্যর্থতা এটাই যে তার বাস্তবায়ন নিছক একটা বাহ্যিক কর্তৃত্ব (অথরিটি)-র ওপর নির্ভরশীল নয়। শরিয়ার মধ্যে বেশির ভাগ প্রয়োগের বিষয়ই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। শরিয়া যেহেতু মানুষের জীবনের সমগ্রতার জন্য তাই এর প্রয়োগের পরিসরও সমগ্র জীবন, আর তা শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের জন্যই নয়, বরং জীবনের সামগ্রিকতার বুনিয়াদও হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়, এবং জীবন ও ইসলামের যোগসূত্রের সূচনা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকেই এবং একজন মুসলিম সে দুনিয়ার

১২৯ Munir, p. 12.

যেখানেই থাক, আর সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দীনের প্রয়োগ নেই, সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়টা কম গুরুত্বপূর্ণ থাকে না, তার মৌলিকত্ব হারায় না। তারিক রামাদান এ বিষয়টি সুন্দরভাবে দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরেছেন।

> তারা যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুক, মুসলিম পুরুষ এবং নারীরা তাদের আমলে এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নির্দেশনা এবং শিক্ষা ধারণ করার চেষ্টা করে সাধ্যমতো। এক্ষেত্রে তারা ঈমানের/বিশ্বাসের পথেই চলে, সেই 'ঝর্ণার পথ' (শরিয়া) ধরে। অন্যভাবে বললে, পাশ্চাত্যে অথবা প্রাচ্যে, তারা শরিয়াকে ধারণ করার প্রয়াস চালায় নিছক শরিয়ার আইনসর্বস্ব কাঠামোতে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে কারও শাহাদাতের ঘোষণা দেওয়া, অর্থাৎ মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে নামাজ পড়া, জাকাত দেওয়া, রোজা রাখার অনুশীলনের প্রয়াস শুরুর মধ্যে, কিংবা মুসলিম নৈতিকতার প্রতি সম্মান দেখানোর প্রয়াসে, সে ইতোমধ্যেই শরিয়াকে বাস্তবায়নের পথে যাত্রা শুরু করে– এটা একজন মুসলিমের জীবনে (ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলেও) ছোটখাটো অগ্রগতি নয়, বরং একটি মৌলিক অগ্রগতি।
>
> এই আমল এবং নৈতিক সচেতনতাই হচ্ছে শরিয়ার উৎস এবং প্রাণ, যা আসলে একজনের ব্যক্তিগত, নিষ্ঠ অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এর বাইরে, ইসলামী পথটি নিজেই পূর্ণভাবে তার প্রভাব ফেলে চলে একজনের অস্তিত্বকে পথনির্দেশনা দিতে। তা হয়তো ভিন্ন জনের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে; কিন্ত পদ্ধতি, মানদণ্ড এবং নিয়মনীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই অপরিহার্য দিকটি অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য শুমুলিয়াত আল-ইসলাম বা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার সমগ্রতার মধ্যে বিধৃত।[১৩০]

ঙ. শরিয়া কি আরোপযোগ্য (enforceable) জীবনের সমগ্র পরিসরে?

শরিয়ার বাস্তবায়ন সাধারণত আলোচিত হয় আরোপযোগ্য আইনের প্রেক্ষাপটে। বস্তুত এ ধরনের বাস্তবায়নের তাৎক্ষণিক প্রতিফলন হয়ে থাকে হুদুদ বা

১৩০ Ramadan, p. 33.

শাস্তিবিধান– কিছু বিশেষ অপরাধ (যেমন– খুন, ব্যভিচার, চুরি, ইত্যাদি)-র সুনির্দিষ্ট শাস্তি আরোপ করার প্রবণতায়। যেমনটি ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে, শরিয়াকে নিছক ইসলামী আইনের সমার্থক বানানো একেবারেই ভুল, কারণ ইসলামের পথনির্দেশনার সমগ্রতায় শুধু আইনকানুনই অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তাতে মূল্যবোধ, নীতি, উপাসনা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই এটা সুস্পষ্ট যে ইসলামের সব দিক কোনো মানব কর্তৃত্বের মাধ্যমে আরোপযোগ্য নয়।

খুররম মুরাদের মতে:

> আইনসমূহ তাই শরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেমনটি আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি, তা এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো তারতম্য স্বীকার করে না: ‘নামাজ পড়া’ যেমন যথাযথ, আরোপযোগ্য, আবশ্যিক এবং অলঙ্ঘনীয়, তেমনি ‘সামষ্টিক বিষয়াদিতে শুরা-পরামর্শ করা,’ অথবা ‘সুদ নিষিদ্ধ করা’ অথবা ‘একজন ব্যভিচারীকে পাথর মারা’ও তেমনই।[১৩১]

এটি অবশ্যই একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। এটা সত্য যে, মুসলিমরা এমন সমাজে জীবনযাপন করার চেষ্টা করবে যেখানে আইনকানুন কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে হয়, কিন্তু জীবনটা নিছক আইন-বিধি-বিধানের প্রয়োগের চাইতেও আরো ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে শায়খ উসমানির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক:

> নিয়মানুবর্তিতা (discipline)-এর জন্য আইনি ব্যবস্থা দেওয়ার পাশাপাশি ইসলাম সমাজের সংস্কারের জন্য অ-আইনি (non-legal) শিক্ষা-দীক্ষাও দেয়। তাই নিছক হুদুদ কার্যকর করেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে এটা কেউ মনে করতে পারে না। বরং শুরুতেই অপরাধ নিরুৎসাহিত করার পরিবেশ সৃষ্টি করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[১৩২]

ইসলাম আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছে। শায়খ উসমানি এটাও পরিষ্কার করেন যে, সেই পরিবেশ তৈরি করা মানে একটি কার্যকরী সমাজ এবং পরিবেশ না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করার। এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে সেই যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা মানে জোরজবরদস্তি করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়।

---

১৩১ Murad, 2007, pdf p. 9.

১৩২ Usmani, 2006, p. 288.

তবু হুদুদের পরিসর যদি হয় অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন, তাহলে তার বিপরীত, অর্থাৎ করণীয় বা দায়িত্বের বিষয়টি? যেসব ফুকাহা করণীয়র ব্যাপারে অবহেলাকে বেআইনি (এবং শাস্তিযোগ্য) হিসেবে মনে করেন, তাদের রায়ের আলোকে যে মুসলিম নামাজ পড়তে অস্বীকার করে তার শাস্তির ব্যাপারে নিজের মত প্রকাশ করেন:

> একটি ইসলামী রাষ্ট্রে যদি কেউ তারিক আস-সালাত বা স্বেচ্ছায় নামাজ না পড়া বা পড়তে রাজি না হওয়া)-র দোষ করে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কেন এ রকম করছে। যদি সে তার এই না পড়ার অভ্যাসের ব্যাপারে জিদ করে, তাহলে ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে যে তাকে হত্যা করা উচিত। ইমাম আবু হানিফার মতে তাকে প্রথমে সতর্কবাণী জানানো উচিত, তারপর যদি না পড়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাকে কারাবন্দি করে রাখা উচিত, যতক্ষণ না সে তাওবা করে অথবা কারাগারেই মৃত্যুবরণ করে।[১৩৩]

যেহেতু নামাজ ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ, এটা পরিত্যাগ করা অবশ্যই সাংঘাতিক ব্যাপার। বস্তুত শাহাদাত ঘোষণা করে বা স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে নামাজ না পড়া অর্থহীন। নামাজের ওপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, কুরআনে আর কোনো আনুষ্ঠানিকতার ওপর এতটা জোর দেওয়া হয়নি। তদুপরি, হাদিসেও এ ব্যাপারে একইভাবে তাগিদ এসেছে। তবু জেলে পাঠানোই হোক আর মৃত্যুদণ্ডই হোক, যেকোনো প্রস্তাবিত শাস্তির যথার্থতা ইসলামী উৎসগুলোর ভিত্তিতে হতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে দুর্বল

---

১৩৩ Randeri, S. A. R. L. Fatawa Rahimiya, 1975-1982, Maktabah Rahimiyyah, V. 1, p. 147. তারিকে সালাতের বিষয়ে প্রচলিত অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Al-Uthaymin (2012), p. 5। ইবনে হাম্বলকে উদ্ধৃত করে শায়খ উসাইমিন বলেন: “যে নামাজ পরিত্যাগ করে, সে কাফির; এটা কুফরী যা তাকে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দেয়, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড যদি না সে তাওবা করে এবং সালাত আদায় করে।” ইবনে হাম্বল বা অন্যান্য ইমাম থেকে লেখক কোনো নির্দিষ্ট রেফারেন্স দেননি। আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং মালিক দ্বিমত পোষণ করেন ইবনে হাম্বলের সাথে। তাদের মতে, এরকম ব্যক্তি ফাসিক বা পাপী, কিন্তু কাফির নয়। তদুপরি চারজনের মধ্যে তিনজনই শাস্তির ব্যাপারে মতদ্বৈধতা প্রকাশ করেছেন। শাফেয়ী এবং মালিক-এর মতে এ রকম ব্যক্তি কতলের যোগ্য, কিন্তু আবু হানিফার মতে তাকে নসীহত করা যেতে পারে, কিন্তু হত্যা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনেক ইসলামী বিশারদদের রায়ের পেছনে দলিল তেমন সহজলভ্য নয়। উল্লেখ্য যে, লেখক শায়খ উসাইমিন অথবা যে সমস্ত আলিমকে সে প্রামাণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের কেউই এটার ওপর কোনো আলোকপাত করেননি যে জোরজবরদস্তি করে কাউকে নামাজ পড়ানোর মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা কি। আল্লাহ তায়ালার কাছে এরকম চাপিয়ে দেওয়া অবস্থায় পড়া নামাজের কোনো মূল্য আছে কি? অথবা অন্য মানুষের কাছেই কি এরকম নামাজ আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে? যদি আল্লাহ তায়ালার জন্যই নামাজ হয়ে থাকে, তিনি কি মানুষের কর্তৃত্বের বা শাস্তির ভয়ে পড়া নামাজের মুখাপেক্ষী? মানুষকে এভাবে জোরজবরদস্তি করে পড়াতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা তো নিজেই তা পারতেন। এ ধরনের জোরজবরদস্তি করা অনেকটা নিজেরাই আল্লাহ সাজার মত। তাছাড়া, শায়খ উসাইমিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে নামাজ পরিত্যাগ করা কুফরী, তবে জাকাত পরিত্যাগ করা কুফরী নয়।[১৩৪] তাই তার দৃষ্টিতে এ দু'টি অপরাধের শাস্তি ভিন্ন হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে কথা থাকে, শাস্তি যদি ভিন্নই হবে, তাহলে জাকাত পরিহার করার শাস্তি কঠোরতর হওয়া উচিত, কারণ জাকাত না দেওয়া সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেখানে দরিদ্র মানুষের অধিকার লঙ্ঘন হয়, অন্যদিকে নামাজ আল্লাহ তায়ালা এবং একজন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক একটি বিষয়। মানুষের উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর অন্যদের যে হক আছে তার সাথে জাকাত সম্পৃক্ত।

এ প্রসঙ্গে নামাজ তরককারীদের শাস্তি দেওয়া বা শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণ প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিকভাবে এটা সামনে রাখা প্রয়োজন যে, মৌলিক কোনো বিষয়ে যার ক্ষেত্রে শাস্তি, বিশেষ করে কঠোর বা মৃত্যুদন্ডসম চূড়ান্ত শাস্তি প্রযোজ্য, সেটা কুরআনে কেন উহ্য থাকবে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মৌলিকভাবে যা কিছু ফরজ, যা কিছু হারাম আর যা কিছু হুদুদ তা আল্লাহ তায়ালা তার একমাত্র নাজিলকৃত কিতাবেই জানাবেন, যা অন্য আরো কোনো সূত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। নবিজি (স.) এ প্রসঙ্গে তার মৃত্যুর আগে বলেছেন:

> ইবনে হুমায়েদ-সালামা-ইবনে ইসহাক-আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবি মুলায়কা (থেকে বর্ণনায়): সোমবার, রাসুলুল্লাহ (স.) মাথা কাপড় জড়ানো অবস্থায় ফজরের সালাত পড়তে বের হয়ে এলেন,

১৩৪ Al-Uthaymin (2012), op. cit, p. 8

যখন আবু বকর (রা.) সালাতে ইমামতি করছিলেন। [সালাত শেষে] তিনি সবাইকে বললেন: "আল্লাহ্র শপথ, আমি কোনো কিছু তোমাদের জন্য হালাল করিনি, যা কুরআনে হালাল করা হয়েছে তা ব্যতিরেকে। আর আমি কোনো কিছু তোমাদের জন্য হারাম করিনি যা কুরআনে হারাম করা হয়েছে তা ব্যতিরেকে।"[১৩৫]

এই পথনির্দেশনার আলোকেই তারিকে সালাতের জন্য শাস্তি প্রসঙ্গে এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, কাউকে জোরজবরদস্তি করে নামাজ পড়ানোর কোনো মানে হয় কি না এবং এ ধরনের চাপিয়ে দেওয়া নামাজ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না।

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

এটা যদি তোমাদের রব্বের মর্জি হতো, তারা সবাই ইমান আনত - সমগ্র দুনিয়াবাসী! তুমি কি তাহলে মানবজাতিকে ইমান আনাবে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও?[১৩৬]

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দীনের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। মিথ্যা থেকে সত্য সুস্পষ্ট: যে তাগুতকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, সে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাত ধরেছে।[১৩৭]

স্পষ্টতই নামাজ-রোজার ব্যাপারে আইন-কানুনের মাধ্যমে চাপানো অথবা এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ব্যাপারে সমাজকে একটি পুলিশ-রাষ্ট্রে পরিণত করা আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় নয়। উপর্যুক্ত দু'টি আয়াত যা দীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি কোনোভাবেই অনুমোদন করে না তা তো আল্লাহ তায়ালার

১৩৫ Al-Tabari, Ibn Jarir (1990). The History of Al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk), Trans. Ismail K. Poonawala, Vol. 9 (Albany, NY: SUNY Press), p. 182.

১৩৬ আল-কুরআন (ইউনুস) ১০:৯৯।

১৩৭ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৫৬।

অভিপ্রায়ের ব্যাপারে এরকমই বোঝায়। বস্তুত অন্যান্য স্থানে কুরআন আরো সুস্পষ্ট যে কুরআন অনড়ভাবে বার বার তাগিদ দিয়েছে যে নবিজি (স.) আরোপকারী (enforcer) হওয়া তো দূরের কথা, তাকে পর্যবেক্ষণ-প্রহরী হওয়ার জন্যও পাঠানো হয়নি।

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

[হে নবি!] তুমি তাদের ওপরে নিয়ন্ত্রক (মুসাইতির) নও।[১৩৮]

وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

তোমার দায়িত্ব শুধু বাণী পৌঁছে দেয়া,[১৩৯]

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো ও রাসুলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসুলের কর্তব্য।[১৪০]

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।[১৪১]

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না এবং

---

১৩৮ আল-কুরআন (আল-গাশিয়া) ৮৮:২২।

১৩৯ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:২০।

১৪০ আল-কুরআন (আল-মায়িদা) ৫:৯২।

১৪১ আল-কুরআন (আর-রা'দ) ১৩:৪০।

তার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' ওদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। রাসুলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।[১৪২]

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

বল, 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে-ই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেওয়া।[১৪৩]

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ

ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি এদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া।[১৪৪]

এগুলো ছাড়াও আরো আয়াত আছে যেগুলোতে নবিজিকে (স.) বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তার দায়িত্ব বাণীকে যথাযথভাবে পৌঁছানো।[১৪৫] এটা অবশ্যই চিন্তাসাপেক্ষ যে আল্লাহ তায়ালা নবিজির (স.) দায়িত্বের এই বৈশিষ্ট্যের দিকটি এত বার কেন উল্লেখ করেছেন? এই আয়াতগুলোর শিক্ষা বা তাৎপর্য কি অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক? যদি মৌলিক পর্যায়ে নবির দায়িত্ব বাণী পৌছানো ছাড়া আর কিছু নয়, যদি আসলেই তিনি মানুষের জীবনের ব্যাপারে প্রহরী (মুসাইতির) না হয়ে থাকেন, তাহলে তার অনুসরণকারীদের দায়িত্বের পরিসর কি আরো বড়?

---

১৪২ আল-কুরআন (আন-নাহ্‌ল) ১৬:৩৫।

১৪৩ আল-কুরআন (আন-নুর) ২৪:৫৪।

১৪৪ আল-কুরআন (আশ-শুরা) ৪২:৪৮।

১৪৫ আরো দেখুন, আল-কুরআন (আন-নাহ্‌ল) ১৬:৮২; (আল-আনকাবুত) ২৯:১৮; (ইয়া-সীন) ৩৬:১৭; (আল-তাগাবুন) ৬৫:১২।

আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোনো দুনিয়াবি কর্তৃত্বের পক্ষ থেকে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করার কোনো উপকারিতা (merit) নেই; নবিজির (স.) জীবন থেকেও তার কোনো সমর্থন মেলে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর পুলিশ হয়ে চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা ঠিক নয় এবং এসংক্রান্ত বিধিবিধান নবিজির (স.) জীবনের দৃষ্টান্তের বিপরীত; আর তাই মুসলিমদের স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এর মানে এই নয় যে, কার্যকরকরণে ইসলামের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতার কিছুই নেই, অথবা এই দুনিয়াতে তাদের ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি পর্যায়ে কোনো ব্যাপারে জবাবদিহির কিছুই নেই, অথবা কোনো নিয়ন্ত্রক বা পরিদর্শক-সম শক্তির পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়ার কিছুই নেই; এ রকম ধারণাও আদৌ সঠিক নয়। যেকোনো সচল, স্বাভাবিক সভ্যতার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি মুসলিম সমাজেও আইন-কানুন থাকবেই এবং আইন-কানুন অর্থহীন যদি তা প্রয়োগযোগ্য না হয় কিংবা প্রয়োগ না করা হয়। তবে আইনের প্রয়োগ মুখ্যত এই দুনিয়াতে মানুষের পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত। যেমন জাকাত ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি অন্যতম হিসেবে নিছক ইবাদতই নয়, বরং তা জাকাত দেওয়া যাদের জন্য ফরজ তাদের ওপর জাকাত পাওয়ার যোগ্য যারা তাদের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামের ব্যাপারে একনিষ্ঠ যেকোনো সমাজ জাকাত আদায় করার দায়িত্বকে আইনি বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখবে। সেজন্যই নবিজির (স.) ইন্তেকালের পর যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) কঠোর অবস্থান নেন। তেমনি, খুনখারাবি, অন্যের ওপর আক্রমণ (assault), প্রকাশ্যে ব্যভিচার, জুয়া, মাদক সেবন ইত্যাদি, যেগুলোর সামাজিক সংশ্লিষ্টতা আছে, সেগুলোর জন্যও প্রয়োগযোগ্য আইন থাকবে। তবু, যে সমস্ত বিষয় ব্যক্তিগত পর্যায়ের, যেমন আল্লাহ তায়ালার আনুষ্ঠানিক উপাসনা, সেগুলো সামাজিক বা রাষ্ট্রশক্তির জোরজবরদস্তির মধ্যে এবং ইসলামের শাস্তি-বিধানের আওতায় পড়ে না। তা যদি না হয়, তাহলে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নবিজির (স.) যে মিশন উল্লেখ করা হয়েছে:

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ

("পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব", ৩৬/ইয়াসীন/১৭; "আপনি তাদের ওপর শাসক/নিয়ন্ত্রক নন", ৮৮/আল-

গাশিয়া/২২) তার সঙ্গে এসব শাস্তিবিধান সঙ্গতিপূর্ণ হবে না; বরং তা হবে ইসলামকে উলটো করে তার মাথার ওপর দাঁড়া করিয়ে দেওয়া। তথাপি, এটাই দুঃখজনক বাস্তবতা যে, এ ধরনের প্রবণতা এবং ভ্রান্তি খুবই ব্যাপক, যার প্রমাণ মেলে সমসাময়িক ফুকাহাদের অনেকের অথবা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সংগঠনের কাজের মধ্যে। বিবেচনা করুন জেদ্দা, সৌদি আরবে, অবস্থিত ইসলামী ফিক্হ অ্যাকাডেমির নিম্নোক্ত ভাষ্য:

> প্রস্তাবনা এন৪৮ (১০/৫) - শরিয়ার প্রয়োগ/আরোপের বিধান মুসলিমদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল কোনো কর্তৃপক্ষের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে শরিয়াকে প্রয়োগ করা। এই কাউন্সিল ইসলামী দেশগুলোর সরকারদের তাগিদ দিচ্ছে জীবনের সার্বিক পর্যায়ে ইসলামী শরিয়া বাস্তবায়িত করতে এবং এর দাবি পূর্ণ এবং স্থায়ীভাবে মেনে চলতে। কাউন্সিল আহ্বান জানাচ্ছে মুসলিম দেশ, ব্যক্তি, জনগণ এবং রাষ্ট্রগুলোকে আল্লাহর ধর্মের দায়দায়িত্ব পালন করতে এবং শরিয়াকে প্রয়োগ করতে, কারণ এই ধর্ম একটি বিশ্বাসব্যবস্থার সাথে সাথে একটি আইনব্যবস্থা, একটি আচার-আচরণের বিধিবিধান এবং জীবনধারাও।[১৪৬]

উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিষ্ঠানটি শরিয়াকে বোঝে শুধুমাত্র তার প্রয়োগ/আরোপ-এর দৃষ্টিতে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ইসলাম নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আইনসর্বস্ব প্রবণতা বেশ প্রবল হয়ে আছে।

যেখানে জোরজবরদস্তির মানসিকতা সকল যুক্তিযুক্ত প্রয়োগের সীমা ছাড়িয়ে যায় সেখানে শরিয়ার বাস্তবায়নে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। যখন একটি সমাজ পুলিশ-রাষ্ট্রে এবং জন-কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগের জোরজবরদস্তির শক্তিতে পরিণত হয়, যেখানে প্রয়োগের বলয় স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে, সে সমাজ দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল হয় না। তালেবানদের দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঔপনিবেশিক, দখলদার বিদেশি শক্তিগুলোকে প্রতিরোধ এবং বিতাড়িত করার ব্যাপারে তাঁরা প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখলেও, শাসনের ব্যাপারে অতিমাত্রিক রক্ষণশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রবণতায় তারা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। আফগান জনগণ আমেরিকানদের অভিসন্ধি এবং তাদের স্বার্থপরতার বিষয়টি ভালোভাবেই বোঝে এবং তাঁরা তাঁদের জীবনে

---

১৪৬ Islamic Fiqh Academy, pp. 96-97.

ইসলামকে ঘনিষ্ঠভাবেই চায়, কিন্তু হয়তো খুব কম আফগানই আছে যারা আবার তালেবান শাসনের কঠোরতা অথবা দীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তির প্রত্যাবর্তন চায়।

চ. শরিয়া কি জীবনের সমগ্র পরিসরের জন্য 'স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট' পথনির্দেশনা দেয়?

শরিয়া স্পষ্ট (clear) এবং সুনির্দিষ্ট (unambiguous) পথনির্দেশনা দেয় কি না এ প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ-সূচকভাবে দেওয়া যেত তাহলে স্বস্তির কারণ হতো, কিন্তু দুঃখজনক যে ব্যাপারটি সেরকম নয়। মুসলিমদের এক গোষ্ঠী শরিয়াকে বাস্তবায়িত করতে উৎগ্রীব, কারণ তাদের বিশ্বাস যে জীবনের সকল সমস্যার জন্য ইসলামে অকাট্য, সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর সমাধান সব সময়ই তৈরি আছে, যেন ইসলাম মুখ্যত সমাধানের একটি নির্দেশাত্মক (prescriptive) ম্যানুয়াল। ঐতিহ্যবাদীদের মত, ইসলাম হচ্ছে 'সুনির্দিষ্ট' (definitive)।[১৪৭] এটা খুবই একটি সরলীকৃত ধারণা যা বিস্তারিতের পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে সেই বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ বিষয়টি নিয়ে এই বইটি জুড়েই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

কুরআন অতীত-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিকমত, উপদেশ, অতীত বা ইতিহাসভিত্তিক পর্যবেক্ষণ পেশ করে আর তার সাথে মানব কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর জন্য আদেশ-নিষেধ সংবলিত নির্দেশনা। এই আদেশ-নিষেধের পরিসরে কুরআন স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। কিন্তু সেসব আদেশ-নিষেধের প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের দিকটি একইভাবে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নয়, যদি না আমরা সবার জন্য এক মাপের কোট-এর ধারা অবলম্বন না করি, অনেক ক্ষেত্রেই যার ফলাফল হয় ইসলামের মাকাসিদ-এর বিপরীত।

নিম্নোক্ত উদাহরণটি বিবেচ্য। পাকিস্তানে একটি সামরিক স্বৈরাচারীর শাসনাধীনে প্রবর্তিত হুদুদ অর্ডিন্যান্সের ফলে ধর্ষণের শিকার হয়ে অনেক মহিলাকে গ্রেফতার, এমনকি কারাবন্দি হতে হয়েছে। যদিও ইতোমধ্যেই ধর্ষণের মতো একটি জঘন্য অপরাধের শিকার, শত শত নারী তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে কারাবন্দি অথবা নিগৃহীত হয়েছে শরিয়ার এই

১৪৭ Laliwala, p. 1.

সংস্করণের অধীনে।[১৪৮] মুসলিম সমাজে আরেকটি বহুল-সংঘটিত বিষয় হচ্ছে তাৎক্ষণিক তিন-তালাক ঘোষণার মাধ্যমে স্বামী কর্তৃক একপেশে, যখন/যেমন খুশি (arbitrary) এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো। এ ধরনের তালাকে প্রায়শই বিনা দোষে স্ত্রীকে তার বাসস্থান, অর্থাৎ স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হয়। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে কুরআনে তালাকের যে পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে তা খুবই প্রজ্ঞাময়, ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ব্যাপারেই সংবেদনশীল। কিন্তু শরিয়ার নামে আইনসর্বস্ব বিকৃত ধারায় (যাকে প্রায়শই ইসলামী আইনের সাথে সমার্থক বানিয়ে ফেলা হয়েছে), তালাকের এই বিকৃত এবং কুরআন-বিরোধী ধারাকে বৈধ বিবেচনা করে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রথা কুরআনের পরিপন্থি এবং নবিজির (স.) জীবন থেকেও তার সমর্থন মেলে না। তথাপি, অধিকাংশ মাযহাব এগুলোকে সঠিক বিবেচনা করে এবং ইসলামী আইনের কাঠামোতে আইনানুগ বা বৈধ হিসেবে ঠাঁই দিয়েছে। বিষয়টি ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সাক্ষ্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে, ইসলামের একটি মৌলিকভাবে আবশ্যিক বিষয়। তবে সাক্ষীর যোগ্যতা বা গুণাবলির শর্তের ব্যাপারে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, কুরআনে যদিও তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী থাকাকে একটি শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে,[১৪৯] শরিয়ার সমার্থক হিসেবে যে ইসলামী বিধান ফিকহে স্থান পেয়েছে, সেখানে সাক্ষী থাকার শর্তকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেটার কারণে তালাকের ক্ষেত্রে বাস্তবে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

রিবা (যার মানে সাধারণত ধরা হয় সুদ) কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু হাদিসে এ প্রসঙ্গে যে ছয়টি সামগ্রীর কথা উল্লেখ আছে তা পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয় যে, বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহে এ ব্যাপারে কত বৈচিত্র্যময় মতপার্থক্য রয়েছে।[১৫০]

আরো সাধারণ পর্যায়ের দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে মুসলিম বিশ্বজুড়ে রমজান মাসের শুরু ও শেষ নিয়ে চিরন্তন বিতর্ক। যদিও চৌদ্দ শতকেরও বেশি

---

১৪৮ Farooq, 2006e.

১৪৯ আল-কুরআন (আল-তালাক) ৬৫:২।

১৫০ Farooq, 2006a; Farooq, 2006b.

অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ঐ একই রমজান মাসের রাতে কত রাকয়াত তারাবির নামাজ পড়তে হবে তার বিতর্কেরই কি অবসান হয়েছে? এমনকি একই মাযহাবের মধ্যেও প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হানাফি মাযহাবে অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হেদায়া-তে ঐ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামসহ তিনজন প্রধান ফকীহ্র মধ্যে ব্যাপক মতদ্বৈধতা পাওয়া যায়।[১৫১]

এই সহজবোধ্য দৃষ্টান্তগুলো দেখায় যে, ইজতিহাদের প্রয়োজন আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কারণ সব প্রশ্ন ও সমস্যার সব উত্তর ও সমাধান এখনো চিহ্নিত বা নিরুপিত হয়নি, স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে তো নয়ই। উসূলে ফিকহে এটা স্বীকৃত যে, ইজতিহাদ আসমানি হেদায়েত এবং অন্যান্য উৎসের ওপর ভিত্তি করে করা হলেও এ থেকে যে জ্ঞান আমরা পাই তা নিছক সম্ভাব্য (probabilistic)। দু'জন প্রথিতযশা মনীষী আবু আল-হুসাইন আলী (পরিচিত আল-আমিদী নামে) এবং মোহাম্মদ বিন আলী আল-শাওকানী (মৃঃ ১২৫৫ খ্রিঃ)-র গবেষণা এই সম্ভাব্যতার বিষয়টিকে আলোকিত করে। আল-আমিদী মুতাকাল্লিমীনদের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন এবং তাঁর ফিকহসংক্রান্ত গ্রন্থ তাঁর আগের চারটি নামকরা উসূলে ফিকহের কাজের ওপর ভিত্তি করেঃ আল-আহ্দ, আল-মু'তামাদ, আল-বুরহান এবং আল-মুস্তাসফা। আল-শাওকানী আরো পরের প্রজন্মের, কিন্তু তার গ্রন্থ, নায়ল আল-আওতার, চারটি মাযহাবের ফিক্হতেই খুবই সমাদৃত হয়েছে। আল-আমিদী এবং আল-শাওকানী, উভয়ের দৃষ্টিতেই ইজতিহাদ মানে হচ্ছে একজন ফকীহর সামগ্রিক প্রয়াস, একপর্যায়ের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে, প্রাসঙ্গিক উৎসগুলো থেকে বিস্তারিত প্রমাণাদির (দলিল; বহুঃ আদিল্লা)-র আলোকে শরিয়ার আহকামগুলো নিরূপণ করা।[১৫২]

প্রকৃতপক্ষে সব কিছু সুস্পষ্ট, সুনিশ্চিত এবং প্রামাণ্য হিসেবে বের করার বিষয়ে এখানে যা আলোচিত হয়েছে তা বিপরীত প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি মাযহাবের

---

১৫১ হানাফী মাযহাবের তিন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মতপার্থক্যের একটি সংকলন মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ 'হিদায়া'তে পাওয়া যায়। বিস্তারিতের জন্য নিম্নলিখিত লিংকের ডকুমেন্ট দেখুনঃ "How much agreement/disagreement even within one school of Fiqh?" Retrieved August 6, 2006, from Web site: http://www.mofarooq.net/oldsite/farooqm/studz_res/islam/fiqh/ijma_hedaya.html.

১৫২ Al-Amidi, al-Ihkam, Vol. IV, p. 162; Shawkani, Irshad, p. 250.

ভেতরে আইন, বিধি-বিধান এবং অবস্থানের মানবিন্যাস (standardization) অর্জনের আভাস থেকে প্রতীয়মান হতে পারে যে অন্তত মাযহাব পর্যায়ে আহকাম সংক্রান্ত বিভেদ বা বাকবিতন্ডা আর নেই। এটা সত্য যে, চারটি সুন্নি মাযহাব (এবং, পৃথকভাবে, শিয়াদের মধ্যে জা'ফরী মাযহাব)-এর বর্তমান কাঠামো বেশ স্থিতিশীলতা এবং মানবিন্যাস এনেছে। তবু কী ধরনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই মাযহাবগুলোর বিকাশ হয়েছে তা বিবেচনা করতে হবে। সেই সাথে বিবেচ্য পরবর্তীকালে প্রতিটি মাযহাবের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃমাযহাব পর্যায়ে যে পারস্পরিক সমঝোতা এসেছে তা আগের বিভেদ অথবা বাকবিতন্ডাকে নির্মূল করেনি, বরং নিছক নেপথ্যে (background)-এ সরিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ ব্যাপারে আসল বাস্তবতার একটি আলেখ্য পাওয়া যায় আব্বাসী শাসনামল থেকে।

আওযায়ী, আবু ইউসুফ, শায়বানী এবং শাফেয়ীর মতো মনীষীরা ঐ সময়ের ফিক্‌হসংক্রান্ত মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রেখে গেছেন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো বিবরণ, খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ, এ প্রসঙ্গে আমরা পাই একজন উচ্চপদস্থ আব্বাসী কর্মকর্তা, সে শাসনামলের পররাষ্ট্র সচিব, ইবনে আল-মুক্বাফ্‌ফা থেকে। সে লিখেছে:

> 'যে সমস্ত বিষয়ে আমিরুল মু'মিনিনের বিবেচনা করা উচিত তার মধ্যে রয়েছে এই দুটো শহর (কুফা এবং বসরা)সহ অন্যান্য প্রদেশ এবং অঞ্চলে বিরাজমান পরস্পরবিরোধী আইন-কানুন, যে ব্যাপারে ভেদ-বিভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা মুসলিমদের রক্তসম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সম্পদ এসব কিছুকেই প্রভাবিত করছে। হেরা-তে যে সমস্ত রক্তের এবং বৈবাহিক সম্পর্ক অনুমোদিত গণ্য হয়, তা কুফাতে নিষিদ্ধ। একই ধরনের ভেদ-বিভেদ দেখা দিয়েছে কুফার অভ্যন্তরেও। এর একটি এলাকায় যে জিনিস হালাল বলে গণ্য, তা হারাম বলে ঘোষিত হচ্ছে কুফারই অন্য এলাকায়। তাছাড়া, বৈচিত্র্যময় রায় দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের জীবন ও তাদের ইজ্জতের ব্যাপারে। এসব রায় দিচ্ছে কাজীরাই এবং সরকার তা প্রয়োগ করছে। এরকম অবস্থায় ইরাক এবং হিজাযে এমন লোক নেই বললেই চলে যারা এ ব্যাপারে অনবহিত; বরং তারা নিজেদের

> মতামতকে নিয়ে গর্ব করে এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিন্দার ডালি ঢেলে দেয়। এটা এমন একটি করুণ অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা চিন্তাশীলদের ব্যথিত বা ব্যাকুল না করে পারে না।'[১৫৩]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, সেই বিভেদের প্রবণতা আসলেই মিটে গেছে কি না। দুঃখজনক, কিন্তু যারাই তাকফির (মুসলিম কাউকে কাফির, ধর্মত্যাগী, বিধর্মী, ধর্মচ্যুত, বিদয়াতি, বাতিলপন্থি ইত্যাদি ঘোষণা করার) সাথে পরিচিত যেখানে মুসলিমরা নিজেরাই এক গোষ্ঠী অন্যকে বা অন্যদের অমুসলিম ঘোষণা করে – এমনকি একই মাযহাবের মধ্যেই, তাতে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে ঐ প্রবণতা মিটে গেছে।[১৫৪] যদিও বাদানুবাদ অথবা অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে এক ধরনের মতৈক্য, সমঝোতা এবং পারস্পরিক সহনশীলতা এসেছে, এটা তেমন বিরল নয় যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ক্ষমতা পেলে তাদের নিজেদের অবস্থান অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখায়। তাছাড়া, যে রকম প্রামাণ্য (authoritative) ভাবে অথবা নিশ্চয়তা (certainty)-র সাথে প্রতিটি মনীষী বা গোষ্ঠী সাধারণত নিজেদের মতামত বা অবস্থানকে পেশ করে থাকে, তার মধ্যে আভাস মেলে যে ইবনে আল-মুক্বাফ্ফার সময়ে যেমন ছিল, আইনকানুন বা বিধিবিধানের ভাণ্ডারে বিশেষ করে বিস্তারিতের পর্যায়ে যেমন অস্পষ্টতা বা বৈচিত্র্য ছিল তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

তার মানে এই নয় যে, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো কাজ হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উল্লেখ করা যেতে পারে OIC-র ইসলামী ফিকহ অ্যাকাডেমি, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব ফতোয়া অ্যান্ড রিসার্চ, অথবা ফিক্হ কাউন্সিল অব নর্থ আমেরিকা ইত্যাদি। তবে নিজেদের প্রামাণ্য মনে করার প্রবণতা এবং সেই ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণের জন্য মনে করে আল্লাহ তায়ালার নামে এই 'প্রতিষ্ঠা'র প্রয়াস মতদ্বৈধতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্য খুবই অনুকূল। নিজের দাবি অনুযায়ীই ইসলামের কথা স্পষ্ট এবং সহজ-সরল– এবং তার মূল্যব্যবস্থা (value system)সহ তার মৌলিক বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইসলাম আসলেই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু শরিয়ার ব্যাপারে এ কথাটি

---

১৫৩ Guraya, p. 63, quoting Ibn al-Muqaffa [d. 756 AD], Rasa'il al-Bulagha, ed. Muhammad Kurd 'Ali, Cairo, 1954, p. 126.

১৫৪ Farooq, 2006g.

প্রযোজ্য নয়, যেখানে মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যায়ে চুলচেরা বিশদ আইনকানুনের ভান্ডার বোঝানো হয়, যে ভান্ডার না আসমানি, আর না অপরিবর্তনীয় বা সুনির্দিষ্ট।

যেহেতু ইসলামী আইনের ভান্ডার ইজতিহাদের সম্ভাব্যতার বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বলেই প্রতিটি মাযহাবের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃমাযহাব পর্যায়ে মতপার্থক্য এত ব্যাপক[১৫৫], তাই পাঠকদের নিজেদেরই এ মূল্যায়ন করতে হবে যে, আসলে তার সমগ্রতায় শরিয়া 'স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট' পথনির্দেশনা দেয় এই অতি ব্যাপক (sweeping), অসীমিত (unqualified) এবং অশোভনীয় বা দুর্বিনীত (immodest) দাবি ইসলামের দৃষ্টি থেকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

৪. আইনসর্বস্বতা (legalism) এবং তার প্রায়োগিকতা (implications)

যেকোনো ধর্মই আইনসর্বস্বতার খপ্পরে পড়তে পারে (vulnerable); ইসলামই শুধু নয়, অন্যান্য বিশ্বাস-ব্যবস্থাগুলোকেও আইনসর্বস্ব প্রবণতার সম্মুখীন হতে হয়।

> সাধারণভাবে ধর্মগুলো এবং বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদ দেখা যায় অনবরতভাবে সংগ্রাম করে আসছে সংশয়বাদ থেকে শুরু করে কমিউনিজম পর্যন্ত অন্যান্য ভাবধারা (আইডিওলজি) বা মতবাদ (ইজম)-গুলোর সাথে। তবে সবচেয়ে গুরুতর এবং বিরতিহীন আশংকা সম্ভবত এমন একটি বিষয় থেকে, যাকে আমি বলে থাকি 'অভ্যন্তরের ইজম' আর তা হচ্ছে আইনসর্বস্বতা।
>
> আইনসর্বস্বতা, কখনো না কখনো, কোনো না কোনোভাবে সব প্রধান ধর্মকেই আক্রমণ করেছে। প্রত্যেক ধর্মকেই আচার-আচরণের বিধিবিধান দিতে হয়। আইনসর্বস্বতা এই প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে একজন ব্যক্তির কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না তা সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে, বিশেষ করে সবকিছুকে খুঁটিনাটি বিস্তারিতের পর্যায়ে।[১৫৬]

---

১৫৫ অনেকেই আন্তঃমাযহাব পর্যায়ে মতপার্থক্য (ইখতিলাফ)-এর ব্যাপারে পরিচিত। তবে বিভিন্ন মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য সম্পর্কে উপরে নোট #১২৪ দেখুন।

১৫৬ Kahoe, 2000.

বস্তুত খ্রিষ্টবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক যা ঈসার (আ.) সংগ্রামে প্রতিফলিত, তা হচ্ছে সেই আইনসর্বস্বতা যার গহবরে পড়েছিল মূসার (আ.) অনুসারীরা। ঈসার (আ.) সবচেয়ে কঠোর নিন্দা ও তিরস্কার ছিল ভণ্ডামিপূর্ণ, গোঁড়া-আচারনিষ্ঠ ইহুদিদের (pharisees) বিরুদ্ধে।

> ধিক্কার ও আইন কানুনের শিক্ষক এবং ফ্যারাইজিরা, তোমরা তো মুনাফিক! তোমরা মিন্ট-মসলা, শুলফা (dill) আর জিরার এক-দশমাংশ তো ঠিকই দাও, কিন্তু তোমরা আইনের বৃহত্তর বিষয়গুলো করো অবহেলাঃ যেমন সুবিচার, দয়া এবং নিষ্ঠা। আগেরগুলোকে অবহেলা না করেই তোমাদের উচিত ছিল পরের বৃহত্তর বিষয়গুলো অনুশীলন করা।[১৫৭]

ফ্যারাইজিদের বিরুদ্ধে হযরত ঈসার (আ.) নিন্দা ও প্রতিবাদ সাধারণভাবে আইনকানুনের বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক যে, প্রান্তিক প্রবণতার শিকার হয়ে খ্রিষ্টবাদ পেন্ডুলামের আরেক প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হয় এবং যদিও হযরত ঈসা (আ.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি আইন রদ করতে নয়, বরং পূর্ণ করতে এসেছেন, তবু খ্রিষ্টবাদ নিজেকে আইনকানুনের তথাকথিত 'বোঝা' থেকে মুক্ত করে নেয়।[১৫৮]

---

১৫৭ New Testament, Matthew 23:23.

১৫৮ "মনে করো না যে, আমি নবিদের বিধান রহিত করতে এসেছি; আমি রহিত করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি। New Testament, Matthew 5:17. অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর সব আইনবিধান খ্রিষ্টবাদে একটি বিধানে বিধৃত (প্রতিবেশীকে ভালোবাস), এই যুক্তিতে সেন্ট পল নাকি মানুষকে সব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। পলের ভাষ্যঃ "তোমাদের দায়িত্ব শুধু পরস্পরকে ভালোবাসা, কেননা যে পরকে ভালোবাসল সে বিধানের (ধর্মীয়) আইন পূর্ণরূপে পালন করেছে।" [Romans, 13:8] তাই বস্তুত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষার বিপরীতে পল-এর সৌজন্যে খ্রিষ্টানরা শূকর খেতে পারে এবং তাদের খতনাও করতে হয় না, যা মূসা (আ.) প্রদত্ত বিধিবিধানের বিপরীত। যদিও পল-এর প্রভাব anti-nomianism হিসেবে পরিচিত (অর্থাৎ, খ্রিষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য কোনো ধর্মীয় আইন প্রযোজ্য নয়), আসলে খ্রিষ্টধর্ম আইনসর্বস্বতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। Anti-nomianism আইনসর্বস্বতার পুরোপুরি বিপরীত। রোমান ক্যাথলিকরা প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে anti-monianism নিয়ে, আর প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আইনসর্বস্বতার। বিস্তারিতের জন্য দেখুন, Badenas, 1985; Dunn, 1990.

একইভাবে, ইসলাম সাধারণভাবে আইনকানুনের বিরুদ্ধে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ যেকোনো সমাজে উন্নতি তো দূরের কথা, কোনো সমাজ চলতেই পারে না যদি তার কোনো কার্যকর আইনব্যবস্থা না থাকে। কিন্তু আইনকানুনকে আলাদা করে দেখলে হবে না; বরং সেগুলোর সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে মানব-বিবেকের সাথে। এটা থেকে বুঝতে সহজ হয় যে ইসলাম একটি কার্যকর এবং গতিশীল সমাজের আইনসংক্রান্ত প্রয়োজনের ব্যাপারে নিছক কিছু আদেশ-নিষেধের আহকাম দেয় না, বরং তার সাথে দেয় আরো বৃহত্তর পরিসরের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনাও। কিন্তু এ প্রেক্ষাপটেই ইসলাম তার অনুসারীদের দ্ব্যর্থহীনভাবে সতর্ক করে যে, তারা ঐ আইনকানুনের প্রভাবে সেগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা যেন ভুলে না যায়।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

> পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউঁ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক (ইবনুস সাবিল), সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।[১৫৯]

ইহুদি ধর্মের আইনসর্বস্বতা আর তার বিপরীতে খ্রিষ্টধর্মের আইনকানুন পরিত্যাগ যে চরম প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, তার পর শেষ রাসুল হযরত মোহাম্মদ (স.) মানবতার কাছে সেই আসমানি বাণীর নির্যাসই নিয়ে এসেছেন, যা

১৫৯ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৭৭।

আল্লাহ তায়ালা মানবতার সূচনালগ্ন থেকেই তাঁর বার্তাবাহকদের মাধ্যমে নাজিল করে আসছেন, যাতে সবসময়ই মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সারল্য (simplicity), পরিমিতিবোধ (moderation) এবং ভারসাম্যের (balance) ওপর।

> وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
>
> এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে (উম্মাত আল-ওয়াসাত) প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। তুমি এ-যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলে তাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়। আল্লাহ্ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অন্যের কাছে এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ এরুপ নন যে, তোমাদের ইমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[১৬০]

এটাই হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের প্রাথমিক উৎকর্ষ যা মানুষকে এখনো ইসলামের দিকে দুর্বারভাবে আকর্ষণ করে। এর মূল্যবোধ এবং নীতিমালা আর সেই সাথে এর ন্যূনতম আবশ্যকীয়তা (requirement)-এর আলোকে ইসলাম যেমন ছিল তেমনি আছে যা মূলত সহজ এবং সরল, যা বলা যেতে পারে না ঐতিহ্যবাদীরা ইসলামকে অথবা আইনসর্বস্ব ধারায় শরিয়াকে যেভাবে দেখে সে সম্পর্কে। ইসলাম যে সহজ এবং সরল তা কুরআনের বাণীতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত এবং নবিজির (স.) জীবনে আদর্শের মতো প্রস্ফুটিত।

> يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

---

১৬০ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৪৩।

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না ...[১৬১]

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান; মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।[১৬২]

মানুষ যেন সবসময়ই ইসলামী জীবনধারাকে এই সহজ-সরল রূপেই পায়, তা নিশ্চিত করা নবিজির (স.) কাছে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল।

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত: নবিজি (স.) বলেছেন: "মানুষের জন্য (দীনকে) সহজ করো, তাদের জন্য কঠিন করে তুলো না, এবং তাদের সুসংবাদ দাও, তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা জাগিয়ো না।"[১৬৩]

মুসলিমদের মধ্যে যারা চুলচেরা পর্যায়ে নৈখুঁত্য অর্জনে প্রয়াসী অথবা নৈখুঁত্যের প্রত্যাশী ছিল, তাদের নবিজি (স.) একটু সহজ বা হালকা হতে স্পষ্ট উপদেশ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ (স.) (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন। তখন সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানি করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন: তুমি কুরবানি করে নাও, কোনো দোষ নেই। অতঃপর আরেকজন এসে বললেন: আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন: কংকর মেরে নাও, কোনো দোষ নেই। সেদিন যেকোনো কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: করে নাও, কোনো দোষ নেই।[১৬৪]

---

১৬১ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৮৫।

১৬২ আল-কুরআন (আন-নিসা) ২:২৮।

১৬৩ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-Adab, #69, https://sunnah.com/bukhari:6125.

১৬৪ Al-Bukhari, Vol. 8, Kitab al-hajj, #658, https://sunnah.com/bukhari:1736.

নিচের দৃষ্টান্তটি আলোকপাত করে নবিজির (স.) জীবনযাপন ধারার ওপর, তিনি কেমন করে 'শরিয়া' বা ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করতেন মানবিকভাবে, যেখানে সম্ভব।

> আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর খেদমতে এসে বলল: 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন: 'ওয়াইহাকা' (আফসোস তোমার জন্য)। এরপর সে বলল: আমি রমজানের মধ্যেই দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন: একটি গোলাম আযাদ করে দাও। সে বলল: আমার কাছে তা নেই। তিনি বললেন: তা হলে তুমি লাগাতার দু'মাস সাওম পালন করো। সে বলল: আমি এতেও সক্ষম নই। তিনি বললেন: তবে তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াও। লোকটি বলল: আমি এর সামর্থ্য রাখি না। নবিজির (স.) খেদমতে এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তখন তিনি বললেন: এটা নিয়ে যাও এবং সাদাকা করে দাও। সে বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা কি আমার পরিবার ব্যতীত অন্যকে দেবো? সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন নবিজি (স.) এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তার পার্শ্বের ছেদন দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন: তবে তুমিই নিয়ে যাও।[১৬৫]

এই ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখা যায়; রোজা রাখা ফরজ হিসেবে ইসলামের বুনিয়াদি ইবাদতের মধ্যে একটি, যেটা ভাঙার বিভিন্ন উপায়ের নিকৃষ্টতমগুলোর মধ্যে পড়ে রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে। তবু এই সীমালঙ্ঘন ছিল আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে এবং এক্ষেত্রে আইনসংক্রান্ত কোনো প্রয়োগ ছিল না। নবিজির (স.) রায় ছিল এই পদস্খলনের জন্য নিছক কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ, কিন্তু সেটাও এমনভাবে যা সাধারণভাবে মানবিক দিককে উপেক্ষা করে নয়। অবশ্যই এ পদস্খলনকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি সবক্ষেত্রেই এভাবে শৈথিল্যের সাথে বিচার-বিবেচনা করতেন। বরং দীনের নির্যাসমূলক (essential) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমনটি হওয়া উচিত,

---

১৬৫ Al-Bukhari, Vol. 8, Kitab al-nafaqa, #110, https://sunnah.com/bukhari:5368.

তেমনি তিনি মানবিকভাবে প্রেক্ষাপটের প্রতি সুবুদ্ধির আলোকে সংবেদনশীল হয়েই বিচার করতেন।

দুঃখজনক যে, এরকম সুস্পষ্ট সুন্নাহ থাকা সত্ত্বেও, সে সুন্নাহকে ভুলে এবং উপেক্ষা করে তার প্রাণপ্রিয় উম্মাহ্‌র মধ্যে জন্ম নিয়েছে চুলচেরা আইনসর্বস্বতার প্রবণতা যার সাথে রয়েছে আরোপ (enforcement)-এর মানসিকতা। এই ধরনের আইনসর্বস্বতার মানে এ নয় যে, মুসলিম ওলামা এবং ফুকাহা আধ্যাত্মিকতা অথবা আল্লাহ-সচেতনতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বস্তুত তাঁদের অনেকেই ছিলেন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক, এমনকি সুফীবাদের বৈরাগ্যের দিকেও অনেকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তবু নবিজির (স.) পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ক্রমাগতভাবে মুসলিম সমাজ আইনসর্বস্বতার দিকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকে পড়ে, যেখানে বিচারমুখী (judgmental) মানসিকতার আলোকে সব কিছুই সাদা-কালো, ঠিক-বেঠিক, অনুমোদিত-অননুমোদিত এরকম কঠোর বিভাজনের শিকার হয়। এটা আলোচনাসাপেক্ষ যে যদিও বিভিন্ন ফিকহি ধারার আবির্ভাবের কিছু উপকারিতা ছিল, তবু এর একটি অনস্বীকার্য ফল হচ্ছে যে, মুসলিম সমাজ বিভিন্ন মাযহাব এবং তাদের শাখা-প্রশাখার মতো ফিরকায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এমনকি তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে তাকফির বা একে অপরকে কাফির ঘোষণা দেবার জঘন্য চর্চায় লিপ্ত হয়, এমন ঘটনা বিরল নয়।

যেমনটি মুকতাদের খান বলেছেন, ইসলামের ব্যাপ্ত ঔদার্য এধরনের আইনসর্বস্ব হ্রস্বকরণ (reductionism)-এর শিকার হয়, যার ধারাবাহিকতা আমাদের সমসাময়িক ঔপনিবেশিকোত্তর সমাজেও প্রতিফলিত:

> ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামী আইনি চিন্তাধারা (legal thought; ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ), ধর্মতত্ত্ব (কালাম), সুফিবাদ (তাসাওউফ) এবং দর্শন (ফালসাফা)– সেটি মানব জ্ঞানভাণ্ডারের সবচেয়ে বিকশিত এবং গভীর একটি ঐতিহ্য। তবে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে অবিকশিত। এর পেছনে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলামী আইনি চিন্তাধারায় ঔপনিবেশিক প্রবণতা। অনেক ফুকাহা ইসলামকে ইসলামী আইন (শরিয়া)'র সমার্থক বানিয়ে ফেলেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত

> করেছেন ইসলামী আইনের সাথে। ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা (পলিটি)'র ধারণা নিয়ে তারা অনুসন্ধান-গবেষণা করেছেন কখনো কখনো। শত শত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় এখন হাজার হাজার ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ তৈরি করছে, কিন্তু সেগুলো কদাচিৎ তৈরি করছে রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ অথবা দার্শনিক। কিছু বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য ইসলামী চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগীয় আইন শাস্ত্রিক ঐতিহ্যের গণ্ডির মধ্যে আটকা পড়েছে। "ইসলাম মানে শরিয়া" এই ধারণাটির ব্যাপক প্রভাবে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক জীবনের বিষয়াদির ওপর আইন প্রাধান্য পেয়েছে।[১৬৬]

আইনসর্বস্ব ঐতিহ্য এখন এমনই শেকড় গেড়ে বসেছে, বিশেষ করে একটি কট্টর শুদ্ধিবাদী মানসিকতার খপ্পরে যে, তা ইসলামের সামগ্রিক গতিশীলতা মারাত্মকভাবে হরণ করেছে। ইয়াহিয়া ইমেরিক, একজন আমেরিকান মুসলিম এবং অতিপ্রজ (prolific) লেখক এ বিষয়ের ওপর সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন:

> যখন আপনারা তাদের বই বা ম্যাগাজিন পড়বেন, আপনি পাবেন সেখানে ইসলামের ব্যাপারে যা কিছুই তাদের বলা আছে সে সবই ঠিক-ভুলের মাপদণ্ডে। (যেমন, অমুক অমুক বিশ্বাস সঠিক নয়, ইত্যাদি)। সত্য কী সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া অবশ্যই স্বাভাবিক এবং প্রশংসনীয়, কিন্তু তাদের ভাবধারায় জীবনের কোনো স্পন্দন নেই, না আছে প্রেম-প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা। এ সবই আইনসর্বস্বতা যেমনটি ছিল হযরত ঈসার সময়ে ইহুদিদের মাঝে। তাই, সম্প্রতি প্রচলিত অভিব্যক্তি 'সালাফী ভস্ম' (salafi burn-out), যেখানে এই আন্দোলন থেকে মানুষ ঝরে পড়ে তাদের হৃদয় থেকে আধ্যাত্মিকতার সব চিহ্ন মুছে যাবার পর।[১৬৭]

সৌদি আরবের ওলামা কেমন করে ফতোয়া দেয় মিলাদুন্নবী বা নবিজির (স.) জন্মদিন উদযাপন করার বিরুদ্ধে, অথচ তারা রাজতন্ত্র, যা ইসলামের সাথে একেবারেই অসংগতিপূর্ণ - সে ব্যাপারে নিশ্চুপ, এতে তাদের বিভাজিত

---

১৬৬ Khan, 2014.
১৬৭ Emerick, n.d.

(dichotomy) মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। পাকিস্তানে সমাজের দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন যারা তারা শরিয়ার শাস্তি পায় ছিঁচকে চুরির জন্য, অথচ যাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আছে তাদের পুকুর অথবা নদী চুরি কিংবা সাত খুনও অনেক ক্ষেত্রে শরিয়া প্রয়োগের নাগালের বাইরে। অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সাধারণ মানুষ মাদক সেবন করলে তাদের অপকর্মের জন্য আইনের খড়্গহস্ত সদাই সজাগ, কিন্তু বিত্তবান, প্রখ্যাত এবং অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা নিয়মিতই সেই পানীয় আরো বৈচিত্র্যময় রঙে পান করে যাচ্ছে বৃহত্তর সমাজের চোখের সামনে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। বস্তুত ইসলামের পবিত্র স্থান দু'টির একজন সাবেক এবং প্রয়াত তত্ত্বাবধায়ক (কাস্টডিয়ান অব দ্য হোলি প্লেসেস ইন ইসলাম) তাঁর সমগ্র জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে সুপরিচিত ছিলেন ফুর্তিবাজ যুবরাজ হিসেবে।[১৬৮] বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারের অভিযোগ এবং শাস্তি আরোপিত হয় নারীদের ওপর, পুরুষদের ওপর সচরাচর হয় না। একইভাবে ইসলামী আইনের প্রচলিত ধারায় তালাক দেয়ার অনেকটা নিঃশর্ত এবং একচ্ছত্র সুবিধা পুরুষদের জন্য, অথচ নারীদের অনুরূপ কোনো অধিকার নেই, যদিও কুরআন অধিকার ও কর্তব্য সামগ্রিকভাবে অনুরূপ (reciprocal; مِثْلُ) হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের (কিছুটা বা এক মাত্রা) মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১৬৯]

কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের সুযোগ-সুবিধার এক মাত্রা (ডিগ্রি) বা কিছুটা বেশি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের পারস্পরিক অধিকার 'অনুরূপ'। কিন্তু সেই 'এক মাত্রা' বেশির অনুচ্ছেদটি (clause) ব্যবহার হয়ে গেছে এক্ষেত্রে নারীদের প্রাসঙ্গিক আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত করতে। ঐতিহ্যবাদী ইসলামী আইনের তাগিদ

---

১৬৮ George Church, “An Exquisite Balancing Act,” Time¸ September 24, 1990, retrieved July 29, 2007, from http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,971191,00.html.

১৬৯ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২২৮।

সামগ্রিকভাবে পড়েছে সমতা ও অনুরূপ অধিকারের ইসলামী নীতিকে সংরক্ষণ করা এবং সমুন্নত রাখার পরিবর্তে ঐ 'এক মাত্রা'কে নিশ্চিত করার ওপর। এটা বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে যার প্রভাবে তা হচ্ছে আইনসর্বস্বতা বা কঠোর, আক্ষরিক অথবা অতিমাত্রায় আইনকানুন বা বিধিমালার ওপর গুরুত্ব দেওয়া। আইনসর্বস্বতাকে বোঝা যেতে পারে আইন, আচার-আচরণের বিধান অথবা ধারণা ইত্যাদি নিয়ে এক ধরনের জড়তা বা অনড়তা (fixation), যাতে নাজাতের জন্য আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার বাস্তবতার আলোকে যে ভারসাম্য থাকার কথা তার অনুপস্থিতি। ইসলামের ইতিহাসে আইনসর্বস্বতা জীবনের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ বা মাতামাতিকে উত্তুঙ্গে উঠিয়েছে।

যেমন, হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবে 'ওয়াজিব'-এর অর্থ এক নয়। হানাফী ফিকহ একটি সূক্ষ্ম তারতম্য করে ফরজ এবং ওয়াজিবের মধ্যে, আর শাফেয়ী ফিকহে এ দুটোর মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। এই ক্ষুদ্র পার্থক্য সত্ত্বেও, বেতর নামাজকে ওয়াজিব গণ্য করেছেন আবু হানিফা (র.) এই সন্দেহে, এক শাফেয়ী আলেম আবু হানিফার বিরুদ্ধে কুফরির অভিযোগ তোলেন এই যুক্তিতে যে, তিনি ফরজ নয় এমন একটি নামাজকে ফরজ (অর্থাৎ, শাফেয়ী পরিভাষায় ওয়াজিব)-এর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। অবশ্য আবু হানিফা তা করেননি।[১৭০] এ দৃষ্টান্ত যতই প্রান্তিক বা চরম হোক না কেন, এটা বুঝতে সহায়তা করে যে খুঁটিনাটি অথবা গৌণ বিষয়কে কেমন করে তিলকে তাল বানানোর মতো অবস্থা সৃষ্টি করে মানুষের মনকে নিরন্তর এক ধরনের দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার মধ্যে ফেলে দেওয়া যে তার ইবাদত-উপাসনায় এবং জীবনের আর সব দিকে নিখুঁত (perfect) বা নির্ভুল কি না। এরকমটা আইনসর্বস্ব মন-মানসিকতার বিশেষ লক্ষণ। ইসলাম অবশ্যই রবোটের মতো নৈখুঁত্য না শিক্ষা দেয় আর না দাবি করে; বরং ইসলাম আশা ও দাবি করে যে, মানুষ চিন্তাশীল ও বিবেকবান হবে, কিন্তু মানুষ প্রকৃতির কারণেই ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ (fallible) আর তাই ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহ তায়ালার রহমত-প্রাপ্তির যোগ্য।

> মানুষ যদি কোনো গুনাহ না করত, তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তার পরিবর্তে আরেক প্রজাতি পাঠাতেন যারা গুনাহ করত যা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করতেন।[১৭১]

---

১৭০ বিস্তারিতের জন্য রেফারেন্সসহ দেখুন, Farooq, 2006g.

১৭১ Muslim, Kitab at-Taubah, #6621, https://sunnah.com/muslim:2749.

নবিজির (স.) এই হাদিস গুনাহের জন্য কোনো লাইসেন্স নয় বা তার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক তা নয়। তথাপি এই বাণীতে মানুষের দুর্বলতা এবং অপূর্ণতার ইতিবাচক স্বীকৃতি রয়েছে। এর বিপরীতে, আইনসর্বস্ব মন-মানসিকতা ও ভাবধারা মানুষের এই অপূর্ণতাময় প্রকৃতির স্বীকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আইনসর্বস্বতার রোগলক্ষণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইনি হ্রস্বকরণ (reductionism)। সব কিছুকে আইনি আঙ্গিক থেকে দেখা হয়। আইনসর্বস্বতা চুলচেরা বিশ্লেষণের অমানুষিকতার বিকাশে সহায়তা করে। আইনসর্বস্বতা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে মানুষ সদাসর্বদা এক দুশ্চিন্তামূলক চাপের মধ্যে থাকে সে কোনো ভুল করল কি না, যদিও এ ব্যাপারে নবিজি (স.) স্পষ্ট করে এবং অত্যন্ত তাগিদের সাথে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

> ধ্বংসপ্রাপ্ত তারা যারা চুলচেরা বিশ্লেষণে (-র মত প্রান্তিকতায়) লিপ্ত হয়।[১৭২]

> যে ব্যক্তিকে (শেষ বিচারের দিনে) কঠোরভাবে কিংবা খুঁটিনাটি ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে ধ্বংস হবে।[১৭৩]

হয়তো আরো গুরুত্বপূর্ণ, আইনসর্বস্বতা একদিকে যেমন সাধুমন্যতা (self-righteousness)-এর জন্ম দেয়, তেমনি অন্যদিকে অপরাপর মানুষের ব্যাপারে বিচারের (judgmental) বা নিজেকে বিচারকের আসনে বসানোর মানসিকতার জন্ম দেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই চূড়ান্ত বিচারক (হাকিম) এবং যদি কেউ তার সেই সম্মানিত আসনে বসার চেষ্টা করে এ ব্যাপারে তিনি মারাত্মকভাবে সংবেদনশীল।

> আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন: আমি রাসুলুল্লাহকে (স.) বলতে শুনেছি: 'বনি ইসরাইলের দু'জন লোক ছিল যারা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়াসী ছিল। (কিন্তু) একজন গুনাহে অভ্যস্ত ছিল, আর অপরজন এই দুনিয়াতে শ্রেয় জীবনযাপন করতে যত্নবান ছিল। পুণ্যবান ব্যক্তিটি যে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার এবাদতে নিবেদিত ছিল, সে দেখত অপরজনকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকতে।

---

১৭২ Muslim, Vol. 4, Kitab al-Ilm, #6450, https://sunnah.com/muslim:2670.

১৭৩ Muslim, Kitab al-Jannah was-Sifat, #6874, https://sunnah.com/muslim:2876d.

সে অপরজনকে বলত: 'এই (গুনাহ) থেকে বিরত থাক।' একদিন সে ঐ ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় দেখল এবং বলল: 'এ থেকে বিরত থাক।'

অপরজন বলল: 'আমাকে আমার প্রভুর সাথে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার ওপর প্রহরী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? সে (পুণ্যবান জন) বলল: 'আমি আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না, তোমাকে বেহেশতেও স্থান দেবেন না।'

যথাসময়ে তাদের রুহ (আল্লাহর কাছে) ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং তারা রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত হয়।

তিনি সেই পুণ্যবান ব্যক্তি যে এবাদতে এত নিবেদিত ছিল তাকে বললেন: 'তুমি কি সত্যিই আমার ব্যাপারে জানো অথবা যা আসলে আমার হাতে সে ব্যাপারে তোমার কোনো ক্ষমতা আছে?' তিনি পাপপ্রবণ ব্যক্তিকে বললেন: 'যাও আমার রহমতে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।' আর তিনি অপরজনের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন: 'ওকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।'

আবু হোরায়রা বলেন: 'যার হাতে আমার জীবন, তার নামে শপথ করে বলছি, সেই (পুণ্যবান) ব্যক্তি এই জীবনে (এমন) একটি কথা বলল যার কারণে তার দোজাহান নষ্ট হয়ে গেল।'[১৭৪]

আরেকটি পর্যায়ে যেসব মূল্যবোধ এবং নীতিমালা ইসলামের নির্যাসের প্রতিফলক সেগুলো থেকে আইনসর্বস্বতা মানুষের মনোযোগ দূরে সরিয়ে নেয়। প্রায়শই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আইনসর্বস্বতা আইনকানুন, আহ্‌কাম, নিয়মাবলি, আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদির সাথে একচ্ছত্রভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখায়, যা সারবস্তুর পরিবর্তে বাহ্যিকতা এবং মূল্যবোধসমূহ এবং ঐ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের অন্তঃস্থ (inner) চেতনার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ও বাহ্যিকতার ওপর অতিমাত্রায় জোর দেয়।

যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, ব্যক্তি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ইবাদত, যেগুলোর স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রূপ রয়েছে, সে ব্যাপারে মুসলিমদের

---

১৭৪ Abu Dawud, Kitab al-Adab, #4883, https://sunnah.com/abudawud:4901.

অনুসরণ করা উচিত সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ঠ হয়ে। তবে ঐসব আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও সেগুলোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সেই সাথে জীবনের আচার-আচরণের বৃহত্তর দিকগুলোর সংযোগের ব্যাপারে আইনসর্বস্বতা নবিজির (স.) শিক্ষা ও আদর্শ বিস্মৃত হয়েছে বা উপেক্ষা করেছে।

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক দিক (চেহারা, appearance) বা বিত্তের দিকে নজর দেন না, বরং তিনি নজর দেন তোমাদের অন্তর এবং আমলের প্রতি।[১৭৫]

আইনসর্বস্বতার আরেকটি প্রধান সমস্যা, খুঁটিনাটি বিষয় বা চুলচেরা বিশ্লেষণের মন-মানসিকতার কারণে, কোনো রকম অগ্রাধিকার-বিন্যাস (prioritization)-এর সচেতনতার অভাবে সবকিছুই সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। যেহেতু প্রকৃতিগত কারণে মানুষ যেকোনো মুহূর্তে একসাথে সবকিছুর ওপর মনোযোগ দিতে পারে না, খুঁটিনাটির ব্যাপারে যাদের মনোযোগ তাদের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে কমবেশি বিচ্যুতি হতে বাধ্য। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আইনসর্বস্ব পরিবেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। আসলে যা হয়, শেষে মানুষ ছোটখাটো বা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়েই বেশি মেতে ওঠে, যেখানে বৃহত্তর দিকগুলোই হয় অবহেলার শিকার। সেখানে জীবনের বৃহত্তর মোজাইকের অন্তঃস্থ (inner) সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এর বিপরীতে, কুরআন সুস্পষ্টভাবে মুসলিমদের শিক্ষা দেয় যে অগ্রাধিকারের একটা প্রাধান্য পরম্পরা (hierarchy) আছে এবং তার রূপ কী, যেমনটি কুরআনে কবিরা গুণাহের ব্যাপারে পরিষ্কার করা হয়েছে।[১৭৬]

এরকম আইনসর্বস্ব পরিবেশেই জামাতের নামাজে কাতার সোজা করার ব্যাপারে অতিমাত্রায় মনোযোগ দেওয়াটা সবার কাছেই পরিচিত, যেখানে পুরো বিন্যাসের বিষয়টি যেন সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলার কায়দার মতো। কিন্তু বিশ্বাসীরা মসজিদের বাইরে পা রাখা মাত্রই জীবনের সামগ্রিক পরিসরে শৃঙ্খলা ও সংগঠনের কথা অনেক ক্ষেত্রেই একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যায়, যার প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবেই দেখা যায় অনেক মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের পথে পথে যানবাহন ট্রাফিকের করুণ অবস্থার মাঝে। তাহারাত বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মুসলিমরা যেভাবে গভীর যত্নসহকারে দেখে তা বাহ্যিকভাবেই দেখা

---

১৭৫ Muslim, Vol. 4, Kitab al-Birr, #6221, https://sunnah.com/muslim:2564c.
১৭৬ Avj-KziAvb 4/Avb-wbmv/31|

যায়। এই একই ব্যক্তিরা যারা দেহের নির্ধারিত প্রতিটি আনাচে কানাচে যাতে অজুর পানি পৌঁছে সেজন্য যা কিছু করা দরকার (তা নাকের গভীরতম কন্দরেই হোক) আর পবিত্রতা বা তাহারাতের জন্য (কেউ কেউ লুঙ্গি অথবা পাজামার মধ্যে বিশেষ জায়গায় কুলুখসহ হাত লাগিয়ে সবার সামনেই পায়চারি করেই হোক), তাদের অনেকেই দেখা যায় রাস্তায় আবর্জনা কীভাবে বা কোথায় ফেলতে হবে সে ব্যাপারে একেবারেই কোনো খেয়াল নেই আর তাই নবিজির (স.) শিক্ষার তাৎপর্য না বুঝে যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে চলেছে। জামাতের নামাজে ইমামের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের ওপরও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। ইমামকে অনুসরণ করতে হবে বলেই ইমামের আগেই সেজদাতে চলে যাওয়া অথবা তার আগে সেজদা থেকে মাথা ওঠানো ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই প্রেক্ষাপটে কেউ যদি নিজেকে ইমাম হিসেবে সবার ওপর চাপিয়ে দেয় তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু আরো বড় ইমামরা, অর্থাৎ নেতা বা শাসকরা, যারা নিজেদের সমাজের ওপর একনায়ক, রাজা বাদশা অথবা সামরিক জান্তা হিসেবে চাপিয়ে দেয়, ইমামের আগে সেজদা যায় না সেই অনুসরণকারীরাই তাদের নবিজির (স.) সুন্নাহ্র অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও প্রজ্ঞা না বুঝে এই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনা বাক্যে স্ব-আরোপিত এই ইমাম/নেতাদের আনুগত্য মেনে নেয়।

মুসলিম নারীরা আরো ভালো করে বুঝতে পারছে এবং সচেতন হচ্ছে যে আইনসর্বস্বতার সাথে পুরুষ-প্রাধান্য (male dominance) যুক্ত হয়ে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক অসংবেদনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অধিকতর শিক্ষিত নারীদের অনেকেই নতুন করে ইসলামকে আবিষ্কার করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রধান আইনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ করছে, কারণ তারা বুঝতে পারছে যে নারী সংক্রান্ত প্রচলিত বা দাবিকৃত ইসলামী আইনের অনেক দিকই ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[১৭৭]

আইনসর্বস্বতার প্রভাবে, সুদমুক্ত ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান চতুর্দিকে গজাচ্ছে। আইনসর্বস্ব আঙ্গিকে, যুক্তি দেখানো হয় যে, সুদ হারাম, যার পেছনে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তা অন্যায় এবং শোষণমুখী (জুলুম)। তবে প্রদত্ত এই যুক্তিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নসাপেক্ষ, কেননা বর্তমান দুনিয়ায়

১৭৭ Deccan Herald, February 3, 2005.

অবিচার ও শোষণের উৎস যারা (বিশেষ করে শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত) তাদের সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের গভীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যে ব্যাপারে এ প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে নিশ্চুপ। তাই ঐতিহ্যবাদী দিক থেকে আহ্কামগত শর্ত পূরণের প্রয়াস সেখানে রয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর পর্যায়ে দারিদ্র্য, বঞ্চনা অথবা শোষণ দূরীকরণের লক্ষ্যের সাথে তার কোনো সংযোগ নেই বললেই চলে।[১৭৮]

আইনসর্বস্বতার বোঝা, যা শরিয়া নিয়ে ভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার মধ্যে বিধৃত (Khan) যেটাকে অভিহিত করেছে 'আইনসর্বস্বতার নিপীড়ন' (the tyranny of legalism), তা মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আইনসর্বস্বতার পাশাপাশি, ইসলাম ধর্মতত্ত্বমুখিতা (থিওলজি-ওরিয়েন্টেশন)-এর শিকার, যেখানে বিশদ আকিদা ও ধর্মমতের শুদ্ধির মানসিকতা ইসলামের রুহকে হরণ করেছে। যা-কিছুতেই বিশ্বাস করা হোক তা আন্তরিকতা এবং শুদ্ধভাবেই করা উচিত, যার আলোকে ইবাদত-বন্দেগী এবং আমল কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহর ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্বাস-আকিদা শুদ্ধ বা সহিহ হওয়া আর গোঁড়া শুদ্ধিবাদ (puritanism) - ধর্ম ও প্রাসঙ্গিক আচার-আচরণে বিশেষ করে খুঁটিনাটি বিষয়ে অতিমাত্রায় কঠোরতা, এমনকি অসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা এক জিনিস নয়। খালেদ আবু এল-ফাদ্ল এ জাতীয় শুদ্ধিবাদের প্রকৃতি এবং ফল, বিশেষ করে তাকফিরি প্রবণতা যা স্বাভাবিকভাবেই আইনসর্বস্বতা আর বাহ্যিকতার দিকে ঠেলে দেয়, সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন:

> এই মুসলিম শুদ্ধিবাদীদের ধর্মতত্ত্বভিত্তিক মন-মানসিকতা পাশ্চাত্যসহ দুনিয়ার অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তিকর রূপ পেশ করে, যেখানে তা অনেক ক্ষেত্রে সর্বজনীন মূল্যবোধের সাথেও সাংঘর্ষিক। তাদের মধ্যে অন্যদের প্রতি পরিলক্ষিত হয় অসহিষ্ণু বর্জনকারিতা (exclusiveness) এবং মারমুখো প্রাধান্যের মানসিকতা। তাদের ধর্মতত্ত্ব (থিওলজি) অনুযায়ী, ইসলামই একমাত্র জীবনপদ্ধতি এবং এটাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস চালাতেই হবে তা অন্যদের অধিকার বা কল্যাণের জন্য যে ফলাফলই বয়ে আনুক না

১৭৮ Farooq, 2007a.

> কেন। তারা বলে, একটি আসমানি আইনভিত্তিক ব্যবস্থা (শরিয়া)র মাধ্যমে সরল পথ (সীরাতুল মুস্তাকিম) সুনির্ধারিত, যা সেই আইনগুলোতে প্রতিফলিত নয় এমন যেকোনো নৈতিক বা নীতিশাস্ত্রিক (এথিক্যাল) দিকের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন কিছু সুনির্দিষ্ট আহকামের মাধ্যমে যে আহকাম যেকোনো অবস্থায় সঠিক আচার-আচরণের জন্য পথ-নির্দেশনা দেয়। এই দুনিয়াতে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যে আসমানি বহিঃপ্রকাশ তার যথাযথ মর্যাদা দান আল্লাহর আহকামকে নিষ্ঠ এবং বিশ্বস্তভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। নৈতিকতার শুরু এবং শেষ ইসলামী আইনের পদ্ধতিগত (mechanics) এবং খুঁটিনাটি (technicalities)-এর সাথে (যদিও ভিন্ন ভিন্ন ফিক্‌হ আহকামগুলো ভিন্নভাবে দেখে)।
>
> এই বিধি বিধান মেনে চলার প্রতি নিবেদিত জীবন অন্য সব বিকল্পের চাইতে সহজাতভাবে (inherently) উৎকৃষ্টতর, আর যেকোনো পথের অনুসারীদের তারা দেখে কাফির, মুনাফিক অথবা ফাসিক হিসেবে। একটি নিরূপণযোগ্য (determinable) আইনের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং নিরাপদ মন-মানসিকতা নিয়ে তারা সহজেই কারা সঠিক পথে আছে আর কারা পথভ্রষ্ট তা অতি সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত তারা আইন (আহকাম) মেনে চলে, আর যারা পথভ্রষ্ট তারা আইন (আহকাম)কে অস্বীকার করে, তাতে শৈথিল্যের সন্ধানে প্রয়াসী হয়, অথবা সে ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে মাতে। স্বাভাবিকভাবেই, হেদায়েতপ্রাপ্তরা শ্রেষ্ঠ (superior), কারণ আল্লাহ তাদের পক্ষে রয়েছেন। মুসলিম শুদ্ধিবাদীরা কল্পনা করে যে আল্লাহর নৈখুঁত্য (perfection) এবং অপরিবর্তনীয়তার গুণ (সিফাত) এ দুনিয়াতে পূর্ণভাবে অর্জনযোগ্য, যেন আল্লাহর নৈখুঁত্য আসমানি আইনে সন্নিহিত আছে, আর এই আইনকে বাস্তবে রূপদান করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়তে পারব যাতে আয়নার মতো আসমানি সত্যের প্রতিফলন হয়।[১৭৯]

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এটা আল্লাহর অভিপ্রায়ই নয় যে, এই দুনিয়া একটি বিশুদ্ধতার আবাস হোক, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অন্য সবকিছুর চেয়ে

১৭৯ El Fadl, 2002, pp. 4-5.

আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সংযোগ গড়া সহজতর করা। যে মানবাত্মা থেকে এসেছে আদম ও হাওয়া বস্তুত সৃষ্টিলগ্নের প্রথম অধ্যায়ের একেবারে শুরু থেকেই - সেই মানবতার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপূর্ণতা ও ভুল ভ্রান্তি-পদস্খলনের সম্ভাবনা (fallibility)। মানবতার এই অপূর্ণতার সম্ভাবনা আল্লাহ তায়ালার নিজেরই সৃষ্ট এবং মানুষের ভুল-ভ্রান্তির প্রবণতার কারণেই তিনি মানবকুলকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আল-গাফুর (পরম ক্ষমাশীল) এবং আল-তাওওয়াব (তাওবাগ্রহণকারী)। আল্লাহ তায়ালা শুধু চান যে, মানুষ নিষ্ঠভাবে প্রয়াস চালাবে ভুল বা গুনাহ না করতে, কিন্তু যদি সে করেই ফেলে এবং সমূহ সম্ভাবনা যে সে করতে পারে - তাহলে সে তাওবা করবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে: আন্তরিকতার সাথে তার ব্যর্থতা স্বীকার করবে এবং সেজন্য তার ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আইনসর্বস্বতা এসব বিষয়কে ধূলিসাৎ করে ফেলে যখন তা খোদায়ী আসমানি বৈশিষ্ট্যকে তার হেদায়েতের নৈখুঁত্য-পূর্ণতা এবং অপরিবর্তনীয়তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে মানবিক পর্যায়ে।[১৮০]

যদিও ইসলামের লক্ষ্যই হচ্ছে মানবতার মুক্তি (liberation)– একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া মানুষের ওপর আর সব প্রভুত্ব থেকে মুক্তি - আসলে বাস্তবতাই যেন জিম্মি হয়ে আছে বিভিন্ন কারণের কাছে যার মধ্যে বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের কারণই রয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে ইসলামের পরিমিতিবোধ (মডারেশন) এবং ভারসাম্যের বাণী পদদলিত হয়েছে ধর্মতাত্ত্বিক গোঁড়ামি (dogmatism), চুলচেরা বিশ্লেষণের ও খুঁটিনাটি নিয়ে মাতামাতির চরমপন্থা এবং আরোপ (enforcement) করার মানসিকতায়। এর নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন আইনসর্বস্বতা থেকে আরো ভারসাম্যপূর্ণ মূল্যবোধমুখী অবস্থানের দিকে প্রাসঙ্গিক ইজতিহাদভিত্তিক মৌলিক পরিবর্তন। ইজতিহাদ তো সব সময়ই ছিল এবং আছে; সেই ইজতিহাদের ঐতিহ্যে মূল্যবোধমুখিতার প্রাসঙ্গিক সংযোগ হওয়া প্রয়োজন।

৫. মূল্যবোধমুখিতা (Value-orientation)

একটি সমাজের আসল চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে তার মূল্যবোধ এবং নীতিমালায় (principles)। একটি আইন ব্যবস্থা এবং পরিবেশও সে সমাজ কী ধরনের

---

১৮০ Farooq, 2003a.

মূল্যবোধ বা নীতিকে সমুন্নত রাখে, তার প্রতিফলন ঘটায়। আইনকানুন বা আহকামকে মূল্যবোধের সম্ভারের ওপরে স্থান দেওয়া বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা আইনসর্বস্বতার বিকাশে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, কেননা তা অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার শামিল। ঐতিহ্যবাদী ইসলামের অভিজ্ঞতা এর সত্যতা প্রমাণ করে; মদিনার আগের অধ্যায়ে কুরআনে যা কিছু নাজিল হয়েছে তার মধ্যে আহকামের তেমন কিছুই ছিল না। বরং সেখানে নতুন একটি সমাজের গোড়াপত্তনের জন্য উম্মাহ্‌কে তৈরি করতে প্রয়োজনীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং নীতিগত দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে উপদেশ, উৎসাহ, সতর্কবাণী ইত্যাদি সংক্রান্ত পথনির্দেশনা। বিস্তারিতভাবে আনুষ্ঠানিক ইবাদত, সমাজ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিধিবিধান অথবা আদেশ-নিষেধের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে মুখ্যত মাদানি অধ্যায়ে, যখন একটি রাষ্ট্রের সামাজিক কাঠামো ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাকওয়ার পুঁজির ভিত্তিতে উম্মাহ তৈরি হয়েছে বিশিষ্ট আইন কাঠামো ও বিধিবিধানসহ একটি সংগঠিত সমাজের জন্য।

কুরআন আসলে সীমিত কিছু আইন-কানুন সংক্রান্ত আহকাম পেশ করে; কুরআনের বেশিরভাগ উপদেশ পরামর্শ ধরনের পথনির্দেশনার মতো। নবিজি (স.) তাঁর অনুসরণীয় জীবনে সেই কুরআনের হেদায়েতই বাস্তবে রূপায়িত করেন। তিনি তার বিশদ দিকগুলো তুলে ধরেছেন যাতে করে ঐ আহকাম, আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হয়। সেই শিশু সমাজের অস্তিত্ব এবং শক্তি জীবনের প্রতিটি দিকে আইন-কানুন বা বিধিবিধানের প্রয়োগ-আরোপের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং তা নির্ভরশীল ছিল একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থার (value system) ওপর, যা তাকওয়া বা আল্লাহ-সচেতনতায় পুষ্ট হয়ে মানুষকে স্বেচ্ছায় আগ্রহী করে তোলে, যেখানে তারা আগ্রহী হয় আসমানি হিদায়াত পেতে এবং তার মূল্য সমুন্নত রেখে তাদের জীবনকে আকাঙ্ক্ষিতভাবে ঢেলে সাজাতে। আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব প্রজ্ঞার প্রতিফলন হিসেবে কুরআন আমাদের অবহিত করে যে, মানবপ্রকৃতি সহজাতভাবে স্বার্থ (self-interest) তাড়িত।[১৮১]

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

১৮১ Farooq, 2006f.

> তোমরা যদি ভালো কাজ করো, তবে তা ভালো করো তোমাদের নিজেদের জন্যই; আর যদি তোমরা খারাপ কাজে লিপ্ত হও, এটাও একইভাবে তোমাদের (নিজেদের আত্মার) বিরুদ্ধেই।[১৮২]

এটা সত্য যে ইসলামী আইনের মধ্যে রয়েছে জেনার মতো অপরাধের জন্য সাংঘাতিকভাবে কঠোর শাস্তি। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তিও বিরত রাখে না কাউকে যদি সে সত্যিই নিজের জীবনের ব্যাপারে কোনো মায়া না রাখে অথবা অন্যের জীবনের ব্যাপারে কোনো সীমারেখা না মানে। তা যাই হোক, জেনার ক্ষেত্রে কাউকে অভিযুক্ত প্রমাণ করার বিষয়টি এতই কঠিন যে, তাতে অভিযোগ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, নবিজির (স.) জীবনে এমন একটিও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে অন্যদের বা রাষ্ট্র দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং ঐতিহ্যবাদী আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এরকম অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ তো পাওয়া যায় যে, কোনো জেনাকারী অনুতপ্ত হয়ে নিজে শাস্তি চেয়ে নিয়েছে, কারণ ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেউ যদি এ দুনিয়াতে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং যথাযথভাবে শাস্তি পেয়ে যায় তাহলে সে আখেরাতের কঠোরতর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে এবং সেই সাথে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার মর্যাদা-মর্তবা আরো বেড়ে যাবে।[১৮৩]

---

১৮২ আল-কুরআন (আল-ইসরা') ১৭:৭।

১৮৩ Muslim, Kitab al-Hudud, #4205, #4207, https://sunnah.com/muslim: 1695a. অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে কিছু ইহুদি তাদেরই কিছু সতীর্থদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে, ইহুদিদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ীই তাদের বিচার করে পাথর নিক্ষেপে মারা হয়। দেখুন Al-Bukhari, Vol. 2, Kitab al-manaqib, #413, https://sunnah.com/bukhari:3635। প্রসঙ্গত, জেনার শাস্তি হিসেবে রজম বা পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়টি অবিতর্কিত নয়, কারণ সহিহ বুখারিতেই পরস্পরবিরোধী তথ্য এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: ... 'আমরা মদিনায় উপস্থিত হলাম। তখন উমর (রা.) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (স.)-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজম' (তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।" (Kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah, #7323, https://sunnah.com/bukhari:7323)। এখানে হযরত উমরের কথা অনুযায়ী রজমের আয়াত কুরআনের অংশ, অথচ আমরা জানি যে কুরআনে তা নেই। কেন এই তথ্যের অসামঞ্জস্যতা তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে, কিন্তু বাস্তবতা এই যে এখানে সহিহ বুখারির মতো হাদিস সংগ্রহে এমন একটি দাবি এসেছে, যা কুরআনের সাথে স্পষ্টতই মিলছে না।

যেহেতু যথাযথ মূল্যবোধমুখিতার বিকাশ ঘটে নবিজির (স.) জীবনাদর্শে, তাই সেখানে আইন তো ছিল, কিন্তু আইনসর্বস্বতা ছিল না। আইন যখন আইনসর্বস্বতায় পর্যবসিত হলো, তখন বিশেষ করে সমাজের দুর্বল এবং শক্তিহীন যারা যাদের মধ্যে রয়েছে নারীরা তারা অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম এবং শরিয়ার নামে অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়ে পড়ল।[১৮৪] দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানের হুদুদ আইনের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সুবিচার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং নিছক আসমানি হেদায়েতের আনুগত্য ও প্রয়োগ, যদিও সুবিচারের ব্যাপারে হেদায়েত এসেছে নির্যাস (essential) এবং মৌলিক পর্যায়ে। বিশদ পর্যায়ে এই আইনগুলো ভুল ত্রুটির সম্ভাবনাময় মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়া। তাছাড়া এসব আইনের প্রয়োগও অসংবেদনশীল এবং অতিমাত্রায় ভুলভ্রান্তিতে ভরা মানুষের হাতে, যারা অনেক ক্ষেত্রে না আইনের অনুশাসন কী এবং আর না তা যে মানুষের জন্য (মানুষ আইনের জন্য নয়) তা সত্যিকার অর্থে বোঝে এবং তার প্রতি সম্মান দেখায়। এরকম পরিবেশে ফলাফল যা দাঁড়ায় তা সত্যিই করুণ।

ইয়াহিয়া ইমেরিক যথার্থই বলেছেন:

> ইসলামের মহিমান্বিত গুণাবলি, যেমন দয়া মায়া, সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং (ইসলামের আলোকে প্রগতিশীলতা) ইত্যাদির সাথে মুসলিমরা সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বনি ইসরাইলের মতোই হয়ে গেছি: আইনসর্বস্বতা, কঠোরতা এবং অসহনশীলতায় নিমজ্জিত। যেমন করে হযরত ঈসাকে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করার জন্য, আমাদের জন্যও তেমনি নতুন জীবনের সঞ্চার প্রয়োজন।[১৮৫]

প্রসঙ্গত, প্রাণসঞ্চারের জন্য আর কোনো নবি আসবেন না, বরং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আসবে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), এবং এসেছেনও।

শরিয়া যদি আসমানি (যেমন, কুরআন), মুখ্যত আসমানি নয় (যেমন, হাদিস), এবং আসমানি নয় (যেমন, ইজমা আর কিয়াস) এরকম উভয় ধরনের উৎস এবং বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং বিশদ পর্যায়ে তা যদি মুখ্যত এবং অনানুপাতিকভাবে আসমানি নয় এরকম উৎসগুলোর বুনিয়াদের

---

১৮৪ Farooq, 2006e.
১৮৫ Emerick, n. d.

ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কি সামগ্রিকভাবে আসমানি বলা সমীচীন? অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অধিকাংশ মুসলিম মুসলিম হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না ইসলামী আইনকে তারা যেভাবে জেনে এসেছে তার প্রতি আনুগত্য ব্যতিরেকে, যদিও কীভাবে এসমস্ত আইন তৈরি অথবা প্রণীত হয়েছে সে ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমই অবহিত নয়। তার পাশাপাশি শরিয়াকে (সামগ্রিকভাবে) আসমানি পর্যায়ের আসনে উন্নীত করার প্রবণতার কারণে এসমস্ত আইন সাধারণ মুসলিমের কোনো সমালোচনা বা মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে উঠে রয়েছে। এ ব্যাপারে একজন সুপরিচিত মুসলিম নারী স্কলার, রিফ্‌ফাত হাসান, বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন:

> মুসলিম হওয়াটা মুখ্যত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় একটি বিশ্বাসের ওপর: যিনি সর্বজনীন স্রষ্টা এবং পালনকর্তা হিসেবে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আসমানি বাণী নাজিল করেছেন, সেই আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস (যা থেকে উৎসারিত বাকি সব বিশ্বাস)। কিন্তু আল্লাহতে এবং নবিজি মুহাম্মদের (স.) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পাঠানো ওহি যা কুরআনে সংরক্ষিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা আর শরিয়াকে নিজেদের ওপর আবশ্যকীয় (বাইন্ডিং) মনে করা এক জিনিস নয় ... শুধুমাত্র কেউ যদি 'শরিয়া'কে নিজের ওপর আবশ্যকীয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে (ইসলামী আইন অর্থে সামগ্রিকভাবে) শরিয়া আসমানি, দুর্জ্ঞেয় (transcendent) এবং চিরন্তন, তাহলেই একজন মুসলিম হতে পারে, এ ধারণার ব্যাপারে অবশ্যই জোরদারভাবে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে (এবং, আমার দৃষ্টিতে তোলা উচিত)।[১৮৬]

তাই সামগ্রিকভাবে আসমানি হিসেবে যদি গণ্য করা না যায়, তাহলে শরিয়াকে কীভাবে বোঝা বা বর্ণনা করা যেতে পারে? এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রস্তাবনা বিবেচনা করা যেতে পারে:

> শরিয়াকে প্রায়শই ইসলামী আইন হিসেবে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু তা ভুল, কারণ এর একটি ক্ষুদ্র অংশ ইসলামের মূল উৎস কুরআনের ওপর অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যেতে

১৮৬ Shaheed, 1994, quoting a renowned female scholar of Islam Dr. Riffat Hassan, http://www.wluml.org/english/pubs/rtf/occpaper/OCP-05.rtf, retrieved August 3, 2006.

> পারে 'মুসলিম আইন' (অর্থাৎ মুসলিমদের আইন), অথবা 'ইসলাম-অনুপ্রাণিত' (Islam-inspired), 'ইসলাম থেকে নিরূপিত' (Islam-derived) অথবা মুসলিমদের আইন ব্যবস্থা)।[১৮৭]

খান যথোচিতভাবে মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছেন: "সব সমস্যার তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারোপযোগী (readymade) সমাধান ভান্ডার হিসেবে না দেখে, ইসলামকে গণ্য করুন বা দেখুন মূল্যবোধের ঝর্ণা-উৎস (fountain) হিসেবে যা মানুষের আচার-আচরণ-কর্মকাণ্ডের জন্য পথ-নির্দেশনা দেয়।"[১৮৮]

তাহলে সেসব মৌলিক মূল্যবোধগুলো কী হবে যা মুসলিমরা সমুন্নত রাখবে এবং তাদের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি এবং আইন ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত (integrate) করবে? নিচে দৃষ্টান্তমূলক একটি তালিকা পেশ করা হচ্ছে, যদিও সে তালিকাকে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে মনে করার কোনো কারণ নেই।

১. মৌলিক মানবমর্যাদা (প্রতিটি মানুষ একজন ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদাবান; একটি বস্তু বা সামগ্রী নয়)

প্রতিটি মানুষকে একটি সামগ্রী হিসেবে নয়, বরং একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে এবং মর্যাদা দিতে হবে। দাসত্ব প্রথা বা মানুষকে ক্রীতদাস বানানো বা সে প্রথাকে হালাল বা অনুমোদনযোগ্য গণ্য করা তখনই সম্ভব যখন মানুষকে একটি সামগ্রীর মতো দেখা হয় যা কারো মালিকানাধীন হতে পারে বা যা নিয়ে লেনদেন চলতে পারে।[১৮৯] রাসুলুল্লাহর (স.) যুগেও দাসপ্রথা এবং ক্রীতদাস বেচা-কেনা ছিল। কিন্তু তা অতীতের সমাজ আর রীতির ধারাবাহিকতায়। দাসপ্রথা বিলুপ্তির লক্ষ্যে ইসলামের ফরজ জাকাতের একটি স্থায়ী খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে দাসমুক্তির জন্য।[১৯০] একই সাথে মুক্ত কোনো মানুষকে বেচাকেনার সামগ্রী বানানোর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন

---

১৮৭ Encyclopedia of the Orient. Retrieved March 15, 2007, http://i-cias.com/e.o/sharia.htm.

১৮৮ Khan, M., 2014.

১৮৯ Farooq, 2006c.

১৯০ "জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে যারা তাদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" [(আত-তাওবা) ৯:৬০]

রাসুলুল্লাহ (স.)।[১৯১] ক্রীতদাসত্ব প্রসঙ্গটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে কিয়াস শীর্ষক অধ্যায়ে।

একই ধরনের চিন্তাভাবনা আইনসর্বস্ব প্রবণতার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়, যেখানে অনেকেই মাহ্‌র (যৌতুক)-কে গণ্য করে লেনদেনে একটি 'মূল্য' বিনিময় হিসেবে।[১৯২] এ রকম পর্যবেক্ষণে অনেকেই শুরুতে অস্বস্তিই বোধ করবেন, কিন্তু আমাদের ফিকহের গ্রন্থাদিতে বিষয়টি কীভাবে এসেছে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে কিয়াস শীর্ষক অধ্যায়ে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে অলঙ্ঘনীয় (sanctified) করেছেন মানুষ হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে মানুষের সেই মৌলিক মানবিক মর্যাদা (Fundamental human dignity) সমুন্নত রাখার ব্যাপারে মুসলিমদেরই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

> "হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ব্যাপারে সচেতন হও (তাকওয়া অবলম্বন করো), যিনি তোমাদের এক আত্মা বা অস্তিত্ব (নাফস) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[১৯৩]

> এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: "ইয়া রাসুলাল্লাহ, কার ইসলাম শ্রেষ্ঠ (আফযাল)?" তিনি বললেন: "যার জিহ্‌বা এবং হাত থেকে মানুষ [আন-নাস, অর্থাৎ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে] নিরাপদ।"[১৯৪]

---

১৯১ রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'শেষ বিচারের দিনে আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবঃ (১) যে আমার নামে চুক্তি করে, অথচ সে বিষয়ে খেয়ানত করে; (২) যে একজন মুক্ত ব্যক্তিকে (দাস হিসেবে) বিক্রয় করে এবং তা থেকে প্রাপ্ত মূল্য ভোগ করে; (৩) যে একজন শ্রমিককে নিয়োগ করে, তাঁর থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করে অথচ তাঁর পারিশ্রমিক পরিশোধ করে না।" [Al-Bukhari, Kitab al-Buyu, #2227, https://sunnah.com/bukhari:2227]

১৯২ দেখুন এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে "বিয়ে, চুক্তি এবং বেচা-কেনা" অংশটি।

১৯৩ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:১।

১৯৪ Hanbal, Musnad-i-Ahmad, #6762.

২. সুবিচার/ন্যায়পরায়ণতা

সুবিচার বা ন্যায়নীতির ব্যাপারে ইসলামের তাগিদ দ্ব্যর্থহীন। নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য যে মান নির্ধারণ করেছে তা অন্য যেকোনো ধর্ম বা মতবাদের চেয়ে অনেক উপরে।

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
>
> "হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই কাছাকাছি। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। তোমরা যদি সুবিচারে বিকৃতি দেখাও অথবা সুবিচার করতে না চাও, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন।"[১৯৫]

ইসলামী আইনের প্রণয়নে অথবা ফতোয়া বিশ্লেষণে সাধারণত প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর কি প্রভাব ফেলবে বা তাঁর ফলাফল সুবিচারপূর্ণ হবে কি না তা সুনির্দিষ্ট বা আলাদাভাবে বিবেচনায় নেয়া হয় না। আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়গুলো ছাড়া, বাকি সব আইনকানুন বা বিধিবিধান যেগুলো মানুষের জীবন, সম্মান এবং সম্পদকে প্রভাবিত করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারী অথবা প্রণয়নকারীদের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে যে, সেই বিশেষ আইনগুলো কেমন করে সুবিচারপূর্ণ এবং সেগুলোর প্রয়োগ কেমন করে সুবিচার প্রতিষ্ঠায়, অর্জনে বা বজায় রাখতে অনুকূল হবে। যেমন, নিখোঁজ স্বামীর ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তি এবং পুনর্বার বিয়ের অনুমতি বা সুযোগ

---

১৯৫ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:১৩৫।

পাবার জন্য স্ত্রীকে কমপক্ষে চার বা দশ বছর, এমনকি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, এরকম আইন নিছক প্রণয়ন করলেই অথবা ফতোয়া দিলেই চলবে না,[১৯৬] বরং এটাও প্রমাণ বা প্রদর্শন করতে হবে যে কেমন করে এই আইন বা শর্ত সুবিচারপূর্ণ, বিশেষ করে স্ত্রীর অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে।

সুবিচার বা ন্যায়নীতিকে কখনোই আপেক্ষিক হিসেবে দেখা উচিত নয়, যেমনটি কিছু আলেম, এমনকি নামকরা আলেম, ভুলবশত দেখে থাকেন।[১৯৭] তার বিপরীতে, ঐতিহ্যবাদীদের ধারা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, প্রখ্যাত মনীষী ইবনে কাইয়েম সুবিচারকে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখেন এবং শরিয়া ও ইসলামকে সুবিচারের সাথে সংযুক্ত করাটাই যথার্থ ইসলামী এই আঙ্গিকের ওপর গুরুত্ব দেন।

> শরিয়াই প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা এবং উভয় জীবনে মানুষের স্বার্থের সংরক্ষণের ভিত্তির ওপর
>
> (فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،)|
>
> এর সামগ্রিকতায়, শরিয়া হচ্ছে সুবিচার, দয়ামায়া এবং হিকমত। এমন প্রতিটি আহকাম যা সুবিচারকে অবিচারে, দয়ামায়াকে তার বিপরীতে, ভালোকে মন্দে আর হিকমতকে মুর্খতায় (triviality) পর্যবসিত করে, তা যদি কোনো না কোনো ভিতিতে আহকাম হিসেবে নিরূপিত হয়েও থাকে, তবু তা শরিয়ার অংশ নয়। শরিয়া হচ্ছে তার সৃষ্ট মানুষের জন্য আল্লাহর সুবিচার এবং রহমত।[১৯৮]

---

১৯৬ al-Qayrawani, The Risala; দেখুন, বিয়ে এবং তালাক অধ্যায়। তালাকপ্রাপ্তির আগে স্বল্পতম অপেক্ষার সময় চার বছর। কোনো কোনো মাযহাবে অপেক্ষার সময় অনির্দিষ্ট কাল। এ বিষয়ে আল-কায়রাওয়ানীর অবস্থান মালিকী মাযহাবের ভিত্তিতে, যার সাথে হানাফী মাযহাব একমত।

১৯৭ Farooq., 2007a.

১৯৮ Guraya, pp. 24-25, citing Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in.

৩. সাম্য (এবং বৈষম্যহীনতা)

মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, শ্বেত-কৃষ্ণ নির্বিশেষে ইসলামের মূল্যবোধভিত্তিক মানদণ্ড (norm) হচ্ছে সাম্য বা সমতা। এই দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে সবাই সমান, বিশেষ করে সেইসব অধিকারের ব্যাপারে যেগুলো জীবন, সম্মান এবং সম্পদ-সংশ্লিষ্ট। একজন মুসলিমের যাই গুণ বা মর্তবা থাক তার পুরস্কার সে আল্লাহ তায়ালা থেকে পাবে আখেরাতে। এই দুনিয়াতে মানবিক পর্যায়ে, মানুষ প্রত্যেককে সমান হিসেবে দেখবে সুবিচারপূর্ণতার আলোকে।

অনেক দিকের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটো দিকে এই সাম্যের বিষয় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ: নারী-পুরুষ এবং মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক। যেমন, তালাকের ক্ষেত্রে কুরআনের পথনির্দেশনা হচ্ছে:

> নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের (এক মাত্রা) মর্যাদা আছে; আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১৯৯]

উপর্যুক্ত আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে যে, এই প্রেক্ষাপটে নারীদের ওপর পুরুষদের (কিছুটা) মর্যাদা বা অগ্রাধিকার বা সুবিধা (advantage বা privilege) থাকলেও মূলত নারী-পুরুষদের পারস্পরিক অধিকার অনুরূপ বা পারস্পরিক (reciprocal)। এটাই ইসলামের আদর্শ (নর্ম)। কিন্তু ইসলামী আইন অর্থাৎ প্রচলিত শরিয়তে আসলে সেই কুরআনি নির্দেশনার বিপরীতে ব্যাপক বৈষম্যের অবতারণা হয়েছে, যা নর্ম-এর জায়গায় পুরুষের প্রাধান্যকে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করেছে যা এই আয়াতের প্রথম এবং সাধারণ অংশের সাথে মেলে না। তালাকের ক্ষেত্রে প্রচলিত ইসলামী আইন পুরুষকে এক মাত্রা বা কিছুটা অগ্রাধিকার দেয়নি, বরং পুরুষকে অনেকটা নিঃশর্ত, একচ্ছত্র সুবিধা দিয়েছে।

কুরআনের আঙ্গিকে, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলত পারস্পরিক অভিভাবকত্ব (wilayah)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

১৯৯ https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের আওলিয়া (অভিভাবক, রক্ষক, বন্ধু); তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদের আল্লাহ্ রহম করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২০০]

কুরআনে পারস্পরিক অভিভাবকত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকলেও, আন-নিসা ৪:৩৪-তে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে শুধুমাত্র অথবা মূখ্যত 'কাওয়াম' (কর্তা বা কর্তৃত্বশীল) হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে। এমনকি পারস্পরিক অভিভাবকত্ব এবং 'কাওয়াম' এর বিষয় দু'টির মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে সেটাও সাধারণত আলোচনার বাইরে রয়ে যায়।

প্রসঙ্গত এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, এখানে সমতা বা সাম্য বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা পাশ্চাত্যের নিঃশর্ত বা অবাধ সমতার ধারণা নয়। পাশ্চাত্যের ধারণায় যে অবাধ সমতার কথা বলা হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে সমতার নামে অবিচারের অবকাশ সৃষ্টি করে। এমনকি পাশ্চাত্য সমাজেও সমানাধিকারের নামে ক্রীড়াঙ্গনে নারী দল আর পুরুষ দলের মধ্যে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না অথবা সেই সমানাধিকারের দাবি করা হয় না। বিষয়টা নিছক সমতার নয়, বরং সুবিচারেরও। ইসলাম মৌলিকভাবে সমতায় বিশ্বাসী, কিন্তু নিছক বাহ্যিক, প্রক্রিয়াগত (procedural) অথবা আনুষ্ঠানিক (ceremonial) সমতায় নয়, বরং মৌলিকভাবে সেই সমতা যেন ফলাফল ও কার্যকারিতার দিক থেকে সুবিচারপূর্ণ হয়। কৃত্রিমভাবে অথবা নিঃশর্তভাবে সমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা করলে অনেক ক্ষেত্রে তা সুবিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে নিচের ছবিটিতে।

---

২০০ আল-কুরআন (আল-মায়িদা) ৫: ৩২।

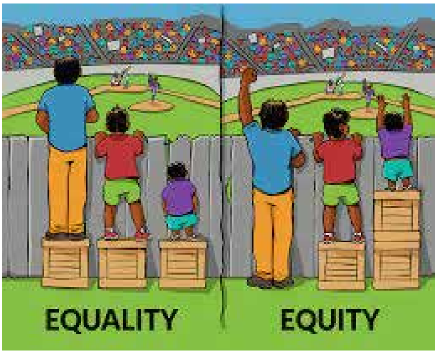

সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল চেঞ্জ[২০১]

একইভাবে জীবনের ক্ষেত্রে ধর্ম-নির্বিশেষে সবার প্রতি মানবিক বা মানবতামুখী (humanity-oriented) আচরণ করা উচিত।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

এ কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি বিধান দিয়েছি যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল; আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের কাছে তো রাসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেল।[২০২]

সুবিচারের ক্ষেত্রে যদি উপর্যুক্ত আয়াতটির যথার্থই কোনো অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা থেকে থাকে, তাহলে জীবনের সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না। যদি কোনো সমাজে বা রাষ্ট্রে একই অপরাধের জন্য একজন অমুসলিমের জন্য নির্ধারিত যে সাজা একজন মুসলিমকে তাঁর চেয়ে দ্বিগুণ সাজা

---

201 Elias, Abu Amina (May 28, 2014). “Muslims not killed for killing non-Muslims?” https://www.abuaminaelias.com/muslims-not-punished-for-killing-non-muslims/.

২০২ আল-কুরআন (আল-বালাদ) ৯০:১-৪।

দেওয়া হয়, মুসলিমরা কি তা সুবিচারপূর্ণ মনে করবে? যদি মনে করা হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি মনে করা না হয়, তাহলে খুনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে হত্যা করার জন্য অমুসলিমের প্রাপ্য সাজা একজন অমুসলিমকে হত্যা করার জন্য মুসলিমের সাজা থেকে ভিন্ন হলে সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়।[২০৩]

আমানুল্লাহ (২০১৮) এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন:

> একজন মুসলিম যদি একজন অমুসলিমকে হত্যা করে তাহলে সেই মুসলিমের মৃত্যুদণ্ড হবে কি না এ নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। যদিও হানাফি ফুকাহাদের মত, মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত, অধিকাংশ ফুকাহাদের মত যে তা উচিত নয়। মুসলিম স্কলাররা, যেমন, আওদাহ, আল-আওয়া এবং অন্যরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল এবং সাম্প্রতিক ফিকহী (ইসলামী আইন-সংক্রান্ত) সাহিত্যের ভিত্তিতে হানাফী অবস্থান (অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড) আরো মজবুত দলিলের ভিত্তিতে এবং আমাদের সমসাময়িক সময়ে মুসলিম আর অমুসলিমদের জনস্বার্থ (public interest) বিবেচনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

সামগ্রিকভাবে সব রকমের বিবেচনায় আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে, ইসলাম আমাদের যেরকম নিষ্ঠভাবে সুবিচার এবং বৈষম্যহীনতার কথা শেখায়, কুরআনের সেই সুস্পষ্ট মূল্যবোধ আমাদের আইন, বিধিবিধান, কানুন, পলিসি এবং আচার-আচরণে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

৪. স্বাধীনতা/ইখতিয়ার (Freedom)

ইসলামের সৌধ যে জোরজবরদস্তির ওপর নয়, বরং ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর তা মূল্যবোধমুখিতার একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলামকে যদি আবার প্রাসঙ্গিক

২০৩ এমনকি একজন নবির সন্তান বা পরিবারও স্বতঃসিদ্ধভাবে মুসলিম হবে বা থাকবে এমন নয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এটা তাদের নিজস্ব ইখতিয়ার। হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর পুত্র ও পরিবার (হুদ ১১:৪২-৪৭); আল-তাহরিম ৬৬:১০) এবং হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীর ঘটনা (হুদ ১১:৮১; আল-হিজ্‌র ১৫:৫৯-৬০) তাঁর সাক্ষ্য বহন করে।

হতে হয় তাহলে যারা এ দীনকে আলিঙ্গন করে তাদের পছন্দ করার স্বাধীনতার ভিত্তির স্বীকৃতি থাকতে হবে। জোরজবরদস্তি হয়তো সাময়িক আনুগত্য আনতে পারে, কিন্তু তা কখনোই হৃদয় জয় করে না; আর তাই তারা প্রথম সুযোগেই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খল খুলে ফেলবে, যার মাধ্যমে যেকোনো সমাজে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত জন্ম নিতে বাধ্য। যখন নবিজি (স.) এবং তার শিশু-উম্মাহ বিরতিহীনভাবে চরম নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে (স.) তাঁর স্বাধীনতাকে আঁকড়ে ধরতে এবং স্বাধীনতার ব্যাপারে আপোষহীন হতে নির্দেশনা দেন। যেকোনো সুস্থ এবং সচল (functional) সমাজের স্বাভাবিক সীমারেখা (parameter) ছাড়া, মানুষের মত-পথ নির্বাচন ও সাধারণভাবে স্বাধীনতার অধিকার হরণ করার অধিকার কারোরই নেই।

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ
وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَد
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد
لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

এই শহরের সাক্ষ্য;
তুমি এই শহরের একজন স্বাধীন ব্যক্তি (হিল্লুন);
এবং পিতা-মাতা ও সন্তানের (আসমানি বন্ধন);
নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সংগ্রাম-সাধনার মধ্যে।[২০৪]

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

ক. ইসলামের বিশ্বাসগত যাবতীয় দিক মুখ্যত প্রাপ্তবয়স্কদের ওপরই প্রযোজ্য। যেকোন সমাজেই প্রাপ্তবয়ষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ছোটরা পিতা-মাতা, পরিবার এবং নিকটের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবেই বড় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান পরিবারের সন্তানরা খ্রিষ্টান বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে, ইহুদি পরিবারের সন্তান ইহুদি হয়ে, হিন্দুর ঘরের সন্তান হিন্দু হয়ে। মুসলিম পরিবারের ক্ষেত্রেও সন্তানরা মুসলিম পরিচিতি ও সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক।

২০৪ Al-Nabhani, n.d., p. 116.

প্রত্যেক ধর্মের পরিসরেই সাধারণত সন্তানরা বড়দের ধর্ম ও বিশ্বাসকে স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা যে পরিবেশে, যে ধর্মকে জেনে বড় হয়েছে এটা নিয়ে প্রশ্ন করে না। কিন্তু পিতা-মাতা বা পরিবারও ধরে নেয়, সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার ধর্ম-পথ নিজেরা ধারণ করবে। কিন্তু সত্য (হক্ব) বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। ইসলামেও তাই, এবং সেজন্যই ইসলামে প্রবেশের দুয়ার এবং পাঁচটি বুনিয়াদের প্রথমটি হচ্ছে শাহাদাত। তাই ইসলামকে প্রচলিতভাবে একটি সংস্কৃতিগত দিক থেকে দেখা, অর্থাৎ মুসলিম শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাপারে আশা করা যে তারা এমনিতেই (automatically) বা অবশ্যই মুসলিম হবে তা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ইসলামে বিশ্বাস করা মানে একজন ব্যক্তি অনুধাবনের আলোকে সম্ভব সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করবে আমল এবং জীবনযাপন করতে। অন্যদের জন্য, এবং বিশেষ করে সন্তানদের জন্য, দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেদের পেশ করা এ প্রসঙ্গে খুবই জরুরি; সেইসাথে নিজেদের সন্তানরা বড় হতে হতে তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া এবং ইসলামকে বুঝতে তাদের সহায়তা করা, বিশেষ করে কেন আমাদের সঠিকভাবে সবকিছু বেছে নিতে হবে এবং সঠিক বা ভুল পথ বেছে নেবার পরিণতি কী সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে উপলব্ধি জাগাতে হবে। কিন্তু অন্যরা তো নয়ই, এমনকি অভিভাবক বা পিতা-মাতারও উচিত নয় সন্তানদের কাছে ইসলামকে এভাবে পেশ করা যাতে করে তারা অন্ধভাবে বা সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ইসলামকে দেখতে শুরু করে জ্যেষ্ঠদের চাপে বা দাবিতে। নিজের ধর্মীয় পরিচিতি ও পথ নির্বাচনে আল্লাহ-প্রদত্ত ইখতিয়ার রয়েছে প্রত্যেকটি জীবনেরই। একটি জীবনপদ্ধতি হিসেবে ইসলাম যে আকাঙ্ক্ষিতভাবে গতিশীল নয় তার অন্যতম কারণ এই যে, পাঁচটি বুনিয়াদের প্রথমটি শাহাদাত বা আল্লাহ তায়ালার কাছে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণ করার উন্মুক্ত ঘোষণা)-কেই অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। মুসলিমদের ঘরে জন্ম হওয়া মুসলিমদের ইসলাম শাহাদাত দিয়ে শুরু হয় না, যেমনটি ছিল সাহাবাদের জীবনে অথবা যারা প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বুঝে-শুনে ইসলাম কবুল করে তাদের জীবনে। আর শাহাদাতের কারণে জীবনের যে উদ্দীপনা এবং গতিশীলতা থ াকার কথা তা আমাদের জীবনে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না।

যখন সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং পিতামাতা-পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানদের কাছে ইসলামের সত্য ও সুন্দর তুলে ধরার পরও, সন্তানদের কেউ যদি বেছে নেয় এমন পথ যা পিতা-মাতার পছন্দনীয় নয়, সেই পছন্দকে না হলেও তার স্বাধীনতা বা ইখতিয়ারকে সম্মান দেখাতে হবে এবং তাদের ওপর আস্থা রেখে তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য পথনির্দেশনা দেবার প্রয়াস চালাতে হবে। আসল কথা হচ্ছে যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে।। নবির সন্তানও নবি-পিতার দীন ও পথ গ্রহণ না করতে পারে, যেমন কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে নূহ (আ.) এবং তাঁর পুত্রের কথা। নবির স্ত্রীও নবির অনুসারী না হতে পারেন, যার পরিণাম সেই স্ত্রীর জন্য ভিন্ন।[২০৫]

জীবনের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয় তাহলে ইসলামের বাণীর অনস্বীকার্য সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হবে এবং আবারও দুনিয়াতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে পারে। তাই আমাদের প্রিয় সন্তানরা জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে মৌলিকভাবে ভুল করলে তাদের প্রতি মারমুখো অথবা বিসর্জনের মানসিকতা না দেখিয়ে, তাদের প্রতি সহজাত স্নেহ-মায়া-মমতা এবং সহমর্মিতা দেখানো উচিত। তাদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা শুধু এ পথেই; বিদ্বেষ অথবা প্রত্যাখ্যানের মনোভাব পুনর্বিবেচনা এবং আকাঙ্ক্ষিত নিষ্পত্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম পরিবারে জন্মেছে এমন সন্তান ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে (অর্থাৎ, প্রচলিত পরিভাষায়, মুরতাদ হতে পারে), কেউ কেউ এ সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে পারে। ঐতিহ্যগত আইনসর্বস্ব এবং রায়সূচক (judgmental) আঙ্গিক থেকে ধর্ম বিসর্জন (ইরতিদাদ, apostasy) নিছক আইনকানুনের বিষয়, যার হুদ্দ-নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত মত এই যে, সেই শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এই বিষয়ে পরবর্তীতে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

---

২০৫ একজন মানুষের জন্মই হয় মুসলিম অথবা অমুসলিম হিসেবে, এটা আরো বড় রকমের একটি ভুল ধারণা। এটা বলা যেতে পারে যে কেউ একটি মুসলিম বা অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয় বা নিয়েছে, কিন্তু তারা মুসলিম অথবা অমুসলিম হিসেবে জন্ম নেয় না। বস্তুত নবিজি (স.) এ-রকমটি বলেছেন যে, সব মানুষই ফিতরাহ অর্থাৎ প্রকৃতিতে (ইসলামে) জন্ম নেয়, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদের গড়ে তোলে তাদের বিশেষ বিশ্বাস বা ধর্ম অনুযায়ী। দেখুন, Farooq, 1999.

এই প্রবণতা এবং অবস্থান দুঃখজনক, বিশেষ করে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পুনর্জাগরণী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সাধারণভাবে মুসলিমরা খিলাফতে রাশেদার সময়কালকে গভীর সম্মানের সাথে দেখে এবং ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক বা মডেল হিসেবে গণ্য করে। তাছাড়া তারা এটাও মনে করে যে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি হচ্ছে এই খিলাফতে রাশেদার অবিস্মরণীয় যুগ। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের গোঁড়া এবং স্থবির চিন্তাভাবনাই হয়তো খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আপামর মুসলিম জনসাধারণের মাঝে আগ্রহ জন্মানোর পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে হিজবুত তাহরীর (HT), যার মুখ্য বা কেন্দ্রীয় মিশন হচ্ছে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এর প্রতিষ্ঠাতা তকীউদ্দীন আল-নাবহানী কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং এইচ-টি কর্তৃক গৃহীত খসড়া সংবিধান (আল-দুস্তুর)-এর ৭গ অনুচ্ছেদ-এ উল্লেখ আছে:

> যারা ইসলাম থেকে ধর্মচ্যুতির অপরাধে অপরাধী (মুরতাদ) তাদের ইরতিদাদের আহকাম অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করবে, যদি তারা স্বেচ্ছায় এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে থাকে।[২০৬]

এই অবস্থান ইসলামের দিক থেকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রমাণের অভাবের কারণে। এ বিষয়টি আরো জটিল হয় এইচ.টি-ধরনের খসড়া সংবিধানের কারণে (যা উল্লিখিত আছে একই আর্টিকেলে):

> যদি তারা অমুসলিম হিসেবে জন্ম নেয় (অর্থাৎ তারা মুরতাদদের সন্তান হয়), তাহলে তাদের প্রতি আচরণ করা হবে মুশরিক কিংবা আহলে কিতাবের ব্যাপারে প্রযোজ্য আহকামের আলোকে।[২০৭]

অনেক সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদ বিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিপন্থি এই অবস্থানকে অইসলামী হিসেবে গণ্য করে এবং ঐতিহ্যবাদী এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেন। ধর্মচ্যুতি বা ইরতিদাদের বিষয়টি আসলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাথে জড়িত, নিছক কারো ধর্ম-পরিবর্তনের সাথে নয়। তাই, আবারও ইসলামী নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে,

---

২০৬ Farooq, 2007b.

২০৭ আল-কুরআন (আল-তাওবা) ৯:৭১।

ইরতিদাদের বিষয়টি আইন-আহকাম বা তার প্রয়োগের ক্ষেত্র নয়। ইরতিদাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, এই ফিকহী অবস্থানটার পেছনে এত ব্যাপক সমর্থন রয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলাটা খুবই সংবেদনশীল ব্যাপার। কিন্তু ইসলামের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতেই যে বিষয়টা নিয়ে চিন্তার শুধু অবকাশ নয়, বরং প্রয়োজন আছে তা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। এ বিষয়টি নিয়ে হাদিস বিষয়ক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।[২০৮]

খ. স্বাধীনতা এবং জোরজবরদস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি দিক হচ্ছে নারীদের ব্যাপারে সাধারণভাবে এবং বিয়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে।

উপরে উল্লিখিত #১ মূল্যবোধের ভিত্তিতে, নারীদের পূর্ণ এবং স্বাধীন মানব সত্তা হিসেবে গণ্য করতে এবং সম্মান দেখাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরও আল্লাহ তায়ালার সম্মুখীন হতে হবে শেষ বিচারের দিনে কারো ছাতার অধীনে কিংবা কারো আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়; তারা তাদের রবের সম্মুখীন হবে পূর্ণ ও স্বাধীন সত্তা হিসেবে জবাবদিহির জন্য। প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণত (mature) নারীদের অন্য পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কোনো আবশ্যিক কারণ নেই। বিবাহিত জীবন পারস্পরিক প্রভুত্ব-দাসত্বের জীবন নয়; বরং তা হচ্ছে পারস্পরিক অভিভাবকত্ব (wilayah)-র সম্পর্ক।[২০৯] ইসলামে নির্ভরতা পারস্পরিক (mutual)। পশ্চিমা মডেল নারী-স্বনির্ভরতাকে এমন পর্যায়ে নিয়েছে যে, অনেক নারীর মন-মগজে এ ধারণা প্রোথিত হয়েছে যে, তাদের কোনো পুরুষের প্রয়োজন নেই, এবং পুরুষের ক্ষেত্রেও একই ধারণা উৎসাহিত করা হয়েছে নারীদের ব্যাপারে। এটা চরম পন্থা বা প্রান্তিকতার আরেকটি রূপ, যার জন্য পাশ্চাত্য সমাজ ইতোমধ্যেই উচ্চ মূল্য দিতে শুরু করেছে ভগ্ন সংসারের মাধ্যমে যা সন্তানাদির ক্ষেত্রে মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলে– তারা সমাজ থেকে বিচ্যুতি (alienation)-সহ, বিষাদগ্রস্ততা (depression), সহিংসতা এবং অন্যান্য সামাজিক রুগ্নতায় আক্রান্ত হয়। তার বিপরীতে, মুসলিম সমাজের প্রচলিত (prevailing) অবস্থা হচ্ছে নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই না পূর্ণ-স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখা হয় আর না সেভাবে সম্মান দেখানো হয়। লক্ষণীয় যে, মুসলিম পুরুষগোষ্ঠী সমসাময়িক ইসলামী পাণ্ডিত্যের বলয় প্রায় একচেটিয়াভাবে পুরুষদের অঙ্গন হয়ে রয়েছে– সেই পুরুষগোষ্ঠীই যেন

২০৮ আল-কুরআন (আল-সাফ্‌ফাত) ৩৭:১০২।
২০৯ আল-কুর্‌আন (আশ-শুরা) ৪২:৩৮।

নারীদের জীবনের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেছে। প্রকৃত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হলে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও ফকীহ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং নিজেদের আলেম, চিন্তাবিদ, মুজতাহিদ, মুফতি এবং নীতি-নির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইসলামী চিন্তাভাবনা এবং জীবনের সার্বিক পর্যায়ে পথনির্দেশনা নিরূপণের টেবিলে পারস্পরিক শলা-পরামর্শ (শূরা)তে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে হবে।

একটি মৌলিক ইসলামী নীতি এই যে, যেসব সিদ্ধান্ত অন্যদের জীবনে প্রভাব ফেলবে ঐ সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছার বিভিন্ন পর্যায়ে সেসব প্রভাবিত ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশ এবং প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিতে হবে। এই প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত মেলে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবনে, যিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশে তার প্রাণপ্রিয় জিনিস (তার প্রথম সন্তান)কে কুরবানি করার জন্য আদিষ্ট হলে তিনি তার সন্তানের মতামত জানতে চান।

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ
افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

তিনি (ইব্রাহিম) বললেন: ‘ও আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে তোমাকে আমি কুরবানি করছি। এ ব্যাপারে তুমি কী বলো?...’[২১০]

নিজে নবি হয়েও কেন ইব্রাহিম (আ.) তার সন্তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তার মতামত চাইলেন? এই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সচরাচর আলোচিত হয় না। মানবকুলের অর্ধেক নারী, তারা আল্লাহ তায়ালার সামনে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিচারের সম্মুখীন হবে, অথচ তাদের বিষয়াদিতেও সব পুরুষ বলে দেবে, ঠিক করে দেবে তাদের কী করতে হবে, কী করতে পারবে বা পারবে না, তাও আবার ক্ষমতা প্রয়োগ করে? কুরআনে পারস্পরিক শূরা-পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যে আদেশ তাতে নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই?[২১১]

নবিজি (স.) নিজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তার অনুসারীদের জড়িত করেন ওহুদের যুদ্ধের কৌশলগত দিক নিয়ে পরামর্শের জন্য। যদিও এ যুদ্ধের

২১০ বিস্তারিতের জন্য দেখুন, Farooq, 2003b.
২১১ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২।

ফলাফল মুসলিমদের অনুকূলে ছিল না, সে বিষয়টি পারস্পরিক পরামর্শ এবং প্রতিনিধিত্বশীল প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। ওহুদের যুদ্ধেরও আগে, যাঁরা রাসুলুল্লাহর (স.) হাতে বাইয়াতে রিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম নারীরাও ছিলেন। এই উদাহরণই যথেষ্ট যে, আহকাম এবং শরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষ করে যেগুলো নারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সেসব যাবতীয় আলোচনা-পর্যালোচনায় নারীদের অনুপস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন। ফিকহ্ শাস্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় সর্বপর্যায়ে, এমনকি ইজতিহাদের পর্যায়েও, নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের এ ধরনের বর্জন অথবা অনুপস্থিতি নারীরা পুরুষের পারস্পরিক অভিভাবক (আওলিয়া), এ কুরআনি নীতির পরিপন্থি। যেকোনো ফিকহী অবস্থান যা এই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ (deficient)। অর্থাৎ, নারী সংক্রান্ত যেকোনো ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান, মত অথবা ফতোয়া যা একচেটিয়াভাবে পুরুষ ফকীহদের বৃত্ত থেকে আসে এবং যেখানে নারীদের প্রাসঙ্গিক অংশগ্রহণের অবকাশ থাকে না তা সাধারণভাবে অসম্পূর্ণ গণ্য হওয়া উচিত, যদি না অসম্পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক ফিকহী আলোচনায় পারস্পরিক আওলিয়ার অর্ধেক যে অনুপস্থিত প্রথমে তা আমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন। এই ভারসাম্যহীনতা এবং খুঁত দূর করার জন্য পর্যায়ক্রমে, কিন্তু অবশ্যই বিশেষ প্রয়াস চালাতে হবে, যে প্রয়াস নারীদের প্রতি করুণা দেখানোর জন্য নয়, বরং সামষ্টিকভাবে সমাজের কল্যাণ এবং সুষম-সামগ্রিকতা (wholeness)-এর জন্য। নবিজির (স.) সমসাময়িক সাহাবাদের সম্মানিত প্রজন্ম সম্পূর্ণ ছিল না হযরত আয়েশা (রা.), উম্মে সালামা (রা.) এবং অন্য আরো অনেক মহিলা সাহাবি ছাড়া, যাঁরা বিজ্ঞ পরামর্শদাতা (mentor), পথনির্দেশক (guide), শিক্ষিকা এবং ফকীহ হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়টি প্রযোজ্য সকল সময়ের জন্য, যেখানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠীর জন্য, একে অপরের পারস্পরিক আওলিয়া হিসেবে ভূমিকা পালন করা আকাঙ্ক্ষিতই নয়, বরং আবশ্যকও। আর তাই ইসলামের আলোকে সমসাময়িক সময়েও আয়েশা, উম্মে সালামার মতো ব্যক্তিদের উপস্থিতি অপরিহার্য।[২১২]

---

২১২ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৫৬।

গ. সম্ভবত স্বাধীনতা এবং জোরজবরদস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্র হচ্ছে ইসলামে রাষ্ট্রের ভূমিকা। ইসলামী আইন এবং তার ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ অমুসলিম-মুসলিম নির্বিশেষে এখন ইসলামী আইনের প্রবর্তন কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে ধর্মীয় শক্তির সংমিশ্রণের ব্যাপারে অনেককেই সন্দিহান বানিয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ বিষয়গুলো সতর্কতা এবং প্রয়োজনীয় সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতার সাথে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। মুসলিম এবং অমুসলিমদের অনেকেই যারা ধর্মীয় বা ধর্মশাসিত (theocratic) রাষ্ট্রের ব্যাপারে রীতিমতো ভীত, তাদের হয়তো সঙ্গত কারণও রয়েছে। তাদের ভীতি মানে এই নয় যে, তাদের কারো সদিচ্ছা নেই বা তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব রাখে (অনেকে হয়তো রাখে)। তবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার আগেই মুসলিমদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর যথাযথ নিরসন না হলে এসব সন্দিহান ব্যক্তিকে ইসলামের ব্যাপারে রাজি করানো এবং (রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর) ইসলাম ও জনগণের সম্পর্কের গতিশীলতা সংরক্ষণ করা আদৌ সহজসাধ্য হবে না।

আগেই যেমনটি আলোচিত হয়েছে, যেসব দেশে বিংশ শতাব্দীতে শরিয়া প্রবর্তনের প্রয়াস চলেছে তাদের অভিজ্ঞতা এখন ইসলামের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের মনোভাব গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলাম না স্বপ্ন দেখে আর না চায় একটি পুলিশি রাষ্ট্র অথবা নিজের মতামত কারো গলা দিয়ে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন হয়েছে আফগানিস্তানে তালেবান পুলিশ রাষ্ট্রের মতো শাসনের সময়, মুসলিম এবং ইসলামের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে ইসলামের শত্রুরাও এতটা সক্ষম হতে পারত কি না তা বলা মুশকিল। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনে পরিবর্তন আসতেই পারে, আর তাই আফগানিস্তানে তালেবানদের নিয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় হয়তো আসেনি। কিন্তু ইসলামের আলোকে কিছু মৌলিক প্রত্যাশা সবার সামনেই থাকা দরকার।

ইসলাম দেখতে চায় এমন শাসনব্যবস্থা বা সরকার, যা হবে সাংবিধানিক, অংশগ্রহণমূলক (participatory) এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ বা জবাবদিহিপরায়ণ (accountable)। আর এর সবকিছুর প্রাথমিক ভিত্তি হবে 'তাকওয়া' (আল্লাহ-সচেতনতা)। যেমন, কুরআনকে পরিচিত করতে গিয়ে প্রথমেই সুরা আল-বাকারায় আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার করেছেন:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

> "এই সে কিতাব যা নিয়ে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। পথনির্দেশনা (হুদা) মুত্তাকীন বা যাদের তাকওয়া আছে তাঁদের জন্য।"[২১৩]

এই তাকওয়াই ইসলামভিত্তিক সমাজ-সভ্যতার প্রাণসম বুনিয়াদ। যেখানে এই তাকওয়ার যথাযথ বীজ বপন এবং বিকাশ হবে, যেমনটি নবিজির (স.) সময়ের সাহাবিদের প্রজন্মে পরিলক্ষিত হয়েছে, সেখানে স্বাভাবিক এবং পরিণত অবস্থার অধীনে একটি ইসলামী সরকার ব্যবহার করবে ন্যূনতম শক্তি, ক্ষমতা এবং জোরজবরদস্তি। একটি ইসলামী কর্তৃপক্ষের শাসন বা কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু তা সে ব্যবহার করবে বিচক্ষণতার সাথে, আইনের শাসন ও সাংবিধানিক সীমারেখার মধ্যে। ইসলাম সঙ্গত কারণেই ভারসাম্যের সাথে যেকোনো কর্তৃত্বকে সীমিত করে দিয়েছে। দুঃখজনক যে, এ বিষয়ে অমুসলিমদের দোষ দেওয়ার অবকাশ নেই, বরং মুসলিমদের মধ্যেও পর্যাপ্ত উপলব্ধি নেই। ইসলামী সমাজে সরকার মানুষের স্বাভাবিক জীবনে গোয়েন্দার মতো কৌতূহলীর ভুমিকা পালন করে না; সত্যিকার অর্থে ইসলামী সমাজের বলয়ে 'ধর্মীয় পুলিশ'-এর কোনো স্থান নেই। ইসলামের কোনো অনুমোদন নেই যে, যারা নামাজ পড়ে না বা রোজা রাখে না তাদের নিয়ে জেলখানা ভর্তি করা যেতে পারে। কোনো নারী যদি মাথা না ঢাকে বা তার কয়েক গুচ্ছ চুল যদি বের হয়েই থাকে, তাহলেই তাদের প্রহার বা হেনস্থা করার অধিকার কোনো কর্তৃপক্ষের নেই। বরং যেখানে এ ধরনের শৈথিল্য দেখা যাবে, তাতে সমাজে যে এখনো তাকওয়ার বীজ যথাযথভাবে বপন বা বিকাশ হয়নি তাই প্রতীয়মান হবে। শক্তি বা ক্ষমতা আছে বলেই যদি কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ এভাবে মানুষের ওপর জোরজবরদস্তি করে, তাহলে 'মিথ্যা থেকে সত্য স্পষ্টতই পৃথক'[২১৪] (অর্থাৎ মানুষকে বুঝিয়ে স্বেচ্ছায় ইসলামের দিকে এগিয়ে আনা)– ইসলামের এই মৌলিক আকর্ষণটা একটি প্রহসনে পরিণত হয়। আগে হোক পরে হোক, যাদের ওপর জোরজবরদস্তি করা হয় একপর্যায়ে গিয়ে তারা বিদ্রোহ করবে, এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়।

---

২১৩ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২।

২১৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৫৬।

একটি বিকাশমান বা জায়মান (nascent) ইসলামী সমাজে, যেমনটি হয়ে থাকে যেকোনো সমাজের গঠনাত্মক (formative) পর্যায়ে, সে সমাজের মূল্যবোধ এবং আদর্শের রূপ দিতে কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতার ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত একটি সমাজে মাদকদ্রব্য-ব্যবসায়ী এবং ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হতেই পারে। কিন্তু এরকম ক্ষমতার যেন অপপ্রয়োগ না হয় এবং মাদকদ্রব্য নির্মূল করার উদ্যোগের নামে যেন বিরোধী রাজনৈতিক অথবা যেকোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নাজেহাল করার প্রহসন না হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে ফলপ্রসূ হতে পারে না।

ঘ. মানুষকে নিজেদের জন্য তাদের পথ বা বিশ্বাস বেছে নেয়ার অধিকার দিতে হবে। যদি কেউ ইসলামের সাথে বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইসলাম যারা পরিত্যাগ করে তাদের শাস্তি দিতে হবে এটা ইসলামের ব্যাপারে একটি মৌলিক ভ্রান্তি এবং বিকৃতি।

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

> “যদি এটা তোমার রবের ইচ্ছে হতো, তাহলে তারা সবাই ইমান আনতো– যারা পৃথিবীর বুকে তারা সবাই! তবে কি তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষকে তুমি জোরজবরদস্তি করে ইমান আনাবে?”[২১৫]

অনেকেই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে পারে যে, এটা অমুসলিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, মুসলিম বা যারা মুসলিম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে নয়। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ইসলামের এই মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ব্যাখ্যা সঠিক হলে বলতে হবে যে, ইসলামের বিশ্বাসের অধিকার শুধু ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত, কিন্তু ইসলামে প্রবেশের পর বুঝতে হবে যে, এটা থেকে বের হওয়ার উপায় নেই মুসলিমদের পায়ে নিজেদের গর্দানটা সমর্পণ না করে। আখিরাতে শাস্তি তো আছেই, কিন্তু এই দুনিয়াতেও একজন মুসলিম যদি মুসলিম না থাকতে চায়, তাহলে দুনিয়াবি শাস্তির ভয়ে মুনাফিক সেজে হলেও মুসলিম পরিচিতি ধারণ করেই থাকতে

২১৫ আল-কুরআন (ইউনুস) ১০:৯৯।

হবে। আর অন্য ধর্মেও যদি ইসলামী আইনের মতো আইন করা হয় যে, তাদের ধর্ম বদলে তারা যদি মুসলিম হয় এবং সেজন্য তাদের শাস্তি/মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, তাহলে সেটা তাদের ব্যাপার, আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। যেহেতু এটা নিছক যুক্তিভিত্তিক আলোচনা নয়, তাই এটাও আমাদের বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন যে, কুরআনে মুরতাদের কোনো দুনিয়াবি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি,[২১৬] এবং কিছু বিতর্কিত হাদিস এ প্রসঙ্গে থাকলেও স্বয়ং নবিজির (স.) জীবদ্দশায় একজন মুরতাদ হলে তিনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কোনো শাস্তি দেননি।[২১৭]

তদুপরি, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নাগরিকতাভিত্তিক, বহুত্ববাদী (pluralistic) জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোতে ইসলামের আলোকে অমুসলিমদের অধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ ও প্রয়োজন রয়েছে। ইরতিদাদ বিষয়টি নিয়ে হাদিসবিষয়ক অধ্যায়ে আরও আলোচিত হয়েছে।[২১৮] নবিজির (স.) সময়ে এবং তার পরবর্তীকালেও অনেক অমুসলিম দূর-দূরান্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসত এবং ইসলামী সমাজের অংশ হয়ে যেত। সেটা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, ইসলামী সমাজ আসলে বহুত্বে বিশ্বাস করে এবং তা সবাইকে নিয়েই। একইভাবে, বর্তমান সময়ে অমুসলিমদের ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাদী বিধিবিধান, যেমন জিযিয়া, রাজনৈতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন পদে বহাল হওয়ার সুবিধা, ইত্যাদি বিষয় পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

> ... মুসলিমদের স্বীকার ও উপলব্ধি করতে হবে যে, স্বাধীনতা বা ইখতিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শুধু নিজেদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্যই। অন্যদের স্বাধীনতার ব্যাপারেও মুসলিমদের সম্মান দেখাতে হবে, যদিও কখনো কখনো তাদের মতবাদ, ধর্ম বা দর্শনের ব্যাপারে মুসলিমরা একমত বা স্বচ্ছন্দ নাও হতে পারে। কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা, এমনকি বিষোদগারে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মুণ্ডু দাবি করা, অথবা তাদের দেশ থেকে কিংবা এ গ্রহ থেকেই বের করে দেওয়ার দাবি করা যেতে পারে না।...

---

২১৬ আল-কুর্‌আন (আন-নিসা) ৪:১৩৭।

২১৭ Al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, #7211, https://sunnah.com/bukhari:7211.

২১৮ Farooq, 2007b.

একটি অতীত-সমৃদ্ধ, কিন্তু ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজন সার্বিক পর্যায়ে স্বাধীনতা এবং তা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য সংগ্রামের গুরুত্ব মুসলিমদের স্বীকার করা। তাদের জন্য এটাও প্রয়োজন যে এমন এক সমাজের নকশা নিয়ে ভাবতে হবে যেখানে মুসলিমদের স্বাধীনতা কোনো একচেটিয়া বিষয় নয়, বরং যেখানে সবার যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতাই স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। এই উম্মাহ যে 'মানবতার জন্য সৃষ্ট' কুরআনের এ আয়াত এ প্রসঙ্গেই অর্থপূর্ণ। [আল- কুরআন ৩:১১০][২১৯]

আসল কথা হচ্ছে যে, ইসলাম জোরজবরদস্তি বা স্বৈরাচার নয়, বরং মৌলিকভাবে ইখতিয়ার ও স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা তাদের ইসলামের পছন্দনীয় সংস্করণ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, তাদের এ ভূমিকা অসঙ্গতিপূর্ণ, যা কুরআনের মৌলিক কতিপয় আয়াতের বিপরীত এবং ইসলামের অন্যতম একটি মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষশীল। তাছাড়া, মুসলিমদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদের গড়া বা আকাঙ্ক্ষিত সমাজের এটা নিশ্চিত করা যে, সে সমাজের স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার-সংক্রান্ত মূল্যবোধ ইসলামের সামগ্রিক মান ও আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[২২০]

৫. সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ (Universal moral values, ma'ruf)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে (সমগ্র) মানবতার জন্য, যারা মা'রুফের নির্দেশ দেয় এবং মুনকার থেকে বিরত রাখে, এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর ইমান রাখে। আহলে কিতাবের যারা তাদের যদি বিশ্বাস থাকত, তাদের জন্য উত্তম হতো: আসলে তাদের মধ্যেও আছে যারা বিশ্বাসী, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই সীমালঙ্ঘনকারী।[২২১]

২১৯ Farooq, 2004b.
২২০ Ibid.
২২১ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:১১০।

মা'রুফের দিকে ডাকা এবং মুনকার থেকে বিরত রাখার এই কুরআনি আহ্বান নৈতিক মূল্যবোধের সাথে জড়িত– সর্বজনীন অর্থে মা'রুফ এবং মুনকার, এ দুটোরই অর্থ ব্যাপক এবং তার যথার্থ অনুধাবন মুসলিম জীবনের জন্য অপরিহার্য।

মা'রুফ মানে সুপরিচিত; সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত; সাধারণভাবে গৃহীত; ভালো, কল্যাণকর এবং সঠিক। অন্যদিকে মুনকার মানে হচ্ছে ভুল, ঘৃণার্হ; অপছন্দনীয়; অস্বীকৃত; প্রত্যাখ্যাত; মন্দ, এমনকি যার অর্থের মধ্যে রয়েছে অমানুষিকতা।

ইসলাম মা'রুফ এবং মুনকার দুটোই বিবেচনায় নেয়, কারণ ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সর্বজনীন হিসেবে যা স্বীকৃত ভালো এবং সঠিক হিসেবে এবং যা কিছু প্রত্যাখ্যাত মন্দ এবং বাতিল হিসেবে। যেমন, এমন কোনো সমাজ নেই যেটা চুরি করা বা মিথ্যে বলাকে ভালো বা সঠিক বলে মনে করে, যদিও সে সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তি চুরি করে অথবা মিথ্যে বলে। সব সমাজই সততাকে একটি অন্যতম গুণ হিসেবে গণ্য করে থাকে, যদিও কিছু কিছু ব্যক্তি অসৎ হতে পারে। তাই মানুষকে মা'রূফের দিকে ডাকা এবং মুনকার থেকে বিরত রাখার প্রয়াস ইসলামের সর্বজনীনতার নির্দেশক।

মুসলিম উম্মাহ্‌র অস্তিত্ব তার নিজের জন্য নয়। তার একটি সুনির্দিষ্ট মিশন আছে, মানবতার জন্য একটি আসমানিভাবে নির্ধারিত সেবার দায়িত্ব আছে। যেমন প্রখ্যাত কুরআন অনুবাদক এবং ব্যাখ্যাকারী, মরহুম আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ব্যাখ্যা করেছেন:

> ধর্মের ইতিহাস বিকাশের যুক্তিযুক্ত উপসংহার হচ্ছে একটি ফিরকা-নিরপেক্ষ (non-sectarian), অবর্ণবাদী, গোঁড়ামিহীন, সর্বজনীন দীন যা ইসলাম নিজের ব্যাপারে দাবি করে। কারণ, ইসলামের নির্যাসমূলক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।
>
> তার মানে হচ্ছে: (১) ইমান, (২) সঠিক কাজ করা, সঠিক কাজ করার ব্যাপারে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, এবং যা সঠিক তা যাতে সমুন্নত থাকে তার কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকা; (৩) মন্দ থেকে বিরত থাকা, এভাবে বিরত থাকার ব্যাপারে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মন্দ ও অবিচার-অনাচার যাতে বিজিত হয় তার ক্ষমতা থ

াকা। ইসলাম [লেখক হয়তো মুসলিম উম্মাহ বা সমাজ বোঝাতে চেয়েছেন] তাই নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য।[২২২]

দুঃখজনক, শুদ্ধিবাদী মৌলবাদের প্রবল প্রভাবে ইসলামের এই সর্বজনীন রূপ বহুলাংশে তিরোহিত হয়েছে। এ ব্যাপারে খালেদ আবু এল ফাদল আলোকপাত করেছেন:

> শুদ্ধিবাদীরা তাদের বর্জনমুখী (exclusionary) এবং অসহনশীল ধর্মশাস্ত্র নির্মাণ করে অন্যসব কিছু থেকে কুরআনের আয়াতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে, যেন ঐ আয়াতের অর্থ একেবারে স্বচ্ছ, যেন ওগুলোর পেছনের নৈতিক ধারণাসমূহ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুত এসব এবং অন্য আয়াতগুলোর যথার্থ বিশ্লেষণ অসম্ভব যতক্ষণ না সেগুলো কুরআনের বাণীর সামগ্রিক নৈতিক তাগিদের আলোকে দেখা না হয়। কুরআন নিজেই কিছু মৌলিক নৈতিক আবশ্যকতা (imperative)-এর ওপর জোর দেয়, যেমন রহমত, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-মায়া এবং সাধারণভাবে ভালো হওয়ার প্রতি। কুরআন এগুলোর কোনোটাই সংজ্ঞায়িত করে না, কিন্তু পাঠকের ন্যূনতম নৈতিক মান (probity) আছে তা ধরে নেয়। যেমন, কুরআন অনবরত জোর দিতে থাকে ভালোর ওপর। ভালোর জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে মা'রুফ, যার অর্থ সর্বজনস্বীকৃত ভালো। কুরআনি প্রেক্ষাপটে ভালোত্ব সেই জিনিসের অংশ যাকে বলা যেতে পারে জীবনের বাস্তবতা (lived reality) - এটি মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং আদর্শভিত্তিক উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২২৩]

এ ধরনের বর্জনমুখী (exclusivist) মানসিকতা ইসলামের শুধু অন্তর্নিহিত সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার পথেই প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে না, বরং তা ইসলাম এবং মুসলিমদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা এবং মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে বাকি দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দিতে সহায়তা করে। মা'রুফের ওপর জোর দেওয়া মানে এই নয় যে, প্রায়োগিক অর্থে ইসলামে কোনো বিশেষ বা অনন্য দিক নেই। তবে মুসলিমদের ফোকাস এই সর্বজনীনতার আঙ্গিকে

---

২২২ Ali, A. Y., n#434.

২২৩ El Fadl, 2004, pp. 14-15.

আরো ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যা সমগ্র মানবতাকে এই উপলব্ধিতে সহায়তা করতে যে ইসলাম কোনো নতুন দীন নয়; আসলে এটা সেই নির্যাসমূলক অভিন্ন সত্য এবং বাণী যা হযরত ইব্রাহিম, মূসা এবং ঈসা (আ.) সবাই নিয়ে এসেছেন।[২২৪]

৬. মানবতামুখিতা এবং বিশ্বজনীনতা (Humanity-orientation and global belonging)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস করো। কিতাবিরা যদি ইমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই দূরাচারী (ফাসিক)।"[২২৫]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদের এক আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার জুটিকে সৃষ্টি করেন, তারপর যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট কামনা করো, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২২৬]

---

২২৪ আল-কুরআন (আশ-শুরা) ৪২:১৩।

২২৫ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:১১০।

২২৬ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:১।

একপর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষই একেকটি পরিবারের সদস্য। আরেক পর্যায়ে সে কোনো জাতি বা দেশের অংশ। অন্য আরেকটি পর্যায়ে মুসলিমরা মুসলিম উম্মাহ্‌র অংশ। আরো বৃহত্তর পর্যায়ে সবাই মানবতার অংশ। এই বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো কিছুর অংশ হওয়াটা একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সাধারণত কেউ তার পরিবার আর জাতি নিজে বেছে নেয় না; একজন ব্যক্তি একটি পরিবার বা জাতির অংশ হয় জন্মগতভাবে; তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের বলয় প্রতিষ্ঠিত হয় জৈবিক এবং অন্যান্য সূত্রে বা বন্ধনের মাধ্যমে। কোনো জাতির অংশ হওয়ার বিষয়টা অনেকটা বদলে যাচ্ছে মানুষের দুনিয়ার একদিক থেকে অন্যদিকে স্থানান্তরের গতিশীলতার কারণে। তবু যেখানে যার জন্মগত উৎস তার সাথে সম্পর্কসূত্র ছিন্ন না করেও মানুষ যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেখানকার সাথে নতুন বন্ধন বা বিশ্বস্ততা গড়ে তোলার মধ্যে অনিবার্যভাবে কোনো সংঘাত নেই। যেখানে মুসলিমরা অভিবাসনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন আবাস গড়ে তোলে সেখানকার মানুষের কাছে এই উপলব্ধিটা পরিষ্কার করাটা মুসলিমদেরই দায়িত্ব।

তদুপরি মুসলিমদের জন্য প্রয়োজন বিশ্ব মুসলিম গোষ্ঠী অর্থাৎ এই প্রিয় উম্মাহ্‌র বন্ধনের বিষয়টি আরো গভীর করা এবং প্রাসঙ্গিক অনুভব ও তাগিদ জাগ্রত করা। যেহেতু ইসলাম জন্মগত সূত্রের বিষয় নয় বরং স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়, তাই উম্মাহ্‌র অংশ হওয়ার ব্যাপারে এই চেতনা ও সংবেদনশীলতা থ াকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে উম্মাহ্‌র সাথে এই নিবিড় বন্ধন কোনোভাবে মানবতার অংশ হওয়ার ব্যাপারে সাংঘর্ষিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই বিভিন্ন পর্যায়ের পারস্পরিকভাবে সংযুক্তির যে বন্ধন (affinity) তাই বিদ্ধৃত হয়েছে কুরআনের বাণী মুসলিম উম্মাহ 'মানবতার জন্য সৃষ্ট' (উখরিজাত লিন্নাস)-সংক্রান্ত আয়াতে।

মুসলিম উম্মাহ্ বিশ্বমানবতার সাফল্য এবং সুখ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং তাতে মুসলিমদেরও ভাগ থাকতে হবে। অন্য মুসলিমদের যা কিছু ভালো হয় সাধারণভাবে মুসলিমদের তাতেই তৃপ্ত হলে চলবে না। এই বিচ্ছেদপ্রবণ (estrangement) মানসিকতা যা থেকে দুনিয়ার অন্যদের 'ওদের বা ওরা" ('the other') হিসেবে দেখা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শুধু মুসলিমদের সুখ-দুঃখের সাথে নিজেদের হৃদয়ের যোগসূত্র থাকাটাই একমাত্র জরুরি

হিসেবে গণ্য করাও সমীচীন নয়। মুসলিমদের হৃদয়ের যোগসূত্র মানবতার পর্যায়েও থাকতে হবে।

মুসলিম আইনের দিক থেকে মানবতার পর্যায়ে বিনা প্রয়োজনে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ানো অনুচিত। বরং তার পরিবর্তে সবাই বিশ্বমানবতার অংশ, এ চেতনার আলোকে মুসলিমদের প্রয়াস চালানো দরকার বিভিন্ন মহৎ লক্ষ্যে সাধারণ ঐক্য (common ground) বা সেতুবন্ধন গড়তে।

> قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
>
> "বল: হে আহলে কিতাবগণ! একটি সাধারণ বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তার সাথে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম (অনুগত)'।"[২২৭]

নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথভাবে ধারণ করেই বিশ্বমানবতার অংশ হওয়ার চেতনার উন্মেষ এবং বিকাশের প্রয়াসে মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।[২২৮]

৭. শূরা: প্রতিনিধিত্ব এবং পারস্পরিক পরামর্শ

> وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
>
> যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ (শূরা)-র ভিত্তিতে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের আমি যে রিযিক দিয়েছি

২২৭ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:৬৪।
২২৮ Farooq, 2006d.

তা থেকে ব্যয় করে।[২২৯]

ইসলামে শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শ মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠান। ইসলামে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক জোর-জবরদস্তি নয়, বরং শূরাভিত্তিক। তাই শাসন (governance), প্রশাসন (administration) এবং নেতৃত্ব প্রাসঙ্গিক মানুষের অংশগ্রহণভিত্তিক (participatory) - অর্থাৎ যেকোনো সিদ্ধান্ত বা কর্তৃত্ব যাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে তাদের অবশ্যই পরামর্শ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রাসঙ্গিক সবার অংশগ্রহণ (inclusive) এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে।[২৩০]

সাধারণত, একমাত্র মানসিক রোগী অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতিরেকে বাকি সবার ক্ষেত্রেই একটি সিদ্ধান্ত বা প্রক্রিয়া যাদের জীবনে প্রভাব রাখবে তাদের অধিকার রয়েছে নিজেদের মতামত যেন সেই প্রক্রিয়ার অংশ হয়। এই শূরার প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত করা উচিত, যেখানে যথাযথ, প্রাসঙ্গিক এবং সম্ভব।

মূল্যবোধমুখীর প্রেক্ষাপটে একটি নীতি হিসেবে শূরা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শরিয়ার আলোকে এর ব্যবহারের কাঠামো বা প্রক্রিয়ার উৎস না আসমানি আর না অলঙ্ঘনীয় (sacred)। একজন মুসলিম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, কিন্তু যখন কোনো বিষয় আইনের পর্যায়ে বা প্রয়োগযোগ্য আহকাম হিসেবে প্রণয়ন করা হয় তখন তা প্রাতিষ্ঠানিক শূরার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদি উৎসগুলোর সার্বিক দিকের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক, কারণ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর্যায়ে প্রতিটি বুনিয়াদি উৎসই ব্যাপকভাবে ভিন্ন বা বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থানের জন্ম দিতে পারে, এমনকি একই মাযহাব বা ফিক্‌হের মধ্যেও। এ সবের নিস্পত্তিও তাই শূরার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন।

যখন এটা স্বীকার করা হয় যে, আসমানি হেদায়েতকে বোঝা এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মুখ্যত একটি মানবিক গঠন (construct) এবং তাই আসমানি হেদায়েতের ভিত্তিতে যা কিছুই মানবিক গঠন তা যেহেতু অলঙ্ঘনীয় পর্যায়ের পবিত্র হতে পারে না, তখন একদিকে আসমানি হেদায়েত এবং অন্যদিকে

---

২২৯ আল-কুরআন (আশ-শুরা) ৪২:৩৮।
২৩০ Farooq, 2002a.

মানবীয় অবদানপুষ্ট আইন-কাঠামোর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিরসন হতে হবে শূরার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই আঙ্গিকে ইসলামী কোনো বিধি যখন প্রায়োগিক আইন পর্যায়ে প্রণয়নের জন্য বিবেচনা করা হয়, তখন তা প্রামাণ্য মর্যাদা পায় না নিছক ইজমা বা বিশেষ কিছু ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্য (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে ঐকমত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই) অথবা কিয়াস (যা নিছক সম্ভাব্য - স্পেকুলেটিভ) তার ভিত্তিতে। তাই যেকোনো নির্দেশনা আইনের মর্যাদায় উন্নীত হয় শূরা প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির মাধ্যমে। ইজমা ও কিয়াসের ব্যাপারে এই পর্যবেক্ষণে অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন অথবা ক্ষুব্ধও হতে পারেন। তবে ইজমা এবং কিয়াসের প্রসঙ্গে এই বিষয়টির নিহিতার্থ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

বস্তুত শূরার প্রক্রিয়া মানে কোনো রাজতন্ত্রী, সামরিক জান্তা কিংবা স্বৈরাচারী শাসক বা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো পরামর্শ পরিষদ (consultative council) নয়। বরঞ্চ, ইসলামের শূরার অন্যতম শর্ত হচ্ছে এই যে, সব কর্তৃত্বই শূরার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা নির্ধারিত হবে। তাই ইসলামী শাসনের প্রেক্ষাপটে কোনো স্বৈরাচারী শাসক বা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতাবলে নিযুক্ত কোনো পরামর্শ সভা শূরার ইসলামী ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৮. আইনের শাসন (Rule of law)

ইসলাম তার আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিধিবিধানের আলোকে একটি নিয়মতান্ত্রিক সমাজ, যেটা বিধৃত হয়েছে শরিয়ার শাসনের ধারণায়। বিশেষ করে শাসন-বিচার এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণে এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতার ওপর নির্ভরশীল নয়। সুবিচারের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, প্রতিপত্তিশীল-প্রতিপত্তিহীন, সবার ক্ষেত্রেই আইন একইভাবে প্রযোজ্য। সবাই দায়বদ্ধ। ইসলামে আইনের শাসনের মূল ভাবধারার সারসংক্ষেপ নিম্নলিখিত চারটি পয়েন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

(ক) আইনের সামনে সবাই সমান; কেউই তার ঊর্ধ্বে নয় এবং আইন যেখানে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও সবার নাগালের মধ্যে এমন বিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত;

(খ) স্বাধীন বিচার বিভাগ;

(গ) আইনের প্রয়োগ সুশীল এবং নিরপেক্ষ বা বৈষম্যহীন;

(ঘ) কোনো বিবাদ-সংঘাতের নিষ্পত্তি হয় আইনের কাঠামো বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অথবা উভয়টির মাধ্যমেই, রাষ্ট্র বা নাগরিকদের কোনো পক্ষের সহিংসতা ছাড়াই।

যখন কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে গণ্য করা হয় তা আসলে আইনের গোড়াতে অথবা কেন্দ্রতে বিকৃতির শামিল, যেমনটি হয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রবাদ, রাজতন্ত্র, সামরিক জান্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। নবিজির (স.) জীবনের দিকে তাকালেই বৈসাদৃশ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কারণ তিনিই শিখিয়েছেন যে কেউই, এমনকি তার নিকটজনরাও আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ইসলাম অনুযায়ী আইনের শাসনের অধীনে না হলে শরিয়াকে প্রবর্তনের কোনো প্রয়াসকে ইসলামী বলে গণ্য করা যায় না।

قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।"[২৩১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"[২৩২]

---

২৩১ আল-কুরআন (আল-আন্‌আম) ৬:১৫। এই আয়াত অনুযায়ী নবিজি (স.)-ও যদি আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হতেন, যেটা অচিন্তনীয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকেও ছাড়তেন না। আল্লাহ তায়ালার কাছে সুবিচারের মানদণ্ডে সাধারণভাবে সবাই সমান।

২৩২ আল-কুরআন (আল-মায়িদা) ৫:৮।

> আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করল, তা কুরাইশদের অত্যন্ত অস্থির করে তুলেছিল। লোকেরা বলল, কে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট এ ব্যাপারে কথা বলবে (অর্থাৎ সুপারিশ করবে)? (বলা হলো) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন উসামা (রা.) ব্যতীত আর কে নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? অতঃপর উসামা (রা.) তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর দণ্ডবিধি থেকে কোনো এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে মানুষেরা! শুনে নাও, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বকার লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের রীতি ছিল যখন তাদের মধ্য থেকে কোনো অভিজাত ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন তাদের মধ্যে কোনো অসহায় দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ (স.)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবো।[২৩৩]

যেকোনো ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি অথবা পদকেও যদি আইনের শাসনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় তাতেই সেই ব্যবস্থা নির্যাসগতভাবে অইসলামী এবং অবৈধ হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালার হেদায়েতের আলোকে। যেকোনো একনায়কতন্ত্রবাদ অথবা রাজতন্ত্র, যা কোনো এক ব্যক্তি, পরিবার অথবা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকে মুসলিমদের দেখা উচিত অইসলামী এবং অগ্রহণযোগ্য হিসেবে। একই কারণে যেকোনো আইন, যেমন পাকিস্তানে হুদুদ অর্ডিন্যান্স একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত, যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অবৈধ সরকার বা শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সে কারণে সাধারণভাবে তার ইসলামী বৈধতা প্রশ্নসাপেক্ষ।[২৩৪] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,

---

২৩৩ Muslim, Kitab al-Hudud, #4187, https://sunnah.com/muslim:1688a.

২৩৪ কেউ কেউ প্রশ্ন ওঠাতে পারেন যে, নবিজির (স.) জন্য কিছু বিশেষ ছাড় ছিল যা একেবারেই ব্যতিক্রম। যেমন, তার ১৩টি বিয়ে, অথচ ইসলাম সর্বোচ্চ সংখ্যক বিয়ে চারে সীমিত করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনে

সাধারণভাবে ঐতিহ্যবাদীদের দৃষ্টিতে ইসলামের সব কিছুকেই হালাল-হারামের কাঠামোতে মূল্যায়ন করা হয়, অথচ শাসন বা শাসক প্রসঙ্গে যেন হালাল-হারাম বলে কিছু নেই। একজন মুসলিম শাসক কীভাবে শাসক হলো বা শাসকের দায়িত্ব পেল তাও যেন ইসলামের গণ্ডির বাইরে, অথচ সালাতের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যক্তি নিজেকে ইমাম হিসেবে চাপিয়ে দিলেই নয়, শুধু ইমাম হওয়ার খাহেশ প্রকাশ করলেও তাকে আমরা সালাতে ইমামতির যোগ্য হিসেবে গণ্য করি?

> আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই নবিজির (স.) কাছে গেলাম। তাঁদের একজন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ (স.)! মহামহিম আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, তাতে আমাকে একটি কাজে নিয়োগ করুন। অপর লোকটিও অনুরূপ আরজি পেশ করল। জবাবে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন: আল্লাহর শপথ! আমরা এ কাজের দায়িত্বে এমন কাউকে নিয়োগ করি না যে তা চায়, এবং এমন কাউকেও নিয়োগ করি না যে তা পাওয়ার লালসা করে।[২৩৫]

একসাথে চার স্ত্রী নেয়ার অনুমতির বিষয়টি শর্তহীন নয়। বরং এটির সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট আছে এবং এ ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আছে যদিও ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিধান দেখলে তা মনে হবে শর্তহীন। সাধারণভাবে, ঐ ব্যতিক্রমগুলো বিবেচনায় নিয়েও, ইসলামের বিধিবিধান ওনার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এটারই প্রতিফলন মেলে তার বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান যে সুবিচার এবং আইনের অনুশাসনের দিক থেকে তার নিজের প্রিয় কন্যা ফাতিমাও (রা.) কোনো বিশেষ সুবিধা পেতে পারে না, পাবে না। এটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে একজন নবি এবং সমাজপ্রধান হিসেবে তার ব্যতিক্রমী দায়িত্বও ছিল। যেমন, গভীর রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ তার জন্য ওয়াজিব ছিল, যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য তা নিছক অত্যন্ত পছন্দনীয়। বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ সীমার বাইরে তেরটি বিয়ের মধ্যে এর বেশ কয়েকটি ছিল আন্তঃগোত্র সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে, অথবা কিছু নির্বাচিত বিধবা এবং বয়স্ক নারীকে নিজের পরিবারে ঠাঁই দেয়ার জন্য। এক্ষেত্রে তার স্ত্রীদের জন্য কঠিন শর্ত ছিল যে, তারা দুনিয়াবি কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, বরং নবিজির (স.) স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের মাতা) হিসেবে পরিগণিত হয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। বিধিবিধান এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে নবিজি নিজেকে তার অনুসারীদের ওপর প্রযোজ্য বিধিবিধানের উর্ধ্বে মনে করেননি, যে বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

২৩৫ Muslim, Kitab al-Imarah, #1733, https://sunnah.com/muslim:1733c.

৯. পারস্পরিক কল্যাণের জন্য মতৈক্যের সাধারণ ভিত্তি সন্ধান (Seeking common ground for mutual good)

মানুষের এটা সাধারণ প্রবণতা যে মতৈক্যের চাইতে তারা মতানৈক্যের ওপর বেশি নজর ও গুরুত্ব দেয়। মুসলিমরাও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। ইসলাম মানুষকে চিরন্তন সত্যের দিকে দাওয়াত দেয়। মানুষের কাছে সে আখেরাতের সুসংবাদ এবং সতর্কবাণী দুটোই পৌঁছায়। তথাপি, যেখানে প্রযোজ্য এবং সম্ভব, ইসলাম সমগ্র মানবতার বন্ধনের ভিত্তিতে ঐকমত্যের সাধারণ ভিত্তির সন্ধান করে এবং গড়ে তুলতে চায়। এই বৈশিষ্ট্যই নবিজির (স.) নেতৃত্বাধীনে মদিনায় একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল এবং ভালো-মন্দের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়। পথ বেছে নেবার এবং জীবনের ব্যাপক পরিসরে সিদ্ধান্ত নেবার ইখতিয়ার ইসলাম মানুষকে দিয়েছে। কিন্তু, তার পাশাপাশি ইসলাম তার অনুসারীদের এটাও শেখায় যে, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, বিশেষ করে মা'রুফের নির্দেশ এবং মুনকার থেকে বিরত রাখতে, ইসলাম ভালো যেকোনো কিছুতে সাধারণ ঐকমত্য গড়ে তুলতে চায়।[২৩৬]

> وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
>
> সৎকর্ম এবং তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্র ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।[২৩৭]

ভালো এবং কল্যাণমুখী কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা (তা'আউন) করা শুধু ইসলামীই নয়, এটা জীবনে বাস্তবিক প্রয়োজন। ইসলামের আদর্শ এবং মূল্যবোধকে বিসর্জন বা আপোষ করে নয়, বরং তা ধারণ করেই মতৈক্য এবং সহযোগিতার অবকাশ সন্ধান করা উচিত। দুঃখজনক যে, অমুসলিমদের সাথে ভালো বা মা'রুফ কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা তো দূরের কথা, মুসলিমরা এখন নিজেদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তির কত রকমের প্রাচীর গড়ে তুলেছে যেখানে নানা খোঁড়া অজুহাতে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা তো দূরে থাক, তারা যেন বিভেদ-বিভক্তির মহোৎসবে মেতে আছে।

২৩৬ Ali, A. Y., n#434
২৩৭ আল-কুরআন (আল-মায়িদা) ৫:২।

১০. সহিংসতাকে স্বাভাবিকভাবে দেখার মানসিকতা প্রত্যাখ্যান (Rejection of violence as normal)

ইসলামে শান্তি এবং অসহিংসতা আদর্শস্থানীয়। অন্যায়ভাবে কারো বিরুদ্ধে সহিংসতা (unjustified aggression) ইসলাম অনুমোদন করে না, তবে যুক্তিযুক্ত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধও করে না। সাধারণভাবে শুধু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ইসলাম স্বীকার করে, তবে সেক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগের সূচনাকারী হিসেবে নয়, কোনোরকম বাড়াবাড়ি ছাড়াই এবং আইনের অনুশাসনের কাঠামোর মধ্যে। এর বাইরে সহিংসতা বা বলপ্রয়োগের কোনো অনুমতি ইসলাম মুসলিমদের দেয় না, বিশেষ করে আগ্রাসি প্রহরীর (vigilante) মতো আচরণকে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তাহলে (জেনে রাখ) জালিমদের ব্যতীত অন্য কারো সাথে কোনো বৈরিতা (শত্রুতা) নেই।”[২৩৮]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম;

“তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।’

---

২৩৮ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৯৩।

আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসারবিরারগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ– যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[২৩৯]

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[২৪০]

লক্ষণীয় যে, মুসলিমরা যখন মক্কায় শুরুর দিকে নিপীড়িত, দুর্বল এবং নিগৃহীত ছিল, তখন তাদের বদলা নেবার কোনো অনুমতি ইসলাম দেয়নি। সেই অসহিংসতাই ইসলামের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য আদর্শ। পরবর্তীকালে তাদের অনুমতি দেয়া হয় আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পাল্টা ব্যবস্থা নিতে, কিন্তু তাও কোনো ধরনের আগ্রাসন অথবা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক অসহিংসতা আন্দোলনগুলো নবিজির (স.) ঐতিহ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবাদ-সংঘাত নিরসনে ইসলামের পূর্ণ সম্ভাবনা এখনো যথার্থভাবে উপলব্ধি বা বাস্তবায়িত হয়নি। ধর্ম এবং ঐতিহ্য হিসেবে ইসলামে দু'দিক থেকেই শান্তিপূর্ণ এবং অসহিংসভাবে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য অনেক রকমের রসদ রয়েছে। ইসলামী ধর্মগ্রন্থগুলো এবং তার ধর্মীয় শিক্ষা প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং নীতি/কৌশলগত দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ যা বিভিন্ন বিবাদ-সংঘাতের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ও অসহিংস আপোষ-মীমাংসার ওপর মৌলিক গুরুত্ব

---

২৩৯ আল-কুরআন (আল- হজ) ২২:৩৯-৪০।

২৪০ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৯০। উল্লেখ্য, এখানে যুদ্ধ করাকে প্রতিরোধমূলক হিসেবে দেখানো হয়েছে, আগ্রাসি অর্থে নয়।

> আরোপ করে। ইসলামের এ দিকগুলো অনুধাবনের জন্য কুরআন, নবিজির (স.) ঐতিহ্য এবং প্রথম দিকের ইতিহাস জানা অপরিহার্য, কারণ এই উৎসগুলো ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে মুসলিমদের এবং ইসলামী আন্দোলনগুলোকে পথনির্দেশনার অনুসরণীয় কাঠামো জুগিয়েছে এবং সেগুলোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় মুসলিমদের দার্শনিক, ভাবধারাগত (ideological) এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাঝে। তাছাড়া, সেই শুরুর অধ্যায়গুলো এবং কুরআনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় পরবর্তীকালে আধুনিক অসহিংসতা আন্দোলনগুলোর মাঝে, যেমন মহাত্মা গান্ধীর দর্শন এবং পদ্ধতির মাঝে, যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে ম্যাকডোনাও এবং সাথা-আনন্দ।[২৪১]

সহিংসতা এড়ানোতে সচেতন প্রচেষ্টায় নবিজির (স.) জীবন আদর্শস্থানীয়। এমনকি নবি হওয়ার আগেও তার কমিউনিটি তাকে ডেকেছিল কা'বার প্রাঙ্গণে কালো পাথর পুনঃস্থাপন নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (arbiter) হিসেবে। সেই ঘটনায় তিনি শুধু যথাযথ নেতৃত্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্তই প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং কেমন করে শান্তি বা সন্ধি প্রতিষ্ঠার কাঠামোয় বিবাদ-সংঘাতের নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হতে হয় তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দুঃখজনক যে, পরবর্তীকালে মুসলিমরা এই শান্তিকামী এবং শান্তিমুখিন চেতনা ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে পারেনি, অনেক ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, উম্মাহ্র অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ এবং অনৈক্যের কারণে। যখন কিছুটা হলেও শক্তি ছিল, তখন ঐক্যবদ্ধ না হওয়ায় নিজেদের ভেতরের দুর্বলতায় উম্মাহ্কে মৌলিকভাবে খেসারত দিতে হয়। যখন পাশ্চাত্যের উত্থান হয় এবং স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের

---

২৪১ আবু নিমার লিখেছেন (পৃঃ ২১৯), "উপবাস (বা রোজা রাখা) একটি অন্যতম মূল্যবোধ এবং অনুশীলন যাকে গান্ধী ইসলামের সংশ্লিষ্টতায় দেখেছিলেন, বিশেষ করে তিনি শুরুর দিকে যখন কারাবন্দি ছিলেন। দেখুন Shella McDonough (1994). Gandhi's Responses to Islam 122 (D.K. Printworld New Delhi, India); Chaiwat Satha-Anand (1993). "Core Values for Peacemaking in Islam: The Prophet's Practice as Paradigm," in Building Peace in the Middle East: Challenges for States and Civil Society (Elise Boulding, ed., Lynne Reinner Publishers, Boulder, Colorado).

বিরুদ্ধে আগ্রাসন হয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যাওয়া মুসলিম বিশ্ব তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। আর পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্ব যখন ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকার হয়, মুসলিমরা তাদের সরাসরি শাসন ও নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।। গত কয়েক শতাব্দী ধরেই সেই ঔপনিবেশিক ধারার প্রভাবেই মুসলিম বিশ্ব এখন অর্ধ-শত জাতিরাষ্ট্রে খণ্ডিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে অথবা একে অপরের বিরুদ্ধেই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে আছে। আজ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমরা কাশ্মীরে, ফিলিস্তিনে, চীনে, মিয়ানমারে যেভাবে নিগৃহীত, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মেরুদণ্ড অথবা বিবেক কোনোটাই কাজ করছে না।

ইসলাম বলপ্রয়োগের বা অসহিংসতার ব্যাপারে নিরংকুশ (absolute) বা চরম কোনো অবস্থান নেয় না। তবে, ইসলাম বলপ্রয়োগকে উৎসাহিতও করে না, মহিমান্বিত (glorify) করে না, একমাত্র শান্তি এবং সুবিচারের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্র ছাড়া।[২৪২] এর বিপরীতে ইসলাম সুস্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে জোর দেয় শান্তিমুখিতা (peacemaking)-এর ওপর। আত্মরক্ষা এবং জীবনের সংরক্ষণসহ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের অনুমতি ইসলাম দেয়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও (যেমনটি বিধৃত হয়েছে আল-বাকারা ২:১৯০-তে, ইসলাম মানবিক এবং নৈতিক অনেক সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয় যেকোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা আগ্রাসন এড়ানোর জন্য। তাই, আবু-নিমার বলেন:

> শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের কিছু মূল্যবোধ আছে, যা সবসময় এবং নিয়মানুগভাবে প্রয়োগ করলে, বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে; এই মূল্যবোধগুলোর মধ্যে রয়েছে: সুবিচার (আদ্‌ল), মহানুভবতা (ইহ্‌সান) এবং প্রজ্ঞা (হিকমা) আর এগুলো শান্তি অর্জনের কৌশল এবং কাঠামোর মূল নীতির ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।[২৪৩]

বস্তুত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসন হয়নি বা তারা কোনো হুমকির সম্মুখীন নয়, তদুপরি বিপক্ষীয় শক্তি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, এমন অবস্থায় কোনো ধরনের বদলা নেয়া বা সহিংসতার পথ কুরআন খোলা রাখে না।

---

২৪২ Farooq, 2002b.
243 Abu-Nimer, p. 220.

> وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
>
> তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[২৪৪]

মুসলিমরা নিজদের স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে একদিকে যেমন সংগ্রাম করবে, তেমনি মুসলিমরা আগ্রাসনের শিকার না হলে, ইসলামী আদর্শের আলোকে অন্যের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো আগ্রাসনে লিপ্ত হবে না। যেখানে সুবিচার এবং শান্তি আছে, সেখানে অশান্তি-ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির অবকাশ নেই। যেখানে বিরোধ-সংঘাত-যুদ্ধ সেখানে শান্তি অর্জনের প্রয়াস চালানোই ইসলামী আদর্শ, যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে নবিজির (স.) সুন্নাহতে।

১১. বিচারপ্রবণ মানসিকতা বর্জন (Non-Judgmental)

আখিরাতে যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিচার বসবে, ইবাদত-বন্দেগীর আনুষ্ঠানিক সব ব্যাপারে বিচারের বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিজের ইখতিয়ার এবং এসব ব্যাপারে অপরাপর মানুষকে বিচারের দৃষ্টিতে দেখা মুসলিমদের দায়িত্ব নয়।

> ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ
>
> "তোমাদের এ শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্র শরিক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব (হুকুম)।"[২৪৫]

সমস্ত হুকুম বা কর্তৃত্ব আল্লাহ্র, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যেসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা অতিমাত্রায় বা সবচেয়ে সংবেদনশীল তার মধ্যে পড়ে কোনো মানুষ যদি খোদাগিরিতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করে। সেজন্যই তিনি 'বিচার দিনের মালিক' (মালিকি

---

২৪৪ আল-কুরআন (আল-আনফাল) ৮:৬১।

২৪৫ আল-কুরআন (আল-গাফির) ৪০:১২।

ইয়াওমিদ্দিন, সুরা আল-ফাতিহা ১:৩), আর কেউ নয়। সত্যকে জানা প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজন আর তা জানার পর গ্রহণ করা এবং নিজের জীবনকে তার অনুবর্তী করা সত্যের দাবি। নিজের নাজাতের লক্ষ্যে বা স্বার্থে এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর ইমানী দায়িত্ব। সেই সাথে নিজের নাজাতের পাশাপাশি অন্যদের নাজাতের জন্য সত্যের প্রচারে ভূমিকা রাখাও ইমানী দায়িত্বের অংশ। অসত্যের আবরণ উন্মোচন করে সত্যের আলো সবার সামনে তুলে ধরাটাও তাই একজন মু'মিন-মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সুন্দর আর ন্যায়ের সাথে সত্য একই সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা। আর সেই সত্য-সুন্দর-ন্যায়ের জন্য সাক্ষী হওয়া মুসলিম হওয়ার একটি বৈশিষ্ট।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী গোষ্ঠী (উম্মাতান ওয়াসাতান) বানিয়েছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।[২৪৬]

আল্লাহ তায়ালার খাস রহমতে তিনি আরবদের, যাদের প্রাক-মুহাম্মদ পর্যায়ে সভ্যতার কোন বড় রকমের পদচিহ্ন ছিল না এবং যারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অনৈক্য ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্যে লিপ্ত থাকতো, তাদের অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানব সভ্যতার দরবারে এক অনন্য মর্যাদায় উন্নীত করেন। তিনি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত যে প্রথম প্রজন্ম তাদের হৃদয় এত গভীরভাবে কাছে নিয়ে আসেন যে তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক ভালোবাসায় এবং ভ্রাতৃত্বে এক সীসা ঢালা প্রাচীরে পরিণত হয়।[২৪৭]

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

২৪৬ আল-কুর্আন (আল-বাকারা) ২:১৪৩।

২৪৭ আল-কুরআন (আস-সফ্) ৬১:৪।

> আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার।[২৪৮]

আহলে কিবলা হয়ে যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে সভ্যতার শিখরে এবং মানবতার নেতৃত্বের আসনে যারা অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তারাই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অন্যদের ইসলামের সত্য আর সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে, দীনের সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস (আকিদা) আর আমলের খুঁটিনাটি নিয়ে আইনসর্বস্ব ও বিচারিক প্রবণতায় মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে খারিজ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এর একটি অন্যতম দিক হচ্ছে একেক গ্রুপ তাদের নিজেদের 'সহিহ' আকিদা আর 'সহিহ' আমলের নামে বিচারপ্রবণতার খোদাগিরিতে জড়িয়ে পড়া।

মুসলিমদের ইতিহাসে এই বিভেদের উৎসবের অংশ হিসেবে আছে শিয়া-সুন্নি, আশয়ারী-মু'তাযিলা, মাযহাবী-লা মাযহাবী ইত্যাদি ধরনের বড় পর্যায়ের বিভক্তি, তেমনি বিভক্তির অংশ হিসেবে দৃষ্টান্তস্বরূপ, আহলে সুন্নাহ্‌র মধ্যেও বিভিন্ন ফাটল রেখা রয়েছে। বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে আহলে হাদিস, দেওবন্দী, বেরেলভী ইত্যাদি ধারাও সেই একই প্রবণতার প্রতিফলন। এটা যদি একে অপরের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে দেওয়ার জন্য গঠনমূলক এবং আন্তরিক প্রয়াস হতো তাহলে তা ভিন্ন ছিল। কিন্তু তারা তাকফিরি প্রবণতার ফাঁদে পড়ে জান্নাত তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, আর অন্য মুসলিমরা যাদের আকিদা আর আমলের সাথে তাদের 'সহিহ' আকিদা আর আমলের সাথে মেলে না, তাদের একেবারে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোয় তাদের অনেকেই লেগে আছে।

---

২৪৮ আল কুরআন (আল-ইমরান) ৩:১০৩।

এই রোগ যে কতটা গভীর, প্রকট এবং তা পরিবেশকে কতটা বিষাক্ত করেছে তার প্রাসঙ্গিক একটি নমুনা মেলে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বেরেলভীদের পক্ষে মাওলানা আহমদ রেজা খান কি বলেছেন তার মধ্যে।

> "কাফেরদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে। বড় এক ধরনের কুফরী হচ্ছে খ্রিষ্টবাদ; তার চেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে মাজুসীরা; তার চেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে মুশরিকরা; তার চেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ওহাবীয়াত; আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ হচ্ছে দেওবন্দীয়ানা ওরা হলো জাহান্নামের কুত্তা।"[২৪৯]

হয়তো এত রঙ্গিন ভাষা প্রয়োগের মানসিকতা ও দক্ষতা সবার নেই, কিন্তু বেরেলভীদের বিরুদ্ধেও অন্যরা ছেড়ে কথা বলেনি। এই পারস্পরিক নিন্দা আর তাকফিরিতে মুসলিমদের নিজেদের মাঝে যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু দুঃখজনক আর বেদনাদায়কই নয়, তা শুধু কুরআনের বাণী, নবিজির (স.) সুন্নাহ ও আদর্শেরই খেলাপ নয়, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্তেরই বিপরীত নয়, বরং তা উম্মাহ্‌কে অনৈক্য আর বিভেদের মাধ্যমে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছে। মুসলিমরা একে অপরের ভুল দেখলে বা তারা ভুল করছে মনে হলে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালাবে তা স্বাভাবিক এবং কাম্য, কিন্তু কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে এরকম কোনো বিচারিক মানসিকতার মতো খোদাগিরিতে লিপ্ত হবে না।

এর আগে উল্লিখিত একটি হাদিসে এরকম খোদাগিরির চরম পরিণতি শিক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে এসেছে যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ আরেকজনকে ধর্মীয় একটি বিষয়ে উত্যক্ত করছিল এবং একপর্যায়ে প্রথম জন (বেশি ধার্মিক) অপরজনকে বলেই ফেললো তুমি এই অভ্যাসটি না ছাড়লে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই যে সে বলে দিলো যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না– এরকম রায়সূচক বা বিচারিক অবস্থান আল্লাহ তায়ালা মানুষ হয়ে খোদাগিরির মতো বিবেচনা করেছেন এবং যে ধার্মিক ব্যক্তি এরকম করল, তাকে আল্লাহ তায়ালা আগুনে নিক্ষেপ করলেন।[২৫০]

---

২৪৯ Shouri, 1995, 644-645, ফতোয়া-ই-রিজভিয়া, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩-৪, ৩৫, ৭০-এর রেফারেন্স দিয়ে।

২৫০ Abu Dawud, Kitab al-Adab, #4901, https://sunnah.com/abudawud:4901.

ইসলামের শিক্ষার আলোকে মুসলিমদের এমন ধরনের গোঁড়ামি ও মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন যেখানে তাদের কথা থেকে মনে হয় যে তারা যেন 'জানে' যে এই দুনিয়াতে কারা (গোষ্ঠী বা ফিরকা হিসেবে) বেহেশতে ঠাঁই পাবে না। এই দুনিয়াতে এমন মুসলিম আছে যারা আলেম, দানবীর অথবা শহীদ হিসেবে পরিচিত ছিল, অথচ আল্লাহ তায়ালার বিচারে তারা নাজাত পাবে না।[২৫১] আবার এমন মুসলিমও আছে, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে তার সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছিল যে, তার মৃত্যুর পর তাকে যেন পুড়িয়ে সেই ছাই বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে জিজ্ঞেস করবে সে কেন এমন করেছিল, সে বলবে: আল্লাহ তায়ালার শাস্তির ভয়ে। আল্লাহ তায়ালা তার কৈফিয়ত গ্রহণ করবেন এবং তাকে রহমতের ভাগীদার করবেন।[২৫২]

তাই একে অপরের ভুল শোধরানোর উপলক্ষ বা প্রয়াসের আন্তরিক প্রয়াসের বাইরে আমাদের নিজেদের সঠিক বা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যেন আমাদের মনে এক ধরনের নিশ্চিত ভাব বা অহংকার তৈরি না হয়। কে জান্নাতে যাবে আর কে যাবে না এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচার আল্লাহ তায়ালার হাতে না ছেড়ে এই দুনিয়াতেই আমাদের খোদাগিরিতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ এটা অনেকটা নিজেদের নাজাত নিয়ে জুয়া খেলা।

এই বিচারিক প্রবণতা অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যেহেতু মুসলিমরা ইসলামকে সত্য হিসেবে গণ্য করে, তাই তারা তা প্রচার করবে, অন্যদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং উম্মাহ হিসেবে সবাই মিলে আখিরাতে সফল হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করবে। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিচার চূড়ান্ত অর্থে আল্লাহ তায়ালার। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এমন আয়াতও রয়েছে যা হয়তো ঈঙ্গিত দেয় যে, যেদিন তিনি বিচার দিনের মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন সেদিন তার বিচার ততটা একচেটিয়া (exclusive) নাও হতে পারে যতটা মনে করা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

২৫১ Muslim, Kitab al-Imarat, #1905, https://sunnah.com/muslim:1905a

২৫২ Al-Bukhari, Kitab al-Ahadith asl-ambiya, #3489, https://sunnah.com/bukhari:3478

> নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে, যারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ও সাবিঈন, যারাই আল্লাহ্ ও আখেরাতে ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৫৩]

এই আয়াত থেকে সাধারণভাবে এরকম কোনো অবস্থান সঠিক হবে না যে কুরআন বলে দিচ্ছে যে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবিঈন যে কেউই নাজাত পাবে বা জান্নাতে যাবে। 'তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'– এটা থেকে মনে হতে পারে যে, আয়াতের এই অংশটুকু পরিষ্কার। তবে এখানেও আলোচনার অবকাশ থাকতে পারে। মুহাম্মদ আসাদ তার কুরআনের তাফসিরে এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন:

> উপর্যুক্ত আয়াত, যেটা কুরআনে কয়েক জায়গায় এসেছে, ইসলামের একটি মৌলিক নীতির প্রতিফলক। অন্য ধর্মগুলোর সংকীর্ণতার বাইরে আরও প্রসারিত একটি ভিশন ইসলাম তুলে ধরে: 'নাজাত'-এর ধারণা এখানে শুধু তিনটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল: আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস এবং দুনিয়াতে নেক আমল। এই প্রেক্ষাপটে– অর্থাৎ বনি ইসরাইলকে উদ্দেশ করে বলার প্রসঙ্গে– এ বিষয়টি ওঠানো মূলত মিথ্যে ইহুদি বিশ্বাস যে ইব্রাহিমের বংশধারা হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র বিশেষ মনোনীত গোষ্ঠী (God's chosen people) তা অপনোদনের জন্য।[২৫৪]

বাস্তবতা এই যে, শেষ বিচারের দিনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ তায়ালার। এই বিষয়টি নিম্নলিখিত আয়াতেও পুনরুচ্চারিত হয়েছে।

> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

---

২৫৩ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:৬২; আরো দেখুন, (আল-মায়িদা) ৫:৬২; (আল-হজ) ২২:১৭।

২৫৪ Asad, 2008, p. 29.

> যারা মু'মিন, যারা ইহুদি, সাবেয়ী, খ্রিষ্টান, মাজুস এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে।[২৫৫]

যদি এ বিষয়টি এই দুনিয়াতেই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে উপর্যুক্ত আয়াতে কিয়ামতের দিনে ফায়সালা করার আর কি থাকবে? প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত রায়ের ব্যাপারে কোনো ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে গোঁড়া অনড় মত পোষণ করা অনুচিত। অমুসলিমরা এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলে তাঁদের নিজেদের সরাসরি কুরআন পড়ে তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসার পরামর্শ দেওয়াই হয়তো শ্রেয়, অথবা জানিয়ে দেওয়া যে, কুরআনের অন্য জায়গায় মুসলিম হওয়া এবং নাজাতের জন্য আরো কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, মানুষ হিসেবে কে জান্নাতে যাবে না এ ব্যাপারে অমোঘ কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনই যথোচিত। এ ব্যাপারে ফেরাউনের একটি প্রশ্নের জবাব হযরত মুসা (আ.) কীভাবে দিয়েছিলেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক।

> قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ
>
> قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى
>
> ফেরাউন বলল: তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী হবে?
>
> মুসা বললেন: তাদের খবর আমার রবের কাছে লিখিত আছে। আমার রব ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না।[২৫৬]

লক্ষণীয় যে, ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে মুসা (আ.) কে নাজাত পাবে কে পাবে না, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে, সে প্রসঙ্গেই যাননি। বরং, চূড়ান্ত রায় যে আল্লাহ তায়ালার সে কথাটাই তিনি তার শ্রোতাকে জানিয়ে দিলেন।

বিচারপ্রবণতা নিছক অন্যদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে এবং মুসলিমদেরকে অহংকারী বা উদ্ধত বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয় যে, বেহেশত শুধু একচেটিয়াভাবে তাদের জন্যই নয়, বরং মুসলিমদের মধ্যেও শুধু তাদের জন্য যারা তাদের

২৫৫ আল-কুরআন ২২ (আল-হজ্জ): ১৭।
২৫৬ আল-কুর্আন ২০ (তা-হা): ৫১-৫২।

(নিজেদের বিশেষ) আকিদার সাথে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করে; তা না হলে তাদের জন্য তাকফিরের অস্ত্র যেন আমাদের সব সময়ই তৈরি। এল ফাদ্‌ল, বর্তমান বিশ্বের একজন অন্যতম ইসলামীক অ্যাকাডেমিক স্কলার, এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> যদিও কুরআন স্পষ্টভাবে দাবি করে যে, ইসলাম আসমানি সত্য এবং ইব্রাহীমি নবুয়তের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় আসা শেষ নবি হিসেবে মুহাম্মদের প্রতি ইমান আনাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য করে, অন্য পথেও মানুষ নাজাত পেতে পারে এ সম্ভাবনার পথ কুরআন সম্পূর্ণ এবং অকাট্যভাবে বন্ধ করে দেয়নি। কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করে যে, তিনি তার রহমত কার প্রতি বর্ষণ করবেন তা তার একচ্ছত্র এখতিয়ার। বেশ অনেকগুলো লক্ষণীয় আয়াতে, যেগুলো মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদরা (theologians) এখনো পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষণ (theorize) করেননি, যেখানে কুরআন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আইন-বিধিবিধানের বহুত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[২৫৭]

প্রসঙ্গত এই বিশেষ আয়াত (২:৬২) - আরো বেশ কিছু আয়াতসহ ব্যাখ্যা করা হয় নাস্‌খ-মানুসুখ তত্ত্বের কাঠামোয়। আত-তাবারী তার তাফসিরে ২:৬২ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন: "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই মত পোষণ করতেন আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, ইহুদি, নাসারা ও সাবিয়ীনের মধ্য থেকে যারা নেক আমল করবে, তাদের আখিরাতে জান্নাত প্রদান করা হবে। অতঃপর ৩ (আল-ইমরান): ৮৫ আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়।"[২৫৮]

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নাজাতের ক্ষেত্রে পথের বহুত্বের ধারণা তখনো ছিল। কিন্তু নাসখ-মানসুখের কাঠামোর আলোকে তা রহিত গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে, কুরআনের সামগ্রিকতা বিবেচনায় নিলে এটাই প্রতীয়মান যে, নবিজির (স.) নবুয়তপ্রাপ্তির পর নাজাতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমানের সাথে নবিজির (স.) ওপর ইমান আনাও অপরিহার্য। সে কারণেই নাসখ-তত্ত্বের

২৫৭ El Fadl, 2004, p. 17.

২৫৮ তাফসিরে তাবারী, ২:৬২ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আলোকে ২:৬২-র কার্যকারিতা রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে দাবি করা হয়। কিন্তু এই বইয়ের অন্য জায়গায় এই তত্ত্বের ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই তত্ত্বটি মুসলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে কুরআনে চিরস্থায়ীভাবে মানসুখ বা রহিত কোনো আয়াত নেই বা থাকতে পারে না। তবে নাসখ-মানসুখের বিতর্কিত কাঠামোর প্রসঙ্গ অবতারণা না করলে, এটাই কুরআনের সামগ্রিকতায় প্রতীয়মান যে নাজাতের জন্য ২:৬২-র বাইরেও ইমানের আরো মৌলিক অংশ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নবুয়তের ধারাবাহিকতায় শেষ নবি হিসেবে মোহাম্মদ (স.)-কে গ্রহণ করা এবং তার আনুগত্য করা।

এই বিচারিক মানসিকতার বিষয়টা অমুসলিমদের চাইতে মুসলিমদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে আরো গুরুত্বপূর্ণ। বিচারিক প্রবণতা যদি শুধু অমুসলিমদের ব্যাপারে হতো তাহলে ব্যাপারটা ভিন্ন হতো। কিন্তু মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে খারিজ করে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোয় রীতিমতো তাকফিরি প্রতিযোগিতা আছে, সেটাও এই বিচারিক মানসিকতারই সংশ্লিষ্টতায়। এমন যদি হতো যে, মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত কোনো ফায়সালার ব্যাপারে খোদাগিরিতে লিপ্ত হবে না, তাহলে অমুসলিমদের ব্যাপারে বিচারিক মানসিকতা নিয়ে এ আলোচনা এড়ানো যেত। কিন্তু যে বিচারিক মানসিকতা ও প্রবণতার কথা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তা এক ধরনের গোঁড়া মানসিকতা যাতে খোদাগিরির মতো বড় রকমের ফাঁদে পড়ার মতো অবকাশ থাকে এবং নিজেদের নাজাত নিয়ে জুয়া না খেলে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়।

১২. বাহ্যিকতার চেয়ে সারবস্তুর ওপর গুরুত্বারোপ (Emphasis on substance over form)

ইসলাম বাহ্যিকতার চেয়ে সারবস্তুর ওপর গুরুত্বারোপ করে এটা সুবিদিত। তাছাড়া ইসলাম শুধু কথার নয়, কাজেরও। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আসাদ বলেন:

> ইমান বা বিশ্বাস এক ধরনের অলঙ্কার বা কথার কথায় পরিণত হয়েছে, যে কথায় সেই ধরনের সজীবতা বা উদ্দীপনা নেই যেমনটি [মুসলিমদের] ইতিহাসের শুরুর দিকে ছিল, এমন সজীবতা যা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অর্জনে অক্ষয় অবদানের জন্য উজ্জীবিত করেছিল। নিঃসন্দেহে, আবেগের জগতে ইসলাম এখনো সজীব।

> ইসলাম যে সঠিক, এর নীতি-আদর্শই যে সঠিক কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে সেই ধারণার পক্ষে তো সহজাত ভালোবাসা রয়েছে; কিন্তু তাদের অনেকেই সেই আদর্শ ও নীতি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বুঝতে পারে, অথবা সেগুলোকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে তারা প্রস্তুত।[২৫৯]

মানবজগত এবং বিশ্বমণ্ডল যার অংশ এই মানবজগত সেসব কিছুরই একটা বাহ্যিক রূপ (form) আছে। তাই কোনো কিছুকে চিনতে আকৃতি বা বাহ্যিক দিক অপরিহার্য। জীবনে যত কর্মকাণ্ড মানুষ করে তার অধিকাংশেরই কোনো না কোনো রকম বাহ্যিক দিক আছে। কিন্তু কোনো কিছুর বাহ্যিক দিক সাধারণত অর্থপূর্ণ হয় তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে। তাই নামাজ পড়ার সময় মুসলিমরা কিবলামুখী হয় এটা যেমন বাহ্যিক একটি দিক, তেমনি নামাজের আনুষ্ঠানিকতার বেশ কিছু বাহ্যিক রূপ রয়েছে। তবে ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে, যা কিছু আনুষ্ঠানিকতা বা বাহ্যিকতা আবশ্যিক হিসেবে গণ্য তা তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু কিংবা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং ঐ সারবস্তু যেন মুসলিমদের সব সময় নজরে থাকে।

> لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

> পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, আল-কিতাব এবং নবিগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে

২৫৯ Asad, 1982, pp. 30-31.

দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।[২৬০]

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক রূপ/চেহারা অথবা সম্পদের দিকে নজর দেন না, কিন্তু তিনি নজর দেন তোমাদের অন্তর এবং কর্মকাণ্ডের দিকে।"[২৬১]

মুসলিমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে এটি মৌলিক একটি বিষয়: সারবস্তু, অর্থাৎ অন্তর্নিহিত চেতনা বা মূল্যবোধ, যা থেকে বাহ্যিকতা এবং আনুষ্ঠানিকতা বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই কুরআনের বাণীকে অধ্যয়ন এবং অনুধাবনের পরিবর্তে কুরআনের কিছু সুরা, এমনকি সমগ্র কুরআন মুখস্থ করার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি বুনিয়াদের ওপর। শাহাদাত বা ইসলামে প্রবেশের পর মুসলিমদের আনুষ্ঠানিক ইবাদতের জীবনে ফরজ চারটি হচ্ছে: নামাজ (সালাত), জাকাত, হজ এবং রোজা (সওম)।[২৬২] প্রত্যেকটি ইবাদতই এক বা একাধিক মূল্যবোধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে মূল্যবোধগুলো ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনে প্রতিফলিত দেখতে চায়। তাই, নামাজ, যা মুসলিমদের প্রতিদিন পাঁচ বার আদায় করার কথা, তাও যদি সম্ভব হয় তাহলে জামাতে, সে ব্যাপারে কুরআন নির্দেশনা দেয়:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে, যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, এবং সালাত কায়েম করো। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে

---

২৬০ আল-কুরআন ২ (আল-বাকারা): ১৭৭।

২৬১ Muslim, Vol. 4, Kitab al-Birr, #6221, https://sunnah.com/muslim:2564c.

২৬২ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবিজি (স.) বলেছেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তার বান্দা এবং রাসুল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ করা ও রমজানের রোযা রাখা। [Muslim, Kitab al-Iman, #21, https://sunnah.com/muslim:16c]

অশ্লীল (ফাহিশা) ও মন্দ কার্য (মুনকার) থেকে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন।[২৬৩]

দুঃখজনক, যদিও অনেক মসজিদে মুসলিমদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না, তবু লজ্জাকর কর্মকাণ্ড কিংবা অন্যায়-অবিচার মুসলিম সমাজে যথেষ্ট। মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশে মাহর বা যৌতুক নিয়ে বিয়ের কনে বা বিয়ের পর স্ত্রীদের ওপর নিপীড়ন এবং অবিচার, বিয়ের প্রস্তাবে কিংবা অবৈধ যৌন সম্পর্কে রাজি না হওয়ার কারণে কোনো মেয়ের মুখে বা দেহে এসিড নিক্ষেপ, 'সম্মান-হত্যা' [অনার-কিলিং]-এর প্রথা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দুনিয়ার অনেক জায়গার পাশাপাশি, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া যেখানে বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার বৃহত্তম সমাবেশ, সেখানে বেশ প্রকট। এগুলো ইসলামের চেতনা থেকে আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর বিচ্ছিন্নতার নির্দেশক। অনেক মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নারীরা এসব সমস্যার মুখ্য শিকার এবং আইনের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানে জিয়াউল হকের সামরিক স্বৈরাচারের সময় থেকে শুরু করে, হুদুদ অর্ডিন্যান্সের অধীনে অনেক ধর্ষিত নারী 'জিনা' বা ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত, এমনকি কারাগারবন্দিও হয়েছে, যা বিশ্বাস করা মুশকিল, কিন্তু তবু তা সম্ভব হয়েছে হুদুদ অর্ডিন্যান্সের ব্যাপারে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের সমর্থন-সহযোগিতা নিয়েই, যারা এখনো এই অবিচারপূর্ণ অর্ডিন্যান্সের বাতিল বা সংস্কারের বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

রোজা রাখা ইসলামের আরেকটি অন্যতম বুনিয়াদ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রত্যেক সক্ষম, প্রাপ্ত-বয়স্ক মুসলিমের ওপর রোজা রাখা ফরজ। মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম কমিউনিটিগুলোতে এই মাসে দেখা যায় মুসলিমদের হৃদয়ের সাথে কি গভীর সম্পর্ক এই মহান মাসের বিশেষ ইবাদতের।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।[২৬৪]

২৬৩ আল-কুরআন (আল-আনকাবুত) ২৯:৪৫।
২৬৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৮৩।

তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ-সচেতনতা ইসলামে এবং মুসলিম জীবনে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা, কারণ কুরআনে আসমানি হেদায়েত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এটাকে একটি পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

> এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের (মুত্তাকুন) জন্য।[২৬৫]

এই তাক্‌ওয়া নিছক আল্লাহ তায়ালার সাথেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ার জন্য নয়, বরং তা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগতের অংশ হিসেবে মানবতার সাথে বন্ধনের ব্যাপারে সচেতনতা জাগানোর জন্যও। যাদের পাতে কোনোদিনই খাবার অভাব হয় না, রোজা তাদের অনাহারী, বুভুক্ষু মানুষেরা যেভাবে ক্ষুধায় ভোগে সে যন্ত্রণা ও অনুভূতির উপলব্ধির মাধ্যমে সাধারণভাবে দারিদ্র্য-বঞ্চনার ব্যাপারে সংবেদনশীল হতে রোজা সহায়ক। রোজার অভিজ্ঞতা যেমন একজন ব্যক্তিকে তার নৈতিক সংযম বাড়াতে সহায়ক, তেমনি তা আপামর মানবতার দুঃখ-যাতনার সাথে যোগসূত্র গড়তে অনুপ্রাণিত করার কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ইবাদত-বন্দেগীর আনুষ্ঠানিক দিকগুলো আমাদের সংবেদনশীলতার উন্মেষ তো ঘটায়ই না, বরং যাদের সে সংবেদনশীলতার উদ্রেকও হয় তাও কার্যকর কিছু নয়। তাই দেখা যায়, মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই সাদাকার সাওয়াব অর্জনের জন্য বিশেষ করে রোজার মাসে দরিদ্র বা অনাহারীদের খাবার দিতে যথেষ্ট সংবেদনশীল। কিন্তু তারাই একই সাথে কীভাবে মানুষকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবার পথ করে দেওয়া যায় দীর্ঘমেয়াদে এবং স্থায়ীভাবে সে ব্যাপারে তাদের আদৌ কোনো কার্যকর সংবেদনশীলতা নেই।

ইসলাম তাহারাত বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং তাই নামাজের আগে অজু করা বা থাকা ফরজ। একজন সাধারণ বা নিরক্ষর/অশিক্ষিত মুসলিমও জানে যে তাহারাত ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ।

> আবু মালিক আল-আশ'য়ারী বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'তাহারাত ইমানের অর্ধেক ...'[২৬৬]

---

২৬৫ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২।

২৬৬ Muslim, #432, https://sunnah.com/muslim:223.

আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুবই সজাগ হতে দেখা যায়। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক তাহারাত আর সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (sanitation)-এর মধ্যে এক মৌলিক বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুসলিমদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সজাগ হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেখা যায় গণ-স্বাস্থ্য (পাবলিক হেলথ্)-এর ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন।

অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের চেয়ে বাহ্যিক কাঠামো প্রাধান্য পাওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত মেলে ইসলামী ফাইন্যান্স এবং ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে। কুরআনে সুস্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে রিবা নিষিদ্ধ। একই ভিত্তিতে, সুদও - কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই একেবারে নিষিদ্ধ গণ্য করা হয় এবং এই যুক্তিতেই ইসলামী ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। এখানেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে বিবেচনা না করার কারণে এমন সব ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট-এর জন্ম হয়েছে তা সুদমুক্ত বা রিবা-মুক্ত নিছক নামে বা বাহ্যিকভাবে। মাহমুদ এল-গামাল, রাইস ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স এবং ব্যবস্থাপনার অধ্যাপক, পর্যবেক্ষণ করেন:

> প্রাক-আধুনিক (প্রি-মডার্ন) চুক্তি কাঠামোর ভিত্তিতে সমসাময়িক ফাইন্যান্সিয়াল জগতের অনুরূপ বা হুবহু নকল (replicate) করার প্রয়াস করতে গিয়ে ইসলামী ফাইন্যান্স মাকাসিদ আল-শারিয়া বা ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বললেই চলে। যেখানেই সমসাময়িক ফাইন্যান্সিয়াল রীতি-প্রথা ইসলামী আইনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, প্রাক-আধুনিক চুক্তি কাঠামোগুলোর (পরিবর্ধন-পরিমার্জনাসহ বা ব্যতিরেকে) সাধারণ পরিণতি হচ্ছে এফিসিয়েন্সি হ্রাস যা এড়ানো সম্ভব। এটা ক্ল্যাসিক্যাল উসূলে ফিক্‌হের আইনি উদ্দেশ্যের অন্যতম একটির লঙ্ঘন হয়। তার বিপরীতে চুক্তির সারবস্তুর ওপর যথাযথ জোর না দিয়ে বাহ্যিক কাঠামো ইসলামী হওয়ার ওপর জোর দেওয়ার কারণে, যে সমস্ত অর্থনৈতিক লক্ষ্যে প্রাক-আধুনিক চুক্তি কাঠামোগুলো ক্ল্যাসিক্যাল উসূলে ফিক্‌হে বিধিবদ্ধ হয়েছিল সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। ... 'ইসলামী ফাইন্যান্স'-এ ইসলামী দিকটি নিছক চুক্তি

কাঠামো-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি (mechanics) এর পরিবর্তে ফাইন্যান্সিয়াল লেনদেনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত।[২৬৭]

বস্তুত রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে মুখ্য কারণ হচ্ছে জুলুম (অন্যায়, শোষণ)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

> হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং রিবার বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।
>
> যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা জুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না।[২৬৮]

ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টা সুস্পষ্ট এবং অকাট্য। তাই মুসলিমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হবে এবং গুরুত্বের সাথে এ নিষেধকে দেখবে এটাই স্বাভাবিক এবং কাম্য। কিন্তু যে মুখ্য কারণে এই হারামের নিষেধাজ্ঞা– অর্থাৎ অন্যায় এবং শোষণ– তা থেকে যদি প্রচলিত বিধিবিধান বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জুলুমের বিষয়টি শুধু অবহেলিতই হয় না, বরং সে ব্যাপারে শুধু মেকী কান্নাই দেখা যায়। তাই, যদিও বর্তমান ইসলামী ব্যাঙ্কিং এবং ফাইন্যান্স আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে একটি 'নিষেধাজ্ঞামুখী' (prohibition-driven)[২৬৯] শিল্পখাত হিসেবে, কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জুলুমমুক্ত সমাজ গড়ার বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন।[২৭০]

---

২৬৭ El Gamal, 2006, p. xii.

২৬৮ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৭৮-২৭৯।

২৬৯ El Gamal, 2006, p. 8.

২৭০ Farooq, 2007a.

১৩. জীবন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে আমাদের সামষ্টিক জ্ঞানার্জন পথের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা

ঐতিহ্যবাদী চিন্তাধারার বিপরীতে ইসলামে আসলে ভারসাম্যহীনভাবে কিতাবমুখী হওয়ার কথা নয়। এই দুনিয়াকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ যেন জীবন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়। তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রমণ করতে, দেখতে এবং ইতিহাস থেকে শিখতে। নিছক পবিত্র বা সম্মানিত কিতাবের ভাণ্ডারে মুখ গুঁজে থাকার পরিবর্তে মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করে বাস্তব জগত নিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তা-ভাবনা করতে।

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

তোমাদের পূর্বে বহু বিধান-ব্যবস্থা (সুনান) গত হয়েছে; সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম![২৭১]

ইসলামের এটা কাম্য নয় যে, মানুষের মন হবে নিছক অনুকরণকারী, তাও প্রশ্নাতীতভাবে। বরং ইসলাম গুরুত্ব দেয় পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং চিন্তাশীলতার ওপর।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ

এও কি তাদের পথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তো ওদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবু কি এরা শুনবে না?[২৭২]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

---

২৭১ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:১৩৭।

২৭২ আল-কুরআন (আল-সাজদা) ৩২:২৬।

ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।[২৭৩]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।[২৭৪]

এটাও উল্লেখ্য যে, ইসলামী আইন গবেষণায় ফতোয়া রচনা অথবা ফতোয়া প্রয়োগ করার আগে (ex-ante) সাধারণভাবে প্রাসঙ্গিক এম্পিরিক্যাল গবেষণা করা হয় না, আর ফতোয়া দেওয়া বা প্রয়োগের পরেও (ex-post) তাঁর কী প্রভাব বা ফলাফল তা নিয়েও গবেষণা হয় না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

১৩টি মূল্যবোধের এই তালিকা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়। উপর্যুক্ত মূল্যবোধ এবং নীতিগুলো সরাসরি কুরআনের ওপর ভিত্তি করে। যেসব মৌলিক নীতিমালা কুরআন ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ইসলামী আইন নিরূপণ এবং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে উপর্যুক্ত মূল্যবোধগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যেহেতু চূড়ান্ত আসমানি বাণীর বাহক হিসেবে নবিজির (স.) অবস্থানও কুরআনের বিরোধী বা বিপরীত হতে পারে না যখন হাদিসসহ অন্য কোনো উৎস কুরআনের সাথে বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়; এই সরাসরি কুরআনভিত্তিক নীতিমালাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তদুপরি, আইন-বিধিবিধান, যা জীবনের জন্যই প্রয়োজনীয়, সে ব্যাপারে আইনসর্বস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে atomistic

---

২৭৩ আল-কুরআন (আর-রুম) ৩০:৮।

২৭৪ আল-কুরআন (আল- হজ) ২২:৪৬।

বা সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে একেকটি বিষয়কে সূক্ষানুসূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই, কোনো বিপরীত প্রমাণের অনুপস্থিতিতে, যেকোনো আইন বা বিধান যা মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিরূপিত তা কোনোভাবেই কুরআনি মূল্যবোধ ও নীতিমালার সাথে সংঘর্ষশীল হতে পারে না এবং যাতে না হয় সে ব্যাপারে মুসলিমদের বিশেষ সচেতনতা থাকা প্রয়োজন।

উসূলে ফিক্‌হের অঙ্গনে ইতোমধ্যেই মূল্যবোধমুখীর দিকে আহ্বান বিরল হলেও শোনা যাচ্ছে। নিয়াজীর লেখা সাম্প্রতিক পাঠ্যগ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'The Third Mode of Ijtihad: A Value-oriented Jurisprudence'।[২৭৫] এই গ্রন্থে লেখক মূল্যবোধের বিষয়টির অবতারণা করেছেন মাকাসিদ আল-শারিয়া বা শারিয়ার বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে। সে অনুযায়ী মাকাসিদ হিসেবে চিহ্নিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা: বিশ্বাস বা ধর্ম (দীন), জীবন (নাফস), পরিবার ব্যবস্থা (নাসল), বুদ্ধিবৃত্তি (আকল) এবং ধন-সম্পত্তি (মাল)।[২৭৬] এই পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় 'সর্বাবস্থায়,' যদি না কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরিয়া ব্যতিক্রম নির্দেশ করে।[২৭৭]

এই পাঁচটির মধ্যে শেষের চারটি (জীবন, পরিবার, বুদ্ধি এবং সম্পত্তি) প্রথমটির, অর্থাৎ দীন-এর অধীন। ইমাম গাজ্জালীর মত ছিল কিছুটা আরো সূক্ষ্ম (nuanced)।

> আল-গাজ্জালী বলেছেন দ্বিতীয় মাকসুদটি, অর্থাৎ জীবনের সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা, মনে করা যেতে পারে দীনের ওপর অগ্রাধিকার রয়েছে, কেননা জীবন ছাড়া ধর্মই হতো না। এই মতটি সামগ্রিক

---

২৭৫ উল্লেখ্য, এই বইতে যে মূল্যবোধমুখিতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়াজীর ব্যবহৃত পরিভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এই বই লেখার অংশ হিসেবে গবেষণার সময় নিয়াজী ব্যবহৃত পরিভাষা সম্পর্কে এই লেখক জানতে পারেন, তবে নিয়াজী তার পরিভাষা নিয়ে বিস্তারিত কিছু লেখেননি। তাছাড়া, তার লেখাটি মূলতঃ ক্ল্যাসিক্যাল মাকাসিদভিত্তিক। আর এই বইতে মূল্যবোধের যে কাঠামো পেশ করা হয়েছে, তা ক্ল্যাসিক্যাল মাকাসিদভিত্তিক নয়।

২৭৬ Nyazee, 2000, p. 39; also p. 202.

২৭৭ Nyazee, 2000, p. 39.

> জীবনকে বিবেচনা করে এবং সে অর্থে এ অগ্রাধিকার বুদ্ধি (আকল)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ ফুকাহার দৃষ্টিতে বুদ্ধিসম্মত হওয়া বা স্বাভাবিক আকল থাকা তাকলিফ (আইনি আবশ্যিকতা)-র জন্য একটি শর্ত। তিনি অবশ্য এটাও বলেন যে, ফিকহের কিছু কিছু দিক আছে, যা দীনের স্বার্থটিকে সর্বোচ্চ বিবেচনা দেওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করে।[২৭৮]

লক্ষণীয়, নিয়াজী এই মাকাসিদকে সেক্যুলার মূল্যবোধ বা লক্ষ্য, যা মানব যুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত, তার সাথে তুলনা করেছেন।

প্রাকৃতিক আইন (natural law) তার আধুনিক রূপে মূল্যবোধমুখী আইনশাস্ত্রের ব্যাপারে বেশ অনুকূল। ... তার অর্থাৎ ডিয়াস-এর মতে পশ্চিমা আইনশাস্ত্রে চূড়ান্ত মূল্যবোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নিম্নোক্তগুলো: (১) জাতীয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা; (২) ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তা; (৩) সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা; (৪) সামাজিক কল্যাণ; (৫) সাম্য; (৬) নিয়ম, নীতি, মতবাদ (doctrine) এবং ঐতিহ্য প্রতি বিশ্বস্ততা; (৭) নৈতিকতা; (৮) প্রশাসনের সুবিধা; এবং (৯) আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য।

বিস্তারিত পরীক্ষায় দেখা যায় যে এই বিষয়গুলো ইসলামী আইন বা মাকাসিদ আল-শারিয়ার পাঁচটি বিষয়ের একেবারে অনুরূপ । লক্ষণীয় যে, সেগুলোর ব্যবহার এবং পদ্ধতি-কাঠামো (methodology)ও অনুরূপ।[২৭৯]

মাকাসিদ আল-শারীয়া যদি প্রাকৃতিক আইন এবং মানব যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আহরণ করা মূল্যবোধগুলোর এত কাছাকাছি হয়, তাহলে শরিয়াভিত্তিক এই মাকাসিদের প্রতি কতটা যথার্থতা এবং ওজন (weight) আরোপ করা যায়, যেখানে আসমানি এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে শরিয়াকে ভুল বোঝা হয়?

যে মূল্যবোধমুখী আঙ্গিকের কথা এই গ্রন্থে বলা হয়েছে তা নিয়াজীর পেশ করা আঙ্গিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, কারণ সে মাকাসিদকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে তাতে মাকাসিদ যেন নিছক ঐ মূল্যগুলোর নির্দেশক। কিন্তু মূল্যবোধমুখিতা আরো সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত: মাকাসিদের ঐতিহ্যবাদী

---

২৭৮ Nyazee, 2000, p. 205.
২৭৯ Nyazee, 2000, p. 314.

অগ্রাধিকার-বিন্যাসের আরেকটি সংশ্লিষ্ট সমস্যা হচ্ছে যে, তাতে অন্যসব মাকসুদগুলোকে (জীবন, পরিবার, বুদ্ধি ও সম্পদ) বিশ্বাস বা দীনের অধীনস্থ দেখা হয়। আধুনিককালে যেভাবে ইসলামের নামের অপব্যবহার চলে তাতে ঐ চারটি মাকসুদের অলঙ্ঘনীয়তার ব্যাপারে আর সম্মান যথাযথভাবে দেখানো হবে না, হয়তো এই নেতিবাচক প্রবণতার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং সেজন্যই এই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। তৃতীয়ত: ইজতিহাদের তিনটি ধারা, যার মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধমুখী আইনশাস্ত্র যেমনটি নিয়াজী উল্লেখ করেছেন তাও অন্তর্ভুক্ত, তা কিতাবমুখী ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি একটি বড় সমস্যা এবং এর সীমাবদ্ধতা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে। সবশেষে, এ মূল্যবোধগুলো যেসব সূত্র থেকে আহরণ করতে হবে তা যে মূলত কুরআনে সীমাবদ্ধ করা উচিত, যে ব্যাপারে এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, সেরকম কোনো মত নিয়াজী পোষণ করেন না।

তথাপি, মূল্যবোধমুখিতার দিকে প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা কিছুটা হলেও ধীরে ধীরে ঝুঁকছে তা স্বাগতম এবং অনেক প্রতীক্ষিত। এ বইজুড়েই ইসলামী আইনের ওপর আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকতার প্রভাব, যা আইন এবং তার মাকাসিদ-এর মধ্যে বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. উপসংহার

কার্যকর হতে যেকোনো সমাজেই নিয়মনীতি (regulation)-এর প্রয়োজন। কিন্তু, আইনকানুন অবশ্যই কিছু মৌলিক মূল্যবোধ বা আদর্শের ভিত্তিতে হতে হবে এবং ইসলামের ক্ষেত্রে সেই মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত এবং আহরণ করতে হবে সরাসরি কুরআন থেকে। এটা ধরে নেয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, যদি কোনো নীতি বা মূল্যবোধ সত্যিই মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহ তায়ালা কুরআনেই স্পষ্ট করে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমনটি ব্যাখ্যা করেছেন আল-শাতিবী:

> কুরআন হচ্ছে শরিয়ার সমগ্রতা, দীনের খুঁটি, জ্ঞান-প্রজ্ঞার উৎস-ঝর্ণা, নবুয়তের নিদর্শক এবং চক্ষু ও হৃদয়ের নূর। এছাড়া আল্লাহর দিকে আর কোনো পথ নেই এবং নাজাতেরও আর কোনো উপায় নেই। তোমরা আর কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরবে না, যা কুরআনের

বিপরীত। এটি এমন একটি বিষয়, যা স্বতঃসিদ্ধ, কারণ এটা এই উম্মাহ্‌র দীনের প্রেক্ষাপটে সবার জানা। সেজন্যই যে কেউ শরিয়ার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান চায়, শরিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায় এবং তার অনুসারীদের কাতারে শামিল হতে চায়, তাকে কুরআনকে নিত্য সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং দিন ও রাতে, অন্বেষণে এবং কর্মকাণ্ডে কুরআনকে আপন করে নিতে হবে।[২৮০]

তদুপরি, আইন এবং বিধিবিধানের কাঠামো থাকা মানে এ নয় যে, তা আইনসর্বস্বতায় পরিণত হতে হবে। যদিও শরিয়াকে ভুল করে আইনের সমার্থক গণ্য করা হয়, এটা বোঝা এবং স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট সেই আদেশ-নিষেধগুলো এবং হুদুদ বা শাস্তি-বিধানগুলো ব্যতিরেকে, শরিয়া কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক হলেও মূলত বিস্তারিত পর্যায়ে ব্যাখ্যাপ্রসূত মানব-নির্মিত একটি কাঠামো। তাই, সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে, শরিয়াকে 'চিরন্তন', 'আসমানি', কিংবা 'অপরিবর্তনীয়' হিসেবে বোঝা, গণ্য করা অথবা অভিহিত করা ভুল। এই ভুল খণ্ডনের জন্য রয়েছে কুরআন, নবিজির (স.) ঐতিহ্য এবং ইজতিহাদের অবিচ্ছিন্ন ধারা যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

যদি শরিয়াকে বোঝা হয় আসমানি ইচ্ছা 'যেমনটি আছে আল্লাহর মনে', তাহলে শরিয়া আসমানি, অপরিবর্তনীয় এবং অভ্রান্ত। কিন্তু শরিয়াকে ফিকহ কিংবা ইসলামী আইনের সমার্থক গণ্য করা যাবে না। যেভাবেই শরিয়াকে সংজ্ঞায়িত করা হোক, এ দু'টির মধ্যে যেকোনো শুধু একভাবে করতে হবে। যেমনটি এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, বস্তুত এই পরিভাষার যথার্থ অর্থ হচ্ছে 'আসমানি ইচ্ছা' আইন বা বিধিবিধান নয় যা মানব-প্রণীত, যদিও তা আসমানি সূত্রের ভিত্তিতে কিংবা তার আলোকে হয়। তাই শরিয়াকে নিছক আইন বা বিধিবিধানের পর্যায়ে নামানো সঠিক নয়। এতে ইসলামের শুধু অপব্যাখ্যাই হয় না, বরং তা আইনসর্বস্বতায় ইসলামকে পর্যবসিত হওয়া এবং বিশ্বকে পথনির্দেশনা দিতে ও সমসাময়িককালের সমস্যার সমাধান দিতে ইসলামের প্রাণশক্তি ও গতিশীলতা হরণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

২৮০ Abu Zahra, n.d., Chapter One, quoting al-Shatibi, al-Muwafaqat, Vol. 3, p. 247.

চূড়ান্ত পর্যায়ে, ইসলামী আঙ্গিক থেকে শরিয়ার যথার্থ ধারণা ও উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ নিছক তাত্ত্বিক কারণে নয়, বরং এটা প্রয়োজন যদি মুসলিমরা সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তিকে আবার অর্জন এবং পুনর্বহাল করতে চায় যা নবিজির (স.) নেতৃত্বাধীনে এবং নির্দেশনার আলোকে মুসলিমদের সক্ষম করেছিল এমন একটি কমিউনিটির জন্ম দিতে যা থেকে বিকশিত হয়েছিল একটি প্রাণবন্ত সমাজ এবং সভ্যতা। আত্মসমালোচনামূলক পারস্পরিক মতবিনিময়, সৃজনশীল এবং গঠনমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবন, নৈতিক ও ধর্মীয় স্বচ্ছতা যা সহজ-সরল এবং দ্ব্যর্থহীন, একটি সমস্যা-সমাধানমুখী এবং মূল্যবোধমুখী ধারা যার ভিত্তি কুরআন এবং সেই সাথে নবিজির (স.) ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত এবং নির্দেশিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের নিজেদের প্রতি, মানবতার প্রতি এবং সব কিছুর ওপর তাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে, আর অর্জন করতে দোজাহানের হাসানা এবং আখিরাতে নাজাত।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আইন এবং হাদিসের ব্যবহার ও অপব্যবহার

কুরআন হচ্ছে ইসলামের মূল উৎস। মৌলিক নীতিমালা, মূল্যবোধ এবং আদর্শসহ কতিপয়– আসলেই কতিপয় - আইনসংক্রান্ত বিধিবিধান এই আসমানি গ্রন্থ থেকে উৎসারিত। বস্তুত পূর্বোক্ত অধ্যায়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, আইনসর্বস্ব চিন্তা বা প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠে মূল্যবোধমুখিতার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হলে এটা অপরিহার্য যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, মূল্যবোধ এবং আদর্শগুলো সরাসরি কুরআন থেকে আহরণ করতে হবে। কুরআনের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই: তারা কুরআনকে গ্রহণ করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সরাসরি নাজিলকৃত আসমানি বাণী হিসেবে। কিন্তু হাদিসের ব্যাপারে এ ধরনের কোনো ঐকমত্য বা ইজমা নেই।

ঐতিহ্যবাদী অবস্থান অনুযায়ী কুরআন এবং হাদিস হচ্ছে ইসলামী পথনির্দেশনার মুখ্য দু'টি সম্পূরক উৎস। তথ্যভান্ডার হিসেবে হাদিসের ক্ষেত্রে তা যেভাবে সংগৃহীত এবং সংকলিত হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু সমস্যা হয়তো আছে। তবে যেগুলোকে সহিহ গণ্য করা হয় সেগুলো থেকে বাকিগুলো পৃথক করার মাধ্যমে হাদিস বিশারদরগণ (মুহাদ্দিসীন) প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো নিরসন করেছেন। বাকি যে সমস্যাই থাক, এই জ্ঞানভান্ডার ইসলামের অপরিহার্য এবং বহুলাংশে নির্ভরযোগ্য বুনিয়াদি উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

কিছু হাদিস সংগ্রহকে সাধারণভাবে সহিহ হিসেবে গণ্য করা হয়; আর অন্য সংগ্রহগুলো স্বীকৃত এমন ভান্ডার হিসেবে যাতে অন্যান্য সহিহ হাদিসসহ দুর্বল (যঈফ) এমনকি জাল (মাওজু) হাদিসও সংমিশ্রিত আছে। ফিকহ বা ইসলামী আইনের ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ ভান্ডার মৌলিকভাবে নির্ভরশীল হাদিসের ওপরে। হাদিস বিশেষজ্ঞসহ ইসলামী মনীষীরা অনেক দূরত্ব অতিক্রম করেছেন হাদিসের পবিত্রতার সমর্থনে, যার ভিত্তিতে তারা শুধু ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই করেননি, বরং ইসলামকে একটি 'পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' হিসেবে গণ্য করে ইসলামী আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন।

হাদিস বিষয়ে উপর্যুক্ত ঐতিহ্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন হিসেবে তার বইয়ের মুখবন্ধে কাজী বলেন: 'রাসুলুল্লাহ্‌র সব বাণী, ভাষণ এবং বক্তব্য... আসমানিভাবে অনুপ্রাণিত[২৮১]... তাঁর সব সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডও আসমানিভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। তাঁর বক্তব্যটি ঐতিহ্যবাদী অবস্থানের প্রতিফলন।

> সুন্নাহ এবং হাদিস নিছক জ্ঞানী এবং দার্শনিকদের প্রজ্ঞাময় বাণী অথবা শাসক ও নেতাদের রায় হিসেবে দেখলে হবে না। পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে একজনের বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসুলুল্লাহ্‌র কথা এবং কাজ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অনুসরণ এবং আনুগত্য করতে হবে।[২৮২]

ঐতিহ্যবাদীরা হাদিসের কোনো না কোনো মাত্রার আসমানিত্ব (divinity) আরোপ করে, যা ইসলামী সাহিত্যে বা লেখনীতে খুব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলাউইয়া লিখেছেন:

> হাদিস বা সুন্নাহ আল্লাহ তায়ালা থেকে একটি ওহি (inspiration), অর্থাৎ এর ভাষা নবিজি (স.) থেকে এবং অর্থ আল্লাহ তায়ালা থেকে (অর্থাৎ, আসমানি শুধু অর্থের দিক থেকে) ... আল্লাহ তায়ালা থেকে দুই ধরনের ওহি আছে ... কুরআনের আয়াতগুলো প্রথম ধরনের (যেখানে ভাষ্য ও অর্থ দু'টিই আসমানি) আর নবিজির (স.) সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের। [২৮৩]

> নবিজির (স.) সাধারণ ভাষ্যগুলো এবং যা আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তার প্রতি নাজিল করেছেন তার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমটি আসমানি শুধু তার অর্থে আর পরেরটি আসমানি অর্থে এবং কাঠামোতে (ফর্ম)।[২৮৪]

> নবিজির (স.) সব কথা এবং কাজ আসমানিভাবে অনুপ্রাণিত (inspired) এবং শুধুমাত্র সেগুলোর মধ্যেই আমরা প্রতিফলন পাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রকৃত অর্থ এবং যথার্থ তাৎপর্য।[২৮৫]

---

২৮১ Kazi, pp. 1-2.
২৮২ Kazi, p. 2.
২৮৩ Alauya, p. 24.
২৮৪ Alauya, p. 40.
২৮৫ Alauya, p. 42.

এ প্রসঙ্গে কুরআনের যে আয়াতটি বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় (নবি) কথা বলেন না।

এটা ওহি যা নাজিল হওয়া।[২৮৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, রাসুলুল্লাহ (স.) যা কিছুই বলেছেন তা আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে। কুরআন এবং হাদিসের পার্থক্য হচ্ছে যে কুরআনের ওহি 'মাতলু' (যা আক্ষরিকভাবে হুবহু আল্লাহ তায়ালা যেভাবে নাজিল এবং সংরক্ষণ করেছেন আর যা তিলাওয়াত করা হয়) আর হাদিস 'গায়রে মাতলু' (যার ভাবটা নাজিলকৃত আর কথাটা নবিজির (স.) নিজের।

কুরআনের বাইরেও যে নবিজি (স.) ওহি পেয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে যে, প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদাস ছিল, পরে নবিজিও (স.) আশা করছিলেন তা বদলে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তা পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত দেন।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার ওপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসুলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদের আল্লাহ পথ

২৮৬ আল-কুরআন (আন-নাজম) ৫৩:৩-৪।

> প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ইমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।[২৮৭]

লক্ষণীয়, নবিজি (স.) যে প্রথম কিবলা অনুসরণ করতেন তা কুরআনে নাজিল হওয়া কোনো আদেশেরই ভিত্তিতে। কিন্তু সে ব্যাপারে আলাদা কোনো ওহি কুরআনে আসেনি। যেহেতু এরকম মৌলিক ব্যাপারে নবিজি (স.) নিজে থেকে কিছু করবেন না, তাই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুরআনের বাইরেও ওহি পেতেন এবং এটাই যুক্তিযুক্ত কারণ কুরআনে তার জন্য যে দীনের সার্বিক শিক্ষক এবং উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে ভূমিকা নির্ধারিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে পথ নির্দেশনা দেবেন।

তাছাড়া নবিজির (স.) যে দায়িত্ব এবং ভূমিকা কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন ৩/১৬৪-তে, তাতে তিনি আল্লাহ তায়ালার মনোনীত শিক্ষক মুসলিমদের জন্য, যারা তাদের জীবনকে আল্লাহ তায়ালার হেদায়েতের আলোকে গড়তে, সাজাতে চায়। আর সে কারণেই শুধু কুরআনবাদীরা (আহলে কুরআন) যেভাবে নবিজি সম্পর্কে জানা কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চায়, তা কুরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং এজন্যই তার জীবনের বিস্তারিত যতটুকু নির্ভরযোগ্যভাবে আমাদের জানা সম্ভব তা জানা প্রয়োজন।

> لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ
>
> আল্লাহ ইমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবি পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।[২৮৮]

তবে মাতলু আর গায়রে মাতলু– কুরআন-হাদিসের মধ্যে এই পার্থক্যকরণ সব প্রাসঙ্গিক ইস্যুর নিষ্পত্তি নয়। কুরআনের বাইরেও যে নবিজি (স.) অহি পেতেন

---

২৮৭ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৪৩।

২৮৮ আল-কুরআন (আল-ইমরান) ৩:১৬৪।

তা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি তার সব কথাই যে ওহিভিত্তিক নয় তার প্রমাণও হাদিসেই রয়েছে।

> আমিও একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন তোমাদের দীন সম্পর্কে কোনো আদেশ দেই, তা পালন করো আর যখন নিজের থেকে কিছু বলি, তখন আমিও একজন মানুষ বৈ কিছু নই। আমি আন্দাজে একটি কথা বলেছিলাম; তোমরা আমার ধারণা-অনুমানভিত্তিক কথা গ্রহণ করো না। অবশ্য আমি যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিছু বলি, তা গ্রহণ করো; কারণ আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কখনো মিথ্যা আরোপ করি না। নেহায়েত দুনিয়াবি ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান বেশি।[২৮৯]

> আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ-মীমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ অপেক্ষা দলিল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি রায় দেই (দুই পক্ষকে) শুনে, আর (তার ভিত্তিতে) যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।[২৯০]

উপর্যুক্ত দু'টি হাদিস, একটি সহিহ মুসলিম এবং একটি সহিহ বুখারি থেকে। প্রথমটি পরিষ্কার করে যে, রাসুলুল্লাহ (স.) দুনিয়াবি ব্যাপারে নিজে থেকেই বলেছেন এবং তা না ওহিভিত্তিক আর না তা সে ব্যাপারে তার কথা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আর দ্বিতীয় হাদিসটি পরিষ্কার করে যে, বিচার-সংক্রান্ত কাজে বিচারক হিসেবে যে রায় দিতেন, তা সাধারণত ওহিভিত্তিক নয়। তাই ঢালাওভাবে হাদিস মানেই ওহিভিত্তিক এটা না কুরআনের সাথে মেলে, আর না হাদিসের ভিত্তিতে।

হাদিস্ের যে ভান্ডার রয়েছে তা ঢালাওভাবে ওহিভিত্তিক নয় সেটা অনস্বীকার্য। তা কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রহীত এবং সংরক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এই সংগ্রহ আর সংরক্ষণ যেভাবেই বিবেচনা করা হোক, তা কুরআনের সমকক্ষ বা সমতুল্য নয়। সে কারণেই হাদিসের ওপর আসমানিত্ব আরোপ থেকে কিছু দুঃখজনক

২৮৯ Muslim, Kitab al-Fadhail, #2362, http://sunnah.com/muslim:2362.
২৯০ Al-Bukhari, Kitab al-Hiyal, #6967, http://sunnah.com/bukhari:6967.

তাৎপর্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, কুরআন এবং হাদিসের প্রামাণ্যতা (authoritativeness) সমান অথবা প্রায় সমান পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

> মূল্যগত দিক থেকে আনুগত্যের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ্‌র হাদিসের শরিয়া-মূল্য কুরআনের শরিয়া-মূল্যের অনুরূপ । ...[২৯১]

দ্বিতীয়ত, একই বিষয়ে যদি কোনো হাদিসের ব্যাপারে এটা নিরূপণ করা যায় যে, কালানুক্রমিকভাবে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতের পরবর্তীকালে সে হাদিস পরে এসেছে, তাহলে ঐতিহ্যবাদীদের অনেকের দৃষ্টিকোণ থেকে সে হাদিস কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতকে রহিত করে।

> বস্তুত যখন কোনো নবুয়তী সুন্নাহ্‌র সময়কাল প্রাসঙ্গিক আয়াতের পরবর্তীকালে হয়ে থাকে, তাহলে সুন্নাহ কুরআনের আয়াতের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।[২৯২]

যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে, কুরআনের কোনো আয়াত অপর কোনো আয়াতকে রহিত করার অবকাশ নেই, আর কোনো হাদিসের ভিত্তিতে কুরআনের কোনো আয়াতকে রহিত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি, এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে যে, সামগ্রিকভাবে হাদিসের ওপর কুরআনের মতোই সামগ্রিকভাবে আসমানিত্ব আরোপ করার অবকাশ আছে কি না।

হাদিসের ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টিকোণের বিপরীত প্রান্তে রয়েছে তারা, যারা হাদিসের পুরো ভান্ডারকেই সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে। তারা যুক্তি দেয় যে, রাসুলুল্লাহ (স.) তার জীবদ্দশায় তার কোনো কথা বা কাজকে বাণীবদ্ধ আকারে পৃথকভাবে সংগ্রহ করতে নির্দেশ তো দেনইনি, বরং তিনি এ ব্যাপারে নিষেধও করেছেন। বস্তুত সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত যে, হাদিসের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শুরু হয় প্রায় নবিজির (স.) এক শতাব্দী পর এবং সংগ্রহকারীদের সর্বোত্তম প্রয়াস এবং নিয়ত থাকলেও অধিকাংশ সংকলনগুলোতে সহিহ এবং অ-সহিহ (দুর্বল, এমনকি জাল) হাদিসগুলো মিশ্রিত হয়ে যায়। তাছাড়াও, যে সংকলনগুলো সহিহ বলে পরিচিত, অর্থাৎ সিহাহ্-সিত্তা (ছয়টি সহিহ সংকলন) তো বটেই, প্রধান দু'টি সংকলন যার নামের মধ্যেই সহিহ রয়েছে (সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম), সে দুটোতেও মতনের দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য হাদিসও স্থান পেয়েছে।

---

২৯১ Alauya, p. 43

২৯২ Alauya, p. 40.

বেশ কিছু সহিহ হাদিসের ব্যাপারে হাদিস বিশারদদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। সেই সাথে একই ঘটনা এবং বিষয় নিয়ে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা রয়েছে, এমনকি কখনো কখনো বেশ কিছু হাদিস পরস্পরবিরোধী। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আইন ও বিধিবিধান নির্ধারণ বা প্রণয়নের নামে অগ্রহণযোগ্য ধর্মমত (dogma) এবং লোকাচারও (taboo) ভূমিকা রাখে হাদিস ভান্ডারের ভিত্তিতে এই ফিক্হী ভান্ডারের একটি ব্যাপক অংশ গড়ে ওঠে। যেখানে কুরআনের ভাষ্যে সাধারণভাবে দেখা যায় সাম্য ও সুবিচারের প্রতিফলন, ইসলামী মনীষীরা এবং ফুকাহা হাদিসের ভিত্তিতে এমন অনেক আইন, বিধিবিধান অথবা প্রথা গ্রহণ বা বৈধায়ন (validate) করেন, যা বৈষম্যমূলক অথবা ন্যায়নীতি বিবর্জিত (এমনকি অতি কঠোর এবং অনেক ক্ষেত্রে অসমর্থনীয়, indefensible)। হাদিস প্রত্যাখ্যানকারীরা তাই কুরআনকে হেদায়েতের একমাত্র আসমানি উৎস হিসেবে গ্রহণ করে, আর হাদিসের সমগ্র ভান্ডারকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর প্রসঙ্গও টানা হয়।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

ওরা এই বাণী (হাদিস) বিশ্বাস না করলে সম্ভবত ওদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।[২৯৩]

আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী (আহসানুল হাদিস) সংবলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃপুন আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাঁদের রবকে ভয় করে, তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়; তারপর তাঁদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি এ দিয়ে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।[২৯৪]

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

২৯৩ আল-কুরআন (আল-কাহ্‌ফ) ১৮:৬।
২৯৪ আল-কুরআন (আল-জাসিয়া) ৩৯:২৩।

> এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কোন্ বাণী (হাদিসে) বিশ্বাস করবে? [২৯৫]

তাঁদের মতে, নিছক এই আয়াতগুলোর ভিত্তিতে বিবেচনা করলে কুরআনই হাদিস এবং ৪৫:৬ আয়াতে বলাই হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার আয়াতের বাইরে বা পরিবর্তে অন্য কোন 'হাদিস'-এ মানুষ বিশ্বাস করবে? তাঁরা এ আয়াতগুলোর সূত্র টানে তাঁদের 'শুধু-কুরআন' (Qur'an-only) অবস্থান থেকে। 'শুধু-কুরআন'বাদিতার মৌলিক সমস্যা হচ্ছে যে কুরআন থেকে আমরা রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে যা জানতে পারি সেটার বাইরে তাঁর জীবনের সমগ্রতা এবং বিস্তারিতকে অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে ফেলা হয়, যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

হাদিস আসমানি আর কুরআনই হাদিস এ দু'টি প্রান্তিক অবস্থানেরই মারাত্মক সমস্যা রয়েছে এবং প্রকৃত অবস্থা দু'টির মাঝামাঝি। বস্তুত হাদিস-অস্বীকারকারী আন্দোলন বা তাদের মতাবলম্বীদের অবস্থানের সারবস্তু সমর্থনযোগ্য তো নয়ই, বরং তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য, যদিও তাদের অবস্থান মূলত ঐতিহ্যবাদীদের প্রান্তিক দাবি ও মতবাদের প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

এ দু'টি প্রান্তিক অবস্থানের পর্যালোচনা অনেকের কাছে তর্ক-বিতর্কের জন্য উপাদেয় বলে মনে হলেও, আসলে সমস্যার প্রকৃত জটিলতা যা নিয়ে ঘিরে আছে তা হলো এই যে হাদিসের ভিত্তিতেই ইসলামী আইন ও বিধিবিধানের ভাণ্ডারের অধিকাংশই প্রণীত, কিন্তু সে সবের মধ্যে এমন বিধিবিধানও রয়েছে যা বাস্তবে কুরআনের লক্ষ্য ও চেতনা এবং সুবিচার ও ন্যায়নীতির প্রতি ইসলামের মৌলিক প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি, যে বিষয়টি এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হাদিসের বিশুদ্ধতার বিষয়টিই শুধু নয়, বরং আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নে হাদিস এবং সুন্নাহ কীভাবে ব্যবহার করা হয় তাও প্রাসঙ্গিক। ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান ব্যাখ্যা করেছেন:

> সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধতার সমস্যাটি আসলে অনেক শতাব্দীর পুরনো ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র নিয়ে মুসলিমদের অস্বাচ্ছন্দ্যের বহিঃপ্রকাশ এবং প্রতিফলন।[২৯৬]

---

২৯৫ আল-কুরআন ৪৫ (সুরা আল-যাছিয়া): ৬।

২৯৬ AbuSulayman, p. 83.

হাদিস এবং সুন্নাহ পুরোপুরি সমার্থক না হলেও, হাদিস সংক্রান্ত জটিল বিষয়বস্তু নিয়ে পর্যালোচনা সহজ এবং স্বচ্ছ রাখার জন্য, হাদিস এবং সুন্নাহ এ দু'টি পরিভাষা সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হবে, যেমনটি সচরাচর করা হয়ে থাকে। তবে প্রাথমিকভাবে কিছু ধারণা শুরুতেই পরিষ্কার করাটা প্রাসঙ্গিক। সুন্নাহ্‌কে বুঝতে হবে 'একটি আদর্শ, মডেলসম আচার-আচরণ এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার, সেই সাথে মুখ্য অর্থে 'দৃষ্টান্ত স্থাপন'[২৯৭], তবে যদিও সুন্নাহ্‌কে চিহ্নিত করা হয় নবিজির (স.) আদর্শ আচার-আচরণের সাথে, কোনো বিশেষ বিষয়ে কোন্‌টি সুন্নাহ বা অনুকরণীয়/অনুসরণীয় আদর্শ তা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বস্তুত 'আহলে রায়' আন্দোলন (যারা যুক্তিবাদী - rational - অথবা মানব-বিবেচনাভিত্তিক ব্যাখ্যার পক্ষে) তাদের প্রভাবে পরিণামস্বরূপ দেখা যায় অনেক প্রথা-রীতি যা আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে।

> যুক্তিবাদী প্রবণতা প্রথম দেড় শতাব্দীতে আইনি, ধর্মীয় এবং নৈতিক চিন্তাভাবনার এক বিশাল ভাণ্ডারের জন্ম দেয়। কিন্তু সে ভান্ডার সত্ত্বেও, এই জ্ঞান-গবেষণার ফসল হয়ে দাঁড়ায় নৈরাজ্যিক, অর্থাৎ কোনো একক সুন্নাহ নয়, বরং বিভিন্ন এলাকার সুন্নাহ। প্রায় সব বিষয়েই বিশদ পর্যায়ে হিজায, ইরাক, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলের সুন্নাহ হয়ে পড়ে মতপার্থক্যের প্রতিফলন।[২৯৮]

এই নৈরাজ্যিক অবস্থা স্থায়ী থাকে যতক্ষণ না ইমাম শাফেয়ীর নেতৃত্বে 'আহলে হাদিস'-এর ঐতিহ্যবাদিতা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধতা (authenticity) নিরূপণে হাদিসের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও ভূমিকা প্রতিষ্ঠায় ইমাম শাফেয়ীর সাফল্য নতুন মানদণ্ড (orthodoxy) হয়ে দাঁড়ায়।[২৯৯] তাই এ অধ্যায়ের ফোকাস সুন্নাহ্‌র পরিবর্তে হাদিসের ওপর। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মুসলিম চিন্তাধারায় এ ধারণাটাও আছে সুন্নাহ্‌র সূচনা বা উৎস প্রাথমিকভাবে রাসুলুল্লাহ (স.) নন,

২৯৭ Guraya, p. 76.

২৯৮ Rahman, F., pp. 14-15.

২৯৯ এটা কাকতালীয় নয় যে, অধিকাংশ হাদিস সংকলক এবং হাদিস বিশেষজ্ঞরা শাফেয়ী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। "হাদিস বিশারদদের মধ্যে রয়েছেন অনেক শীর্ষস্থানীয় শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী, যেমন বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, আবু দাউদ, ইবনে কাসীর, যাহাবী এবং নাবাবী" [al-Misri, p. vii]

বরং তাঁর অনেক আগে যে আরেকজন উসওয়াতুন হাসানা ছিলেন, হযরত ইব্রাহিম (আ.)।[৩০০] কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইব্রাহিম (আ.)কে অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে রাসুলুল্লাহ (স.)-কে।

> ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
>
> অতঃপর তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীন (মিল্লাত) অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৩০১]

হামিদুদ্দীন ফারাহী (মৃঃ ১৯৩০ খ্রিঃ) এবং মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহীর ভাবশিষ্য জাভেদ ঘামিদী সুন্নাহ সম্পর্কে বলেনঃ

> সুন্নাহ দীনের একটি স্বতন্ত্র (independent) সূত্র। এটা হাদিস থেকে কিছুটা ভিন্ন। যেহেতু অনেক সময় হাদিসে সুন্নাহ বিধৃত হয়ে, তাই প্রায়শই দুটোকে এক করে ফেলা হয়। সুন্নাহ হচ্ছে নবি ইব্রাহিম (আ.) দীনের ঐতিহ্য (ট্রেডিশন) যা রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁর অনুসারীদের জন্য পুনরুজ্জীবিত এবং সংস্কার/পরিবর্ধিত করেন। সুন্নাহ উম্মাহর কাছে পৌঁছেছে অনুশীলনের নিরবচ্ছিন্ন সিলসিলায়, আর তাই এই সুন্নাহ্র মর্যাদা কুরআনের মতোই।[৩০২]

সুন্নাহ্র মর্যাদা কুরআনের মতোই, এ রকম অবস্থান প্রশ্নসাপেক্ষ। এখানে ঘামিদীর এই পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরা নিছক সুন্নাহ সম্পর্কে ইব্রাহীমি ধারাবাহিকতার সংশ্লিষ্টতায়। এই চিন্তাধারায় হাদিসের অবস্থানটা অনেকটা গৌণ। এই বইতে এই আঙ্গিকে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবে ঐতিহ্যবাদী ধারায় সুন্নাহ্র সংশ্লিষ্টতায় হাদিসকে অপরিহার্য এবং সম্পূরক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সে আলোকেই এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

আইন এবং হাদিসের মধ্যে যোগসূত্র পর্যালোচনার আগে হাদিসের ব্যাপারে কিছু প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

---

৩০০ আল-কুরআন (আল-মুমতাহানা) ৬০:৪.

৩০১ আল-কুরআন (আন-নাহল) ১৬:১২৩।

৩০২ Ghamidi, translator’s introduction, 2010, p. 12.

হাদিস শাস্ত্র (ইল্‌ম্‌ উসূল আল-হাদিস) ইসলামী জ্ঞানের একটি খুবই টেকনিক্যাল শাখা, যার সাথে বিশেষ করে সাধারণ মুসলিমরা ভালোভাবে পরিচিত নয়, সেজন্য এটা প্রথমে বোঝা প্রয়োজন যে, ঐতিহ্যবাদী অবস্থান এমন কোনো পর্যবেক্ষণ, যুক্তি বা প্রমাণ এতটুকু সহ্য করে না, যা তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় হাদিসের বিরুদ্ধে আক্রমণ অথবা হাদিসের গুরুত্ব হ্রাস করার প্রয়াস হিসেবে। পাঠকরা ধৈর্য ধরে অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা পড়লে আশা করি বিষয়টা পরিষ্কার হবে। কিন্তু এ পর্যায়ে চারটি ভ্রান্তি (myth) নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

ক. হাদিস সম্পর্কে কিছু সাধারণ ভ্রান্তি (Common myths about the hadith)

১. যদি কোনো হাদিসে নবিজিকে (স.) উদ্ধৃত করা হয়, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, নবিজি (স.) একেবারে হুবহু তাই বলেছেন।

দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এ ধারণা সত্য নয়। কাউকে উদ্ধৃত করা বলতে বোঝায় তার হুবহু কথার পুনরুক্তির মাঝে দিয়ে সেই সূত্রের স্বীকৃতি দান। তাই কাউকে উদ্ধৃত করলে এটা ধরে নেয়া হয় যে, তার ভাষ্যকে বিশ্বস্ততার সাথে তা পরিবেশন বা উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্যই যখন কোনো হাদিসে বলা হয় 'রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন' অথবা 'রাসুলুল্লাহকে (স.) বলতে শুনেছি' তাহলে পাঠক বা শ্রোতারা সঙ্গতভাবেই ধরে নেবে যে, নবিজির (স.) ভাষ্যকে হুবহু বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে যে তা নয়, বরং বর্ণনাকারী যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে যা শুনেছে তা নিজের কথায় শব্দান্তরিত (paraphrase)-করে বলছে এ ব্যাপারটি প্রায়শই প্রকাশ হয় না আর সে ব্যাপারে তো স্বীকারোক্তিও (ডিজক্লেইমার) থাকে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যা অধিকাংশ মুসলিমের না জানা আছে আর না তারা বোঝে, সে ব্যাপারে ইকবাল আহমেদ খান সুহেইল তার গ্রন্থ 'হোয়াট ইজ রিবা' (রিবা কি?)-তে আলোচনা করেছে। অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা বাদই দেওয়া যাক, ঐতিহ্যবাদী গোঁড়া মতের কারণে হাদিস বিশারদরাও বৃহত্তর মুসলিম কমিউনিটিকে হাদিসের প্রসঙ্গে এ মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে পর্যাপ্তভাবে এবং বিশেষ করে শিক্ষিত বা অবহিত করেন না।

> অধিকাংশ রেওয়ায়েতেই আহরিত [derivations; অর্থাৎ প্রকৃত ভাষ্যের হুবহু উদ্ধৃতি নয়]। তার মানে, রাসুলুল্লাহ্‌র প্রকৃত ভাষ্য হুবহুভাবে রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়নি। বরং বর্ণনাকারী রাসুলুল্লাহ্‌র বক্তব্যের যা অর্থ বুঝেছেন তা যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী এবং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথেই নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। এটা সবারই জানা যে শব্দ পরিবর্তনসহ নিজের মতো করে উদ্ধৃত করার সময় সামান্য পরিবর্তনও অর্থকে ব্যাপকভাবে বদলে দিতে পারে।[৩০৩]

এই প্রেক্ষাপটে মুতাওয়াতির এবং আহাদ হাদিসের পার্থক্য অনুধাবন করাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মুতাওয়াতির বর্ণনা মানে হচ্ছে 'অবিচ্ছিন্ন ধারায় বার বার বর্ণিত' অথবা 'অসংখ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত যাতে করে একটি মিথ্যার ওপর তাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং তা চলতে থাকা অচিন্ত্যনীয়'।[৩০৪] তবে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য হতে ন্যূনতম কতজনের ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হতে হবে সে ব্যাপারে কোনো ইজমা নেই।

পর্যালোচনার এ পর্যায়ে প্রসঙ্গতই এসে যায় যে মুতাওয়াতির-আহাদ শ্রেণি-বিন্যাসে হাদিস বিশারদদের মানদণ্ড অনুযায়ী যেগুলো বিশুদ্ধ গণ্য করা হয় সেই সহিহ হাদিসগুলোর অবস্থান কী। সাধারণভাবে কোনো হাদিস মুতাওয়াতির হবে, কিন্তু সহিহ নয় এটা অকল্পনীয়। কিন্তু আহাদ শ্রেণির হাদিসের বিষয়টি মুতাওয়াতির থেকে একেবারে ভিন্ন। যদিও শাব্দিক অর্থে আহাদ মানে হচ্ছে একক (solitary), যেকোনো হাদিস যা মুতাওয়াতির নয়, সংজ্ঞার দিক থেকে তা-ই আহাদ। আহাদ হাদিস মানেই এটা নয় যে, ঐ হাদিসের জন্য মাত্র একটি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা পরম্পরা (chain of transmission) রয়েছে। যতক্ষণ না রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির পর্যায়ের সংখ্যায় না পৌঁছে, ততক্ষণ একাধিক বর্ণনা ধারা হলেও তা আহাদ হাদিসই। আহাদ হাদিসও শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে নিম্নলিখিতগুলোতে ভাগ করা হয়েছে: সহিহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি।

মুতাওয়াতিরেরও দু'টি প্রকার রয়েছে, যার প্রথমটি হচ্ছে মুতাওয়াতির বিল লাফজ (যেখানে রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) নিজের ভাষ্য সবগুলো রেওয়ায়েতেই হুবহুভাবে এসেছে)। যেমন, "যে আমার নামে মিথ্যা বলে তার নিবাস হবে

---

৩০৩ Suhail, p. 47.

৩০৪ Kamali, 2003, p. 93.

জাহান্নামের আগুন”[৩০৫] - এ ধরনের মুতাওয়াতির বিল লাফজ হাদিস একেবারেই বিরল। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে মুতাওয়াতির বিল মা'না, যেটাতে রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) ভাষ্যের অর্থের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, কিন্তু আসল কথা বা শব্দের ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। বেশির ভাগ মুতাওয়াতির হাদিস এই দ্বিতীয় প্রকারের, যদিও এগুলো প্রায়শই বর্ণিত রাসুলুল্লাহকে (স.) উদ্ধৃত করে, যেমন “রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন ...” কিংবা “আমি রাসুলুল্লাহকে (স.) বলতে শুনেছি ...”। এ ধরনের রেওয়ায়েতগুলো ‘ধারণাসংক্রান্ত রেওয়ায়েত’ (conceptual transmission)।[৩০৬]

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটিতে একই ব্যাপারে হাদিসে যে বর্ণনাগত পার্থক্য থাকে এবং রাসূলের (স.) নামে হলেও ভাষ্যটি যে রাসুলের (স.) কথার হুবহু বর্ণনা নয় তা জানা যায়।

> এই হাদিসটি একই রাবীদের পরম্পরায় আ'মাশের মাধ্যমে জরীর থেকে বর্ণিত হয়েছে (এটার কথা পূর্বোক্ত হাদিস থেকে কিছুটা ভিন্ন): যখন রমজান মাস (-এর রোজা) ফরজ হয়, তখন তিনি এটি (অর্থাৎ আশুরায় রোজা রাখার অভ্যাস) ছেড়ে দেন।[৩০৭]

এবার পরবর্তী উদাহ্‌রণটি বিবেচনা করা যাক, যেখানে আবারও রাসুলুল্লাহকে (স.) সরাসরি উদ্ধৃত না করে, একই প্রসঙ্গে হাদিসের ভাষ্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

> এই হাদিসটি সুলাইমান আল-তাইমী থেকে একই বর্ণনা পরম্পরায় (কিন্তু শব্দের কিছু তারতম্যসহ) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ) (স.) বলেছেন: সুবহে সাদিক তো ওরকম নয় যেমনটি বলা হয়; তারপর তিনি তার আঙ্গুলগুলো একত্রিত এবং নিম্নমুখী করলেন। তবে তিনি বললেন এটা এরকম (এবং তিনি তার তর্জনী অপরটির ওপর রাখলেন এবং তার হাতটি প্রসারিত করলেন)।[৩০৮]

---

৩০৫ Kamali, 2003, p. 95 quoting Abu Dawud, 3, 1036, Kitab al-Ilm, #3643, https://sunnah.com/abudawud:3651.

৩০৬ Kamali, 2003, p. 106.

৩০৭ Muslim, Vol. II,Kitab as-Siyam, #2511, https://sunnah.com/muslim: 1127b.

৩০৮ Muslim, Vol. II, Kitab as-Siyam, #2405, https://sunnah.com/muslim:1093b.

উপর্যুক্ত হাদিস দু'টি সহিহ মুসলিম থেকে। অবশ্য এই সংকলনসহ অন্যান্য সংকলনগুলোতেও এমন হাদিস আছে যেক্ষেত্রে একই গ্রন্থেই কিংবা এক গ্রন্থের তুলনায় অন্যটিতে বর্ণনার তারতম্য আছে। উল্লেখ্য, বর্ণনার তারতম্য থাকলে যেমন করে সহিহ মুসলিম-এ তা চিহ্নিত বা স্পষ্ট করে বলা আছে, অন্য সংকলনগুলোর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তবু বর্ণনার তারতম্য নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাক আর না থাক, যেসব ক্ষেত্রে বর্ণনার তারতম্য নেই সেগুলোও মুতাওয়াতির (যা নিশ্চিত জ্ঞান - certainty of knowledge) দেয় তেমন নয়। (নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয়টি এ অধ্যায়েই পরের দিকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)।

স্পষ্টতই, হাদিসের ভাষ্যে তারতম্য থাকলে (এবং এ ধরনের তারতম্য প্রায়শই আছে), রাসুলুল্লাহ (স.) প্রকৃতপক্ষে কী বলেছেন– হুবহু কী শব্দ ব্যবহার করেছেন– তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, যেটি একটি মৌলিক এবং বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শব্দের সামান্য তারতম্য (এমনকি কখনো কখনো একটি অনুচ্ছেদে অক্ষরের সামান্য তারতম্যও) অর্থের বিভিন্নতার জন্ম দেয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

> [শাফেয়ী] জবাব দিলেন: হাদিস থেকে একটি শব্দ হয়তো বাদ পড়ে থাকতে পারে, যা হাদিসটির অর্থ বদলে দিতে পারে; অথবা একটি শব্দ রাবী যেভাবে উচ্চারণ করেছিল তা থেকে ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে হাদিসটির অর্থ বদলে দিতে পারে, যদিও সে এরকম ভিন্ন উচ্চারণ ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। যে পরম্পরায় হাদিস বর্ণনা করে সে যদি তার অর্থের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, তাহলে হাদিসটি সে বোঝে না, এবং তার থেকে আমরা গ্রহণ করি না। [কারণ] সে যদি বর্ণনা করে যা সে বোঝে না, তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হুবহু বর্ণনা করে না, এবং সেক্ষেত্রে সে শুধু হাদিসটির অর্থ বর্ণনা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তার অর্থই বোঝে না।[৩০৯]

শাফেয়ীর মন্তব্য থেকে এ সিদ্ধান্তে কি পৌঁছানো উচিত যে, বর্ণনার ভাষ্য যদি হুবহু না হয় তাহলে সে রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়? অবশ্যই তা নয়, তার

৩০৯ Al-Shafi'i, p. 244, #374.

সহজ কারণ এই যে, ইমাম শাফেয়ী সহিহ হাদিসের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড নিজেই প্রয়োগ করেননি। এটাই উল্লেখ্য যে, যদিও তার মতে হাদিসের ভিত্তিতে নিরূপণ করা কোনো ইসলামী আইনের আনুগত্য আবশ্যিক, কিন্তু সে হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে উপর্যুক্ত মানদণ্ড তিনি নিজেই প্রয়োগ করেননি। যদি করতেন তাহলে তাকে নিছক মুতাওয়াতির হাদিসই নয়, বরং আরো সীমিত পর্যায়ে মুতাওয়াতির-বিল-লাফয শ্রেণির হাদিসে সীমাবদ্ধ থাকতে হতো।

২. সহিহ সংকলনের হাদিসগুলো অবিসংবাদিত

(Sahih collections contain hadith that are indisputable)

সহিহ হাদিস বিভিন্ন হাদিস সংকলনেই আছে, একমাত্র কিছু সংকলন যেগুলো বিশেষ করে দুর্বল কিংবা জাল হাদিসের জন্য সেগুলো ছাড়া। ছয়টি হাদিস সংকলনকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য হিসেবে 'স্বীকৃত' (canonical) গণ্য করা হয়।[৩১০] সমষ্টিগতভাবে সেগুলো সিহাহ্ সিত্তা নামে পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে: সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, জামি আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসায়ী এবং সুনান ইবনে মাজাহ।[৩১১]

এই ছয়টি সংকলনের মধ্যে সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম-এর মর্যাদা সবগুলোর ওপরে গণ্য করা হয়। বস্তুত অনেকেই মনে করেন যে আল-বুখারিই হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং প্রামাণ্য, আর তাই ইসলামে কুরআনের পর সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ।

> একজন মহান হাদিস বিশারদ যিনি তার হাদিস-সংক্রান্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে আল্লাহ-সচেতনতা, সঠিকতার ব্যাপারে কঠোরতা ও পারদর্শী একজন সম্পাদক বা সংকলকের সজাগ দৃষ্টি যোগ করার ফসল এই 'সহিহ', যা দ্রুত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে যেটার মর্যাদা পরিগণিত হয় একমাত্র কুরআনের পর।[৩১২]

---

৩১০ Hasan, S., 1994. See the Foreword.

৩১১ Alauya, p. 51.

৩১২ Siddiqi, M. Z., pp. 57-58.

কিন্তু, অন্য সংকলনগুলোর কথা বাদই দেওয়া যাক, সেই উচ্চ-মর্যাদার আল-বুখারিতে অন্তর্ভুক্ত সব হাদিসই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। "অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই বুখারির কাজের সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনা প্রায় ৮০ জন বর্ণনাকারী এবং প্রায় ১১০টি হাদিস নিয়ে।"[৩১৩]

আল-বুখারির সর্বাগ্রগণ্যতা স্বীকার করেও, হাদিস স্কলার ও বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মদ যুবায়ের সিদ্দিকী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

> তবে 'সহিহ'কে ভুল-ত্রুটিমুক্ত গণ্য করা অথবা মুসলিম মনীষীরা তার সমালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এটা মনে করা ঠিক হবে না। সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত যে, অন্যান্য হাদিস সংকলকের মতো আল-বুখারিও তার হাদিস নির্বাচন (সিলেক্শন)-এর ব্যাপারে মনোযোগ দেন বর্ণনাকারীরা এবং তাদের বিশ্বস্ততার প্রতি এবং সামান্যই নজর দেন রেওয়ায়েতের ভাষ্যের সত্যতা বা যথার্থতার সম্ভাব্যতার প্রতি। রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণে তার রায় কখনো কখনো ভ্রান্ত ছিল এবং মুসলিম হাদিস বিশেষজ্ঞরা এটা ধরিয়ে দিতে দ্বিধাও করেননি, ব্যর্থও হননি।[৩১৪]

তদুপরি, অধিকাংশ মুসলিম হয়তো এ ব্যাপারে অবহিত নয় যে, যদিও আল-বুখারি হাদিসের সবচেয়ে মর্যাদাপ্রাপ্ত সংকলন, কিন্তু সংকলক তার সংকলনে হাদিস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মূল্যায়ন করতে কী কী মানদণ্ড (criteria) ব্যবহার করেছেন তা তিনি স্পষ্ট করেননি। বস্তুত সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত ছয়টি সংকলকের সবাই তাদের মানদণ্ড প্রকাশ করে যাননি। পরবর্তীকালে হাদিস বিশারদরা সেই মানদণ্ডগুলো নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন 'উল্টো প্রকৌশল' (reverse engineering) পদ্ধতিতে, যার মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে কেমন করে তৈরি করা হয়েছে তা নিরূপণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্মিত কোনো কিছুর ভিত্তিতে - যেমন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ চেষ্টা করেছে পিরামিড কেমন করে নির্মাণ করা হয়েছে তা বের করতে)। আল-মাকদিসী (মৃঃ ১২০৩ খ্রিঃ) দ্বাদশ খ্রিষ্ট শতাব্দীর একজন নামকরা জ্ঞানী এবং

---

৩১৩ Azami, p. 92, referring to Suyuti, Tarikh, I, 134 and Ibn Hajar, Hadi al-Sari, II, 106.

৩১৪ Siddiqi, M. Z., p. 58.

ইবনে সালাহ্-এর সমকালীন। 'রিসালাত আল-হাফিজ মোহাম্মাদ ইব্ন্ তাহির আল-মাকদিসী ফি শুরুত কুতুব আল-আয়িম্মা আল-সিত্তা' - তার লেখা এই গ্রন্থটিতে মাকদিসী 'সিহাহ সিত্তা'তে প্রয়োগ করা মানদণ্ডগুলো নির্ণয় বা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-হাজীমী অপর আরেক জ্ঞানী (মৃঃ ১১৮৮ খ্রিঃ), যিনি 'শুরুত আল-আ'ম্মাহ আল-খামছা' নামক তার বইতে একই প্রয়াস চালিয়েছেন।[৩১৫]

> যেহেতু আল-বুখারি কোথাও উল্লেখ বা প্রকাশ করেননি যে, হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তিনি কি মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন, অথবা কেন তিনি এ গ্রন্থ সংকলন করেছেন, পরবর্তীকালে অনেক জ্ঞানী তার গ্রন্থ থেকেই সেই মানদণ্ডগুলো নির্ণয় বা আহ্রণ করার চেষ্টা করেছেন। আল-হাজীমী, তার 'শুরুত আল-আ'য়িম্মা'-তে, আল-ইরাকী তার 'আলফিয়্যা'-তে, আল-আইনি এবং আল-ক্বাস্তাল্লানী 'সহিহ'-এর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের পরিচিতিতে, এবং ইবন আল-সালাহসহ হাদিস শাস্ত্রের আরো অনেক গবেষক-মনীষী 'বুখারি' গ্রন্থ থেকেই হাদিস মনোনয়নে বুখারির নীতিমালা আহ্রণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৩১৬]

একটি হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ ও মূল্যায়নে যত নিষ্ঠ ও কঠিন সাধনাই করা হোক, তা আসল সমস্যার সমাধান দেয় নাঃ তা হচ্ছে যে হাদিস সহিহ হওয়া না হওয়াও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অঙ্গনই হচ্ছে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় মানুষের অঙ্গন। আব্দ আল-রাহমান আওজায়ী (র.) (মৃঃ ৭৭৪ খ্রিঃ), একটি বিলুপ্ত ফিক্হের প্রতিষ্ঠাতা এবং আবু ইউসুফ (র.) (মৃঃ ৭৯৮ খ্রিঃ), আবু হানিফার (র.) দু'জন মুখ্য শিষ্যের একজন, তাদের মধ্যে একটি বিনিময়ে আওজায়ীর জবাবে আবু ইউসুফ লেখেনঃ

> আল-আওজায়ী কী বলেছে তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ্‌র হাদিসের অনেক অর্থ হয় এবং তার বিভিন্ন দিক আছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, (যার মধ্যে কিছু কিছু আছে) যা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা যাকে তাওফিক দেন সেই বুঝতে পারে।[৩১৭]

---

৩১৫ Al-Hazimi, n.d., মাকদিসী বহুল পরিচিত আল-কায়সারানী নামে। আল-হাযিমি এবং আল-কায়সারানীর দু'টি কাজ পাওয়া এক সম্মিলিত খণ্ডে।

৩১৬ Siddiqi, M. Z., p. 56.

৩১৭ Guraya, p. 113, citing Abu Yusuf, al-Radd 'ala Siyar al-Awza'i (Hyderabad,

উল্লেখ্য যে, এই দুই পথিকৃৎ মনীষী হাদিসের সহিহ হওয়া, না হওয়া নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হননি, বরং একেকটি হাদিসের ব্যাপারে তারা নিজেরা কী বুঝতেন তা নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন। কয়েকটি হাদিস নিয়ে আল-কারাদাওয়ীর বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করে:

১. 'যে নারী স্বর্ণের হার পরে তাকে শেষ বিচারের দিন অনুরূপ আগুনের হার পরানো হবে। আর যে নারী স্বর্ণের কানের দুল পরবে তাকে সেদিন অনুরূপ আগুনের কানের দুল পরিয়ে দেওয়া হবে।' ...

২. 'যে তার প্রিয়াকে (শেষ বিচারের দিন) দেখতে চায় আগুনের আংটি পরানো অবস্থায়, সে যেন পরার জন্য তাকে সোনার আংটি দেয়। আর যে তার প্রিয়াকে সেদিন দেখতে চায় আগুনের হার পরানো অবস্থায়, যে যেন পরার জন্য তাকে সোনার হার দেয়। আর যে তার প্রিয়াকে দেখতে চায় আগুনের বালা পরানো অবস্থায়, যে যেন পরার জন্য তাকে সোনার বালা দেয়। তবে রুপা নিয়ে তোমরা যেমন খুশি করতে পারো।

৩. সাওবান বর্ণনা করেছে যে, রাসুলুল্লাহ (স.) তার কন্যা ফাতিমাকে সতর্ক করেন একটি সোনার হার পরার জন্য। সেজন্য ফাতিমা তা বিক্রয় করে সেই অর্থ দিয়ে একজন ক্রীতদাস ক্র্য় করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। যখন এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ্র গোচরে আসে, তিনি বলেন: 'আলহামদুলিল্লাহ, যিনি ফাতিমাকে আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।' [৩১৮]

কিন্তু ফিকহবিদগণ এসব হাদিসের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

> কেউ কেউ হাদিসগুলোর ইসনাদ পরীক্ষা করেছেন এবং সেগুলোকে যঈফ বা দুর্বল বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং (স্বর্ণের গয়না) নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য অপ্রতুল গণ্য করেছেন, যেখানে নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট দলিল প্রয়োজন এবং যেসব বিষয় সাধারণ ব্যবহারের বিষয় এবং যা মুসলিমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে, সে ব্যাপারে সযত্ন গবেষণা প্রয়োজন।

India, 1938 AD), pp. 61, 76.

৩১৮ Al-Qaradawi, 1981, pp. 84-85.

কেউ কেউ ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে ইসনাদ ঠিকই আছে, কিন্তু এ হাদিসগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে, কেননা অন্যান্য সূত্রে যে সমস্ত দলিল পাওয়া গেছে তা নারীদের স্বর্ণ পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছে। আল-বায়হাকী এবং অন্যরা এ বিষয়ে ইজমার বরাত দিয়েছেন, যা ফিকহে গৃহীত হয়েছে এবং একটি সাধারণভাবে স্বীকৃত রীতিতে পরিণত হয়েছে।

কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন যে, এই হাদিসগুলো তাদের ওপর প্রযোজ্য যারা তাদের স্বর্ণের ওপর জাকাত দেয়নি; তারা তাদের মতামত দিয়েছেন অন্য কিছু হাদিসের ওপর ভিত্তি করে যেগুলো নিজেরাই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি, নারীদের গয়নার ওপর যাকাতের ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবে কোনো মতৈক্য নেই।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছে যে, এ হাদিসগুলো যারা স্বর্ণে নিজেদের অলংকৃত করে নিজেদের বিত্তশালীতা জাহির করার মনোভাব পোষণ করে তাদের সতর্ক করার জন্য। আন-নাসায়ী কিছু হাদিস বর্ণনা করেছে নিম্নলিখিত শিরোনামের অধীনে: 'বাব আল-কারাহিয়্যাহ লি আন-নিসা ফি ইযহার হুলিই আল-যাহাব'। অন্য ফুকাহা বলেছেন যে, ঐ হাদিসগুলো শুধু তাদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য যারা প্রদর্শনেচ্ছা অথবা অহংকার দেখাতে স্বর্ণ পরিধানে বাড়াবাড়ি করে।

আমাদের সমসাময়িক সময়ে শেখ নাসির আল-দীন আল-আলবানী অন্য আরেক মত দিয়েছেন, যা নারীদের স্বর্ণের গয়না পরিধানের অনুমতির ব্যাপারে ইজমার বিপরীত, যে ইজমা গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে চারটি মাযহাবই গ্রহণ করে এসেছে। তিনি শুধু মনেই করেন না যে এ হাদিসগুলোর ইসনাদ সহিহ, বরং তিনি এটাও মনে করেন যে এগুলো রদ হয়নি। তাই তার রায় হচ্ছে যে এ হাদিসগুলো সোনার আংটি এবং কানের দুল নিষিদ্ধ করেছে।[৩১৯]

তাহলে, কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে: উপর্যুক্ত হাদিসগুলো আসলে সহিহ, না সহিহ নয়? যারা এগুলোকে সহিহ মনে করে তাদের দৃষ্টিকোণ

৩১৯ Al-Qaradawi, 1981, pp. 84-85.

থেকে, এ হাদিসগুলো কি বাতিল হয়েছে, নাকি হয়নি? অথবা, এগুলো কি আসলে নিছক নাক উঁচূ নারীদের প্রদর্শনেচ্ছার ব্যাপারে সতর্কবাণীস্বরূপ? নাকি এ হাদিসগুলো যেসব নারী তাদের সোনার গয়নার ওপর জাকাত দেয় না তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য? আসলে এগুলোর বিষয়ে কোনো মতৈক্য নেই। তবু সমসাময়িক সময়ের অন্যতম মুসলিম মনীষী, আল-কারাদাওয়ী তার মতকে এমনভাবে প্রকাশ করেন যেন গত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে।[৩২০] এটি প্রকৃষ্ট একটি দৃষ্টান্ত যে, ইসলামের নামে অনেক আইন-বিধানের যথার্থতা এবং প্রামাণ্যতার ভিত্তি কত নাজুক হতে পারে।

৩. হাদিসে কোনো অসঙ্গতি নেই

(There is no contradiction in any hadith)

হাদিসভান্ডারের পবিত্রতা (sanctity)-র পক্ষে ঐতিহ্যবাদীরা পেশ করেন জোর দাবি। তারা মনে করেন যে, হাদিস– বিশেষ করে সহিহ হাদিস-এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই, যার সাথে এ দাবিও যোগ করা হয় যে সহিহ হাদিস নিয়ে যেকোনো আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেহেতু আল-বুখারিকে হাদিসভাণ্ডারের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই বাকি সংকলনগুলোর চাইতে আল-বুখারি থেকে বেছে নেয়া কিছু হাদিস নিচে আলোচনা করা হলো।

(ক) মোহাম্মদ আকরম খান (একজন প্রখ্যাত বাঙালি আলেম; মৃঃ ১৯৬৯ খ্রি:)[৩২১] আল-বুখারি থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন:

> জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন: (যেখানে বাইয়াতে রিজওয়ান সংঘটিত হয় সেই) আকাবাতে আমার দুই মামার সাথে আমি উপস্থিত

৩২০ মহিলাদের জন্য স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোশাক ব্যবহার হারাম না করে মহিলাদের বিশেষ দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল-কারাদাওয়ী, ১৯৮৪, পৃঃ ১২২। [যোগ পূর্ণ সাইটেশন; আল-কারাদাওয়ী, ইউসুফ (১৯৮৪), ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (মাওলানা আবদুর রহীম অনূদিত), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

৩২১ Khan, M. A., 1975, pp. 42-51. For excerpts, translated by this author from Bangla, available online. See: http://www.mofarooq.net/oldsite/farooqm/studz_res/islam/hadith/akramkhan_hadith.html, Retrieved July 15, 2006.

ছিলাম। ইবন উয়াইনা বলেন: 'তাদের দু'জনের একজন ছিল আল-বারা বিন মা'রুর।'[৩২২]

আকাবাতে যে বাইয়াত সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে পাঠকদের কাছে পেশ করা হবে। বুখারিতে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস আছে। সে হাদিস অনুযায়ী সেই বাইয়াতের অনুষ্ঠানে তার মামা বারা ইবনে মা'রুর-এর সাথে জাবির উপস্থিত ছিলেন (বুখারি, ১৫-৪৬৪)। কিন্তু এটা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বারা জাবির-এর মামা নন। জাবির-এর মাতা আনিসা-র শুধু দু'জন ভাই ছিলেন: সা'লাবা এবং আমর। তারা দু'জনে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে উপস্থিত ছিলেন। [ফত্হুল বারী, পূর্বোক্ত] তাই এ হাদিসে কিছু একটা অবশ্যই ত্রুটি আছে এবং কোনো না কোনো ধরনের তা'বিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কৌশল) প্রয়োগ করতেই হবে।

অসঙ্গতির ব্যাপারে আলোকপাত করার পর আকরম খান কোনো না কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কৌশলের অবকাশ রেখেছেন, যদিও অতীতে তা'বিলের এরকম প্রয়াস এসব অসঙ্গতি নিরসন করেনি। এই হাদিসের অসঙ্গতি কি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব? হয়তো সম্ভব, কিন্তু আল-বুখারিতে এমন হাদিসও আছে যার অসঙ্গতি নিরসনে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই কাজে আসে না।

(খ) নিম্নোক্ত হাদিসটিও বিবেচনা করা যেতে পারে; দৃষ্টান্ত হিসেবে এটিও পেশ করেছেন মাওলানা আকরম খান।

আনাস, আয়েশা এবং ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন: 'আল্লাহ তায়ালা তাকে (নবি হিসেবে) প্রেরণ করেন ৪০ বছর বয়সে এবং (তারপর) তিনি মক্কায় অবস্থান করেন ১০ বছর এবং মদিনায় অবস্থান করেন ১০ বছর।'[৩২৩]

---

৩২২ Al-Bukhari, Vol. 5, Kitab al-manaqib al-ansar, #230, https://sunnah.com/bukhari:3890.

৩২৩ Al-Bukhari, Vol. 4, #747-748, Vol. 7, Kitab al-manaqib al-ansar, #787, https://sunnah.com/bukhari:3851; also Muslim, Vol. IV, Kitab al-fadail, #5794, https://sunnah.com/muslim:2347a.

এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত যে, ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর, নবিজি (স.) মক্কায় অবস্থান করেন ১০ বছর নয়, বরং ১৩ বছর। কিন্তু উপর্যুক্ত হাদিস অনুযায়ী, নবিজি (স.) নবি হিসেবে মক্কায় অবস্থান করেন ১০ বছর। মজার ব্যাপার, তথ্যগত এই অসঙ্গতি আল-বুখারির একটি হাদিস এবং অপর আরেকটি সংকলনের কোনো হাদিসের মধ্যে নয়; এই অসঙ্গতি আল-বুখারিরই দু'টি হাদিসের মধ্যে। আল-বুখারি (খণ্ড ৫, #১৯০ এবং #২৪২)-তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (স.) মক্কায় অবস্থান করেন ১৩ বছর।

> ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তারপর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন ১৩ বছর। তারপর তিনি আদিষ্ট হন হিজরত করতে। তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ১০ বছর অবস্থান করার পর ইন্তেকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, তথ্যগত এই অসঙ্গতির এখানেই শেষ নয়। সহিহ আল-বুখারির প্রায় সমমর্যাদার সংকলন, সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (স.) মক্কায় অবস্থান করেন ১৫ বছর।[৩২৪]

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যদি ধরে নেয়া যায় যে নবিজি (স.) নবুয়তপ্রাপ্ত হন চল্লিশ বছর বয়সে, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেন ১০, ১৩ না ১৫ বছর? এই হাদিসগুলোর আলোকে স্পষ্টতই ১০, ১৩ আর ১৫ বছরের মধ্যে অসঙ্গতি ব্যাখ্যার কসরত-কৌশলে দূর করা সম্ভব নয়, কারণ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবগুলো হাদিসই 'সহিহ'। যদি এধরনের তথ্যগত বিষয়ে সহিহ হাদিসের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অসঙ্গতি থাকে, তাহলে যেসব হাদিসে বিভিন্ন ধারণা, বিশ্বাস কিংবা পর্যবেক্ষণ নবিজির (স.) নিজস্ব ভাষ্যে হুবহু বর্ণিত হয়নি, বরং বর্ণনাকারীর বোঝা, উপলব্ধি এবং স্মৃতির ভিত্তিতে নিজস্ব ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর বিষয়টা কী দাঁড়ায়?

(গ) এ ধরনেরই বৈপরীত্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত মেলে কুরআনে নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াত কোন্‌টি সে ব্যাপারে।

> ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন: 'নবিজির (স.) ওপর (কুরআনে) নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াতটি ছিল রিবা প্রসঙ্গে'।[৩২৫]

৩২৪ Muslim, Vol. IV, Kitab al-Fadail, #5809, #5805, https://sunnah.com/muslim:2353e.
৩২৫ Al-Bukhari, Vol. 6, Kitab at-Tafsir, #67, https://sunnah.com/bukhari:4544.

> আল-বারা বর্ণনা করেছেন: সর্বশেষ নাজিল হওয়া সুরা ছিল বারা'আ, এবং সর্বশেষ নাজিল হওয়া আয়াত ছিল: 'তারা তোমাকে প্রশ্ন করে হুকুমের ব্যাপারে। বলো: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশনা দেন 'ক্বালালা'র ব্যাপারে, যারা কোনো উত্তরসূরী অথবা উত্তরাধিকারী ছাড়াই মারা যায়। (৪:১৭৬)[৩২৬]

অনুরূপ বর্ণনা এসেছে সহিহ মুসলিম থেকেও।

> 'আল-বারা' বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনে নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে: 'তারা তোমাকে হুকুমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; বলো: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্বালালা সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন।'[৩২৭]

৪:১৭৬ আয়াতটি হচ্ছে এরকম:

> লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদের আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন: কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তাঁর উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।' তোমরা পথভ্রষ্ট হবে– এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

উপর্যুক্ত কুরআনি আয়াত এবং ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত সেই হাদিসটিতে যেটাতে বলা হয়েছে যে সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াতটি হচ্ছে রিবা নিয়ে– এ দু'টির মধ্যে স্পষ্টতই কোনো সম্পর্ক নেই।[৩২৮]

---

৩২৬ Al-Bukhari, Vol. 6, Kitab at-Tafsir, #129, https://sunnah.com/bukhari:4605.

৩২৭ Muslim, Vol. III, Kitab al-Faraidh, #3939, https://sunnah.com/muslim:1618a.

৩২৮ Alauya (আল-বাকারা) ২:২৮১ (এবং সেই দিনকে ভয় করো যখন তোমাদের আল্লাহ্ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তখন প্রত্যেক আত্মাই প্রাপ্ত হবে যা সে অর্জন করেছে, এবং কেউই অবিচারের সম্মুখীন হবে না)। প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে এটাই সর্বশেষে নাজিল হওয়া কুরআনের আয়াত। তিনি যুক্তি দেন যে, এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। তবে ইজমা নিয়ে ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচনার আলোকে পাঠকরা দেখবেন যে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আলাউইয়া বলেন: "এটা ওলামাদের ইজমা; আল-সূয়ুতী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বরাত

(ঘ) রিবা-সংক্রান্ত হাদিসগুলোসহ অনেক হাদিসেরই দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলো অসংগতিপূর্ণ।

> উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: সোনা ও সোনার বিনিময় 'রিবা', যদি না তা হাতে হাতে এবং সমান ওজনের হয়; এবং গমের সাথে গমের বিনিময় 'রিবা', যদি না হাতে হাতে এবং সমান ওজনের হয়; এবং খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় 'রিবা', যদি না তা হাতে হাতে এবং সমান ওজনের হয়; যব (বার্লি)-র সাথে যবের বিনিময় 'রিবা', যদি না তা হয় হাতে হাতে (spot) এবং সমান ওজনের।[৩২৯]

উপর্যুক্ত হাদিস অনুযায়ী, সোনা আর রুপার বিনিময় 'রিবা', যদি না তা হয় নগদ বা হাতে হাতে এবং সমান ওজনের। এ হাদিসে কি কোনো অস্পষ্টতা আছে? কিন্তু আল-বুখারি থেকেই নিম্নোক্ত হাদিসটিতে ভিন্ন নির্দেশনা পাওয়া যায়, যেখানে হাতে হাতে হওয়ার কোন শর্ত যুক্ত হয়নি।

> আবদুর রাহমান বিন আবু বাকরা বর্ণনা করেছেন: তার পিতা বলেছেন: 'নবিজি (স.) সোনার সাথে সোনার বিনিময় এবং রুপার সাথে রুপার বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন, যদি না তা হয় সমান ওজনের, এবং তিনি সোনার সাথে রুপা অথবা রুপার সাথে সোনার বিনিময়ের অনুমতি দিয়েছেন আমাদের যেমন খুশি (সেভাবে করতে)।'[৩৩০]

দিয়ে বলেছেন যে (উপরোক্ত) আয়াতটি সর্বশেষে নাজিল হওয়া সুরা এবং তারপর নবিজি (স.) মাত্র নয় রাত্রি জীবিত ছিলেন; ১৩ই রবিউল আউয়াল, সোমবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।"

ওলামাদের অনেকে বিকল্প মত অনুযায়ী মনে করেন যে, সর্বশেষ নাজিল হওয়া আয়াত হচ্ছে: "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম" (আল-মায়িদা) ৫:৩। কিন্তু এই মতও সঠিক নয়; এই আয়াতটি বহুল পরিচিত তথ্য অনুযায়ী নাজিল হয়েছিল বিদায় হজের সময়। "নবিজি ঐ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় আরাফা-তে ছিলেন এক শুক্রবার নামাজ পড়ার পর। সুতরাং, তিনি এরপর ৮১ দিন বেঁচে ছিলেন এবং তারপর ইন্তিকাল করেন।" (পৃঃ ১৬-১৭)

সুতরাং, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বশেষে নাজিল হয়েছে? এর চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো উত্তর নেই।

৩২৯ Al-Bukhari, Vol. 3, Kitab al-Buyu, #344, https://sunnah.com/bukhari:2174.

৩৩০ Al-Bukhari, Vol. 3, Kitab al-Buyu, #388, https://sunnah.com/bukhari:2182.

উপর্যুক্ত হাদিস অনুযায়ী, সোনার সাথে রুপার বিনিময় 'রিবা' যদি না তা হয় সমান ওজনের। এ হাদিসে সোনার সাথে সোনার বিনিময় বা রুপার সাথে রুপার বিনিময়ে হাতে হাতে বা নগদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। এবার আল-বুখারি থেকেই আরেকটি হাদিস বিবেচনা করা যাক।

> ইয়াহিয়া ... আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি ১০০ দিনার বিনিময় করতে চাইলেন। তিনি বললেন, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে ডেকে পাঠালো এবং আমাদের মধ্যে বিনিময়ের ব্যাপারে একটি চুক্তি হলো। সে সোনা হাতে নিলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হাত ঘুরিয়ে তা আমার দিকে এনে বলল, 'এটা আমি করতে পারছি না যতক্ষণ তা আমার কোষাধ্যক্ষ আল-ঘাবা থেকে আমার জন্য অর্থ না নিয়ে আসে।' উমর ইবনে খাত্তাব শুনছিলেন এবং তিনি (আমাকে) বললেন: 'আল্লাহ তায়ালার শপথ! তুমি এখান থেকে চলে যেও না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে তুমি (তোমার প্রাপ্য) নিয়েছ!' তখন তিনি (আরো) বললেন: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'সোনার পরিবর্তে রুপার বিনিময় 'রিবা', যদি না তা হয় নগদ বা হাতে হাতে। গমের পরিবর্তে গমের বিনিময় 'রিবা', যদি তা না হয় হাতে হাতে। খেজুরের পরিবর্তে খেজুরের বিনিময় 'রিবা', যদি তা না হয় হাতে হাতে। যবের পরিবর্তে যবের বিনিময় 'রিবা', যদি তা নয় হয় হাতে হাতে।'[৩৩১]

এ হাদিস অনুযায়ী সোনা আর রুপার বিনিময় 'রিবা', যদি তা নয় নগদ বা হাতে হাতে। কিন্তু এখানে সমান ওজনের কোনো শর্তের উল্লেখ নেই। কিন্তু আল-বুখারির নিম্নোক্ত হাদিসটি আরো ভিন্নতর চিত্র প্রকাশ করে।

> আবু বাকরা বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'সোনার পরিবর্তে সোনা বিনিময় করবে না, যদি তা না হয় সমান ওজনের, রুপার সাথে রুপার বিনিময় করবে না, যদি তা না হয় সমান ওজনের; কিন্তু সোনার সাথে রুপা অথবা রুপার সাথে সোনার বিনিময় তোমরা করতে পার তোমাদের খুশিমত।[৩৩২]

৩৩১ Also, Malik, Muwatta, Kitab al-Buyu, #1321, https://sunnah.com/urn/513200.
৩৩২ Al-Bukhari, Vol. 3, Kitab al-Buyu, #383, https://sunnah.com/bukhari:2175.

এই হাদিস অনুযায়ী সোনা আর রুপা অথবা রূপা আর সোনার বিনিময় কোনো ধরনেরই কোনো নিয়ন্ত্রক শর্ত আরোপ করা হয়নি। কিন্তু, সহিহ মুসলিম-এর আরেকটি হাদিস অনুযায়ী তা আদৌ ঠিক নয়।

> উবাদা বি. আল-সামিত বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ - অনুরূপের বদলে অনুরূপ এবং সমানের বদলে সমান, মূল্য বিনিময় নগদ বা হাতে হাতে। যদি এদের প্রকার বা শ্রেণি ভিন্ন হয়, তাহলে যেমন খুশি বিনিময়/লেনদেন করতে পার যদি তা হয় নগদ বা হাতে হাতে।[৩৩৩]

এক্ষেত্রে হাদিসটি শর্ত আরোপ করছে যে, যদি লেনদেনের জিনিসটি ভিন্ন হয়, অর্থাৎ সোনার পরিবর্তে রুপা অথবা রুপার পরিবর্তে সোনা হয় - তাহলেও যেমন খুশি লেনদেন করা যাবে না, বরং তা হতে হবে নগদ বা হাতে হাতে। কোন্ বাঁধানিষেধ প্রযোজ্য হবে এবং কোন্‌টি সঠিক তা কি স্পষ্ট হলো? এখানেই ব্যাখ্যার কৌশল হিসেবে অনেকে নাসখ্-মানসুখের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রিবা-সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ব্যাপক পরস্পর-বিরোধিতা নাসখ্-মানসুখের কৌশলেও দূর হয় না।

নবিজি (স.) আসলে কী বলেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে নিরূপণ করার জন্যই শুধু নয়, বরং রিবা-সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে এই চক্ষু-উন্মীলনকারী তারতম্য যেকোনো সময় – আমাদের সময়েও – বাস্তব বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ম-কানুন আহ্রণ করার জন্যও প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাঙ্কিং 'রিবা-সুদ সমীকরণ' (Riba-Interest Equation, অর্থাৎ রিবা আর সুদ সম্পূর্ণভাবে সমার্থক এবং অভিন্ন) – এই পূর্বকল্পের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাঙ্কিং তার বিস্তারিত নিয়ম-কানুনের জন্য হাদিস ভাণ্ডারের ওপর নির্ভরশীল। উপর্যুক্ত হাদিসগুলো বিনিময় বা লেনদেন-সংক্রান্ত বা রিবা আল-ফজলের সাথে সংশ্লিষ্ট। কুরআন দ্ব্যর্থহীন এবং সুস্পষ্টভাবে রিবা নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ফিক্‌হের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে

---

৩৩৩ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3853, https://sunnah.com/muslim:1587c.

আইনসর্বস্ব প্রবণতা প্রাবল্য বিস্তার করার কারণে ফকীহরা ধীরে ধীরে কি আসলে হারাম তার আওতা বা পরিসর বাড়াতে বাড়াতে এমন পর্যায়ে নিয়েছেন যে, আধুনিক যুগে এমন ইসলামী ফাইন্যান্সের উদ্ভব হয়েছে যে ব্যাপারে অনেক মুসলিম বিশ্লেষক/গবেষকদেরই পর্যবেক্ষণ আছে যে প্রচলিত ইসলামী ফাইন্যান্স ইসলামী শুধু বাহ্যিক বা কাঠামোগত দিক থেকে, সারবস্তুর দিক থেকে নয়।[৩৩৪]

আইনসর্বস্বতার প্রাধান্যে ইসলামী ফাইন্যান্স পরিণত হয়েছে একটি 'হারাম-তাড়িত' (prohibition-driven) শিল্পখাতে যা 'ইসলামী', 'হালাল', 'শরিয়া-সম্মত', বা 'শরিয়া-অনুমোদিত' ইত্যাদি লেবেলের অধীনে গতানুগতিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টের অনুকরণ করে চলেছে বলে অনেক পর্যবেক্ষকের অভিযোগ। বস্তুত পুরো উদ্যোগটিই ইসলামের বৃহত্তর অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ (যেমন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অধিকতর ন্যায়সঙ্গত আয়-বণ্টন ইত্যাদি) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ইসলামী ফাইন্যান্স উৎকৃষ্টতর, কেননা তা মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়েরই ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ভিত্তিতে, এই দাবির সমান্তরালে এই শিল্পটি মূলত ব্যবহার করে মূরাবাহা (নির্দিষ্ট খরচের ওপর মুনাফা যোগ করা, যা ঝুঁকিমুক্ত বললেই চলে) এবং অন্য কাঠামোগুলো যেগুলোতে পূর্ব নির্ধারিত মুনাফার সুযোগ থাকে, আর অন্যদিকে মুনাফা-ক্ষতি ভাগাভাগিভিত্তিক (profit-loss sharing) বিভিন্ন লেনদেন সামগ্রিকভাবে এড়িয়ে চলছে।

সমসাময়িক একজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ, ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতা হিসেবে যার চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং যিনি রিবা-সুদ সমীকরণের একজন প্রবল প্রবক্তা, মুফতি মুহাম্মাদ ত্বকী উসমানি যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তা সবিশেষ লক্ষণীয়:

> এই [ইসলামী] দর্শন বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকার (অর্থাৎ, অংশীদারিতা) ব্যবহারের পরিসর সম্প্রসারিত করে। এটা সত্যি যে, অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকা ব্যবহারের বাস্তব সমস্যা আছে, বিশেষ করে যেখানে

৩৩৪ El Gamal, 2000a; El Gamal, 2006; Siddique and Iqbal, 2016; Farooq, 2008.

> ইসলামী ব্যাংকগুলো বিচ্ছিন্নভাবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বর্তমান পরিবেশে চলে আসছে। তবু এটাও বাস্তবতা যে, এতদিনে ক্রমাগতভাবে হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকার দিকে কিছুটা এগিয়ে যাবার কথা এবং মুশারাকাভিত্তিক অর্থায়নের খাত অর্থপূর্ণভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার কথা। দুঃখজনক যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই মৌলিক শর্ত উপেক্ষা করেছে এবং ধীরে ধীরে, এমনকি সীমিত পর্যায়ে মনোনীত কিছু ক্ষেত্রেও তার কোনো লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখাতে পারছে না। ... ইসলামী ব্যাংকিং-এর বুনিয়াদি দর্শনই উপেক্ষিত হয়ে চলেছে।[৩৩৫]

(ঙ) হাদিসের ভান্ডারে বিভিন্ন ধরনের তারতম্য ও বৈসাদৃশ্যের আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে সহিহ মুসলিম থেকে। এটা কিতাব আল-বুয়ু (বেচা-কেনা) থেকে, বিশেষ করে "উট বিক্রয় এবং বাহক হিসেবে ব্যবহারের শর্ত" অধ্যায়ের অধীনে। যেহেতু এ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য বেশ কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করতে হবে, তাই সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও জটিলতা যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য এ হাদিসগুলো মনোযোগ সহকারে এবং বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

এ হাদিসগুলো অধ্যয়নের এবং পর্যালোচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয় বা প্রশ্নগুলো সামনে রাখাটা উপকারী হবে, কারণ এটি বেশ শিক্ষণীয়।

- উটের মূল্য কি নির্ধারণ করা এবং মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- সূচনাতে মূল্য নির্ধারণ কে করেছিল?
- জাবির (রা.) কি বিক্রয়ে অনাগ্রহী ছিল?
- প্রত্যাবর্তনের পথে উটকে বাহন হিসেবে ব্যবহারের শর্ত কি জাবির যোগ করেছিলেন না নবিজি (স.) সে প্রস্তাব করেন?
- নবিজি (স.) কত দাম দিয়েছিলেন?
- নবিজি (স.) কি উটটি মূল্যসহ না মূল্য ছাড়া ফিরিয়ে দেন?

---

৩৩৫ Usmani, 2000, p. 113.

বিভিন্ন তারতম্য ও বৈসাদৃশ্যের সারাংশ এই হাদিসগুলোর পর পেশ করা হবে।

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার একটি শীর্ণকায় বা মৃতপ্রায় উটের ওপর সফর করছিলেন এবং তিনি উটটিকে ফেলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। নবিজির (স.) সাথে দেখা হয় তার এবং নবিজি (স.) উটটির জন্য দোয়া করে ধাক্কা দিলে উটটি দুলকি তালে আবার চলতে শুরু করে, এমনি তালে যেমনটি সে আগে কখনো করেনি। নবিজি (স.) বললেন: 'আমাকে এক উক্বিয়ায় এটা বেচে দাও'। আমি বললাম: 'না'। তিনি আবার বললেন: 'আমাকে এটা বেচে দাও'। অবশেষে আমি তাকে এক উক্বিয়ায় বেচে দিলাম, কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলাম যে, আমার বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত আমাকে উটে চড়তে দিতে হবে। তারপর আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে উটটি ওনার কাছে নিয়ে গেলাম এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। আমি তখন ফিরে গেলাম এবং (কিছুক্ষণ পর) দেখতে পেলাম যে, সে একজনকে আমার পেছনে ডাকতে পাঠিয়েছেন। যখন (আমি তার সামনে এলাম) তিনি বললেন: 'তুমি খেয়াল করেছ তো যে এই উটটি কেনার সময় আমি এর মূল্য হ্রাস করতে বলেছিলাম? এই নাও তোমার উট এবং তোমার মুদ্রাগুলো; এগুলো তোমার।'[৩৩৬]

জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহর (স.) সাথে আমি একটি অভিযানে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে অতিক্রম করে গেলেন, যখন আমি পানি বহনকারী একটি উটের ওপর ছিলাম এবং উটটি কাহিল হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার উটের কি হয়েছে?' তিনি তখন পেছনে ফিরে সওয়ার হলেন এবং দোয়া করলেন। ফলে উটটি (এতটা তেজী হয়ে উঠল যে) তখন সব উটের আগে আগে চলছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'কেমন মনে হচ্ছে এবার?' আমি বললাম: 'এ তো আপনার দোয়ার মাহাত্ম্যে একেবারে ভালো হয়ে গেছে।' তিনি বললেন: 'তুমি আমার কাছে এটা বেচে দেবে?' আমি লজ্জা পেলাম না বলতে, কারণ পানি বহন

৩৩৬ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3886, https://sunnah.com/muslim:715m.

করার জন্য আমাদের আর কোনো উট ছিল না। তবু পরে রাজি হয়ে বললাম: 'হ্যাঁ' এবং এই শর্তে বেচলাম যে, মদিনা পৌঁছা পর্যন্ত আমি এটাতে চড়তে পারব। আমি ওনাকে বললাম: 'রাসুলুল্লাহ (স.), আমি নব্য বিবাহিত' আর তাই ওনার অনুমতি চাইলাম কাফেলার চেয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতে। তিনি অনুমতি দিলেন; আমি কাফেলার অনেক আগেই মদিনায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমার মামার সাথে দেখা হলো এবং তিনি আমাকে উটটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, আমি জানালাম উটের ব্যাপারে কি করেছি। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করলেন। ... যখন রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনায় এলেন, সকাল বেলা আমি উটটি নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে মূল্য পরিশোধ করে দিলেন এবং উটটিও ফিরিয়ে দিলেন।[৩৩৭]

জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমরা মক্কা থেকে মদিনায় রাসুলুল্লাহ্‌র সাথে যাবার পথে আমার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং বাকি হাদিসটি অভিন্ন। (কিন্তু এটাতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে) তিনি (নবিজি) (স.) আমাকে বললেন: 'উটটি আমার কাছে বেচে দাও।' আমি বললাম: 'না, তবে উটটি আপনারই'। তিনি বললেন: 'না (তা হতে পারে না), তুমি এটা আমার কাছে বেচে দাও।' আমি বললাম: 'না, রাসুলুল্লাহ (স.) উটটি আপনার।' তিনি (আবার) বললেন: 'না, তা হতে পারে না, কিন্তু আমার কাছে এটা বেচে দাও।' তখন আমি বললাম: 'তাহলে আমাকে এক উক্বিয়া সোনা দিন, কারণ ঐ পরিমাণ আমার একটি দেনা আছে। তাহলে এটা আপনার হয়ে যাবে।' তিনি তখন বললেন: 'ঠিক আছে, আমি (ঐ মূল্যে - এক উক্বিয়া সোনার বদলে নিচ্ছি) এবং এটাতে চড়েই তুমি মদিনায় যাবে।' আমি মদিনায় পৌঁছলে রাসুলুল্লাহ (স.) বিলালকে বললেন: 'ওকে এক উক্বিয়া সোনা দাও এবং তার সাথে কিছুটা বেশিও দিয়ে দাও।' সে (জাবির) বলল: 'উনি আমাকে এক উক্বিয়া সোনাসহ আরো সিকি পরিমাণ বেশি দিলেন।' সে (জাবির) বলেন: 'রাসুলুল্লাহ (স.) আমাকে যা অতিরিক্ত দিয়েছিলেন তা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম

৩৩৭ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3888, https://sunnah.com/muslim:715o.

এবং তা আমার পকেটে ছিল হার্‌রাহ্-র দিনে সিরিয়ার লোকজন যতক্ষণ না আমার কাছে থেকে নিয়ে নেয়।'[৩৩৮]

জাবির (রা.) বর্ণনা করেন: আমার উটটি একেবারেই কাহিল হয়ে পড়েছিল, যখন রাসুলুল্লাহ (স.) আমার কাছে এলেন। তিনি উটটিকে নাড়া দিতে শুরু করলেন এবং উটটি লাফিয়ে উঠে পড়লো। তারপর লাগাম ধরে উটটিকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হলো, যাতে করে আমি রাসুলুলাহ্‌র (স.) কথা শুনতে পারি। কিন্তু (উঁটটি এতটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে) তা সম্ভব হলো না। রাসুলুল্লাহ (স.) আমার সাথে (আবার) দেখা করে বললেন: 'এটা আমার কাছে বেচে দাও' এবং আমি তাকে পাঁচ উক্বিয়ায় বেচে দিলাম। আমি বললাম: 'এ শর্তে যে মদিনা পর্যন্ত আমি এটাতে চড়ে ফিরতে পারব।' তিনি বললেন: 'ঠিক আছে, তুমি মদিনা পর্যন্ত এটা চড়ে যেতে পারো।' মদিনায় ফিরে এসে যখন আমি উটটি তার হাওয়ালায় দিলাম, তিনি (আমরা যে মূল্যে মতৈক্যে পৌঁছেছিলাম তার) অতিরিক্ত একটি উক্বিয়াও দিলেন এবং তারপর (সেই) উটটিকেও আমাকে দিয়ে দিলেন।[৩৩৯]

আব্‌দ মুতাওয়াক্কিল আল-নাজ্‌ল বর্ণনা করেছেন জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে যিনি বলেন: 'একটি সফরে (রাবী বলেন, জিহাদে) আমি রাসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং তার বর্ণিত হাদিসের বাকি অংশটুকু অভিন্ন। (তবে) এটুকু তিনি যোগ করেন: তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: 'জাবির, তুমি কি দামটা পেয়েছ?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ' যেটা শুনে তিনি বললেন: 'দামটাও তোমার, সেইসাথে উটটিও।'[৩৪০]

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন: রাসুলুল্লাহ (স.) দুই উক্বিয়া এবং এক বা দুই দিরহামে আমার কাছ থেকে একটি উট কেনেন। যখন তিনি (মদিনার কাছে একটি বসতি) সিরার-এ

---

৩৩৮ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqa, #3889, https://sunnah.com/muslim:715p.
৩৩৯ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3891, https://sunnah.com/muslim:715r.
৩৪০ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3892, https://sunnah.com/muslim:715s.

পৌঁছেন, তিনি একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দিলেন এবং তা জবাই করা হলো, সবাই তা খেল। যখন তিনি (রাসুলুল্লাহ) মদিনায় পৌঁছলেন তিনি আমাকে মসজিদে যেতে এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আমার জন্য উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন; সেই সাথে কিছু অতিরিক্তও দিলেন আমাকে।[৩৪১]

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) এই তারতম্যসহ বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে: তিনি (রাসুলুল্লাহ) আমার থেকে একটি উট কেনেন নির্ধারিত মূল্যে। এবং তিনি দুই উক্বিয়া এবং এক বা দুই দিরহামের কথা উল্লেখ করেননি, এবং তিনি একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন; তা করা হয় এবং তারপর তিনি তার গোশ্‌ত সবার মাঝে বিতরণ করেন।[৩৪২]

জাবির বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে বলেছেন: "আমি তোমার উট নিয়েছি চার দিনারের বিনিময়ে এবং তুমি সে উটে চড়েই মদিনা যেতে পারো।"[৩৪৩]

যেসব প্রশ্ন এই পর্যালোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর আলোকে এই হাদিসগুলো থেকে নিম্নলিখিত তথ্য (fact) সারাংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ক. মূল্য নির্ধারণ এবং একমত হওয়া:

হাদিস নং	মূল্য
#৩৮৮৬	এক উক্বিয়া
#৩৮৮৮	মূল্যের উল্লেখ নেই
#৩৮৯১	পাঁচ উক্বিয়া
#৩৮৯৩	দুই উক্বিয়া এবং এক বা দুই দিরহাম
#৩৮৯৪	দুই উক্বিয়া এবং এক বা দুই দিরহাম-এর কোনো উল্লেখ নেই
#৩৮৯৫	চার দিনার

৩৪১ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3893, https://sunnah.com/muslim:715t.
৩৪২ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3894, https://sunnah.com/muslim:715u.
৩৪৩ Muslim, Vol. III, Kitab al-musaqah, #3895, https://sunnah.com/muslim:715v.

খ. মূল্য প্রস্তাবনা:

হাদিস নং	**মূল্য প্রস্তাবক**
#৩৮৮৬	অস্পষ্ট
#৩৮৮৯	জাবির
#৩৮৯১	জাবির
#৩৮৯৩	অস্পষ্ট
#৩৮৯৫	নবিজি (স.)

গ. বিক্রেতার দ্বিধা:

হাদিস নং	**বিক্রেতা দ্বিধাগ্রস্ত?**
#৩৮৮৮	হ্যাঁ
#৩৮৮৯	হ্যাঁ
#৩৮৬৩	না
বুখারি, খণ্ড ৩, #৩১০	না

ঘ. বিক্রীত উটে চড়ে মদিনা ফেরার প্রস্তাবনা/শর্ত:

হাদিস নং	**উটে চড়ে ফেরা**
#৩৮৮৬	জাবির (রা.) শর্ত দেন
#৩৮৮৮	জাবির (রা.) শর্ত দেন
#৩৮৯১	জাবির (রা.) শর্ত দেন
#৩৮৮৯	কোনো শর্তের উল্লেখ নেই

ঙ. নবিজির (স.) আদায়কৃত মূল্য:

হাদিস নং	**অতিরিক্ত**
#৩৮৮৬	পূর্বনির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত
#৩৮৮৮	কোনো অতিরিক্তের উল্লেখ নেই
#৩৮৮৯	অতিরিক্ত এক কিরাত
#৩৮৯১	পূর্বনির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত
#৩৮৯২	কোনো অতিরিক্তের উল্লেখ নেই
#৩৮৯৩	অতিরিক্ত, কিন্তু কত তা উল্লেখ নেই

চ. মূল্যসহ উট ফিরিয়ে দেয়াঃ

হাদিস নং	উট ফিরিয়ে দেন, মূল্যসহ
#৩৮৮৬	হ্যাঁ
#৩৮৮৮	হ্যাঁ
#৩৮৮৯	উট ফিরিয়ে দেন; মূল্য ফিরিয়ে দেয়ার উল্লেখ নেই
#৩৮৯১	হ্যাঁ
#৩৮৯২	হ্যাঁ
#৩৮৯৩	উট বা মূল্য ফিরিয়ে দেয়া, কোনোটারই উল্লেখ নেই

এই উটের লেনদেনের ঘটনা থেকে দ্রষ্টব্য যে, (ক) মূল্য কি নবিজি (স.) প্রস্তাব করেছিলেন না জাবির (রা.) চেয়েছিলেন; (খ) নির্ধারিত মূল্য কি এক উক্বিয়া, পাঁচ উক্বিয়া, দুই উক্বিয়া ও এক/দুই দিরহাম, চার দিনার না কোনো মূল্য উল্লেখই নেই; (গ) বিক্রীত উটে চড়ে মদিনায় ফিরতে পারার শর্ত কি জাবির (রা.) যোগ করেছিলেন কি না; (ঘ) নবিজি (স.) কি মূল্যের কোনো অতিরিক্ত দিয়েছিলেন কি না এবং তা কত ছিল; এবং (ঙ) নবিজি (স.) কি মূল্যসহ না মূল্য ছাড়া উটটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এর কোনো একটি দিকের ব্যাপারেও পরস্পরবিরোধিতা ছাড়া তথ্য মেলে না, তাও মাত্র একটি লেনদেনের প্রসঙ্গেই। তাছাড়া, এই একটি লেনদেন সংক্রান্ত হাদিসগুলো মূলত একটি মাত্র হাদিস সংগ্রহ থেকে এখানে পেশ করা হয়েছে। সহিহ মুসলিমেই অন্যত্র আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, নবিজি (স.) যখন উটটি ফিরিয়ে দেন, তখন জাবির খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।[৩৪৪] অন্য সংগ্রহগুলোতে, যেমন সহিহ আল-বুখারির আরেকটি হাদিসে অতিরিক্ত মূল্য কিংবা উটটি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই।[৩৪৫] তাছাড়া সহিহ আল-বুখারির আরেকটি হাদিসে শুধু উটটি ফিরিয়ে দেবার কথা আছে, কিন্তু মূল্য ফিরিয়ে দেবার কথা নেই।[৩৪৬]

---

৩৪৪ Muslim, Vol. III, Kitab ar-rida’w, #3463, https://sunnah.com/muslim:715i.

৩৪৫ Al-Bukhari, Vol. 3, Kitab fil-istiqrad, #570, https://sunnah.com/bukhari:2385.

৩৪৬ Al-Bukhari, Vol. 3, Kitab al-Buyu, Kitab fil-isqitrad, #310, https://sunnah.com/bukhari:2097.

বিক্রীত উটে চড়ে মদিনায় ফিরতে পারার শর্ত জাবির (রা.) দিয়েছিলেন, এর বিপরীতে সহিহ আল-বুখারির আরেকটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে এ প্রস্তাবনাটি নবিজি (স.) নিজেই করেছিলেন: "আমার কাছে এটি বেচে দাও, এবং তুমি এটাতে চড়েই মদিনায় যেতে পারবে।"[৩৪৭] ঐ হাদিসটিতে এটাও উল্লেখ আছে যে, জাবিরকে মূল্যসহ উটটি ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর তার সাথে গণীমতের মালের একটি অংশও।

এই বিষয়টির উপসংহারে একই বিষয়ে আরেকটি হাদিস উদ্ধৃত করছি সুনান ইবনে মাজা থেকে যাতে এ পর্যন্ত উল্লিখিত সব তারতম্যের চেয়ে আরো বেশি এবং এ হাদিসটিও উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

> জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে: আমি নবিজির (স.) সাথে একটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: 'তুমি কি এক দিনারের বিনিময়ে এই উটটি আমার কাছে বেচবে? আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।' আমি বললাম, 'রাসুলুল্লাহ (স.)! এ উটটি হবে আপনার যখন আমি মদিনায় পৌঁছি।' তিনি বললেন: 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি কি দুই দিনারে বেচবে?' তিনি (জাবির) বলেন: 'নবিজি (স.) এক দিনার করে বাড়াতে থাকলেন এবং প্রত্যেক বারই বলতে থাকলেন 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন', যতক্ষণ না তার প্রস্তাব ২০ দিনারে পৌঁছল। যখন আমি মদিনায় পৌঁছলাম, আমি উটটির মাথা টেনে ধরলাম এবং রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) কাছে নিয়ে এলাম। তখন তিনি বললেন: 'হে বেলাল, গণীমতের মাল থেকে ওকে বিশ দিনার দিয়ে দাও' এবং তারপর আমাকে বললেন 'তোমার উটটি নাও এবং ওটার সাথে তোমার পরিবারের কাছে যাও।'[৩৪৮]

কোন্ শর্ত এই দৃষ্টান্তে যোগ বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে? আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে লেনদেনের ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা যায় কি না (বিশেষ করে উট বা প্রাণী নিয়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে)। কিন্তু এত তারতম্যপূর্ণ বর্ণনার ভিত্তিতে সে সংক্রান্ত

৩৪৭ Al-Bukhari, Vol. 3, #589, https://sunnah.com/bukhari:2405.
৩৪৮ Ibn Majah, Vol. 3, Kitab al-buyu, #2205, https://sunnah.com/ibnmajah:2205.

কোনো আহকাম বা বিধি কীভাবে আহরণ করা যেতে পারে, যদি তা আদৌ সম্ভব হয় এসব তারতম্যের প্রেক্ষাপটে? এসব জটিলতা সত্ত্বেও এই বর্ণনাগুলোর সারবস্তু চিহ্নিত করার মাধ্যমে মূল বিষয়ের নিরসন সম্ভব। আসলে এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে বেচা-কেনার লেনদেনে কোনো শর্ত আরোপ করা যায় কি না। সব দলিলের ভিত্তিতে সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই হবে 'হ্যাঁ'। কিন্তু তার জন্য কি এই উটের ঘটনা এবং বিশেষ করে তা নিয়ে ব্যাপক তারতম্যপূর্ণ হাদিসগুলো প্রয়োজন? এ ব্যাপারে একটি মৌলিক ইসলামী নীতি রয়েছেই যে, যা কিছুই কুরআন এবং সুন্নাহতে সুনির্দিষ্টভাবে হারাম নয় তাতে পারস্পরিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে লেনদেনের চুক্তিতে শর্তাদি হিসেবে আসতে পারে। তাই মদিনায় ফিরতে উটে চড়া শর্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছিল কি না, অতিরিক্ত মূল্য নবিজি (স.) দিয়েছিলেন কি না, উটটি উপঢৌকন হিসেবে অথবা অন্য কোনো ভিত্তিতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল কি না, সেসব বিষয়ই নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির আওতায় পড়ে।

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
>
> হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ... নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়ালু।[৩৪৯]
>
> আবু সাইদ খুদরী বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'পারস্পরিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন লেনদেন সঠিক' (ইন্নামা আল-বায়'উ 'আন তারাদি; আল-যাওয়ায়েদ-এর মতে এর ইসনাদ সহিহ এবং এর রাবীরা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য)। ইবনে হিব্বান তার সহিহ-তেও এটি বর্ণনা করেছেন।[৩৫০]

এই বিশেষ ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনায় এতটা তারতম্য ও বৈপরীত্য– যেখানে

---

৩৪৯ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:২৯।

৩৫০ Ibn Majah, Vol. 3, Kitab al-buyu, #2185, p. 306, https://sunnah.com/ibn-majah:2185.

এই লেনদেনের সঠিক তথ্য নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়– তা এ সমস্ত বৈপরীত্যপূর্ণ বর্ণনা আসমানি এবং প্রামাণ্য হওয়া এবং তার ভিত্তিতে আহরিত আহকাম মুসলিমদের ওপর অকাট্যভাবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য (binding) হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ রাখে। তার পরেও আমরা এসব হাদিস থেকে কীভাবে উপকৃত হতে পারি সে বিষয়ে এ অধ্যায়ের অন্য স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. হাদিসের ভান্ডার যে জ্ঞান অথবা তথ্য প্রদান করে তা নিশ্চিত ও অকাট্য (The Hadith literature provides knowledge or information that is certain or definitive)

কোনো বিষয় অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের যথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রযোজ্যতা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিরূপণ করতে হলে, কুরআনের সাধারণ মূলনীতিগুলো এবং পথ-নির্দেশনার বাইরে, স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের হাদিসের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেউ যদি একটি হাদিসের কথা উঠালো তাতেই অধিকাংশ মুসলিম সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং সে হাদিসটি আদৌ হাদিস কি না বা কোথায় আছে তা এটা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না বা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করে না। তাছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখক বা বক্তা সে তথ্যটুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরবরাহ করার তাগিদ অনুভব করে না। লেখক বা বক্তা যদি দয়ালু (generous) হন, তাহলে হয়তো হাদিস সংগ্রহটির নাম (যেমন– আল-বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, ইত্যাদি) উল্লেখ করেই খালাস। পাঠক যদি সে হাদিস বের করতে চান আর এ ব্যাপারে যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে আল-বুখারির পাঁচ বা নয় খণ্ড জুড়ে অনুসন্ধানের মজা উপভোগ করতে পারে। অনেক লেখক বা বক্তা হয়তো এ সম্ভাবনার কথাই চিন্তা করতে পারেন না যে কোনো কোনো পাঠকের হয়তো আরো শেখার, জানার বা গবেষণার আগ্রহ থাকতে পারে এবং এজন্য লেখকের যেমন পর্যাপ্ত রেফারেন্স দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তেমনি বক্তার কাছে উদ্ধৃত বা উল্লেখ করা হাদিসের রেফারেন্স থাকাও আবশ্যক। দুঃখজনক যে, অনেক মুসলিম এতটুকুতেই সন্তুষ্ট যেকোনো মত, রায় বা তথ্যের ব্যাপারে কেউ শুধু বলল যে তার সমর্থনে হাদিস আছে।

এই পরিসরের বাইরে যারা জ্ঞানার্জনের অঙ্গনে একটু-আধটু সক্রিয় তারা হয়ত

জানতে চান যে, উল্লেখ করা হাদিসটি সহিহ কি না। এ পর্যায়ে কিছু বড় সমস্যা দাঁড়ায়। প্রথমত, যেমনটি ইতোমধ্যেই আলোকপাত করা হয়েছে, একটি হাদিস সংগ্রহ, যেমন আল-বুখারি অথবা মুসলিম, যদিও সহিহ হিসেবে পরিচিত অথবা গণ্য হয়, তা নিশ্চয়তা দেয় না যে ঐ সংগ্রহের সব হাদিসই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, যদি প্রাসঙ্গিক হাদিসগুলো সহিহও হয়, শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে অনেক হাদিসের প্রকৃত মর্যাদা বা অবস্থান নিয়ে সংশ্লিষ্ট মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অর্থাৎ একটি হাদিস যেটি এক হাদিস বিশেষজ্ঞ সহিহ হিসেবে গণ্য করেন, আরেকজন বিশেষজ্ঞ তা নাও করতে পারেন; যেমন, ইতঃপূর্বে সহিহ হিসেবে পরিগণিত বেশ কিছু হাদিসকে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী অ-সহিহ হিসেবে নতুন করে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যদিও আল-আলবানীর মতো মনীষীদের কাজ বিতর্কিত রয়ে গেছে, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অনেক হাদিস নিয়ে বড় হাদিস-মনীষীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে বড় প্রাসঙ্গিক সমস্যা হচ্ছে এই যে, হাদিসভান্ডার, আর তার যা কিছু সহিহ হিসেবে গণ্য, তা কি নিশ্চিত জ্ঞান (certainty of knowledge) সরবরাহ করে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং কোনো বিশেষ হাদিস সহিহ অথবা সহিহ নয় সে আলোচনার বাইরে, ধরা যাক একটি হাদিসকে সহিহ বলে গণ্য করা হয়। সেই হাদিস কি তাহলে সব সংশয়ের ঊর্ধ্বে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আবশ্যিকভাবে (necessarily) এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। এর কারণ, এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, শুধুমাত্র মুতাওয়াতির হাদিসই সব সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

> "মুতাওয়াতিরঃ এত অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারীদের রেওয়ায়েত যারা কোনো মিথ্যের ওপর ঐকমত্যে পৌঁছবে তা অকল্পনীয়। এই শর্ত একটি বর্ণনা পরম্পরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রুটিমুক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে।
>
> মুসলিম মনীষীদের মতে, যে হাদিস তাওয়াতুর হিসেবে এসেছে এবং যার বর্ণনাকারীরা তাদের বর্ণনা করেছেন প্রত্যক্ষ, দ্ব্যর্থহীন, বাস্তবতার সাথে কল্পনা সংমিশ্রণ না করার ওপর ভিত্তি করে, সে হাদিস জোগায়

জ্ঞান, নিশ্চয়তার সাথে।”[৩৫১]

একটি মুতাওয়াতির হাদিস সেটাই যা মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্মের পরিসরে এত অসংখ্য বর্ণনাকারী রেওয়ায়েত করেছেন যে এরকম ক্ষেত্রে জালকরণের সম্ভাবনা থাকতে পারে না।[৩৫২]

কুরআন যে পর্যায়ে, মুতাওয়াতির হাদিসের অবস্থান সেই একই পর্যায়ে।[৩৫৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মেতে, মুতাওয়াতির হাদিসের প্রামাণ্যতা কুরআনের সমপর্যায়ের। তাওয়াতুর– সর্বজনীনভাবে নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরার সাক্ষ্য – ইয়াকীন বা নিশ্চয়তা দেয় এবং এ থেকে যে জ্ঞান হয় তা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানের সমকক্ষ।[৩৫৪]

উসূলপন্থী বা মুসলিম আইনতাত্ত্বিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এ মত পোষণ করেন যে, মুতাওয়াতির আবশ্যিক বা প্রত্যক্ষ (জরুরি) জ্ঞান দেয়, যার সমান্তরালে সংখ্যালঘিষ্ঠ মত হচ্ছে যে, এসব বর্ণনা যে জ্ঞান বা তথ্য দেয় তা জানা যেতে পারে মধ্যস্থ (mediate) অথবা অর্জিত (acquired) জ্ঞান (মুকতাসাব বা নাযারী)-র মাধ্যমে।[৩৫৫]

মুতাওয়াতির বা ‘অতি-প্রসিদ্ধ’ হাদিস দ্বারা সুনিশিত জ্ঞান বা ‘ইলম-কাত’য়ী’ এবং ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ বা ‘ইয়াকীন’ লাভ করা যায়। কুরআন কারীমের পাশাপাশি এই প্রকার হাদিসই মূলত ‘আকিদা’র ভিত্তি।[৩৫৬]

যেসব হাদিস মুতাওয়াতির শ্রেণির নয়, সেগুলো আহাদ (একক বা নিঃসঙ্গ; solitary) হাদিস হিসেবে পরিচিত। আহাদ হাদিস সহিহ বা যতই বিশুদ্ধ হোক, এই হাদিসগুলো সন্দেহাতীত নয় যা নিশ্চিত জ্ঞান জোগায়। তাছাড়া, মুতাওয়াতির হাদিস দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: মুতাওয়াতির বিল্ লাফজ

৩৫১ Azami, p. 43.
৩৫২ Siddiqi, M. Z., p. 110.
৩৫৩ Kamali, 2003, p. 80.
৩৫৪ Kamali, 2003, p. 94.
৩৫৫ Hallaq, 1999, p. 79, referring to al-Qarafi, Sharh, pp. 349-350.
৩৫৬ জাহাঙ্গীর, ২০০৭, পৃঃ ২৯।

(যে সব রেওয়ায়েতের ভাষ্য তারতম্যহীন) এবং মুতাওয়াতির বিল মা'না ("যে সব রেওয়ায়েতের ভাষ্য অর্থের দিক থেকে অভিন্ন, কিন্তু কথা বা কাঠামোর দিক থেকে হুবহু নয়")।[৩৫৭] স্পষ্টতই দ্বিতীয় শ্রেণির হাদিসগুলো মুতাওয়াতির বিল লাফজ, যা 'কুরআনের অবস্থানের সমপর্যায়ের', সে মর্যাদার অবস্থানে নয়।

তাই মুতাওয়াতির হাদিসগুলো প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই সহিহ, কিন্তু সব সহিহ হাদিস মুতাওয়াতির নয়। এ কারণেই কতগুলো হাদিস মুতাওয়াতির সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

> মুতাওয়াতির বিল লাফজ শ্রেণির হাদিস, যেগুলো রাবীরা হুবহু বর্ণনা করেছেন, তা মাত্র কয়েকটি। তবে, মুতাওয়াতির বিল মা'না অর্থাৎ ধারণা বা অর্থের দিক থেকে একই হাদিসের সংখ্যা অনেক।[৩৫৮]
>
> এই (অর্থাৎ, মুতাওয়াতির) শ্রেণির হাদিস যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা খুবই কমসংখ্যক।[৩৫৯]
>
> সবশেষে, আমরা মুতাওয়াতির– যা নিশ্চিত জ্ঞান জোগায়– সে বিষয়ে আলোচনা করব। স্মর্তব্য যে, ইবনে সালাহ নিজে স্বীকার করেছেন মুহাদ্দিসীনরা তাদের হাদিসের ভাণ্ডারের শ্রেণিবিন্যাসে এই শ্রেণি (সাধারণত) অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ইবনে সালাহ আরো অগ্রসর হয়েছেন। তিনি অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন যে, মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিস আসলে বিরল। 'কাউকে যদি মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিসের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য বলা হয়, সে সেই অনুসন্ধানের ভারে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' সে তার নিজের অনুসন্ধানে শুধুমাত্র একটি হাদিস বের করতে পেরেছেন, যা শতাধিক সাহাবির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে: 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে তার ঠিকানা খুঁজে পাবে জাহান্নামের আগুনে।' আরেকটি হাদিস তিনি খুঁজে বের করতে পেরেছেন, যা মুতাওয়াতির-এর কাছাকাছি পৌঁছে যা হচ্ছে: '(মানুষের) কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন হবে তার নিয়তের

৩৫৭ Kamali, 2003, p. 94.
৩৫৮ Azami, p. 43.
৩৫৯ Siddiqi, M. Z., p. 110.

> ভিত্তিতে।' তবে তিনি এটা স্বীকার করেন যে, যদিও এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মুতাওয়াতির পর্যায়ের অসংখ্য রাবীদের মাধ্যমে, তবে এই অসংখ্যতা (apodictic) পরিলক্ষিত হয় পরম্পরার মাঝামাঝি, একেবারে শুরু থেকে নয়। তাওয়াতুর বিরল হওয়ার ব্যাপারে ইবনে সালাহ-এর বক্তব্যের সাথে পরবর্তী যুগের আইনতাত্ত্বিক আনসারী (মৃ: ১৭০৭ খ্রি:) এবং ইবনে আবদ আল-শাকুর (মৃ: ১৮১০ খ্রি:) সাধারণভাবে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা মনে করেন যে এধরনের আরো হাদিসের অস্তিত্ব আছে। তবে সেই বহু পরিশ্রমের অনুসন্ধানে নিজেদের অবসাদগ্রস্থ করার পর তাঁরা চারটি হাদিস বের করতে পেরেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তাঁরা ইবন আল-জাওজী (মৃ: ১২০১ খ্রি:)-কে উদ্ধৃত করেন: 'আমি মুতাওয়াতির হাদিস খুঁজে বেড়িয়েছি এবং কয়েকটি বের করতে পেরেছি।' তিনি সর্বমোট ছয়টির কথা বলেছেন, যার একটি অবশ্যই (সম্ভবত দু'টিও হতে পারে), আনসারী এবং আবদ আল-শাকুর যেগুলোর কথা বলেছেন সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই শীর্ষস্থানীয় হাদিস বিশারদগণ এবং ফুকাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধানের পরও আটটি বা নয়টির বেশি মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিস খুঁজে বের করতে পারেননি।[৩৬০]

সুতরাং যথার্থ মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিস হয়তো দশটির বেশি নয়; বাকি সব হাদিস হয় আহাদ (অ-মুতাওয়াতির) অথবা অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিস। এ ধরনের হাদিসগুলো নিশ্চিত জ্ঞান দেয় না, নিছক সম্ভাব্য (probabilistic) জ্ঞান জোগায়। শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী, বিশেষ করে হাদিস মনীষীদের কাজের ভিত্তিতে হাল্লাক এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

> আহাদ শ্রেণির হাদিস থেকে যা পাওয়া যায় তা (জ্ঞানের দিক) থেকে শুধু সম্ভাব্যতা ঈঙ্গিত করে ... যখন কেউ আহাদ শ্রেণির হাদিস শ্রবণ করে, বলতে হবে যে সে সেই হাদিসে বর্ণিত তথ্য এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জন করেছে।[৩৬১]

---

৩৬০ Hallaq, 1999, p. 87.
৩৬১ Hallaq, 1999, pp. 78-79.

মুতাওয়াতির-আহাদ এই শ্রেণিবিন্যাসের তাৎপর্য ভালো করে বুঝতে হলে দু'টি প্রতিযোগী মতামতকে জানা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমটির প্রতিনিধিত্ব করেন প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবন আল-সালাহ শাহরাজুরী (মৃঃ ১২৪৫ খ্রিঃ), যাকে গণ্য করা হয় 'মুতা'আখ্‌খীরিন' বা পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে একজন অন্যতম বিশিষ্টজন হিসেবে।[৩৬২] হাদিসের ক্ষেত্রে ইবন আল-সালাহ-এর কাজ 'এই ক্ষেত্রে কাজের পূর্ণাঙ্গতা ও উৎকৃষ্টতার দিক থেকে এতটা উচ্চে গণ্য করা হয় যে, পরবর্তী সময়ের হাজার হাজার হাদিস মনীষী ও শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক শতাব্দী ধরে এবং এখন পর্যন্ত মানদণ্ডস্বরূপ হয়ে আছে।' তার অন্যতম কাজ 'উলুম আল-হাদিস (যা সাধারণভাবে মুকাদ্দিমা ইবন আল-সালাহ হিসেবে পরিচিত) পরবর্তী প্রজন্মের অনেক শীর্ষস্থানীয় মনীষীরা ব্যবহার করেছেন। যেসব উঁচু মর্যাদার মনীষী ইবন আল-সালাহ-এর কাজ থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আন-নাবাবী (মৃঃ ১২৭৭ খ্রিঃ), ইবনে কাসীর (মৃঃ ১৩৭৩ খ্রিঃ), ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃঃ ১৪৪৭ খ্রিঃ), আল-সূয়ুতী (মৃঃ ১৫০৫ খ্রিঃ), প্রমুখ।[৩৬৩]

সে অনুযায়ী, ইবন আল-সালাহ 'পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে মুহাদ্দিসীনদের শ্রেণিবিন্যাসে মুতাওয়াতির কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না; সেটা এজন্য যে রেওয়ায়েতের ভাণ্ডারে এ জাতীয় হাদিস না থাকারই মতো।'[৩৬৪]

যেহেতু মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিস একেবারেই বিরল, ইবন আল-সালাহ মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামের প্রয়োগ বা অনুশীলন (praxis)-এর জন্য জ্ঞানের নিশ্চয়তা না সম্ভব আর না প্রয়োজন। বরং, সম্ভাব্য অথবা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ইসলামী অনুশীলনের পূর্ণ পরিসরেই যথেষ্ট।

> মুতাওয়াতির মুহাদ্দিসীনদের হাদিসভাণ্ডারের অংশ না হলেও অসুবিধা নেই, তাদের আয়ত্তে ছিল আহাদ হাদিস, এমনকি দুর্বল বা যঈফ হাদিসের বিশাল সংগ্রহ। এটা ভালো করেই জানা যে উৎসগুলো পরিষ্কার করে দেয়, মুহাদ্দিসীনরা নির্মাণ করে শ্রেণিবিন্যাসের একটি

---

৩৬২ Hallaq, 1999, p. 84.

৩৬৩ Hasan, S. (n.d.). See the segment "An Introduction to the Science of Hadith," Retrieved June 29, 2006, from the Web site: https://www.islamic-awareness.org/hadith/ulum/asa1.

৩৬৪ Hallaq, 1999, p. 84.

> চিরায়ত (ক্ল্যাসিক্যাল) কাঠামো যাতে মূলত হাদিসকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: সহিহ (বিশুদ্ধ), হাসান (উত্তম) এবং যঈফ (দুর্বল)।[৩৬৫]

এভাবেই একটি ভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস, যা সহিহ শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে যা নিশ্চিত জ্ঞান জোগায় এমন হাদিস বিরল। তবে ইবনে আল-সালাহ্ এবং আরো মনীষী এটাকে কোনো সমস্যা মনে করেন না। বরং মজার ব্যাপার যে তারা এ যুক্তি খাড়া করানোর চেষ্টা করেন যে মুতাওয়াতির না হলেও, নিছক সহিহ শ্রেণির হাদিস থেকেই নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায়।

> আহাদ হাদিস ... এমন হাদিস যা এক বা একাধিক সূত্রে নবিজি (স.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। (এসব হাদিস) মুতাওয়াতির অথবা মাশহুর (সুপরিচিত)-র মানের শর্ত পূরণ করে না। এটা এমন ধরনের হাদিস যা নিজে থেকে নিশ্চিত (positive) জ্ঞান জোগায় না, যদি না অতিরিক্ত অথবা আনুষঙ্গিক তথ্যের সমর্থন থাকে। এটাই অধিকাংশের মত, কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যদের মতে আহাদ নিশ্চিত জ্ঞান জোগাতে পারে। কিছু ওলামা এই (সংখ্যালঘু) মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কিয়াসের ভিত্তিতে যে সাক্ষ্যের আহকাম অনুযায়ী শুধু একজন সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্য আইনানুগ প্রমাণের শর্ত পূরণ করে না। যারা প্রশ্নাতীতভাবে আহাদ-এর প্রামাণ্যতা গ্রহণ করে, যেমন যাহিরী মাযহাব, এই মত পোষণ করে যে নবিজি (স.) যখন কোনো বিষয়ে আহকাম দিতেন, তখন তিনি মদিনার সব নাগরিক সেখানে জড়ো করতেন না।[৩৬৬]

অধিকাংশ ঐতিহ্যবাদী ওলামা আহাদ হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা গ্রহণ করেন, কিছু শর্ত সহকারে: 'চারটি সুন্নি মাযহাবের অধিকাংশ ওলামার মতামত অনুযায়ী, আহাদ-এর ভিত্তিতে আমল করা অপরিহার্য, যদিও তা নিশ্চিত জ্ঞান জোগাতে না পারে। তাই, বাস্তবে আহ্কাম সংক্রান্ত বিষয়ে সম্ভাব্য বা যা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় (যন্ বা speculation) আমল করার আবশ্যিকতার ভিত্তি হিসেবে যথেষ্ট। শুধু আকিদা সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমানমূলক (conjecture) জ্ঞান 'সত্যের বিপরীতে কোনো কাজে আসে না'। এটা সত্ত্বেও আহাদ কোনো

---

৩৬৫ Hallaq, 1999, p. 84.

৩৬৬ Kamali, 2003, p. 97

আবশ্যিক কর্তব্যের ভিত্তি হয়, যদি পূরণ হয় ...' ছয়টি শর্ত।[৩৬৭]

অন্যান্য ব্যাপারে যেরকম, এই শর্তের ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে কোনো মতৈক্য নেই।[৩৬৮] তবে, আহাদ থেকে নিশ্চিত জ্ঞান না পাওয়া গেলেও, আহাদ-এর ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে আমল করতে হবে– এ অবস্থানের ব্যাপারে অন্য মনীষীরা দ্বিমত পোষণ করেন যে আহাদ-এর ভিত্তিতে আমল করা শ্রেয় (আবশ্যিক নয়), কারণ তা নিছক সম্ভাব্য বা অনুমানমূলক জ্ঞান জোগায়।

> ফকীহদের অধিকাংশই স্বীকার করেন যে আহাদ আহকাম নির্ধারণ করতে পারে, যদি তা একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয় এবং হাদিসটি যুক্তিবিরোধী না হয়। অনেক আলেমই মত পোষণ করেছেন যে আহাদ নিছক সম্ভাব্য বা অনুমানমূলক জ্ঞান জোগায়, যার ভিত্তিতে আমল করা ভালো (কিন্তু আবশ্যক নয়)। যদি সে হাদিসের সমর্থনে আরো দলিল পাওয়া যায় অথবা তার বিপরীত কোনো প্রমাণ না থাকে, তাহলে আহাদ হলেও তার ওপর আমল করা আবশ্যক। কিন্তু, অধিকাংশ আলেমের মতেই আকিদা-সংক্রান্ত বিষয়ে আহাদ-এর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না।[৩৬৯]

এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, আকিদার ব্যাপারে আহাদের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না– এটা নিছক একটি ধার্মিক বুলি (pious statement) মাত্র। যে কোনো মুসলিম আকিদা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে, যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব-এর কিতাব আল-তাওহীদ, অথবা মুহাম্মাদ সাঈদ আল-ক্বাহ্তানীর আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, পড়লেই প্রমাণ মেলে যে এ সমস্ত দীর্ঘ গ্রন্থগুলো লেখা আদৌ সম্ভব হয়েছে কি না আহাদ হাদিস ব্যবহার না করে।

বাস্তবে প্রায় সমগ্র হাদিস ভান্ডারই তো আহাদ হাদিস নিয়েই, যা নিশ্চিত জ্ঞান জোগায় না। তবু অনেক আলেমই দাবি করেছেন যে, আহাদ হাদিস সন্দেহাতীত। এটা অনেকটা 'একই সাথে কেক রাখা এবং খাওয়া– দুটোই'

---

৩৬৭ Kamali, 2003, p. 98.

৩৬৮ Kamali, 2003, pp. 101-106.

৩৬৯ Kamali, 2003, p. 97.

তার মতো। যে অন্যতম কারণে মুসলিমরা সমগ্র কুরআনকে সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে মনে করে তা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি আয়াতসহ সমগ্র কুরআনটি মুতাওয়াতির। অনুরূপভাবে, 'অধিকাংশ আলেমের মতে মুতাওয়াতির হাদিসের প্রামাণ্যতার মর্যাদা কুরআনের সমকক্ষ।'[৩৭০] কুরআনের আসমানি বিশুদ্ধতা এ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরা নিশ্চিত জ্ঞান জোগায় এবং তাই যেহেতু কুরআনের প্রতিটি আয়াতই মুতাওয়াতির, কুরআন একটি গ্রন্থ হিসেবে তার সমগ্রতায়ই নিশ্চিত জ্ঞান জোগায়। যদি আহাদ রেওয়ায়েতগুলোও একই পর্যায়ের নিশ্চিত জ্ঞান জোগায়, তাহলে যা দাঁড়ায় যে নিশ্চিত জ্ঞান যেমন মুতাওয়াতির বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় আহাদ বর্ণনা থেকে। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি যারা দেন তাঁরা হয়তো খেয়াল করেননি যে তা পরোক্ষভাবে হলেও মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরার প্রতি যে বিশেষ মর্যাদা আরোপ করা হয় তা মৌলিকভাবে খর্ব হয়ে যায়।

আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে কোনো আহকাম বা বিধিবিধান আহরণ কিংবা নিরূপণ করার ব্যাপারটা ভিন্ন। কিন্তু মুসলিমরা যদি কুরআনের আসমানি বিশুদ্ধতার বিষয়টি খর্ব বা লঘু না করতে চায়, তাহলে তাদের আহাদ হাদিস নিশ্চিত জ্ঞান জোগায় এ ধারণা বা দাবি স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

বস্তুত অনেক শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী, যেমন ইমাম নাবাবী এ প্রসঙ্গে ইবনে আল-সালাহ্‌র মতের বিরোধিতা করেছেন এবং তার দাবি– 'আহাদ হাদিস নিশ্চিত জ্ঞান জোগায়'– প্রবলভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

> নাবাবী ... এবং ইবনে আল-সালাহ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানের পক্ষ সমর্থন করতে মাঠে নেমেছেন। নাবাবী দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'সহিহ মানে এতটুকুই যে তা সহিহ; তার মানে এই নয় যে তা নিশ্চিত।' তিনি প্রবলভাবে যুক্তি দেন যে অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা (আল-মুহাক্কিকুন ওয়াল-আখতারতুন) এই মত পোষণ করেন যে, যদি কোনো সহিহ হাদিস মুতাওয়াতির শ্রেণির না হয়, তাহলে তা 'সম্ভাব্য' হবে এবং তা কখনোই নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না।[৩৭১]

---

৩৭০ Kamali, 2003, p. 94.

৩৭১ Hallaq, 1999, p. 85.

সহিহ শ্রেণির হাদিস নিশ্চিত জ্ঞান দেয়– ইবনে আল-সালাহ্‌র এই অবস্থানের দুর্বলতা ও সারশূন্যতা এ পর্যায়ে উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ইমাম নাবায়ীর অবস্থান সঠিক এবং এটা স্পষ্ট যে, শুধু মুতাওয়াতির শ্রেণির হাদিসই সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তাই, ইসলামী আকিদা অথবা আহকাম যে মূলত অ-মুতাওয়াতির বা আহাদ শ্রেণির সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সেজন্যই কিছু মৌলিক বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়ে আমাদের উত্তর, মত বা সমাধান অনড়, অপরিবর্তনীয় অথবা প্রশ্নাতীত নাও হতে পারে।

ফিকহ এবং উসূলে ফিকহের সাথে হাদিসের যোগসূত্রের বিষয়টির মূল সমস্যা হচ্ছে যে, ইসলামী আইন এবং বিধিবদ্ধকরণ মূলত অ-মুতাওয়াতির বা আহাদ হাদিস ভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করে, যা সর্বোত্তম পর্যায়েও নিছক 'সম্ভাব্য' জ্ঞান জোগায়।

> হাদিসকে মুতাওয়াতির এবং আহাদ-এ আইনশাস্ত্রবিদদের শ্রেণিবিন্যাসের ফল এটাই যে হাদিসের ভান্ডারটি মোটামুটি পরের শ্রেণিতে অর্থাৎ আহাদ-এ ভরা, আর প্রথমটিতে অর্থাৎ মুতাওয়াতির শ্রেণির অধীনে থেকে যায় মাত্র অনূর্ধ্ব এক ডজন হাদিস, যা অবিসংবাদিত প্রকৃতির। আহাদ হাদিসগুলো, যার মধ্যে হাসান শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত, গৃহীত ও স্বীকৃত হয় সর্বজনীনভাবে যে ভান্ডার নিয়ে হাদিস বিশারদরা কাজ করেন এবং যার ভিত্তিতে ফুকাহা আহ্‌কাম বা বিধি-বিধান আহরণ অথবা প্রণয়ন করেন।[৩৭২]

ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, হাদিসের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী মুতাওয়াতির বিল মা'না সেগুলোই যেগুলোর ভাষ্য নবিজি (স.) থেকে হলেও তা বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারীর নিজের কথায়। পরিষ্কার করার জন্য, এটা পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এগুলো 'ভাবার্থবোধক রেওয়ায়েত'। অনুরূপভাবে, আহাদ হাদিসের ক্ষেত্রেই নবিজি থেকে হুবহু বর্ণনার শর্ত হাদিস মনীষীরা আরোপ করেন না। বরং যদিও অধিকাংশ বিশারদই স্বীকার করেন যে, আহাদ হাদিস থেকে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না, কিন্তু তারপরও তারা মনে করেন যে আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে আহ্‌রণ করা আহ্‌কাম বা বিধিবিধান সবার ওপর আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য।

---

৩৭২ Hallaq, 1999, p. 88.

> বর্ণনাকারী শুরুতে কি শুনেছিল তা তাদের হুবহু বর্ণনা করতে হবে এ শর্ত আহাদ হাদিসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমই আরোপ করেন না, যদিও হুবহু বর্ণিত রেওয়ায়েতের প্রামাণ্যতা সবচেয়ে উপরে। বরং তারা আহাদ হাদিসের ক্ষেত্রে ভাবার্থমূলক রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন, এই শর্তে যে বর্ণনাকারী ভাষা এবং হাদিসের মূল বাণী পুরোপুরি বোঝে।
> ...
>
> হানাফীসহ অন্যান্য মাযহাবের কিছু ওলামা এ মত পোষণ করেছেন যে, ভাবার্থবোধক রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এটি সংখ্যালঘু মত এবং অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে যে, সাহাবি অনেক সময় একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন কথায় বা শব্দে প্রকাশ বা বর্ণনা করেছেন এবং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ... কিন্তু তার পরেও, তারা মেনে নিয়েছেন যে, হাদিস বর্ণনায় সঠিকতা (accuracy) এবং সূচনায় যেমন ছিল সেভাবেই তা সংরক্ষণ করা খুবই ভালো।[৩৭৩]

অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এই মত পোষণ করেন যে, আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য আইন বা বিধিবিধান প্রণয়ন করা যায়। কিন্তু আকিদা সংক্রান্ত ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। তবু বাস্তবতা এই যে, আকিদার অঙ্গন আহাদ হাদিসের দীর্ঘ হাত থেকে মুক্ত নয়। আগেই বলা হয়েছে, আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে আইনই প্রণয়ন করা যাবে না, বরং কিছু শর্তসাপেক্ষে সে আইন অবশ্য প্রযোজ্য, অনেক বিশারদের এ দাবি একেবারেই দুর্বল যা আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মহত্তম মনীষীরাও ব্যাপক স্ববিরোধিতার স্বাক্ষর রেখেছেন চিন্তা ও কর্মের অনেক দিকে। তার পথিকৃত গ্রন্থ রিসালা-তে ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন:

> যাদের [আহকাম সংক্রান্ত] জ্ঞান আছে তাদের পক্ষে কখনোই উচিত নয় তাদের মতামত প্রকাশ করা, যদি না তা হয় নিশ্চয়তার ভিত্তিতে। অনেকে আছে যারা [আহকাম-সংক্রান্ত] জ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছে, যেখানে তারা তা থেকে বিরত থাকলেই ভালো ও নিরাপদ হতো, এটা আমার বিশ্বাস।[৩৭৪]

৩৭৩ Kamali, 2003, pp. 105-106.
৩৭৪ Al-Shafi'i, p. 80, #28.

এটাই যদি সত্যি হয় যে, নিশ্চয়তা ছাড়া কোনো জ্ঞানী বা বিশারদ তার মত প্রকাশ করবে না, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে ইসলামী আইনের ভাণ্ডারের বেশির ভাগই প্রণীত হয়েছে সেই সব আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে যা শুধু সম্ভাব্য জ্ঞান জোগায়?

তাই এটা যতই অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হোক, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে অধিকাংশ জ্ঞানী ও ফকীহ্‌রা স্পষ্টতই এই মত পোষণ করেন যে, হাদিস আহাদ হলেও তার মানে এই নয় যে, তা পথনির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বস্তুত অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে, সেই সব বিধিবিধানের প্রযোজ্যতা আবশ্যিক হিসেবে গণ্য করেন।

অন্যদিকে, সমগ্র উম্মাহ উপকৃত হবে যদি একথা কার্যকরভাবে স্বীকার করা হয় যে, প্রায় সব হাদিসই আহাদ এবং সেগুলো নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে নিছক সম্ভাব্য জ্ঞান জোগায়। সেই সাথে এই অনুসিদ্ধান্তেও পৌঁছা প্রয়োজন যে সম্ভাব্যতাভিত্তিক কোনো সূত্রের ভিত্তিতে যে কোনো আইন, বিধিবিধান অথবা আকিদা সংক্রান্ত বিষয় প্রণয়ন বা আহরণের ক্ষেত্রে আমাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তার চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই সব আইন বা বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেগুলো মানুষের জীবন, সম্মান এবং সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ করে প্রভাব ফেলবে।

খ. ইসলামী আইন আহরণে এবং সত্যায়নে হাদিসের ব্যবহার এবং অপব্যবহার (Use and abuse of hadith in the formulation and validation of Islamic laws)

নবিজি (স.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকেই ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজগুলো আইনসর্বস্ব প্রবণতার শিকার হয়ে পড়ে, যেখানে জীবনে প্রত্যেকটি বিষয়কে সাদা আর কালো, ঠিক এবং ভুল, অনুমোদিত এবং নিষিদ্ধের ছকে অনড়ভাবে সাজানোর প্রয়াস চালানো হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভবের কিছু তর্কসাপেক্ষ ইতিবাচক অবদান থাকলেও, এই উদ্ভবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম হচ্ছে আইনসর্বস্বতার অভ্যুদয়ের সমান্তরালে মুসলিম সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিভিন্ন মাযহাব এবং ফির্কায় ভেদাভেদ-বিভক্তি আসে; এর একটি অনিবার্য প্রভাব দেখা যায় মুসলিমদের এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর

বিরুদ্ধে তাকফির (কুফরী ফতোয়া দিয়ে কাউকে ইসলাম থেকে বহিষ্কারে), অথবা অন্তত একে অপরকে বাতিল বা বাতিলপন্থী অথবা যথেষ্ট সহিহ নয় ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করার দুঃখজনক আচরণে।[৩৭৫]

এই প্রবণতার দ্বিতীয় এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম পরিলক্ষিত হয় ইসলামের নামে বিবিধ আইন রচনায় যাতে বিশেষ ভাবে নারীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্যবিধ অবিচারমূলক প্রবণতা যা ইসলামের ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পরিপন্থি। এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, বিস্তারিত পর্যায়ে গোড়া ঐতিহ্যবাদী অবস্থানগুলো সাধারণভাবে একচেটিয়াভাবে পুরুষদের রচনা, যেখানে এসব আহ্কাম, বিধি-বিধান রচনায় এবং আদর্শ-আচরণ (norm) নিরূপণের আলোচনা-পর্যালোচনায় নারীরা প্রায় অনুপস্থিত ছিল নবিজি (স.)-এর কয়েক দশক পর সাহাবায়ে কেরাম প্রজন্মের পর থেকেই। এ প্রসঙ্গেই গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী অবস্থানগুলোর কয়েকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং পর্যবেক্ষণ পেশ করা হলো। তবে সুবিচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অধিকাংশ বিষয়েই কোনো একই বা অভিন্ন ধারার মত নেই এবং আধুনিক সময়ের চাপ ও অন্যান্য আরো কারণে মুসলিম সমাজগুলোতেও অবস্থানের দিক থেকে পরিবর্তন বা সংস্কারমুখী নিজস্ব ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে তার তেমন ছোঁয়া পড়েনি এবং সেই নিজস্ব পরিসরের অবিসংবাদিত অবস্থানগুলো একইভাবে গোঁড়া ও ঐতিহ্যবাদী রয়ে গেছে। তার মানে এই নয় যে, মুসলিম মনীষীরা অথবা ফকীহদের কোনো অভিসন্ধির সমস্যা ছিল; বরং এক্ষেত্রে যে দিকটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ছিল তা হচ্ছে হাদিসের অতিমাত্রিক, অসঙ্গত এবং অন্যবিধ, বিশেষ করে আইনসর্বস্ব প্রয়োগ। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বশীল দৃষ্টান্তগুলো বিবেচনার জন্য পেশ করা হলো।

১. মসজিদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারীদের নিরুৎসাহিত করা

অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে,[৩৭৬] মসজিদের জামাতের নামাজে নারীদের খুব একটা অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই

৩৭৫ Farooq, 2005.

৩৭৬ ইসলামের বহুত্ববাদী আদর্শ এবং ঐতিহ্যের আলোকে, যেমনটির প্রাথমিক দৃষ্টান্ত মেলে নবিজির (স.) নেতৃত্বে মদিনার সনদে, একটি দেশকে 'মুসলিম দেশ' হিসেবে আখ্যায়িত না করে, 'মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ' হিসেবে আখ্যায়িত করাটা শ্রেয়তর।

তাদের বিরত রাখা হয়। কোনো কোনো দেশে, যেমন তাজিকিস্তানে, মসজিদে অংশগ্রহণ তাদের জন্য বারণ।[৩৭৭] এমনকি উত্তর আমেরিকাতেও, অনেক মসজিদের পক্ষ থেকে নমনীয়তা (flexibility) দেখানো হলেও, আরো অনেক মসজিদ আছে যেখানে নারীরা মসজিদের অঙ্গনে পা না রাখলেই ভালো মনে করা হয়; যদি কোনো কারণে তাদের উপস্থিতি 'সহ্য' করতেই হয়, তাদের মসজিদে অংশগ্রহণ এবং কাটানো সময়টুকু যাতে খুব আরামপ্রদ বা স্বচ্ছন্দ না হয়, সে ব্যাপারে অনেক কিছুই কাজ করে। ফলে নারীদের অনেকেই যারা ইসলামপ্রেমী এবং নিবেদিতপ্রাণ তারা বিক্ষুব্ধ এবং অনেকে রীতিমতো বিদ্রোহ করছে। বিষয়টির জটিলতা আরো বাড়ে যখন কেউ নিজেকে 'কেন নারীদের জন্য ঘরে নামাজ পড়া শ্রেয়?' এ প্রশ্নের জবাব বা সমাধান দেওয়ার প্রয়াস চালায় ঐতিহ্যবাদী চিন্তা-চেতনার আলোকে।[৩৭৮]

অনেক হাদিস আছে যেগুলো থেকে নবিজির (স.) অকাট্য নির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত করে মসজিদে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের বিরত না রাখতে। নারীদের নিয়মিত এবং অবাধ অংশগ্রহণের ব্যাপারে নবিজির (স.) নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর পরিবর্তে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করতে, এমনকি বিরত রাখতে, যে সমস্ত হাদিস সচরাচর উদ্ধৃত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিতগুলো:

> আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'নারীদের জন্য বাড়িতে নামাজ পড়া তার বাড়ীর আঙিনায় পড়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে পড়া বাড়িতে পড়ার চেয়ে উত্তম।'[৩৭৯]
>
> হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন: রাসুলুল্লাহ (স.) যদি জানতেন যে নারীরা কি করছে, তাহলে বনি ইসরাঈল যেমন নিষিদ্ধ করেছিল, তেমনি নারীদের মসজিদের যাওয়া থেকে বারণ করতেন। ইয়াহিয়া

৩৭৭ Sharifi, 2004.

৩৭৮ Islamqa, Retrieved April 22, 2021, from Web site: https://islamqa.info/en/answers/8868/it-is-better-for-a-woman-to-pray-in-her-house-than-in-the-mosque. (updated).

৩৭৯ Abu Dawud, Vol.1, Kitab as-salat, #570, https://sunnah.com/abudawud:570.

বিন সাঈদ (একজন অধঃস্তন বর্ণনাকারী) 'আমরা (অপর আরেকজন অধঃস্তন বর্ণনাকারী)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'বনি ইসরাইলের নারীদের জন্য কি এ রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল?' তিনি জবাবে বললেন: 'হ্যাঁ'।[৩৮০]

লক্ষণীয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ-এর (রা.) বর্ণনা কোনো মুতাওয়াতির হাদিস নয়। মুতাওয়াতির না হলেও, শুধু সহিহ হাদিস হিসেবে এ থেকে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে নবিজি (স.) আসলে কি বলেছেন তার নিশ্চিত সত্যতা নিরূপণ করা যায়। এই রেওয়ায়েতের বিপরীতে বহু হাদিস রয়েছে যেগুলো থেকে স্পষ্ট করে জানা যায় যে, নারীরা নিয়মিত এবং বিরাট সংখ্যায় মসজিদে অংশগ্রহণ করত। তাই যদি হয়, তাহলে হয় এসব অংশগ্রহণকারী নারীরা নবিজির (স.) জীবদ্দশাতেই তাদের প্রতি নবিজির (স.) শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সম্মান দেখাননি অথবা তারা এই বিশেষ হাদিসটিকে ভিন্ন অর্থে বুঝেছেন।

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণনাটির প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে যদিও এই বর্ণনাটি আল-বুখারিতেও এসেছে, এটা নবিজি (স.) থেকে সরাসরি কোনো বর্ণনা নয়। এটা একজন সাহাবির মতামত, যদিও তিনি রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) সম্মানিত একজন সাহাবিই নন, বরং তার অন্যতম স্ত্রী। ইসলামের টেকনিক্যাল পরিভাষায়, এ ধরনের বর্ণনাকে বলা হয় 'আছার'। কিন্তু যদিও এই বর্ণনা রাসুলুল্লাহ্‌র একজন উচ্চ মর্যাদার সাহাবি এবং অন্যতম স্ত্রী থেকে এসেছে, তবু এটা একক একজন বর্ণনাকারীর মতামত যা নবিজির (স.) নিজস্ব কথা বা মত নয়। তাছাড়া আরো শিক্ষণীয় যে, হযরত আয়েশার (রা.) এই মতের পক্ষে সমর্থন হিসেবে সমসাময়িক আর কোনো উৎস থেকে ন্যূনতম প্রামাণ্য বা অবিসংবাদিত তথ্য, ভাষ্য বা বর্ণনার অস্তিত্ব নেই, যা থেকে জানা যায় যে, নারীরা (উম্মুল মু'মিনিন আয়িশার সমসাময়িক মহিলা সাহাবিরা) মসজিদে এমনকি সব ন্যক্কারজনক, অপছন্দনীয় অথবা গর্হিত কাজ করতেন যে এব্যাপারে নবিজি (স.) জানলে তাদের তিনি মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। 'আছার' ধরনের বর্ণনা মুসলিমদের ওপর আবশ্যিকভাবে বাধ্যতামূলক নয়, এটাই অধিকাংশ জ্ঞানী

---

৩৮০ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-adhan, #828, https://sunnah.com/bukhari:869.

ও ব্যাখ্যাতার অভিমত।[৩৮১] যেমনটি, একজন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আল-শারীফ আল-জুর্‌জানী (মৃ: ১৪১৩ খ্রি:) তার 'মুখ্‌তাসার'-এ বলেছেন:

> যা কিছুই একজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়, তা কথা কিংবা কাজের বর্ণনার আকারে, তা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় হোক আর না হোক, তা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।[৩৮২]

কিন্তু দুঃখজনক যে, যদিও এসব বর্ণনা আসলে হাদিস নয়, আর তাই বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে না, তবু মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবন-ধারায় তার গভীর প্রভাব পড়েছে এবং তার ফলে জনজীবনে নারীদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধের জন্ম দিয়েছে। এই 'আছার'গুলো এখনো ব্যবহার হয়ে চলেছে এবং নিয়মিতই এগুলোর রেফারেন্স টানা হয় ঐতিহ্যবাদীদের পক্ষ থেকে নারীদের মসজিদ ও জনজীবনের অঙ্গন থেকে পৃথক করা অথবা দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। ইসলাম এবং নারীর অবস্থান নিয়ে সাম্প্রতিক অনেক গবেষণার মধ্যে যেগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তাঁর মধ্যে রয়েছে দু'টি কাজ।[৩৮৩]

---

৩৮১ অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় ইমাম মালিকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেকোনো বিষয়ে একটি অবস্থানে পৌঁছুতে অনেক ক্ষেত্রেই হাদিসের পরিবর্তে, বিশেষ করে আহাদ হাদিস হলে, আছার-এর ওপর নিয়মিত জোর দিয়েছেন। "যখন হাদিস তার মতের অনুকূলে হয়নি, তিনি সেসব হাদিসকে উপেক্ষা করেছেন।"[Guraya, p. 117] "মুয়াত্তায় যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে মালিক নবিজি (স.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আইনি যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে, সেগুলো গ্রহণ করেছেন তখনি যখন সেগুলো তার মতের অনুকূলে পেয়েছেন। অন্যথায় তিনি অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া যুক্তি-প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্য সেসব উৎস হতে পারে সাহাবি, মদিনাবাসীদের চর্চা বা রীতি, তার নিজের গবেষণালব্ধ অবস্থান যার সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে কিছু অস্পষ্ট উৎস এবং তাবেয়ী থেকে বর্ণনা।" [Ibid., p. 123] মালিক-এর (রঃ) ধারা থেকে বোঝা যায় যে, হাদিস ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গণ্য হলেও, ফুকাহা অনেক সময়ই তাদের পছন্দমাফিক হাদিস ব্যবহার করেছেন।

৩৮২ Rahman, S., p. 72, citing the Mukhtasar of Sayyid al-Sharif al-Jurjani.

৩৮৩ আবু শুক্কাহ (২০১১), রসুলের যুগে স। নারী স্বাধীনতা, অনুবাদ, ১-৪ খণ্ড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামীক থ্যট, ঢাকা, বাংলাদেশ; আওদা (২০২১), রিক্লেইমিং দ্য মস্ক (অনুবাদ: জোবায়ের আল মাহমুদ), সমাজ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

২. নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

কোনো মুতাওয়াতির হাদিস নয়, বরং আবু বাকরা (খলিফা হযরত আবু বকর নয়) নামে এক সাহাবি (রা.) থেকে বর্ণিত একটি আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে গোঁড়া রক্ষণশীল অবস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যাতে নারীদের কোনো শাসন সংক্রান্ত নেতৃস্থানীয় পদ বা দায়িত্ব অইৈসলামী ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু ফুকাহা এই বিধি-নিষেধ শুধু খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদের মধ্যে সীমিত করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহ্যবাদীদের মত হচ্ছে যে, নারীদের জন্য কোনো শাসন সংক্রান্ত (নির্বাহী বা এক্সিকিউটিভ) পদ বা দায়িত্ব দেয়া নিষিদ্ধ, যদি না তা শুধুমাত্র নারীদের অঙ্গনে বা নারী-সর্বস্ব কাঠামো (সংগঠন, প্রতিষ্ঠানে) সীমাবদ্ধ হয়।

> আবু বাকরা (রা.) বর্ণনা করেছেন: জঙ্গে জামাল-এর সময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি কথার মাধ্যমে উপকৃত করেন (যা আমি রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) কাছে থেকে শুনেছি)। যখন তাঁর কাছে এই খবর পৌঁছল যে পারস্যের জনগণ খসরুর মেয়েকে তাদের রানির আসনে (শাসক হিসেবে) অধিষ্ঠিত করেছে, তখন তিনি বললেন: 'যারাই একজন নারীকে তাদের শাসক বানাবে জাতি হিসেবে তারা কখনোই উন্নত বা সফল হবে না।'[৩৮৪]

নারীর নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদী অবস্থানের ওপর এই হাদিসের গভীর প্রভাব ছিল এবং এখনো আছে।

> শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকহি অবস্থানে এই হাদিসের অর্থ করা হয়েছে যে, কোনো নারী একটি রাষ্ট্রপ্রধান (খলিফা) হতে পারে না, এমনকি একই ভিত্তিতে সে কোনো কাজীর আসনেরও উপযোগী নয়, কেননা কাজীর কাজ খলিফার কাজের আওতাভুক্ত। এই ফিকহি অবস্থানের কারণে সমাজে নারীদের মর্যাদা এবং অবস্থানের অবনতি হয়েছে এতদূর পর্যন্ত যে, মুসলিম নারীরা পুরুষদের অনুরূপ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চতর পাবলিক পদ, সাক্ষী, কাজী এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন। উল্লেখ্য, এই অবস্থানের আরেকটু

384 Al-Bukhari, Vol. 9, Kitab al-Fitan, #219, https://sunnah.com/bukhari:7099.

> কিছুটা শিথিল অবস্থান অনুযায়ী এই হাদিসের ভিত্তিতে নারীদের কাজী হতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু তারা নেতৃত্ব কিংবা খলিফার আসন অলংকৃত করতে পারবে না।[৩৮৫]

ঐতিহাসিক দিক থেকে শুধু এই হাদিসের অভ্যন্তরীণ সাযুজ্য নিয়েই সমস্যা নেই, বরং ব্যক্তি, আবু বাকরা (রা.), যিনি অগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সাজা পেয়েছিলেন, সে বিষয়টিও এই হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।[৩৮৬] আল-বুখারি যদিও তার সংগ্রহে এ হাদিসটিকে স্থান দিয়েছেন, হাদিস সহিহ কি না তা নিরূপণের তার যে মাপকাঠিগুলো রয়েছে, সেই আল-বুখারির মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ তা হয় না। আল-বাকরাকে (রা.) ঘিরে মার্নিসী-র গবেষণা ও ঐতিহাসিক তথ্য অবিসংবাদিত নয়।[৩৮৭] কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, নারী নেতৃত্বের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নের ব্যাপারে ইসলামী বিধিবিধান নির্ধারণে একটি সন্দেহজনক এবং বিতর্কিত 'আহাদ' হাদিস ব্যবহার করা, যা থেকে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না, তার ভিত্তিতে নারীর নেতৃত্বের ব্যাপারে এমন ব্যাপক এবং কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কোনো সঙ্গত এবং সুবিচারপূর্ণ কারণ নেই।

এই সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ হাদিসটির বিপরীতে, কুরআ্নে সাবা-র রানি বিলকিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নারীর নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক দিকের সামান্যতম আভাস-ইঙ্গিতও নেই। বস্তুত কুরআনে রানি বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিলকিসের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা পুরোপুরিই ইতিবাচক। তবু কুরআনের এই শিক্ষণীয় বর্ণনাকে উপেক্ষা করে আবু বাকরা (রা.) বর্ণিত, সন্দেহ-সংশয়ে ভরা একটি আহাদ হাদিসের ওপর এই বিরাট নিষেধাজ্ঞার সৌধ রচনা করা হয়েছে।[৩৮৮] আসগার আলী ইঞ্জিনিয়ার এ প্রসঙ্গে যথোপযুক্তভাবে মন্তব্য করেছেন: "নারী হাদিসের মাধ্যমে হারালো, যা তারা অর্জন করেছিল কুরআনের মাধ্যমে।"[৩৮৯]

---

৩৮৫ Sisters in Islam, online SIS Working Paper, see the bibliography.

৩৮৬ Mernissi, pp. 49-61, citing Ibn al-Athir, Usd al-ghaba, vol. 5, p. 38. যদি আবু বাকরা (রা.) সাজা পেয়েছিলেন, অন্য কিছু সূত্র ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী সে সাজাতে তার স্কলনের যথোপযুক্ত প্রমাণ ছিল না।

৩৮৭ Haddad, 2005.

৩৮৮ আল-কুরআন (আন-নামল) ২৭:২০-৪৪।

৩৮৯ Engineer, 2008.

৩. অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে দিতে অভিভাবকত্বের অধিকার

যদিও ঐতিহ্যবাদী ইসলামী আইন অপ্রাপ্তবয়স্ক (এমনকি শিশু)-দের বিয়ে দেবার অনুমতি দিয়েছে, এ জাতীয় প্রথা আসলে প্রাক-মোহাম্মদ (স.) যুগ থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। তবু এই সত্য অনস্বীকার্য যে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে বিয়ে দেওয়া একেকটি ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মানবীয় মর্যাদার ব্যাপারে একটি মৌলিক বৈপরীত্যের পরিচায়ক, কেননা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তার নিজস্ব এখতিয়ার প্রয়োগ করার অধিকার ও সুযোগের এটা পরিপন্থি। এটা মৌলিক মানব মর্যাদার পরিপন্থি। এই মূল্যবোধটিই গত অধ্যায়ে মূল্যবোধের তালিকায় সর্বপ্রথম আলোচনা করা হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে এটি প্রচলিত থাকে, সেই সমাজে আরো অনেক কিছু প্রচলিত (উর্‌ফ) ছিল সে হিসেবে। কিন্তু এটা বাধ্যবাধকতার কোনো বিষয় নয়, অর্থাৎ মুসলিম সমাজ যদি মানুষের এই মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে এরকম আর না করতে দেয়, তা আসলে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধেরই অনুকূল হবে।

ঐতিহ্যবাদী অবস্থান অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা বালিকার বিয়ে দিতে অভিভাবকত্বের অধিকার, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হবে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারের ধারায়ঃ

১. পিতা
২. দাদা এবং তদূর্ধ্ব
৩. ভাই
৪. সৎ-ভাই
৫. ভাতিজা
৬. সৎ-ভাতিজা
৭. চাচা
৮. সৎ-চাচা
৯. চাচাতো-ভাই
১০. সৎ-চাচাতো ভাই এবং অনুরূপ আত্মীয়েরা (পিতার পক্ষের উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে)

১১. মা

১২. পুত্রের কন্যা

১৩. কন্যার কন্যা

১৪. দাদার কন্যা

১৫. কন্যার নাতনী

১৬. বোন

১৭. সৎ-বোন

১৮. সৎ-ভাই

১৯. মীরাসী আইন অনুযায়ী মায়ের পক্ষের অন্যান্য আত্মীয়

২০. শাসক/কাজী

উপর্যুক্ত তালিকা মাযহাব থেকে মাযহাবে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, যদিও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণভাবে হানাফী মাযহাবই মূলত অনুসরণ করা হয় এবং এই তালিকাটি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী। এই তালিকাটি গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হানাফী মাযহাবের সুপরিচিত সংগ্রহ 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' থেকে।[৩৯০] অনুরূপ তালিকা মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর লেখা প্রখ্যাত ও খুবই জনপ্রিয় বই 'বেহেশতী জেওর'এও রয়েছে।[৩৯১]

লক্ষ করুন যে, অভিভাবকত্বের অগ্রাধিকারের তালিকায় মায়ের অবস্থান; বাবা অর্থাৎ পুরুষের পক্ষের দশ ধরনের আত্মীয় – অবিশ্বাস্য হলেও যার মধ্যে রয়েছে সৎ-আত্মীয়েরা – তাদের পর মায়ের অবস্থান একাদশতম স্থানে। এই প্রথাকে প্রচলিত করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বাদই দেওয়া যাক, কিন্তু তার নিজের সন্তানের বিয়ের অভিভাবকত্বের অগ্রাধিকারে মায়ের অবস্থান একাদশ পর্যায়ে হওয়ার ভিত্তি কি হতে পারে? না এই প্রথার পক্ষে আর না এই অগ্রাধিকারের তালিকার পক্ষে কুরআন আর সুন্নাহ থেকে কোনো অকাট্য অথবা অবিসংবাদিত প্রমাণ মেলে।

এবার অগ্রাধিকারের তালিকাটি অন্য আঙ্গিক থেকে দেখা যাক। ঐতিহ্যবাদী ইসলামী আইন অনুযায়ী, রক্তের পারিবারিক সম্পর্কের আলোকে পরিবারের বা

৩৯০ Musa and Haque, *Bidhibadhdha Islami Ain*, Vol. I, p. 149.
৩৯১ Thanwi, 2005, p. 408.

সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্বের তালিকাটি নিম্নরূপ:

১. স্বামী

২. পিতা

৩. মাতা

৪. যুক্তভাবে মাতামহ/পিতামহ এবং নাতি/নাতনী

৫. পুত্র

৬. অন্যান্য রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়[৩৯২]

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বিয়ে দেবার অভিভাবকত্বের অগ্রাধিকারের সাথে ভরণপোষণের দায়িত্বের অগ্রাধিকারের তালিকা তুলনা করলে একটি উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভরণপোষণের দায়িত্বের তালিকায় মায়ের অবস্থান শীর্ষের কাছাকাছি, অর্থাৎ স্বামী এবং পিতার পরপরই। অন্যদিকে, অভিভাবকত্বের তালিকায় তার অবস্থান একাদশতম স্থানে। এই ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অথবা দায়িত্ব ও অধিকারের যে পারস্পরিকতা (reciprocity) তার কী হলো?

এ বিষয়টি বুঝতে হলে হাদিসের প্রসঙ্গ টানতে হবে। অভিভাবকত্বের অগ্রাধিকারের তালিকায় পৈতৃক সম্পর্কের গুরুত্ব নির্দিষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ, 'হেদায়া'তে। কোনো সূত্র ছাড়াই সেখানে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে:

> রাসুলুল্লাহ (স.) ঘোষণা দিয়েছেন: 'বিয়ে-শাদির বিষয়টি পৈতৃক ব্যাপার...'[৩৯৩]

'হেদায়া'তে উদ্ধৃত এই হাদিসটির সূত্র কোনো হাদিস সংকলনে পাওয়া যায় না। এটার আরবি ভাষ্যটি নিম্নরূপ। তবে, এটি পাওয়া যায় আল-সারাখসী (মৃ: ১০৯৬ খ্রি:)-র 'মাবসূত' গ্রন্থে।[৩৯৪]

---

৩৯২ Musa and Haque, *Bidhibadhdha Islami Ain*, Vol. I, p. 166.

৩৯৩ Al-Marghinani, p. 107.

৩৯৪ As-Sarakhsi, Vol. 4, p. 219.

النكاح إلى العصبات
আন-নিকাহ ইলাল আসাবা

এটা যে কোনো মুতাওয়াতির বা মাশহুর হাদিস নয় সে কথা বাদই দেওয়া যাক, এটি কোনো হাদিস সংকলনেও স্থান পায়নি। মজার ব্যাপার যে, হাসকাফি-র 'দুররুল-মুখতার', 'হেদায়া'র মত অতীতের প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোকে লেখা অনেক পরবর্তী যুগের একটি হানাফি ফিকহী সংগ্রহ এবং এটাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনায় ঐ হাদিসটির কোনো উল্লেখ নেই।[৩৯৫] তদুপরি, এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'ইবনে আবিদীন (মৃঃ ১৮৩৬ খ্রিঃ)-এর লেখা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'রাদ্দ আল-মুহ্তার আলা দুররুল মুখতার', যাতে লেখকের সময় পর্যন্ত হানাফি ফিকহের সারাংশ পেশ করা হয়েছে, তাতেও এ হাদিসটি উল্লিখিত হয়নি।[৩৯৬]

নিয়াজী তার 'আল-হিদায়া'র ইংরেজি অনুবাদের এই বর্ণনাটির ওপর মন্তব্য করেছেন:

> আল-যায়লায়ী-র গ্রন্থে এই হাদিসটির উল্লেখ নেই। আল-যায়লায়ী, খণ্ড ৩, ১৯৫। এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আল-সারাখসী। কোনো ভালো (সাউন্ড) সংগ্রহে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। চার মাযহাবের ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে এ হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, এটা হযরত আলী থেকে 'মাওকূফ' এবং 'মারফু" হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল-আইনি, খণ্ড ৫, ৯৩।[৩৯৭]

হাদিসের অতিমাত্রিক ব্যবহারের এটি আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেটাতে ফিকহ-বিশারদরা তাদের অবস্থানের সমর্থনে হাদিসের সন্ধানে মরিয়া হয়ে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন তা পরিষ্কার হয়। তাই, কোনো গ্রহণযোগ্য হাদিস

---

৩৯৫ Ibid., p. 43. এই অংশের গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতা করেছেন, ড. মুহাম্মদ আল-ফারুক, সহযোগী অধ্যাপক, মধ্যপ্রাচ্যীয় স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়, আরবানা-শ্যাম্পেইন।

৩৯৬ এই পর্যবেক্ষণ ড. আল-ফারুক শেয়ার করেছেন ব্যক্তিগত ইমেইল যোগাযোগে। তার পর্যবেক্ষণ নিছক এই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে; তার এই পর্যবেক্ষণ মানে এই নয় যে এ বইয়ের সব কিছুতে তার মতৈক্য রয়েছে।

৩৯৭ Al-Marghinani, 2006, p. 496, #12.

সংগ্রহে পাওয়া যায় না এবং এমন হাদিস যা 'মাওকূফ' ('যে রেওয়ায়েত সাহাবিদের পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত নয়')[৩৯৮] অথবা মার্‌ফু' (যেটাতে পরম্পরা বা 'ইসনাদ রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু মাঝখানে কোথাও পরম্পরা ভেঙে গেছে'),[৩৯৯] সে ধরনের হাদিসের ওপর ভিত্তি করে পিতৃতান্ত্রিক অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রয়েছে এখানে। এ ধরনের একেবারে দুর্বল দলিলের আরো জটিলতা হচ্ছে এই যে, রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) নামে আরোপিত এই রেওয়ায়েতের প্রেক্ষাপট কী সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য বা ইঙ্গিত এখানে নেই। তবু হাদিস সংগ্রহগুলোর বাইরের একটি অপ্রামাণ্য সূত্র থেকে একটি 'আহাদ' হাদিস (যা থেকে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান এমনিতেই পাওয়া যায় না এমন প্রমাণ)-এর ভিত্তিতে নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপারে মা বা নারীদের ওপর মারাত্মকভাবে অগ্রহণযোগ্য বিধিবিধান আরোপ করেছেন এবং দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য যে, ফিকহের গ্রন্থে এবং ঐতিহ্যবাদী ধারায় এজাতীয় বিধি-নিষেধ এখনো কার্যকর আছে। কিন্তু, দ্বৈত-মানদণ্ডের মতো ভরণপোষণের দায়িত্বের ব্যাপারে নারীদের তালিকার নীচের দিকে রাখা হয়নি, বরং রাখা হয়েছে সন্তানের পিতা, বা স্বামীর একেবারেই পাশে, যার মধ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এক অবিচারপূর্ণ ব্যবধান এবং বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ ধরনের বৈষম্য সুবিচার-সংক্রান্ত ইসলামের মূল্যবোধ - সুবিচার (#২)-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

৪. দীন-ত্যাগ বা ইরতিদাদের শাস্তি

হাদিসের অপব্যবহারের একটি চক্ষু-উন্মীলনকারী দৃষ্টান্ত মেলে মুরতাদের শাস্তির ক্ষেত্রে। ঐতিহ্যবাদী ধারায় মুরতাদ (যে 'রিদ্দা' অথবা 'ইরতিদাদ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত) তার ব্যাপারে প্রায় নিরংকুশ অবস্থান হচ্ছে এই যে, এই অপরাধ শুধু শাস্তিযোগ্যই নয়, বরং তার ওপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করতেই হবে।[৪০০] এমনকি কিছু প্রখ্যাত, শীর্ষস্থানীয়, সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব, যেমন, তক্বীউদ্দীন আল-

৩৯৮ Al-Marghinani, 2006, p. 629.

৩৯৯ Azami, p. 44.

৪০০ এই ট্রেডিশনাল অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Chapter on Apostasy in Friedman.

নাবহানী[৪০১], সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী[৪০২], ইউসুফ আল-ক্বারাদাভী[৪০৩], এবং অন্যরা এই ঐতিহ্যবাদী অবস্থানের প্রবল এবং অকুণ্ঠিত সমর্থক।

রিদ্দাকে ইসলাম একটি অন্যতম বড় গুনাহ বলে গণ্য করে, কিন্তু বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা এবং মুরতাদের মধ্যে। কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে এই দুনিয়াতে নিছক রিদ্দা (ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ম পালটানো, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বেচ্ছায় সবার গোচরে ইসলাম বর্জন করার ঘোষণা দেওয়া)-র জন্য কোনো শাস্তির কথা বলে। বরং কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্ম বা বিশ্বাসের ব্যাপারে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি মানবতার সামনে পেশ করেছে।[৪০৪]

ঐতিহ্যবাদী অবস্থান অনুযায়ী, রিদ্দা, কোনো দেশদ্রোহিতা (treason) বা বিদ্রোহের সাথে জড়িত না হলেও, কিছু কিছু হাদিসের ভিত্তিতে শাস্তিযোগ্য অথবা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তির উপযোগী।[৪০৫] একটি বিশেষ বর্ণনা রিদ্দার ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদী অবস্থানের জন্য মুখ্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়: “কেউ দীন বদল করলে তাকে হত্যা করো” (*‘মান বাদ্দালা দ্বীনাহু, ফাকতুলুহু’*)।[৪০৬] এটা একটি ‘আহাদ’ হাদিস। অধিকাংশ মুসলিম মনীষী “একমত যে নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ) প্রতিষ্ঠিত হয় না ‘আহাদ’ হাদিসের ভিত্তিতে এবং নিছক অবিশ্বাসের জন্য মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা যায় না।”[৪০৭]

মৃত্যুদণ্ড যেহেতু একটি চরম শাস্তি, যদি তা সত্যিই এরকম মৌলিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো, তাহলে, হাদিসে নয়, কুরআনেই তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতো। তাছাড়া এরকম কোনো হাদিস নেই যা থেকে নবিজির (স.) সুন্নাহভিত্তিক কোনো উদাহ্রণ আছে যে নিছক রিদ্দা বা স্বেচ্ছায় ধর্ম বদলানোর

---

৪০১ Al-Nabhani, 2002, Article 7(c), p. 116.

৪০২ Mawdudi, 1994.

৪০৩ Al-Qaradawi, 2006.

৪০৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৫৬।

৪০৫ যে সব হাদিসের ভিত্তিতে ইরতিদাদ-এর শাস্তির আবশ্যকতার সাফাই দেওয়া হয়, সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Saeed and Saeed, 2004; Subhani, 2004; Rahman, 1996.

৪০৬ Al-Bukhari, Vol. 9, Kitab istitaba al-murtadin, #57, https://sunnah.com/bukhari:6922. অন্য যেসম উৎসে এই হাদিস এসেছে তার তালিকা এবং প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Shafaat, 2007.

৪০৭ Kamali, 1997, referring to Shaltut, al-Islam ‘Aqidah wa-Shari’ah, pp. 292-93.

জন্য তিনি কারো ওপর শাস্তি আরোপ করেছেন। বরং, এর বিপরীতে, যখন কোনো দেশদ্রোহিতা বা বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট নয়, এ রকম ক্ষেত্রে তিনি নিছক সাধারণ রিদ্দার ব্যাপারে কি করেছেন তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত মেলে নিম্নোক্ত সহিহ হাদিস থেকে:

> একজন বেদুঈন রাসুলুল্লাহ্‌র কাছে বাইয়াত দিয়েছিল। তারপর মদিনাতে তার জ্বর হয়। সে রাসুলুল্লাহ্‌র কাছে এসে বলল: 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (স.)! আমার বাইয়াতকে বাতিল করে দিন।' রাসুলুল্লাহ (স.) তা করতে সম্মত হননি। সে তারপর আবার ফিরে এসে বললো: 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার বাইয়াতকে বাতিল করে দিন।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা করতে রাজি হলেন না। সে তারপর আবার ফিরে এসে বললো: 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার বাইয়াতকে বাতিল করে দিন।' অতঃপর সে মদিনা ছেড়ে চলে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন: 'মদিনা এক চুলা বা ফার্নেস (কীরা)-র মতো: তা যা কিছু ময়লা বা আবর্জনা তা বের করে দেয়, আর যা কিছু ভালো তাকে আরো উজ্জ্বলতর করে।"[৪০৮]

রিদ্দার ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদী অবস্থান কেমন করে এই বিশেষভাবে বিকশিত হলো? মুখ্যত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই ক্ষেত্রে রিদ্দার বিষয়টি একটি নব্য কমিউনিটি বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা অথবা বিদ্রোহ থেকে পৃথক করে দেখতে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থতা। পরবর্তীকালে এই অবস্থান কঠোরভাবে রক্ষণশীল হয়ে যায় মূল্যবোধমুখীর পরিবর্তে আইনসর্বস্ব প্রবণতার কারণে। এই দু'টি ভিন্নমুখী প্রবণতার বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আইনসর্বস্ব ফিকহি অবস্থানটিকে পছন্দ করার স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব চয়েস; ২য় অধ্যায়ে আলোচিত #৪ মূল্যবোধ, যেখানে পছন্দ করার স্বাধীনতার মধ্যে ধর্ম বদলের স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত), এর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী নীতি বা মূল্যবোধ যদি ঐ হাদিস যেটাতে ধর্ম বদলের জন্য হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ("যে ধর্ম বদল করে তাকে হত্যা করো") সেই হাদিসের পাশাপাশি বিবেচনা করা হয় তাহলে বৈপরীত্যটা

৪০৮ Al-Bukhari, Vol. 9, Kitab Fadail al-Madinah, #318, https://sunnah.com/bukhari:1883.

পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু ওলামা এবং ফুকাহা ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট নীতি ও মূল্যবোধের পরিবর্তে উপর্যুক্ত হাদিসটির মতো 'আহাদ' হাদিসকে প্রাধান্য দেন। এই হাদিসটি আল-বুখারির মতো 'সহিহ' সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হলেও, হাদিস 'মুতাওয়াতির' না হলে তা থেকে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায় না, আর তাই কোনো হাদিস – এমনকি সহিহ হাদিসও – কুরআনের আয়াতের তুলনায় সমান অবস্থানে নয়। তাছাড়া, 'আহাদ' হওয়া ছাড়াও এ হাদিসের আরো অনেক দুর্বলতা আছে যে ব্যাপারে রাহমান আলোকপাত করেছেন।[৪০৯]

তবে, এটা উল্লেখ্য যে, আইনসর্বস্ব ধারা ও মানসিকতা কুরআনভিত্তিক নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ উপেক্ষা করে, যদিও আইন, বিশেষ করে কঠোর আইনগুলো, কুরআনের নীতিমালা ও আদর্শের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। নবিজির (স.) জীবন ও সুন্নাহ এই মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। হাদিসে যেখানেই রিদ্দার শাস্তি প্রসঙ্গ এসেছে তা মুখ্যত দেশদ্রোহিতা অথবা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে, আর তাই এ প্রসঙ্গে কোনো হাদিস, তাও আবার কোনো আহাদ বা যঈফ হাদিস, কুরআনে বিধৃত ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা খর্ব করায় ব্যবহার করা যেতে পারে না। সৌভাগ্যবশত রিদ্দার ব্যাপারে সমসাময়িক মতামত মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ইসলামে বিশ্বাসের স্বাধীনতার পক্ষে।[৪১০]

---

৪০৯ এই হাদিসের অনেকগুলো দুর্বলতার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, যদি এই হাদিস আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয় তাহলে কোনো অমুসলিম ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হলে তাকেও কতল করতে হবে। সাঈদ (১৯৯৪) বলেন: "এই হাদিসটি সাধারণ ('আম) শ্রেণীর। এর আক্ষরিক অর্থের ভিত্তিতে এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে কেউ একবার কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে সে আর পরিবর্তন করতে পারবে না, তা ইসলাম, খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ অথবা যে ধর্মই হোক।" ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ এই হাদিসকে আসলেই আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন, শর্তহীনভাবে। "ইমাম শাফেয়ী এবং ইবনে হাজম এই মত পোষণ করতেন যে, যেহেতু হাদিসের ভাষ্যটি সাধারণ, এটা কোনো অবিশ্বাসী তার ধর্ম পরিবর্তন করলে তার ক্ষেত্রেও ইরতিদাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।" অন্যরা, যেমন শাফেয়ী এবং ইবন হাজমের সাথে ইমাম মালিক দ্বিমত পোষণ করেছেন। দেখুন, Rahman, S. A., 1996, chapter II.

৪১০ নতুন একটি ব্লগ "Apostasy and Islam" ইরতিদাদ বিষয়ে একটি মূল্যবান তথ্যসম্ভার হিসেবে কাজ করছে, যেখানে শতাধিক ওলামা, ফুকাহা, অ্যাকাডেমিক এবং ইমামদের মতামত সংগ্রহ রয়েছে। Retrieved June 5, 2007, http://apostasyandislam.blogspot.com/.

গ. হাদিসের ব্যাপারে আইন-বিশারদ এবং অন্য জ্ঞানীদের, বিশেষ করে হাদিস বিশারদদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

হাদিসের ব্যাপারে ফুকাহাদের থেকে অন্যদের, বিশেষ করে হাদিস বিশারদদের চিন্তাধারা (approach) বেশ কিছুটা ভিন্ন। হাদিস বিশারদরা হাদিস অধ্যয়ন, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণিবিন্যাস করেন, ফুকাহা (দলিলের অন্যান্য উৎসের সাথে) হাদিস ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন আইন প্রণয়ন অথবা আহরণে।

নবিজির (স.) জীবন-কথা ও কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত জ্ঞানের ভান্ডার সংরক্ষণে এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কাছে পেশ করতে হাদিস বিশারদ এবং গবেষকগণ উল্লেখযোগ্য, বিশাল এবং অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। শুরুতে যা ছিল মৌখিক বর্ণনা সেগুলো সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা হাদিসের ভান্ডার ধীরে ধীরে শ্রেণিবিন্যাসের একটি জটিল কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যে বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে সহিহ, হাসান, যঈফ এবং মাউজু প্রকারের হাদিস। এই কাঠামো ইসলামী জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটির বিশিষ্টতা এবং সেই সাথে এই অপরিহার্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষণে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট মনীষীদের নিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রয়াসের পরিচায়ক। হাদিস সংগ্রহের মৌলিক কাজ বহু শতাব্দী আগেই শেষ হলেও, হাদিস নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণের কাজ চলমান এবং চলতেই থাকবে। এর সমান্তরালে ফিকহের অঙ্গনে হাদিস কীভাবে ব্যবহার হবে সেটার দায়িত্ব ফুকাহা বা আইনশাস্ত্র বিশারদদের।

হাদিস বিশারদের সমান্তরালে ফকীহরা হাদিস গ্রহণে এবং প্রয়োগে কিছুটা ভিন্ন নীতি অবলম্বন করে থাকেন। যতক্ষণ না কোনো হাদিস কুরআনের কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতি বা আদর্শ, অন্যান্য বিশুদ্ধ বা স্বীকৃত হাদিস এবং ওলামা-ফুকাহার ইজমার পরিপন্থি না হয়, ফকীহরা সাধারণত 'আহাদ' – এমনকি যঈফ - হাদিসকে দলিলের উৎস হিসেবে অগ্রাধিকার দেন কোনো ব্যক্তির কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক যুক্তি (analogical reasoning)-র চেয়ে বেশি। তবে বলাই বাহুল্য, অনেকেই এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং কিয়াস ও ইজমার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন।[৪১১]

৪১১ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এই বইয়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়।

মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে যেমন প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে হাদিসের ব্যাপারে আরো ভালো এবং সূক্ষ্ম বা পরিশীলিত (nuanced) জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, তেমনি আলেমদের, বিশেষ করে ফকীহদের প্রয়োজন মাকাসিদ এবং ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী আইনের প্রচলিত ভান্ডার পুনর্মূল্যায়ন করা। এ প্রসঙ্গেই এটা অনুধাবন এবং স্বীকার করা দরকার যে, হাদিস সামগ্রিকভাবে সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়, একই কারণে ফিকহ, যা মুখ্যত হাদিসভিত্তিক, তা আসমানি কোনো কিছু নয়। বরং, ফিকহ হচ্ছে ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা মানব যুক্তিবুদ্ধির আলোকে অভ্রান্ত আসমানি ইচ্ছা (divine will) নিয়ে মানব ধারণা ও বোঝা। এই ফিকহ প্রায়শই শরিয়া, যা মারাত্মক এবং মৌলিকভাবে ভুল বোঝা এবং ভুল-ব্যাখ্যার শিকার, তার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়।

ঘ. উপসংহার

হাদিসের অপব্যবহারের যে দৃষ্টান্তগুলো উপরে পেশ করা হয়েছে তা একটি সাধারণ (common) সমস্যার পরিচায়ক। ইসলামের নামে আইনের অনেক অতিরঞ্জিত দিকগুলো আহরণে হাদিসের এরকম ব্যবহারের সাথে অনেক বিবেকবান মুসলিম একমত হতে পারে না, বিশেষ করে যেখানে এসব আইনকে আসমানি শরিয়াভিত্তিক হিসেবে পেশ করা হয়, অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ফিকহের বেশির ভাগটুকুই ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রসূত।

এটা অনুধাবন করা খুব কঠিন নয় যে কিছু লোক চরমপন্থি হবে এবং তাদের হাদিসের অপ কিংবা ভ্রান্ত ব্যবহার আইন-বিধানের ক্ষেত্রে অতিমাত্রিকতার দিকে ঠেলে দেবে এবং সেই অতিমাত্রিকতার প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ সমগ্র হাদিস ভান্ডারকেই আক্রমণ অথবা প্রত্যাখ্যান করবে, যদিও এরকম প্রত্যাখ্যান অবশ্যই ভুল। বস্তুত এরকম কিছু গোষ্ঠী আছে যারা নিজেদের "শুধু কুরআন"-এর অনুসারী বলে দাবি করে। এমনই একটি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ড. রাশাদ খালিফা, যিনি হাদিসকে শুধু অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানই করে নি, বরং পরিণতিতে সে নিজেকে প্রতিশ্রুত আরেকজন রাসুল (বাণীবাহক) হিসেবে

দাবি করে বসে কুরআনের ৩/৮১ আয়াতের আলোকে।[৪১২] তার এই অপকর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মুসলিম কমিউনিটির অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান (repudiate) করে। কিন্তু হাদিসের সব প্রত্যাখ্যানকারীই 'শুধু কুরআন'-এর মত ভ্রান্ত মতবাদ এবং রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) পর নতুন কোনো নবির দাবি পেশ করে না। নিঃসন্দেহে এটা এবং এই রকম সব ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কিন্তু তা তাকফির-এর চর্চায় না নেমে। তাকফির এমনই একটি প্রবণতা যার প্রাবল্যে এবং কুফলে মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লেগেছেন এবং একে অপরকে ইসলামের সীমানার বাইরে প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন, এ ব্যাপারে নবিজির কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও।[৪১৩] হাদিস প্রত্যাখ্যানকারীরা যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছে, সেগুলো সত্ত্বেও সমালোচনা আর সমালোচকদের একভাবে দেখলে চলবে না, কেননা যদিও সমালোচকদের প্রত্যাখ্যান করা হয়, তার মানে এই নয় যে তাদের সব সমালোচনাই ভ্রান্ত। তাই সমালোচনার মূল্যায়ন করতে হবে তাঁর সঠিকতার ওপর ভিত্তি করে এবং সমালোচনা যেন তাকফির-এর প্রবণতার দিকে এগিয়ে না দেয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি খতমে নবুয়তের মতো একটি মৌলিক ইসলামী বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেকেই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসেবে পেশ করার মতো চরম আচরণ করে।

এর আগেই যেমন বলা হয়েছে, হাদিসের বিশ্বস্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে আসল সত্যটি যারা হাদিসকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে এবং যারা হাদিসকে আসমানি হিসেবে দেখে তাদের অবস্থানের মাঝামাঝি। যারা আসমানি হিসেবে দেখেন তারা কার্যত হাদিসকে কুরআনের সমপর্যায়ে ওঠান, এমনকি কখনো কখনো হাদিসের ভিত্তিতে কুরআনি আয়াতকে উপেক্ষা করেন। এ সবের পরও হাদিসের ভান্ডার নবিজির (স.) জীবন - তার কথা এবং কাজ, যা মহান সাহাবিরা (রা.) প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সাক্ষ্য দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য একটি অমূল্য

---

৪১২ From the website of the followers of Rashad Khalifa, "Why Did Rashad Announce His Messengership?" Retrieved June 1, 2007, https://submission.org/idx_other_Biography_Khalifa.html

৪১৩ Farooq, 2005.

এবং অপরিহার্য উৎস। তাই, কী ইসলামী এবং কী নয় তা নিরূপণে এবং সংজ্ঞায়িত করায় শুধু কুরআনকে যারা ব্যবহার করতে চায় তাদের অবস্থান মৌলিকভাবে ভুল এবং ভ্রান্তিপূর্ণ।

‘শুধু কুরআন’ মতপন্থিদের আরেকটি সাধারণ ভ্রান্তি হচ্ছে হাদিসকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করা এই ভিত্তিতে যে, এগুলো মানুষের তৈরি বা মনগড়া। এই অনুসিদ্ধান্ত বাস্তবতার ভিত্তিতেই ভুল, কেননা অনেক বা বিভিন্ন স্বাধীন সূত্রে এসব বর্ণনার বিশ্বস্ততা মানবিকভাবে যতটা সম্ভব তা করা হয়েছে। নতুন একটি কমিউনিটির জীবনের নিত্য পরিসরে প্রায়োগিক দিক থেকে নবিজির (স.) সমগ্র নবি জীবনের কথা ও কাজ যেহেতু কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছিল, তাই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পরম্পরায় সে সম্পর্কে নবিজির (স.) সাহাবিরা তাঁদের যোগ্যতা ও নৈকট্য অনুযায়ী অনেক কিছুই স্মৃতিশক্তিতে ধারণ করেছিলেন এবং তা একে অপরের সাথে তাদের স্মৃতিসম্ভার বিনিময় করেছিলেন। নবিজির (স.) নিকটতম প্রজন্ম এই হাদিসগুলো শুনেছেন এবং তার কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন যাতে করে তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ, এমনকি অনেক প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে অনুকরণও করতে পারেন। তাই, যদি হাদিসের সংরক্ষণে এবং তার প্রচার-প্রসারে বেশ কিছু সমস্যা– এমনকি কিছু মৌলিক সমস্যা থেকে থাকে (এবং ছিলও), তার মানে এই নয় যে, এগুলো সামগ্রিকভাবে মানুষের নিজেদের রচনা অথবা তাদের কল্পনাপ্রসূত। আসল কথা হচ্ছে এই যে, হাদিস অবশ্যই কুরআনের পর্যায়ের নয়, এ কথা কখনোই ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা যাবে না। আর যেহেতু হাদিস কুরআনের মতো সামগ্রিকভাবে বা মূলত আসমানি নয়, যা কোনো ধরনের ভুলত্রুটি বা বিকৃতি থেকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সংরক্ষিত নয়, তাই হাদিসের ক্ষেত্রে যে মানব উপাদান বা অবদান মৌলিকভাবে আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মুতাওয়াতির হাদিস মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি (এক ডজনেরও কম) এবং তাই বলা যেতে পারে যে, প্রায় সব হাদিসই ‘সহিহ’ অথবা যে শ্রেণির হোক সেগুলো ‘আহাদ’, যা নিশ্চিত নয়, বরং সম্ভাব্য জ্ঞান জোগায়। তাই এই অমূল্য জ্ঞানের ভান্ডারকে আইন বা বিধিবিধানের পূর্ণাঙ্গ এবং অলঙ্ঘনীয় (sacrosanct) সূত্র হিসেবে ব্যবহারের চেয়ে ব্যবহার করতে হবে আনুষ্ঠানিক ইবাদত সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এবং নৈতিক নির্দেশনা এবং হিকমতের সূত্র

হিসেবে। যেকোনো সমাজেই আইনকানুনের প্রয়োজন আছে, আর তাই মুসলিম সমাজেও তা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু হাদিস যেহেতু নিশ্চিত জ্ঞান জোগায় না, মুসলিমদের আইনকানুন প্রণয়নে হাদিস ব্যবহার করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আহকামের ভিত্তি হিসেবে হাদিসের প্রয়োগে আরো অধিকতর সতর্কতা ও পরিমিতি বজায় রাখতে হবে সেই সব বিধিবিধান প্রণয়নের সময় যেগুলো মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদ সংশ্লিষ্ট। এই সতর্কতা ও পরিমিতিবোধ আরো বিশেষভাবে প্রয়োজন সেই সব আইনকানুনের ক্ষেত্রে যেগুলোর পরিণতিতে বৈষম্য ও অবিচার হয়। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, আইনকানুন আহরণে ও প্রণয়নে, যেখানে প্রযোজ্য ও প্রাসঙ্গিক, সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো এম্পিরিক্যাল (অভিজ্ঞতাজনিত/গবেষণামূলক) দিক থেকে ভালো করে নিরূপণ ও অনুধাবনের প্রয়াস চালাতে হবে এবং প্রস্তাবিত আইনকানুনের সম্ভাব্য ফলাফল আইনের প্রয়োগের আগে মূল্যবোধের আলোকে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োগের পর তার ফলাফল কী দাঁড়ায় তাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই এম্পিরিক্যাল দিকের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

কুরআন যে আসমানি এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তা আসমানিভাবে নাজিল করেছেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তার সাথে তুলনা করলে হাদিসে যে মানবীয় অবদান তা স্বীকার করে নিলে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রেই হাদিসের অমূল্য ভান্ডারকে গতিশীলভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনার নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এরকম প্রেক্ষাপটে হাদিসকে আকিদাগত দিক থেকে অযৌক্তিক পর্যায়ে ধরে নেবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এর মাধ্যমে এমন সব কঠোর আইনকানুন যা বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সে বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এমন সব আইনকানুন থেকে দূরে সরে থাকা যায়। বরং সংশ্লিষ্ট মানুষদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক পরামর্শ বা শূরাভিত্তিক পদ্ধতিতে মুসলিমরা ক্ষমতায়িত হবে হাদিসসহ যাবতীয় প্রাসঙ্গিক উৎসগুলো ব্যবহারভিত্তিক আইন ও বিধিবিধান রচনায়। বস্তুত এই গতিশীল কাঠামোতে হাদিসের ভান্ডারকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; বরং সমাজের জন্য আইন রচনায় (legislative প্রক্রিয়ায়) পথনির্দেশনার জন্য মুসলিমরা কার্যকরভাবে হাদিসেরও শরণাপন্ন হবে।

এই কাঠামোতে কোনো আইনের পবিত্রতা অথবা প্রামাণ্যতার দাবি করা হবে না, নিছক তা হাদিসভিত্তিক বলে। বরং এসব আইন 'ইসলামী আইন' গণ্য করা হবে ইসলামের সামগ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারের আলোকে শূরাভিত্তিক প্রক্রিয়ায়। এই বৈশিষ্ট্য মুসলিমদের সহায়তা করবে হাদিসভাণ্ডারের অমূল্য পথনির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হাদিসকে আকিদাগত দিক থেকে এমন অবস্থানে উঠানো যা ইসলামেরই আলোকে গ্রহণযোগ্য নয় তেমন অবস্থানে। এই মানদণ্ডের আলোকে, কোনো আইন তখনি ইসলামী আইন হবে, যদি (ক) যা ইসলামের মূল উৎসগুলোর ওপর ভিত্তি করে; (খ) যা প্রণীত বা আহরিত হয়েছে ইসলামের মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (মাকাসিদ)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে; এবং (গ) এটা সমাজে আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছে শূরার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই মানদণ্ডগুলোর আলোকে সঙ্গত কারণেই ২য় এবং ৩য় শর্ত যদি পূরণ না হয়, তাহলে সে আইনকে বাধ্যবাধকতামূলক কাঠামোতে 'ইসলামী' আইন বলার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওলামা-ফুকাহা তাদের গবেষণার ভিত্তিতে ফতোয়া দেবেন সে বিষয়টি আর সমাজে আইনি/বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য (enforceable) কোনো ফতোয়া প্রয়োগ করা হবে, দুটো জিনিস এক নয়। ফতোয়া দেওয়া বা আইন রচনায়, হাদিস অবশ্যই মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক সূত্র হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু প্রয়োগযোগ্য (enforceable) আইনি প্রণয়ন এবং তাঁর প্রয়োগের ক্ষেত্রে শূরা প্রক্রিয়ার সংযোগ থাকতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইজমা-সংক্রান্ত আকিদা

ইজমা (ঐকমত্য) নিয়ে কোনো ইজমা আছে কি?

ইজমা বা সম্পূর্ণ ঐকমত্য (consensus) উসূলে ফিকহের চারটি উৎসের একটি।

> ইজমা হচ্ছে আরবি শব্দ 'আজমা'র বিশেষ্য রূপ, যেখানে 'আজমা'র দু'টি অর্থ আছে: কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং তার ওপর ঐকমত্যে পৌঁছা। প্রথম অর্থের দৃষ্টান্ত: 'আজমা' ফুলান 'আলা কাজা', যার অর্থ 'অমুক ব্যক্তি অমুক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। এই অর্থে 'আজমা'র ব্যবহার কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়। 'আজমা'র আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'সর্বসম্মত ঐকমত্য'। দৃষ্টান্তস্বরূপ: 'আজমা' আল-কাওম 'আলা কাজা', যার অর্থ "সবাই অমুক বিষয়ে সর্বসম্মত ঐকমত্যে পৌঁছেছে"। দ্বিতীয় অর্থটির মধ্যে প্রায়শই প্রথমটি অন্তর্ভুক্ত। যেমন যখনই কোনো ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার আগে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সিদ্ধান্ত বা রায় দেওয়া হয়েছে।[৪১৪]

কুরআন এবং সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের দু'টি মুখ্য এবং বুনিয়াদি উৎস। আর ইজমা এবং কিয়াস আরো দু'টি উৎস যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্রথম দু'টির তুলনায় অমুখ্য।

> ক্ল্যাসিক্যাল উসূলে ফিকহের পদ্ধতি-কাঠামো জীবনের বিভিন্ন পরিসরে, যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মুসলিম মন-মানসিকতার নির্ধারণে মুখ্যত গ্রন্থাদি এবং গ্রন্থভিত্তিক (text-oriented) পদ্ধতি ব্যবহার করে। এই উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং ইজতিহাদ (মানব যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ), যেগুলো ব্যবহার করা হয় শরিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। ইজতিহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মুসলিম চিন্তাধারার চতুর্থ উৎস, কিয়াস। ...[৪১৫]

---

৪১৪ Kamali, 2003, pp. 229-230.

৪১৫ AbuSulayman, 1987, pp. 58-59.

> ... কোনো ব্যাক্তির পক্ষেই কোনো বিষয়ে রায় বা মতামত দেওয়া উচিত নয় নিছক এটা বলে যে, অমুক জিনিস হালাল (অনুমোদিত) অথবা হারাম (নিষিদ্ধ), যদি না প্রাসঙ্গিক [কানুনি] জ্ঞান তার নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, এবং সেই জ্ঞান হতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে, অথবা আহরিত হতে হবে ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তিতে।[৪১৬]

ধর্মীয়তন্ত্র থেকে আদর্শ থেকে আইনকানুন, এগুলো ইসলামী জ্ঞানচর্চা এবং ধর্মীয়-সামাজিক ঐক্যের পূর্ণ পরিসরেই ইজমার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও প্রভাব রয়েছে।

> এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মমত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই উম্মাহর শুরুর দিকে ইজমা ছিল নিছক সাধারণভাবে গণ্য মতামত, উম্মাহর সাধারণ বা অভিন্ন অনুভূতি এবং আইনি দিক থেকে ব্যর্থ অথবা বিক্ষিপ্ত অবস্থানের বিরুদ্ধে একটি আবশ্যিক প্রতিরক্ষা। ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে এসে এর বিশদ দিকগুলোসহ জটিল তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়। ধর্মের পরিসরে এটি একটি অকাট্যভাবে প্রামাণ্য দলিলের স্বীকৃতি পায়। সব ধর্মীয় মত (doctrine) ইজমার মাধ্যমেই মানদণ্ডের মর্যাদা অর্জন করে। এটার প্রত্যাখ্যান করা পথভ্রষ্টতা, এমনকি কখনো কখনো কুফরী হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪১৭]

> উল্লেখ্য, কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র তুলনায় ইজমা কোনো আসমানি হেদায়েতের পর্যায়ে পড়ে না। একটি মত এবং শরিয়ার দলিল হিসেবে, ইজমা মূলত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল। ইজমা তত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইজমাকে একটি বাধ্যবাধকতামূলক দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪১৮]

> শরিয়ার বিকাশে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফিকহের বর্তমান ভান্ডার গড়ে উঠেছে ইজতিহাদ এবং ইজমার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায়।[৪১৯]

---

৪১৬ Al-Shafi'i, p. 78.
৪১৭ Hasan, 2003, Introduction.
৪১৮ Kamali, 2003, p. 228.
৪১৯ Kamali, 2003, p. 231.

> একমাত্র ইজমাই সব সন্দেহ-সংশয়ের অবসান করতে পারে এবং যখন কোনো আহ্কাম বা রায়ের পেছনে ইজমার সমর্থন থাকে তা অকাট্য এবং অভ্রান্ত মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইজমাকে সাধারণত রক্ষণশীলতা এবং অতীত ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয় ... যেসব আহ্কাম অনিশ্চিত (speculative) সেগুলোর প্রামাণ্যতা বৃদ্ধিতে ইজমা সহায়ক। অনিশ্চিত আহ্কামগুলোর ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা থাকে না, কিন্তু যখন তার সমর্থনে ইজমা যোগ হয়, তখন তা নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় ... সবশেষে, ইজমা প্রামাণ্যতার পরিচায়ক। ইজমা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রামাণ্য হয়ে যায় এবং সেই আহ্কামের সাথে মুখ্য দু'টি উৎস (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ)-র সাথে যোগসূত্র দুর্বল হয় অথবা পর্যায়ক্রমে একেবারেই থাকে না।[৪২০]

মজার ব্যাপার যে, উসূলে ফিকহে যদিও ইজমার অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত, সাধারণ মুসলিমরা প্রায়শই অনবহিত যে উসূলে ফিকহের একটি সূত্র বা দলিল হিসেবে ইজমার অস্তিত্ব একেবারেই ক্ষীণ বরফের ওপর। আসলেই কি? এই বিষয়টিই এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে। ইসলামী আইনভান্ডার একটি আদর্শ রূপে আনতে বা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে ইজমা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবে বিভক্তিকে স্থায়ীভাবে গভীর করতেও তা কিছু অবদান রেখেছে। তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইজমার অপব্যবহার, যেখানে একটি বিষয়ে বিপক্ষ মতাবলম্বীদের চুপ করানোর জন্য প্রায়শই ইজমার দাবি তোলা অথবা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। এই অপব্যবহার খুব সাধারণভাবেই পরিলক্ষিত হয় ইজমার দাবির মাধ্যমে যেখানে আসলে কোনো ইজমার অস্তিত্ব নেই। অনেকের কাছে এই পর্যবেক্ষণটি বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। তবে এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকলে এটা অনুধাবন করা যাবে যে এটা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। যাহোক, এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঐতিহ্যবাদী মত অনুযায়ী যদি কোনো বিষয়ে ইজমা থাকে, তাহলে আকিদা বা আহ্কামের বিষয় হোক, তা মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করা হয়।

---

৪২০ Kamali, 2003, p. 232.

যারা একটি ধারণা অথবা মত (dogma/doctrine) হিসেবে ইজমার সাথে পরিচিত নন তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে, ইজমার আলোচনার শুরুতেই এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা কেন পেশ করা হয়নি। এটার একটা সঙ্গত কারণ রয়েছেঃ পাঠকরা হয়তো বিস্মিত, এমনকি আঁৎকেও উঠতে পারেন এটা জেনে যে, ইজমার সংজ্ঞা কী সে ব্যাপারেও কোনো ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) নেই। এই অধ্যায়ে ইজমার ধারণার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে সাধারণ মুসলিমদের অবগতির জন্য যাতে করে তারা জানতে পারে উসূলে ফিকহের এই প্রক্রিয়া, যার অবশ্যই গ্রহণযোগ্য স্থান আছে, তা কেমন করে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করা হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ের আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে পর্যাপ্ত উদাহরণ দেওয়ার মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গমে এবং স্বীকৃতিতে সহায়তা করা যে ইজমার প্রাসঙ্গিক ব্যবহারের এখনো অবকাশ আছে যদি তা ব্যবহারের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় সমসাময়িক সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে।

ক. ঐতিহ্যগতভাবে ইজমার ওপর গুরুত্বারোপ

ইজমা অধ্যায়ের এই অংশটির জন্য আহমদ হাসানের বিশদ একটি কাজের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করা হয়েছে, যে কাজে প্রত্যেকটি বিষয়ে আরো বিস্তারিত রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেওয়া ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্র থেকে ইজমার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিবিধ ভাষ্য দিয়েছেন বিভিন্ন জনে।

আল-বায়দাবি (মৃঃ ১২৮০ খ্রিঃ), একজন হানাফী বিশেষজ্ঞঃ “যে ব্যক্তি ইজমাসংক্রান্ত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে সে বৃহত্তর দীনেরই প্রত্যাখ্যান করে। তার কারণ মুসলিমদের জন্য দীনের সব মৌলিক বিষয়ের কক্ষপথ এবং তার প্রত্যাবর্তনস্থল ইজমাকে ঘিরে।”[৪২১]

আল-সারাখ্সী (মৃঃ ১০৯০ খ্রিঃ), আরেকজন হানাফী মনীষীঃ “যে ইজমার যথার্থতা অস্বীকার করে সে যেন পরোক্ষভাবে সামগ্রিকভাবে দীনের ধ্বংস কামনা করে।”[৪২২]

৪২১ Hasan, 2003, p. 36.
৪২২ Hasan, 2003, p. 36.

আবদ আল-মালিক আল-জুওয়ায়নী (মৃঃ ১০৮৫ খ্রিঃ), একজন শাফেয়ী মাযহাবের মনীষী: "ইজমা হচ্ছে শরিয়ার বাধন ও খুঁটি, আর শরিয়ার বিশুদ্ধতা ইজমার কাছেই ঋণী।"[৪২৩]

আল-ক্বারাফী (মৃঃ ১২৮৫ খ্রিঃ), একজন মালিকী ফকীহ: "অকাট্যতার ব্যাপারে ইজমার অবস্থান ফিক্‌হের বাকি তিনটি উৎস, কুরআন, সুন্নাহ এবং কিয়াস, এ তিনটির ওপরে।"[৪২৪]

উল্লেখ্য, আল-জুওয়ায়নী দাবি করেছেন যে, শরিয়ার সঠিকতা বা বিশুদ্ধতা কুরআন, সুন্নাহ বা কিয়াস নয়, বরং ইজমার ওপর নির্ভরশীল। আল-ক্বারাফী আরো অগ্রসর হয়েছেন। অকাট্যতার ব্যাপারে তিনি ইজমাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং কিয়াসের ওপর স্থান দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য ভিন্ন মূল্যায়ন আছে।

> কিছু ফকীহ্ ইজমার মূল্য ও মর্যাদা এতটা অতিরঞ্জিত করেছেন যে, তারা এটিকে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই মতের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, কুরআন এবং সুন্নাহ (বিশেষ নির্দেশনা) রহিত হতে পারে এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু ইজমা অভ্রান্ত এবং অকাট্য। যদি কোনো হুকুম ইজমা-সমর্থিত হয় তাহলে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইজমার অবস্থান কিয়াসের আগে, কারণ কিয়াস কখনো কখনো ভ্রান্ত হতে পারে। উল্লেখযোগ্য, ইজমাকে কুরআন এবং সুন্নাহর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে (দলিল হিসেবে) ইজমা অকাট্য (ক্বাত্‌ই), মৌখিক (লাফজী), দেখা যায় বা স্পর্শ করা যায় (মুশাহাদ) অথবা যা তাওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা। অনিশ্চিত (speculative) ইজমার ক্ষেত্রে তার ওপর কুরআন ও সুন্নাহর অগ্রাধিকার রয়েছে। এই মতের সমর্থনে আল-ইস্‌ফাহানী মন্তব্য করেছেন যে, ফিকহের জন্য দলিল হিসেবে ইজমার অবস্থান আর সব সূত্রের ঊর্ধ্বে এবং অন্য কোনো প্রামাণ্য সূত্রকেই ইজমার সাথে তুলনা করা যায় না। তার মতে বহুসংখ্যক মনীষী এই মত পোষণ করেন।[৪২৫]

---

৪২৩ Hasan, 2003, p. 36.

৪২৪ Hasan, 2003, p. 36.

৪২৫ Hasan, 2003, pp. 149-150.

খ. ইজমার দাবি প্রায়শই এবং অতিমাত্রায় করা হয়

উদাহ্‌রণস্বরূপ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইজমার দাবির একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হচ্ছে যাতে পাঠকরা অনুধাবন করতে পারেন কত সহজে এবং কত তুচ্ছ, এমনকি বিতর্কিত, ব্যাপারেও ইজমার দাবি করা হয়। মজার ব্যাপার, এই সমস্ত দাবির বিপক্ষে বাস্তবতা হচ্ছে, এই তালিকায় সে সমস্ত বিষয় ইজমা দাবি করা হয়েছে তার (হয়তো দু'-তিনটি ছাড়া) কোনোটির ব্যাপারেই ইজমা নেই বললেই চলে। মনে রাখতে হবে, যে বিষয়ে ইজমার দাবির কোনো ভিত্তি নেই তা আসলে ইজমা নিয়ে অসত্যকথন (misrepresentation) -এর সমতুল্য।

- **একসাথে তিন তালাকের ঘোষণা অনুমোদিত:** এটাই জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত এবং এর ওপর উম্মাহ্‌র ইজমা আছে এবং এর যারা বিরোধিতা করে তাদের গ্রাহ্য করার কোনো কারণ নেই।[৪২৬]
- **তারাবি নামাজ ২০ রাকাত:** ইমাম মুওয়াফ্‌ফাক্ব আল-দীন ইবন কুদামা আল-মাক্বদিসী (মৃ: ১২২৩ খ্রি:), হাম্বলী মাযহাবের একজন নেতৃস্থানীয় ফকীহ, তার গ্রন্থ আল-মুগনীতে (১/৮০৩) রায় দিয়েছেন: 'তারাবি যে ২০ রাকাত সে ব্যাপারে সাহাবিদের ইজমা রয়েছে।'[৪২৭]
- **ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়া নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হবে:** সকল মনীষীর ইজমা রয়েছে যে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করে, তাহলে সে নামাজ অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে।[৪২৮]
- **নারীর নেতৃত্ব হারাম:** এ ব্যাপারে উম্মাহ্‌র ইজমা আছে যে নারীর নেতৃত্ব

---

৪২৬ Referring to Sharh Zarqani, Vol. 3, p. 167, Retrieved March 5, 2007, from Al-Islam Web site: https://rahemustaqeemrm.wordpress.com/2016/02/09/the-law/.

৪২৭ "Regarding Tarawih," Retrieved April 23, 2007, from Web site: http://mac.abc.se/~onesr/h/91.html. বিকল্প লিংক https://www.muftisays.com/forums/76-the-true-salaf-as-saliheen/5051-tarawih--proof-for-20-rakats.html.

৪২৮ Imam Nawawi, al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab (3:86), Retrieved December 13, 2006, from SunniPath Web site: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=3&ID=2190&CATE=343 (updated link: https://islamqa.org/shafii/qibla-shafii/33810).

অনুমোদিত নয়। ইজমা ইসলামী আইনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং তার বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪২৯]

- **নবির কবরস্থান হচ্ছে পবিত্রতম জায়গা:** সকল আলেমের ইজমা অনুযায়ী, যে ভূমিখণ্ডে নবিজির (স.) মরদেহ শায়িত আছে সেই ভূমিখণ্ডের চেয়ে পবিত্রতর আর কোনো জায়গা নেই, এবং সেগুলোর মধ্যে কা'বা এবং আল্লাহর আরশের মধ্যে যা কিছু আছে তা অন্তর্ভুক্ত।[৪৩০]
- **তালফিক বা বিভিন্ন মাযহাবের মতের সংমিশ্রণ:** উল্লেখযোগ্য যে ফকীহ্দের মতে ওলামাদের ইজমা রয়েছে যে তালফিক (বা একই বিষয়ে দুইজন ভিন্ন মুজতাহিদের মতের সংমিশ্রণ) ভ্রান্ত। এই মত বর্ণিত হয়েছে হানাফীদের মধ্যে ইবনে আবিদীন ও কাসিম ইবনে কুতলুবুঘা এবং শাফেয়ীদের মধ্যে ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী থেকে।[৪৩১]
- **'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামাজ সুন্নাহ:** [ইবনে আমীর আল-হালাবীর] আল-হালবাতে উল্লেখ রয়েছে: 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে।[৪৩২]
- **সফরের সময় মোজা-মসেহ অনুমোদিত:** আন-নাবাবী বলেছেন: 'যাদের মতামত ইজমার অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য তারা একমত যে মোজা-মসেহ অনুমোদিত, তা ঘরে অথবা সফরে হোক, প্রয়োজনে হোক বা না হোক, এমনকি একজন মহিলা যে ঘরেই থাকে অথবা

---

৪২৯ Retrieved May 7, 2007, from Al-Inaam Web site: http://www.alinaam.org.za/library/fleadership.htm; বিকল্প লিংক https://javedahmad.tripod.com/islam/female-leadership.htm.

৪৩০ Referring to Mulla Ali al-Qari, Retrieved May 17, 2007, from SunniPath Web site: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=2987&CATE=108 (বিকল্প লিংক https://www.islamweb.net/en/fatwa/282880/the-claim-that-the-prophets-grave-is-better-than-the-throne).

৪৩১ Retrieved May 17, 2007, from SunniPath Web site: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=1022&CATE=4 (বিকল্প লিংক https://islamqa.org/hanafi/qibla-hanafi/35537).

৪৩২ Retrieved May 17, 2007, from SunniPath Web site: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=1115&CATE=4 (বিকল্প লিংক https://islamqa.org/hanafi/qibla-hanafi/35343).

একজন পঙ্গু যে হাঁটতে পারে না (তাদের সবার জন্যই এটা অনুমোদিত)।[৪৩৩]

- **জবেহ করার সময় আল্লাহ তায়ালার নাম উল্লেখ না করা অবৈধ:** বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনে আবিদীন উপর্যুক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেছেন: 'কুরআনের (স্পষ্ট) দলিল এবং সকল আলেমের ইজমা অনুযায়ী জবেহকৃত প্রাণী হালাল হবে না, তা একজন মুসলিমই অথবা আহলে কিতাবী জবেহ করুক, যদি না জবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালার নাম উল্লেখ না করা হয়।'[৪৩৪]

- **আহলে কিতাবের বাইরের কোনো নারীকে বিয়ে করা গ্রহণযোগ্য নয়:** মুসলিম ফকীহদের ইজমা রয়েছে যে কুরআন মুসলিমদের আহলে কিতাবের নারীদেরও বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে তা শুধু ইহুদি এবং খ্রিষ্টান নারীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য এবং তা আর কোনো গোষ্ঠীর ব্যাপারে নয়।[৪৩৫]

- **হযরত আবু বকরের নির্বাচন:** হাম্বলী মত অনুযায়ী আকিদা-সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে শুধু একমাত্র বিষয়ে যার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ্‌র (স.) ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হিসেবে নব্য মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া।[৪৩৬]

- **ইমাম আবু হানিফা পথভ্রষ্ট ছিলেন:** মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-মালিকী বলেন: 'আমি আবু বকর সুবজিস্তানীকে তার অনুসারীদের বলতে শুনেছি - 'এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ইমাম আওযায়ী, হাসান বিন সালিহ, সুফিয়ান সাওরী এবং তাদের অনুসারীদের

---

৪৩৩ Fiqh as-Sunnah, Retrieved May 17, 2007, from Muhammad.net Web site: http://www.muhammad.net/ebooks/Fus/fus1_02.html (বিকল্প লিংক https://www.alim.org/hadith/fiqh-sunnah/1/44/).

৪৩৪ Referring to Radd al-Muhtar ala al-Durr, 5/298-299, Retrieved May 18, 2007, from Eat-Halal Website: http://www.eat-halal.com/articles/machineslaughter.shtml (বিকল্প লিংক https://www.ummah.com/forum/forum/lounge-v2/123632-halal-kfc/page16).

৪৩৫ Retrieved May 19, 2007, from Pakistanlink Web site: https://pakistanlink.org/Religion/2005/07222005.htm.

৪৩৬ Retrieved May 20, 2007, from LondonExternal Web site: http://www.londonexternal.ac.uk/current_students/programme_resources/laws/subject_guides/islamic/islamic_ch3.pdf.

ইজমা ছিল সে ব্যাপারে তোমরা কি বল?’ তারা বলল যে, তাহলে তো এটা অবশ্যই সঠিক একটি ফতোয়া হবে। আবু বকর সুবজিস্তানী তখন তাদের বললেন যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইজমা ছিল যে আবু হানিফা খারাপ এবং পথভ্রষ্ট ছিলেন।[৪৩৭]

- **ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে ইজমা:** মিসর এবং সিরিয়ার মুসলিম মনীষীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইবনে তাইমিয়াকে কারাবন্দি করা হয়। তার কারাবন্দি হওয়া ঘটে সমসাময়িক আলেমদের ইজমার ফসল হিসেবে।[৪৩৮]
- **ইসরা বা মি'রাজ ঘটেছিল দৈহিক এবং আত্মিকভাবে:** এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ দৈহিক এবং আত্মিকভাবে মি'রাজের রাতে মক্কার মসজিদ আল-হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদ আল-আকসাতে যান। তদুপরি, এই আলেমরা এটাও বলেন যে, যে ব্যক্তি মি'রাজ অস্বীকার করে সে কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের অস্বীকারকারী হিসেবে ব্ল্যাসফ্লেমার হিসেবে গণ্য হবে।[৪৩৯]
- **সুদ হারাম:** সব মাযহাবের ফিকহ অনুযায়ীই সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে যে রিবা, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ এবং সুদ (সবই) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[৪৪০]
- **আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন:** যেমন সাইয়িদ আলাভী আল-মালিকী বর্ণনা করেছেন, দুর্বল হাদিস-সংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়ে তার ‘মান্‌হাল লতিফ’ গ্রন্থে যে চার মাযহাবের আলেমদের ইজমা রয়েছে– মুজতাহিদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সময় থেকে এখন পর্যন্ত - যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি হাদিস মাউজু বা জাল না হয়, ফজিলতের জন্য দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে আমল করা যেতে পারে।[৪৪১]

---

৪৩৭ Referring to Tarikh Baghdad, Volume 13, p. 383, Retrieved May 12, 2007, from Answering-Ansar Web site: http://www.answering-ansar.org/wahabis/en/chap13.php, citing Tarigh Baghdad, Vol. 13, p. 383.

৪৩৮ Retrieved May 15, 2007, from al-Islam Web site: https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia/ahl-al-sunnah-view-ibn-taymiya-and-his-works.

৪৩৯ Retrieved May 20, 2007, from Islamicmiracles Web site: http://www.geocities.com/islamicmiracles/miracle_of_al.htm (বিকল্প লিংক https://islamichistory.org/miracle-of-ai-isra-ai-miraj/).

৪৪০ Siddiqui, p. 15.

৪৪১ ‘Alawi al-Maliki, Manhal, 251-253, Retrieved May 21, 2007, from Web site: http://www.abc.se/~m9783/maa/ktda_e.html (বিকল্প লিংক https://seekersguidance.org/answers/shafii-fiqh/kissing-the-thumbs-etc-during-adhan/).

- **চরম পরিস্থিতিতে অন্য মানুষকে হত্যা করা এবং খাওয়া:** সর্বশেষ উল্লিখিত এই বিষয়টির বৈশিষ্টের কারণে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তার সবিশেষভাবে বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজমু'তে ইমাম আন-নবাবী (র.) সবসময় না হলেও মাঝে মধ্যেই 'তাসহিহ' (সত্যায়ন)-এর পদ্ধতি ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রথম দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করা যাক– যদি কোনো মুসলিম এমন অবস্থার শিকার হয় (যেমন, মরুভূমিতে) যেখানে হালাল কোনো খাবার পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে হালাল নয় এমন কি ধরনের জিনিস খাওয়ার অনুমোদন রয়েছে? ইমাম নববী (র.) ব্যাখ্যা করেন:

> আমাদের সহযোগীরা এই মত পোষণ করেন যে, কেউ যখন জীবন বাঁচানোর মতো মরিয়া অবস্থায় পড়ে তখন যে দুই ধরনের খাবার সে চাপের মুখে খেতে পারে তা হচ্ছে: এমন খাবার যা আসক্তির সঞ্চার করে (intoxicating) এবং যা তা করে না (non-intoxicating) ... দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে সে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত যাতে এমন সব কিছু যা ইসলামী আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত (ইত্‌লাফ মা'সুম) নয়। যে (জীবন-মরণের মতো) চরম অবস্থার শিকার হলে সে আহার বা পান করতে পারে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, মূত্র এবং অন্যান্য অপবিত্র বা অপরিচ্ছন্ন আহার্য। এ ব্যাপারে কোনো ফিকহী মতভেদ (খিলাফ) নেই যে, এরকম অবস্থায় সে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং মুরতাদদের হত্যা করতে এবং খেতে পারে। বিবাহিত ব্যভিচারকারী (যানী মুহ্‌সান), বিদ্রোহকারী এবং যারা নামাজ পরিত্যাগ করে (তারিকে সালাত) তাদের ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন মত রয়েছে। সঠিকতর (আসাহ্')মত হচ্ছে যে, তাদের হত্যা এবং আহার করা অনুমোদিত। ইমাম আল-হারামাইন, গ্রন্থকার [শিরাজী], এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহা সুনিশ্চিতভাবে এই অনুমোদনের হুকুমের পক্ষে। [এই অনুমোদনের পক্ষে] ইমাম আল-হারামাইন মনে করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় (সাধারণ মুসলিমদের ওপর) এই সব ব্যক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসলে এ ক্ষমতা শাসন কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট বলে (তাফউইদা ইলা আল-সুলতান), যেখানে সেই শাসন কর্তৃত্বের অধিকার ছাড়া

> এ ধরনের হত্যা বৈধ নয়। কিন্তু যখন মানুষ চরম অবস্থায় পড়ে, তখন এই নিষেধাজ্ঞা আর প্রযোজ্য থাকে না।[৪৪২]

এই পর্যায়ে ইমাম আন-নাবাবীর এই অবিশ্বাস্য মতের ওপর কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, মুসলিম ফুকাহা বিশেষ অবস্থায় অন্য মানুষকে হত্যা করে খাওয়ার বিষয়টি শুধু আলোচনাই করেননি, বরং তা হালাল এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই (অর্থাৎ ইজমা রয়েছে) এরকম দাবি করেছেন। এই অনুমোদন যদি জীবন সংরক্ষণের (sanctity) অগ্রাধিকারের নীতির ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে - অর্থাৎ জীবন বাঁচানোর মতো চরম অবস্থায় অননুমোদিত সামগ্রীর ব্যাপারে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়– সেখানে একই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, যেহেতু মানুষের জীবন এতটাই পবিত্র এবং মৌলিকভাবে অলঙ্ঘনীয় যে, নিছক মানুষ হিসেবে (তা সে ব্যভিচারকারী, শত্রুসেনা, নামাজ-পরিত্যাগকারী অথবা মুরতাদ যাই হোক) যেকোনো মানুষের জীবনই অলঙ্ঘনীয় এবং তা কোনো ধরনের খাদ্য-তালিকা বা মেনুতেই কারো জন্যই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

‘ফকীহ্‌দের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই’ ইমাম নববীর এই অবিশ্বাস্য অবস্থান সত্ত্বেও, এই শর্তসাপেক্ষ সর্বভুকতা (cannibalism)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার সাথে একমত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তদুপরি, ইসলামের শত্রুসেনা অথবা নামাজ পরিত্যাগকারী অথবা বিবাহিত ব্যভিচারকারীদের বাকি মানুষদের থেকে ভিন্ন করে দেখার জন্য কোনো বিশেষ দলিল কুরআন এবং সুন্নাহ এ দু’টি মুখ্য সূত্রে অনুপস্থিত।

এই কল্পিত পরিস্থিতি নিয়ে আল-গাজ্জালীর (র.) মতামত নিয়ে নিয়াজী এভাবে আলোকপাত করেন:

> এই পরিস্থিতিটি হচ্ছে একদল মানুষকে নিয়ে যারা নৌকায় করে সাগরে আটকে পড়েছে এবং অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন। তারা লটারি করে যে তাদের মধ্যে একজন সহযাত্রীকে হত্যা করা হবে এবং তার দেহ অন্যরা ভক্ষণ করবে জীবন রক্ষার জন্য। এর বৈধতার জন্য এমন একটি অপরিচিত (গরিব) নিয়মের শরণাপন্ন হতে হয় যা

৪৪২ Hallaq, 2004, p. 31, quoting the works of Imam Nawawi, al-Majmu’: Sharh al-Muhadhdhab, (Cairo: Matba’at al-Tadamun, 1344/1925), 9:43-44.

শরিয়া প্রত্যাখ্যান করে, কেননা আল-গাজ্জালী এটার বৈধতার জন্য আরো তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন:

- প্রথমত, যদিও নৌকার যাত্রীদের জীবন রক্ষা করা অপরিহার্য এবং সে জন্য যদি হারাম খাদ্যও খেতে হয়, সে অজুহাতে কোনো মানুষ হত্যা করা যেতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে আইনানুগ কারণ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। জীবনের সংরক্ষণ যেখানে শরিয়ার অন্যতম লক্ষ্য সেখানে কাউকে হত্যা করে জীবন রক্ষা করা শরিয়া অনুমোদিত কোনো কারণ হিসেবে বিবেচ্য নয়। তার মানে, শরিয়ার দৃষ্টিতে এটা 'জরুরি' নয়।
- দ্বিতীয়ত, নৌকার যাত্রীদের জন্য কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, একজনকে হত্যা করে তার দেহ ভক্ষণ করলে তাদের জীবন রক্ষা হবে। এটাও সম্ভব যে তারা হয়তো সাগরেই থেকে যাবে এবং উদ্ধার পাবে না। তাই ফলাফলটি কাত্‌'ই বা অকাট্য নয়।
- তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ পরিস্থিতিটি নৌকার কয়েকজন যাত্রী সংক্রান্ত, সমগ্র উম্মাহ-সংক্রান্ত নয়। তাই এটা সামগ্রিকভাবে প্রয়োজন নয়, অর্থাৎ 'কুল্লি' শর্ত এখানে পূরণ হচ্ছে না, আর তাই এটা জনস্বার্থ হিসেবে গণ্য নয়।

এই অবস্থায় কোনো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা শরিয়া-অনুমোদিত নয়, কারণ আল-গাজ্জালী আরোপিত তিনটি অতিরিক্ত শর্ত এখানে পূরণ হচ্ছে না। তাই বাকি সহযাত্রীদের স্বার্থ এখানে প্রত্যাখ্যাত হবে।[৪৪৩]

নিয়াজীর আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, কেমন করে ইসলাম আইন ও বিধিবিধান আইনসর্বস্ব প্রবণতায় অতিরঞ্জিত হয়েছে, এবং এতটাই যে ইসলামীই হোক আর মানবিক মূল্যবোধই হোক দুটোই এখানে উপেক্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, ইমাম নবাবী (র.) এখানে স্পষ্টতই ভাবেননি যে, এই হুকুমের আলোকেই অমুসলিমরা যদি মুসলিমদের ব্যাপারে অবস্থান নেয় - অর্থাৎ কোনো কোনো অবস্থায় তারাও যদি মুসলিমদের তাদের খাদ্য-তালিকায়

৪৪৩ Nyazee, pp. 247-248.

অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাহলে? তাছাড়া জীবন-মরণের মতো চরম অবস্থার শিকার হলে কে কী করবে সে ব্যাপারে আগে থেকেই ঠিক করে বলা যায় না, তেমনি তা বিধিবদ্ধও করা যায় না। যদি কেউ সত্যিই এরকম অবস্থার শিকার হয়ে থাকে এবং ফুকাহার মতামত জানতে চায়, সেটা ভিন্ন। কিন্তু এজাতীয় কোনো মতামত যদি কল্পনাপ্রসূত অবস্থা নিয়ে ফকীহদের দূরকল্পী (স্পেকুলেটিভ) যুক্তি-বিশ্লেষণের ফসল হয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য, কারণ হুকুম নিরূপণের বিষয় কল্পনাপ্রসূত অবস্থার পরিবর্তে বাস্তব অবস্থার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সেক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত উসূলে ফিকহের এই নীতির পরিপন্থি হবে।

বস্তুত এই ধরনের ফিক্হী অবস্থান মৌলিক মানব মর্যাদা, যা কুরআন পবিত্র গণ্য করে, সেই ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থি [২য় অধ্যায়ে আলোচিত #১ মূল্যবোধ]। জীবন পবিত্র বলে নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য অন্য আরেকজন মানুষকে হত্যা করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করা– তা সে মানুষ হিসেবে যেই হোক না কেন, তা মানবীয় বিবেচনার আওতার মধ্যেই হতে পারে না। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আরেকজনকে খাবারে পরিণত করার ধারণা ন্যায়নীতি, নৈতিকতা এবং মৌলিক মানব মর্যাদার পরিপন্থি, যার উর্ধ্বে ইসলাম, কুরআন এবং নবিজির (স.) আদর্শ। এরকম ক্ষেত্রে পাপীর জন্য, অমুসলিমের জন্য, এমনকি শত্রুর জন্য জীবন দেওয়ার মধ্যে ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য। এটা পরিষ্কার যে, ইমাম নবাবীর (র.) মতো উচুঁ মর্যাদার এবং মহান একজন মুসলিম মনীষীর দাবি অনুযায়ী এ ব্যাপারে ইজমা থাকলেও, আসলে সে রকম কোনো ইজমা তো নেই, যেমনটি অন্য মনীষীরা আলোকপাত করেছেন: "যদি একদল লোক অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তাহলে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্য মানুষকে হত্যা করে খাদ্য বানানো বৈধ নয়, তার কারণ এতে 'মাস্লাহা' বা জনস্বার্থ আংশিক, পূর্ণ নয়।"[৪৪৪]

ইজমার অতিমাত্রিক ব্যবহারের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে তার সবই জ্ঞানগর্ভ সূত্র থেকে নয়, কিন্তু এটা যে অতি সহজেই এবং খুঁটিনাটি বিষয়েও ব্যবহার করা হয় তা সুস্পষ্ট। দুঃখজনক যে, যে উদাহরণগুলো পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে ব্যবহার এবং অপব্যবহার দুটোরই সমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যদিও উভয় দিকেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো ইজমার আসলে অস্তিত্ব

---

888 Hasan, 2003, p. 280; quoting al-Ghazali, Al-Mustasfa min Ilm al-Usul [Cairo: Matba'ah Mustafa Muhammad], Vol. II, p. 141.

নেই। ঐ উদাহরণগুলোতে লেখক নিছক নিজে থেকে ইজমা দাবি করছেন, যার জন্য যেন কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অনেক ক্ষেত্রে কারো কারো ধারণা (impression) হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইজমা আছে, কিন্তু নিছক ভুল, অসমর্থিত কিংবা মিথ্যে দাবির ভিত্তিতে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছেন এভাবে:

> ইজমার অর্থ হচ্ছে যে উম্মাহ্‌র সব ওলামা কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। আর যখন কোনো আইনি বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা মেনে নিতে অস্বীকার করা বৈধ নয়। তার কারণ সমগ্র উম্মাহ কোনো ভুলের ওপর ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যে ব্যাপারে মানুষ মনে করে যে সেগুলোর ব্যাপারে ইজমা আছে, অথচ আসলে তা নয়। বরং অনেক বিষয়েই সেই ধারণা (যে ব্যাপারে মনে করা হয় ইজমা আছে) তার বিপরীতটাই সঠিক এবং স্বীকৃত।"[৪৪৫]

মুসলিম মনীষী এবং ফকীহ্‌দের মধ্যে এটা একটা সাধারণ প্রবণতা রয়েছে প্রায় অনেক ব্যাপারেই তারা ফিকহী রায় দেন তার সমর্থনে খুব সহজেই এবং প্রায়শই ইজমার দাবি করার ভিত্তিতে। ইজমার প্রভাব এতটাই যে, তার কথা শুনলেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অন্তর কেঁপে ওঠে (এ বিশ্বাসের কারণে যে ইজমা অভ্রান্ত)। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, ইজমা আসলে একটি বিরল ব্যাপার; কেউ কেউ বলেন যে, বেশিরভাগ দাবিকৃত ইজমা আসলে মরীচিকার মতো, যার আসলে অস্তিত্ব নেই। যেমনটি ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান বলেছেন যে সামান্য কিছু মৌলিক বিষয় ছাড়া ইজমার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

> ইজমা সেই সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে কোনো হুকুম নিরূপণে কুরআন অথবা সুন্নাহ থেকে কোনো ভাষ্য (টেক্সট) নেই। ... ফকীহদের মধ্যে ইজমার বিরল দৃষ্টান্ত মেলে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত, জাকাত ফরজ ইত্যাদিতে। তবে (এগুলোর জন্য পৃথক কোনো ইজমার দরকার নেই, কারণ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত, রোজা ফরজ, ইত্যাদি) কুরআন, সুন্নাহ এবং রাসুলুল্লাহ্‌র সাহাবিদের ঐকমত্যের

৪৪৫ Mawdudi, 1983, p. 92, quoting Ibn Taymiyah. Fatawa [Cairo: Matba Kurdistan-al-Ilmiya, 1326 A.H], Vol. I, p. 406.

> ওপর প্রতিষ্ঠিত; এবং এগুলো সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। এগুলোর বাইরে অন্য কোনো বিষয়েই কোনো যথার্থ (absolute) ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বা মতদ্বৈধতা একটি চলমান বিষয়।[৪৪৬]

একই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাশিম কামালী বলেন:

> ইজমা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় ইজমার বিভিন্ন শর্ত বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে জটিলতাগুলোর ব্যাপারে ফকীহ্দের স্বীকৃতির মধ্যে। ইজমার ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞার পূর্ণ শর্ত– সবরকমের ইখতিলাফ বা মতদ্বৈধতার অনুপস্থিতির চূড়ান্ত বাস্তবতার প্রমাণ– প্রায় কখনোই পূরণ হতে দেখা যায়নি। প্রায়শই ইজমার দাবি করা হয়েছে যেখানে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্য রয়েছে, তাও হয়তো একটি বিশেষ মাযহাবের নিজস্ব পরিসরে অথবা বিভিন্ন মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে। অন্যদিকে হাদিসের ক্ষেত্রে রেওয়ায়েতের বিশ্বস্ততা বা বিশুদ্ধতা নিরূপণে যেভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, ইজমার দলিল বা সত্যতা নিরূপণে সেরকম দৃষ্টি আদৌ দেওয়া হয়নি।[৪৪৭]

ইজমার কথা বাদই দেওয়া যাক, পরিভাষাটির যেকোনো প্রচলিত অর্থেই, ব্যাপক ঐকমত্যও খুব দেখা যায় না। এই মন্তব্যটি মূল্যায়ন করতে হলে, পাঠকরা বিবেচনা করতে পারেন হানাফী মাযহাবের কথা, যেটাতে মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার পাশাপাশি তার দুই শিষ্য, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মাযহাবের রূপ দিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। আল-মারগিনানীর ‘হেদায়া’ ক্ল্যাসিক্যাল হানাফী ফিকহভিত্তিক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই বইটির প্রায় যেকোনো বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে (randomly) বেছে নিয়ে কেউ দেখতে পারেন যে, সেখানে কতগুলো বিষয় আছে যে ব্যাপারে এ মাযহাবের তিনজন প্রধান ব্যক্তিত্ব একমত হতে পেরেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই লেখকের সংগৃহীত একটি সংকলন দেখুন।[৪৪৮]

---

৪৪৬ AbuSulayman, 1987, p. 75; emphasis added.

৪৪৭ Kamali, 2003, p. 229.

৪৪৮ এই মতানৈক্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য দেখুন, “Disagreements in Hedaya,” Retrieved February 15, 2007, from Web site: https://www.

গ. ইজমা: সংজ্ঞা এবং সে ব্যাপারে মতৈক্যের অভাব

ইজমা নিয়ে সমস্যার সূচনাতেই রয়েছে ইজমার সংজ্ঞা। ইজমার সংজ্ঞা নিয়ে কোনো ইজমা (সর্বসম্মতিপূর্ণ মতৈক্য) নেই। প্রাসঙ্গিক জ্ঞানভান্ডার সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে এ বিষয়টির প্রমাণ সহজেই মেলে।

মজার ব্যাপার, ইমাম শাফেয়ীর (র., মৃ: ৮২০ খ্রি:) আগে ইজমার সংজ্ঞার বিষয়টি ওঠেইনি। এমনকি দশম শতাব্দীতেও মনীষী আবু বকর আল-জাস্‌সাস (মৃ: ৯৮০ খ্রি:) ইজমার কোনো সংজ্ঞা দেননি। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন মনীষী ইজমার সংজ্ঞা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে হাসানের (২০০৩) গ্রন্থে।[৪৪৯]

আবুল হুসাইন আল-বাসরী[৪৫০] (মৃ: ১০৮৫ খ্রি:): “কোনো কিছু করা বা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠীর বা জামায়াতের ঐকমত্য”।

ইমাম আল-গাজ্জালী (মৃ: ১১১১ খ্রি:): “কোনো দ্বীনি বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর (সা.) ঐকমত্য”।

আল-আমিদী (মৃ: ১২৩৩ খ্রি:): “কোনো বিশেষ বিষয়ে হুকুমের ব্যাপারে, একটি বিশেষ সময়, উম্মতে মুহাম্মদীর সবাই যারা ‘আহলে হাল ওয়া আকদ’[৪৫১] তাদের ঐকমত্য।”

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে ইজমার চারটি সংশ্লিষ্ট দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, এ চারটির কোনোটির ব্যাপারেই কোনো ইজমা বা ঐকমত্য নেই:

- কার ঐকমত্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়?
- যাদের ঐকমত্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের ন্যূনতম কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

---

researchgate.net/profile/Mohammad-Farooq-5/publication/362412823_Disagreements_in_Al-Marghinani’s_Hedaya_Hanafi_compendium_of_Islamic_laws_compiled_by_Dr_Mohammad_Omar_Farooq/data/62e8e8313c0ea87887763ed9/Disagreements-in-Hedaya.pdf

৪৪৯ Hasan, 2003, pp. 72-82.

৪৫০ আল-বাসরী একজন মু’তাযিলী আলেম এবং ফকীহ ছিলেন এবং আল-মু’তামিদ ফি উসূল আল-ফিক্‌হ-এর গ্রন্থকার। ফখরুদ্দীন রাযী-র মাহসূল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত উসূলের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় রকমের প্রভাবশালী গ্রন্থ ছিল।

৪৫১ i.e., ahl al-hal wa al-aqd.

- ইজমা কত সময়ের জন্য প্রযোজ্য?
- কী ধরনের বিষয়াদি ইজমার আওতায় পড়ে?

এ পর্যায়ে কাদের ঐকমত্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা যাক।

> প্রচলিত মতামত অনুযায়ী ইজমা হচ্ছে উম্মাহ্ অথবা সকল আলেমদের সর্বসম্মত ঐকমত্য।[৪৫২]

উল্লেখ্য, ইজমা কি সমগ্র উম্মাহ্র না আলেমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয় সে ব্যাপারে প্রচলিত মত একমতে পৌঁছতে ব্যর্থ। ইমাম শাফেয়ীর (র.) মত অনুযায়ী, ইজমা ইজমা হয় না যদি না তা সমগ্র উম্মাহ্র সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে না হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র.) 'রিসালা'র অনুবাদের মুখবন্ধে মাজিদ খাদ্দুরী ব্যাখ্যা করেছেন:

> ইজমা বলতে শাফেয়ী নিছক মুসলিম বিশ্বের একটি শহর বা এলাকার কিছু আলেমদের কথা বোঝাননি, যেমনটি বুঝিয়েছেন হিজাজ এবং ইরাকি ফকীহ্রা। মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে তিনি ইজমা গণ্য করেছেন সর্বজনীন পর্যায়ে যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহই অন্তর্ভুক্ত। যেসব মৌলিক বিষয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাফেয়ী যুক্তি দিয়েছেন যে, সেগুলোর ব্যাপারে ইখতিলাফ থাকতে পারে না। বিস্তারিত বিষয়াবলির ব্যাপারে একাধিক মত বা উত্তর থাকতে (পারে এবং তা) থাকলে ইসতিহ্সান (ফকীহর দেওয়া অগ্রাধিকার)-এর ভিত্তিতে তার একটি গৃহীত হতে পারে। প্রথম দিকের ফকীহরা তাদের নিজস্ব (যুক্তি-বিশ্লেষণভিত্তিক) অগ্রাধিকারকে শাফেয়ীর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪৫৩]

এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য যে, ইমাম শাফেয়ীর সংজ্ঞা স্পষ্টতই অবাস্তব এবং অকার্যকরী। তবু এ বিষয়টা এড়ানোর উপায় নেই যে, অন্যান্য ইমাম বা স্কলারদের মতে যেখানে ইজমা আছে, সে সবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমাম শাফেয়ীর সংজ্ঞা অনুযায়ী ইজমা নেই। তাছাড়া, ইমাম মালিক, ইমাম আল-গাজ্জালী এবং

---

৪৫২ Hasan, 2003, p. 75.

৪৫৩ Al-Shafi'i's Risala, Khadduri's Introduction, p. 33.

ইবনে হাজম (প্রমুখ র.) (সর্বশেষজন যাহিরী মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী) ইজমার ব্যাপারে যথেষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন।

ইমাম মালিকের (র.) কাছে ইজমা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ্‌র মদিনাবাসী - সাহাবি এবং তাবেয়ীদের (ঐকমত্য) নিয়ে)।[৪৫৪]

> মালিক ... শুধুমাত্র তার নিজের বসতি মদিনার আলেমদের (ঐকমত্যভিত্তিক) ইজমার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৪৫৫]
>
> বৃহত্তর উম্মাহ্‌ নিয়ে শাফেয়ীর ইজমা তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন অন্য মনীষীরা, যার মধ্যে তার কিছু উল্লেখযোগ্য অনুসারীও রয়েছেন, যদিও গাজ্জালী মৌলিক ব্যাপারে সর্বজনীন ঐকমত্যকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিস্তারিত পর্যায়ে তিনি আলেম বা বিশেষজ্ঞদের ইজমাকে মেনে নিয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ্‌র অংশগ্রহণভিত্তিক ইজমার মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে পদ্ধতিগত– এমন পদ্ধতির অভাব যার মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহ্‌ (সর্বজনীন) কোনো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে।[৪৫৬]
>
> যাহিরীদের কাছে, যথার্থ ইজমা শুধুমাত্র সাহাবিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে।[৪৫৭]
>
> ইবনে জরীর আল-তাবারী এবং আবু বকর আল-রাজী সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্যকেও ইজমা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[৪৫৮]

আর ইবনে তাইমিয়ার (র.) মতেঃ

> ইজমা মানে কোনো বিশেষ বিষয়ে যাতে উম্মাহ্‌র সব আলেম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।[৪৫৯]

যাহিরীরা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইজমাকে সীমিত করেছেন শুধুমাত্র সাহাবিদের ঐকমত্যের মধ্যে (অর্থাৎ ইজমা আস-সাহাবা)। মজার ব্যাপার হলো, খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কোনো প্রবক্তা ‘ইজমা

---

৪৫৪ Muslehuddin, p. 146.
৪৫৫ Al-Shafi'i, p. 37, n109.
৪৫৬ Al-Shafi'i, pp. 38-39.
৪৫৭ Muslehuddin, p. 81.
৪৫৮ Mawdudi, 1983, p. 90.
৪৫৯ Mawdudi, 1983, p. 92.

আস-সাহাবা'কে সাংবিধানিক মর্যাদায় সমাসীন করতে চায়। তকীউদ্দীন আল-নাব্হানী [মৃ: ১৯৭৯ খ্রি:] তার গ্রন্থ 'দ্য সিস্টেম অব ইসলাম' [নিজাম আল-ইসলাম]-এ খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি খসড়া সংবিধান পেশ করেছেন।

> বিধি ১২: শরিয়ার আহকামের দলিল হিসেবে শুধুমাত্র চারটি উৎস বিবেচিত হবে: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা আস-সাহাবা এবং কিয়াস। এই উৎসগুলোর বাইরে থেকে কোনো আইনের দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে না।[৪৬০]

যদিও এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, ইসলামী আইনগুলো চারটি মৌলিক উৎস থেকে গ্রহণ করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে ইজমা, তবু ইজমাকে ইজমা আস-সাহাবার মধ্যে সীমিত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ না এ ব্যাপারে কোনো ইজমা বা মতৈক্য আছে আর না অন্য সব মত বা সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে একটি বিশেষ মতকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া সমীচীন। এটা বলা যেতে পারে যে, কিছু কিছু বিষয় আছে যে ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে[৪৬১] এবং ধর্মীয় অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এটাও দাবি করা যেতে পারে যে, 'ইজমা আস-সাহাবা'ই একমাত্র সঠিক ইজমা, কিন্তু যেহেতু সংবিধান একটি আইনসম্মত বাধ্যবাধকতামূলক দলিল বা চুক্তি, ইজমাকে শুধুমাত্র 'ইজমা আস-সাহাবা'তে সীমিত করা এবং তাও একটি ডগ্‌মা

---

৪৬০ al-Nabhani, p. 118.

৪৬১ একটি বিষয়ে যে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং সাহাবাদের (রা.) ইজমা রয়েছে, তা হলো যে কুরআন যেমনটি নবিজির (স.) ওপর নাজিল হয়েছে ঠিক অবিকলভাবেই তা কুরআনে এসেছে; সেই কুরআন যা লিখিত আকারে তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) সময় থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সংরক্ষিত রয়েছে। তবে, এই ইজমা নিছক কুরআন সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে। আল্লাহ্ থেকে নবিজির (স.) কাছে আসা ওহি চূড়ান্ত, সরাসরি এবং অক্ষরে অক্ষরে কুরআনে সংরক্ষিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা কোনো ইজমার ওপর ভিত্তি করে নয়। বরং, নাজিল হওয়া আসমানি বাণী হিসেবে কুরআন কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কারণ, আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি কুরআন নাজিল হওয়ার কারণে তা অভ্রান্ত, যে অভ্রান্ত হওয়ার মর্যাদা অন্য আর কোনো উৎসের জন্য প্রযোজ্য নয়। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ইজমার অভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন থেকে কোনো মতৈক্যভিত্তিক প্রমাণ নেই। তাছাড়া কুরআনের ভিত্তিতেই যদি একটি মৌলিক উৎস হিসেবে ইজমার অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তারপর সেই ইজমার ভিত্তিতেই কুরআন আসমানি হিসেবে নাজিল বাণীর সংরক্ষণের বিষয়ে ইজমার দাবি করা হয়, তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় বৃত্তাকার যুক্তি (circular logic), যা গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এমনকি একটি অপরিহার্য উৎস হিসেবে হাদিসের ক্ষেত্রেও, যেমনটি আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, হাদিস কুরআনের মত অভ্রান্ত শ্রেণিতে পড়ে না।

বা আকিদার পর্যায়ে উন্নীত করার কোনো ভিত্তি নেই।[৪৬২] যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে, তাদের মতের কী হবে? বস্তুত যেখানে আলেমদের মতৈক্যের অগ্রাধিকারটি ইজমাকে 'ইজমা আস-সাহাবা'য় সীমিত করার পক্ষে নয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এটাকে একটি আকিদার পর্যায়ে ওঠানো, বিশেষ করে যেখানে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে, তা একটি মারাত্মক প্রস্তাবনা।

তাছাড়া, এই অবস্থান থেকে কার্যকারিতার দিক থেকে কোনো উৎকৃষ্টতর কিছু বের হয়ে আসে না। তার কারণ এই যে সাহাবিদের নিজেদের মধ্যেই খুব বেশি বিষয়ে ইজমা ছিল না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইজমার সঠিকতা গ্রহণ করলেও, তিনি সবার চোখ খুলে দিয়েছেন:

> আমি নিজেই কোনো সাহাবির অবস্থান গ্রহণ করব, যদি তা আমি পাই আল-কিতাবে, অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহতে, অথবা ইজমায় অথবা সমপর্যায়ের অন্য কিছু যা চূড়ান্তভাবে সেই বিষয়ের সমর্থন দেবে, অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে। কিন্তু [খুঁজতে গেলে] একজন সাহাবি থেকে এমন কোনো অবস্থান বিরল যার বিপরীতে অন্য আরেকজন সাহাবির ভিন্ন মত নেই।[৪৬৩]

এই আলোচনা থেকে এটা আর অস্পষ্ট থাকে না যে, যদিও কোনো কোনো মুসলিম মনীষীর মতে সুনিশ্চয়তার কারণে ইজমার অগ্রাধিকার কুরআন, সুন্নাহ এবং কিয়াসের ঊর্ধ্বে, বাস্তবে উসূলে ফিকহের তৃতীয় উৎস ইজমার ব্যাপারে সত্যিই কোনো ঐকমত্য নেই। তা সত্ত্বেও মজার ব্যাপার, ঐতিহ্যবাদী

---

৪৬২ বস্তুত, এই অবস্থানের যুক্তির অসারতা পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন আমরা কে সাহাবি আর কে নয় সে সংজ্ঞা বা মানদণ্ডের দিকে নজর দেই। অনেকে যেমন সাহাবাদের ইজমাই একমাত্র যথার্থ ইজমা হিসেবে দেখেছেন, তেমনি নাবহানীকেও কে সাহাবা তার নিরূপণে লিপ্ত হতে হয়েছে। নাবহানীর মত অনুয়ায়ী, যার সাথে রয়েছেন তার ভক্তবৃন্দ, সাহাবারা তারাই গণ্য হবেন যারা অন্তত: এক বছর তার সান্নিধ্য পেয়েছেন অথবা অন্তত একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। [দেখুন, কিতাব আল-ওয়া'আ, গ্রন্থকার: আতা আবু রাশ্তা, নাবহানীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান] স্পষ্টতই, এই এক বছরের সান্নিধ্য অথবা অন্তত এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ, এটি ভ্রমপ্রবণ মানুষের অবাধ (arbitrary) ব্যাখ্যাভিত্তিক। যে ধারণাকে অভ্রান্ত মনে করা হবে এবং যার ভিত্তিতে তা কুরআনের সমকক্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে এরকম মৌলিক উৎস এরকম অবাধ ব্যাখ্যাপ্রসূত হতে পারে না। যদি ইজমার এরকম সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা নিছক কাজ চালানোর জন্য তা হতে পারে (working definition), কিন্তু তাকে আকিদা বা (dogma) সাংবিধানিক পর্যায়ে নেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

৪৬৩ Al-Shafi'i, p. 350.

গ্রন্থাবলিতে মীমাংসা সম্ভব নয় এমন ফিকহী মতভেদের উল্লেখের পর, সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত টানা হয় তা অনেক সময় যুক্তি-প্রমাণ থেকে যা প্রমাণিত হয় তার একেবারে বিপরীত।

> উপর্যুক্ত আলোচনা স্পষ্ট করে যে, কোনো ভাষ্য (নাস্) বিশেষ ব্যাখ্যা অথবা কোনো কিয়াস, ইজতিহাদ বা প্রয়োজনীয় প্রণীত বিধি (legislation) যদি উম্মাহ্‌র ইজমা অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা আইনে পরিণত হয় এবং শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রামাণ্য গণ্য হয়। যদি এরকম আইন মুসলিম জাহানের জ্ঞানী ও মনীষীদের দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে তা সমগ্র উম্মাহ্‌র ওপর বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, এবং যদি তা কোনো বিশেষ দেশ অথবা অঞ্চলের জ্ঞানী-মনীষীদের দ্বারা হয়ে থাকে, তাহলে তা সেই দেশ বা অঞ্চলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।[৪৬৪]

স্পষ্টতই, এসব অনড় ব্যাখ্যাতাদের দৃষ্টিতে এমন কোনো কিছুই হতে পারে না যার মাধ্যমে ইজমার অবস্থান খর্ব হয়। এ পর্যন্ত ইজমা প্রসঙ্গে শুধু প্রথম প্রশ্ন (কাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজমা হয়?) এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং স্পষ্টতই এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য নেই। যখন বাকি তিনটি দিক পর্যালোচনা করা হয়, এটা অধিকতর স্পষ্ট হয় যে, সমস্যা আরো জটিল এবং মতভেদ আরো গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু তাতেও ইজমার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে ঐতিহ্যবাদী অবস্থান এতটুকুও শিথিল হয় না।

> সবাই একমত যে ইজমা একটি চূড়ান্ত দলিল। তার মানে, যখন কোনো আসমানি ভাষ্য (নাস্) অথবা ইজতিহাদ, কিয়াস কিংবা প্রাসঙ্গিকভাবে প্রণীত বিধির ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা সবার ওপর বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং তার আনুগত্য অপরিহার্য। মতভেদ হয় শুধু তখনি যখন কোনো হুকুমের ব্যাপারে ইজমা আছে কী নেই তার নিষ্পত্তি হয়নি। ইজমার প্রামাণ্যতা নিয়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। বিতর্ক এই পয়েন্টে হয়: এটা (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে না হয়নি।[৪৬৫]

---

৪৬৪ Mawdudi,1983, p. 92.

৪৬৫ Mawdudi, 1983, pp. 90-91.

> ফিক্‌হের দলিল হিসেবে ইজমার প্রামাণ্যতা সেই পর্যায়ের যে পর্যায়ের মর্যাদা আসমানি উৎস [অর্থাৎ, কুরআন এবং সুন্নাহ]-এর।[৪৬৬]

অন্য কেউ কেউ আরো অগ্রসর হয়ে ইজমাকে অগ্রহণযোগ্যভাবে আসমানি উৎসের পর্যায়ে উঠিয়েছেন।

> ক্ল্যাসিক্যাল ফকীহ্‌রা মনে করেছেন যেকোনো আইন যদি ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে অনুযায়ী এবং সেজন্য তা আল্লাহ তায়ালা থেকে নাজিল হওয়ার সমতুল্য।[৪৬৭]

ঘ. উৎস হিসেবে ইজমার সীমাবদ্ধতা

এটা আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ যেসব বিষয়ের ব্যাপারে ইজমা দাবি করা হয়, তারও আগের সমস্যা হচ্ছে যে কিসে ইজমার প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য নেই। ইসলামী আইনের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে ইজমার আসন নিরূপণ করতে অনেক মনীষী কুরআন থেকে দলিল চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। পৃথকভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্নজন দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। সেগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা ইজমা নিয়ে মাত্র একটি অধ্যায়ে সম্ভব নয়। কিন্তু হাসান (২০০৩) তার ইজমা বিষয়ক গ্রন্থে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, কুরআন থেকে ইজমার প্রামাণ্যতার দলিল খাড়া করানোর চেষ্টা সফল হয়নি এবং ইজমার ধারণার উৎস স্বয়ং কুরআন এ দাবির বিপরীতে অনেক প্রখ্যাত মনীষী তাদের যুক্তি পেশ করেছেন।

> ইজমার ভিত্তি হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ এবং যুক্তিবুদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফকীহদের মধ্যে প্রায় ঐকমত্য রয়েছে যে, যেসব কুরআনি আয়াতকে ইজমার দলিল হিসেবে পেশ করা হয় তা স্পষ্ট করে প্রামাণ্যতা প্রমাণ করে না। হাদিসকে আরও অনেক বেশি মাত্রায় ইজমার দলিল হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফকীহদের মতে কুরআনের চেয়ে এসব হাদিস ইজমার সমর্থনে আরো স্পষ্ট এবং শক্তিশালী।[৪৬৮]

---

৪৬৬ Sh. Yusuf Talal DeLorenzo, in Thomas (ed.), p. 7.
৪৬৭ Alauya, p. 65.
৪৬৮ Hasan, 2003, p. 17.

> আলেমরা মোটামুটি এই ঐকমত্যের কাছাকাছি যে ইজমার সমর্থনে যেসব কিতাবী (টেক্সচুয়্যাল) দলিল পেশ করা হয় তা চূড়ান্ত কোনো প্রমাণ নয়। তারপরেও, এটা যোগ করা যেতে পারে যে আল-গাজ্জালী এবং আল-আমিদী, এ দু'জনের মতেই কুরআনের সাথে তুলনা করলে ইজমার ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে আরো জোরদার যুক্তি মেলে।[৪৬৯]

যেহেতু না কুরআনকে আর না হাদিসকে ইজমার উৎস বা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাহলে প্রশ্নটি রয়েই যায় যে ইজমার প্রামাণ্যতার ভিত্তি কী? কিছু শীর্ষস্থানীয় মনীষী ফিকহের প্রামাণ্য উৎস হিসেবে ইজমার অভ্রান্ত হওয়ার ভিত্তি হিসেবে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় মানব যুক্তিবুদ্ধিকে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। যেমনটি নিম্নোক্ত সারাংশে পেশ করা হয়েছে, ইজমার ভিত্তি হিসেবে সব সম্ভাব্য বিকল্প পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করার পর ইমাম গাজ্জালী (র.) আত্মসমর্পণের মতো ওপরের দিকে দু'হাত তুলেন এবং প্রস্তাব করেন যে, ইজমার ভিত্তি আসলে নিছক প্রথাগত। অর্থাৎ, ইজমা গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে কুরআন বা হাদিসের ভিত্তিতে নয়, বরং নিছক এই ভিত্তিতে যে মুসলিমরা একটি প্রথাগত রীতি (customary standard) হিসেবে গ্রহণ করেছে।

> অর্থোডক্সি যদিও তার মন-প্রাণ নিবেদিত করেছে ঐতিহ্যবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর ইজমার প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, কিন্ত এ ব্যাপারে যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের সম্মত করাতে সক্ষম হয়নি। ইজমার ঐতিহ্যবাদী মতাবলম্বী কিছু ফকীহ, যেমন আল-জাস্‌সাস এবং আল-বাযদাভী, নিছক মানব যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তিতে উম্মাহর অভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে সংশয় পোষণ করেছেন। ... আল-গাজ্জালী, যদিও ঐতিহ্যবাদী, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ফ্যাক্‌চুয়্যাল ভিত্তিতে বেশ প্রবলভাবে ইজমার সমর্থন করেছেন, এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে তিনি নিজেও এসব যুক্তি প্রমাণে তেমন তৃপ্ত হননি। তার গ্রন্থ 'আল-মানখুল'-এ তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে রায় দিয়েছেন যে ইজমাকে শুধু 'উর্‌ফ' বা গৃহীত প্রথার ভিত্তিতেই সমর্থন করা যায়। তিনি মন্তব্য করেন: 'যুক্তিবুদ্ধির ভিত্তিতে ইজমাকে প্রতিষ্ঠিত বা

---

৪৬৯ Kamali, 2003, p. 236.

> সমর্থন করার কোনো আশাই নেই। কুরআনের আয়াত অথবা মুতাওয়াতির হাদিস, যা আসমানি পর্যায়ের মর্যাদা রাখে, তা ইজমার প্রামাণ্যতার দলিল জোগায় না। ইজমার ভিত্তিতে ইজমার সমর্থনও কোনো দলিল হতে পারে না। অকাট্য উৎসের ব্যাপারে কিয়াসের মতো সম্ভাব্য দলিলের ভিত্তিতে ইজমাকে দাঁড় করানো যায় না। এগুলোই উসূলে ফিকহের মৌলিক উৎস। এগুলোর বাইরে প্রথাগত রীতি ('মাসালিক আল-'উর্ফ) ছাড়া আর কোনো উৎসই বাকি থাকে না। ইজমার মন্ত্র (doctrine) সম্ভবত এই সূত্র থেকেই এর মর্যাদাপূর্ণ আসন অর্জন করেছে।'[৪৭০]

ইজমা নিয়ে মুসলিম ওলামা এবং ফুকাহার এতটা মাতামাতি (preoccupation) এবং মোহাবিষ্টতা (fascination) কেন? উত্তরটা একেবারেই সহজ-সরল: ইজমার যে সংজ্ঞাই হোক না কেন, যেকোনো বিষয়ের সমর্থনে দলিল হিসেবে ইজমার মর্যাদাকে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিও দলিলের আর কোনো উৎসের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে ওলামা/ফুকাহা সাধারণভাবে মনে করে না। পাঠকরা হয়তো মনে রেখেছেন:

> শুধুমাত্র ইজমা সকল সংশয়ের নিরসন করতে পারে এবং যখন কোনো হুকুমের ব্যাপারে ইজমার সমর্থন থাকে, তা চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ... ইজমা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রামাণ্য হয়ে যায়।"[৪৭১]

ইজমার সমর্থনে যে হাদিস সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত হয় তা হচ্ছে: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'আমার উম্মাহ কখনোই কোনো ভ্রান্তির ওপর একমত হবে না।[৪৭২] এই হাদিসের তারতম্যপূর্ণ বিভিন্ন বর্ণনা অন্যান্য সংকলনেও আছে, যেমন 'জামে আল-তিরমিজি' এবং 'মুসনাদে আহমদ'।[৪৭৩] অবশ্যই, তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে, যদি কোনো কিছুর ওপর উম্মাহ ঐকমত্যে পৌঁছে, অর্থাৎ ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় অভ্রান্ত এবং তাই, অবিসংবাদিত।

---

৪৭০ Kamali, 2003, p. 67.

৪৭১ Kamali, 2003, p. 232.

৪৭২ Ibn Majah, Vol. 5, Kitab al-Fitan, #3950, p. 282, https://sunnah.com/ibn-majah:3950. . লক্ষ্যণীয় যে এ হাদিসটি জঈফ হিসেবে বিবেচিত।

৪৭৩ Hasan, 2003, p. 50.

কিন্তু ইজমার সমর্থনে এই হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস[৪৭৪] যা সচরাচর উল্লেখ করা হয়, সেগুলোর মৌলিক সমস্যা এই যে এসব হাদিস মুতাওয়াতির নয়, আর তাই না রেওয়ায়েতের ভাষ্য আর না অর্থ বা তাৎপর্যের দিক থেকে এসব হাদিস থেকে নিশ্চিত কোনো জ্ঞান বা তথ্য পাওয়া যায়। বস্তুত মুতাওয়াতির হওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান জোগানো তো দূরের কথা, সুনান ইবনে মাজাতে রয়েছে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা:

> আল-যাওয়ায়েদের মতে, এই ইসনাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আবু খায়েফ আল-আ'মা, যে হাযিম বিন 'আতা নামে পরিচিত এবং সে যঈফ (দুর্বল)।[৪৭৫]

মজার ব্যাপার, ঐ বিশেষ হাদিসটির শেষে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি রয়েছে: "যখন তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখ, তখন তোমাদের ওপর এটা আবশ্যিক যে তোমরা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ (আস-সাওয়াদ আল-আ'যাম)-এর সাথে থাকবে।" হাদিসটির প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে একটি বড় ধরনের তারতম্য দেখা যায়। প্রথম বাক্যটি বলছে যে উম্মাহ কখনোই কোনো ভ্রান্তির ওপর ঐকমত্যে পৌঁছবে না; অথচ দ্বিতীয় বাক্যটিতে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই যে ভ্রান্তিহীনতা (infallibility)-র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা উম্মাহ্‌র ব্যাপারে প্রযোজ্য; উম্মাহ্‌র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, ওলামা, বিশেষজ্ঞ কিংবা কোনো সংকীর্ণ গোষ্ঠীর ব্যাপারে নয়। তাছাড়া এই হাদিস ইজমার ব্যাপারে কোনো সময়সীমাও নির্ধারণ করে দেয়নি। তাই, এই বাস্তবতা বুঝতে খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে সেরকম বিষয় খুব বেশি নেই যে ব্যাপারে উম্মাহ– অর্থাৎ সমগ্র উম্মাহ, সাহাবিদের প্রজন্ম থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মগুলো পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় - ইজমায় পৌঁছেছে বা কোনো ইজমা অব্যাহত রয়েছে।

প্রখ্যাত আলেমদের অনেকে আছেন যাঁরা ইজমার দলিল হিসেবে এই হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। আল-শাওকানীর মতে, "'আমার উম্মাহ্ কোনো ভ্রান্তির ওপর একমত হবে না' - এই হাদিসটির ব্যাপারে এটা উল্লেখযোগ্য যে রাসুলুল্লাহ (স.) এইসব হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তার উম্মাহ্‌র এক অংশ সব

৪৭৪ Hasan, 2003, p. 50.

৪৭৫ Ibn Majah, Vol. 5, p. 282; daif, অর্থাৎ দূর্বল.

সময় সত্যকে সমুন্নত রাখবে এবং বিরোধিতাকারীদের ওপর প্রাধান্য বজায় রাখবে। ইজমার সাথে এই হাদিসের কোনো যোগসূত্র নেই। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদিসগুলো ঐক্যবদ্ধতার ওপর জোর দেয় এবং (উম্মাহ্ অর্থে) জামায়াত থেকে দূরে সরে যাবার ব্যাপারে সতর্ক করে। এ হাদিসগুলো কুরআন এবং সুন্নাহ্র সমান্তরালে ইজমাকে ফিক্হের স্বনির্ভর দলিল হিসেবে প্রমাণিত করে না।"[৪৭৬] শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভীও (মৃ: ১৭৬২ খ্রি:) এ ব্যাপারে আল-শাওকানীর প্রতিধ্বনি করেছেন।[৪৭৭]

এতদসত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে মনীষীরা খুব সহজেই এবং প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ে ইজমার দাবি করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) আসলে কী বলেছেন বা করেছেন সে ব্যাপারে শুধু মুতাওয়াতির হাদিস থেকেই নিশ্চিতভাবে বা নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়। কিন্তু মাত্র কয়েকটি– আসলে এক ডজনেরও কম সংখ্যক মুতাওয়াতির হাদিস ছাড়া বাকি সব হাদিসই আহাদ পর্যায়ে এবং সেগুলো সহিহ হলেও তা থেকে শুধু বিভিন্ন মাত্রার সম্ভাব্য (probabilistic) জ্ঞান পাওয়া যায়।[৪৭৮] তাই একটি অভ্রান্ত সূত্র হিসেবে ইজমার দাবি যদি করা যায়, তাহলে যে কোনো বিষয়ে তা অনেক উচ্চতর সম্মান ও আনুগত্য পায়।

> দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে হাদিস একটি স্বতন্ত্র সূত্র হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের সাথে স্বীকৃত আমল (চর্চা) এবং বিক্ষিপ্ত হাদিসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মু'তাযিলারা সেসব হাদিস মেনে নেননি যেগুলো কুরআনের শিক্ষা এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত আমলের পরিপন্থি। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে তারা প্রায়ই অর্থোডক্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে তারা উম্মাহ্র প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিষয়ে (অর্থাৎ যেগুলো নিয়ে ইজমা আছে) তার পরিবর্তে আহাদ হাদিস গ্রহণ করে। এই বিতর্ক থেকে বোঝা যায় যে, আইন ও আকিদার নিরূপণে ইজমা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মতের (doctrine) সর্বোচ্চ গুরুত্বের কারণে, ইবনে কুতায়বা, মু'তাযিলাদের সমালোচনার জবাবে আহাদ হাদিসের চেয়ে ইজমার পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি বলেন: 'আমরা বিশ্বাস করি যে হাদিস বা

---

৪৭৬ Hasan, 2003, p. 193.

৪৭৭ Hasan, 2003, p. 227; Kamali, 2003, p. 255.

৪৭৮ আরো বিস্তারিতের জন্য দেখুন তৃতীয় অধ্যায়।

রেওয়ায়েতের পরিবর্তে আরো শক্তিশালীভাবে সত্য নিরুপিত হয় ইজমার ভিত্তিতে। তার কারণ হাদিস বিস্মৃত হতে পারে, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, রহিত হতে পারে এবং তা বর্ণনাকারী ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। কখনো হাদিস বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরস্পরবিরোধী হুকুম দেয় ... কিন্তু ইজমা এসব ত্রুটি ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। নিখুঁত ইসনাদের এমন হাদিসও ছিল যা কখনো কখনো উম্মাহ্ আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেনি।”[৪৭৯]

বস্তুত, অন্য আরো উল্লেখযোগ্য মনীষীরা ছিলেন, যেমন উসূলে ফিকহের অন্যতম বিশারদ আল-আমিদী, যিনি বিবেকসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ইজমা আসলে সম্ভাব্যতাভিত্তিক (probabilistic)।

সব বিবেচনার পর, এটাই প্রতীয়মান হয় যে আমিদী সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা ইজমাকে আইনের সম্ভাব্য দলিল (indicator) হিসেবে গণ্য করেন, যা থেকে নিছক বিশেষ মতামতের বেশি আর কিছুই পাওয়া যায় না। সত্য যে, তাকে মনে হয় ইজমার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে দুই নৌকায় পা রেখেছেন এই ঘোষণার মাধ্যমে যে (ইজমার সমর্থনকারী) কুরআনি আয়াত ও হাদিসগুলো দলিল হিসেবে ‘প্রায়’ চূড়ান্ত। কিন্তু ‘প্রায়’ চূড়ান্ত, টেকনিক্যাল দিক থেকে, চূড়ান্ত নয় এবং আমিদী তাই শেষ পর্যন্ত ইজমাকে সম্ভাব্যতাভিত্তিক হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হন। সে কারণেই নিরুপায় হয়েই তার এই অবস্থান নিতে হয় যে ইজমা আসলে একেকজন মুজতাহিদের ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময় বিচার-বিশ্লেষণভিত্তিক একটি সম্ভাব্য নির্দেশক (indicator)।[৪৮০]

ইজমা তত্ত্বের (doctrine) এ জাতীয় মৌলিক সমস্যার কারণেই ইমাম হাযম (যিনি ইজমাকে সাহাবিদের ঐকমত্য হিসেবে গণ্য করেন) যুক্তি দেন:

বিপুলসংখ্যক আহ্কামসংক্রান্ত বিষয়ে যে ব্যাপারে মনীষীরা ইজমা দাবি করেছেন আসলে সে দাবি সঠিক নয়। সেগুলোর অনেকগুলোই বিতর্কিত, আর অন্যগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে।[৪৮১]

৪৭৯ Hasan, 2003, p. 172.
৪৮০ Weiss, 1992, p. 254.
৪৮১ Hasan, 2003, p. 180.

ইমাম শাফেয়ী এবং তার সহ-আলোচক (interlocutor)-এর মধ্যে 'রিসালা'তে যে মতবিনিময় পেশ করা হয়েছে তা এই প্রেক্ষাপটে সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

> ৬৩৩. সে [অর্থাৎ, সহ-আলোচক] বলল: মদিনাবাসীদের ঐকমত্যভিত্তিক কোনো মত কি একজন ব্যক্তির বর্ণনা থেকে অধিকতর শক্তিশালী নয়? তাহলে কেন সে আমাদের কাছে কারো দুর্বল রেওয়ায়েত বর্ণনা করবে এবং [মনীষীদের ঐকমত্যভিত্তিক] অবস্থান যা বাধ্যতামূলক এবং অধিকতর শক্তিশালী তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে?
>
> ৬৩৪. [শাফেয়ী] জিজ্ঞেস করলেন: ধরা যাক কেউ তোমাকে বললো: এটা এ কারণে যে বর্ণনাটি বিরল এবং [এ ব্যাপারে] ঐকমত্যটি বর্ণনার জন্য অতি সুপরিচিত; তাহলে তুমি কি বলবে এ ব্যাপারে আসলে কি ঐকমত্য আছে?
>
> ৬৩৫. সে [সহ-আলোচক] জবাব দিলো: আমি অথবা কোনো মনীষীই বলবে না: 'এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে' যদি না এটা এমন একটি ব্যাপার হয়ে থাকে যে ব্যাপারে বর্ণনা অনেক মনীষী থেকে পাওয়া যায় যে তার কোনো পূর্বসূরী থেকে বর্ণনা করেছে, যেমন জোহ্‌রের নামাজ চার [রাকয়াত] এবং মদ হারাম, ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমি কাউকে বলতে শুনি: 'এ ব্যাপারে ইজমা আছে' (এমন সব ব্যাপারে) যে ব্যাপারে প্রায়শই আমি মদিনার কোনো মনীষীর সন্ধান পাই যার মত এর বিপরীত এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিকাংশ [মনীষীরাও] সেই দাবিকৃত ইজমার বিপরীত মত পোষণ করে।[৪৮২]

এটা বর্ণিত হয়েছে, চারটি মাযহাবের একটির প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ করেছেন: 'যেই ইজমার দাবি করে সে মিথ্যাবাদী'।[৪৮৩]

ইমাম ইবনে হাম্বলের যুক্তি এই যে, একজন এতটুকু দাবি করতে পারে যে একটি বিষয়ে কোনো মতভেদ বা বিপরীত মত বা অবস্থান জানা নেই বা জানা

---

৪৮২ Al-Shafi'i's Risala, pp. 318, #633-635.

৪৮৩ Quoting Ibn al-Qayyim. I'lam al-Muwaqqi'in, pt. 2, p. 179, Retrieved January 11, 2007, http://ourworld.compuserve.com/homepages/Abewley/usul5.html (বিকল্প El Shamsy, 2015, p. 56, citing Imam Ibn Taymiyyah and others.]

যায় না। কিন্তু কেউ যদি নিশ্চিত হিসেবে ইজমার দাবি করে তা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ ছাড়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

নীচে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইজমাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের একটি সারাংশ পেশ করা হলো যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য নেই।

নং	বিষয়	কোনো ইজমা আছে কি?
১	ইজমার সংজ্ঞা	ইজমা নেই
২	কার ইজমা?	ইজমা নেই
৩	যাদের মতের ভিত্তিতে ইজমা তাদের কি যোগ্যতা থাকতে হবে?	ইজমা নেই[৪৮৪]
৪	ইজমার প্রযোজ্যতার কোনো সময়সীমা আছে কি?	ইজমা নেই[৪৮৫]
৫	ইজমা কি ধরনের বিষয়ে হতে পারে?	ইজমা নেই[৪৮৬]
৬	ইজমার প্রামাণ্যতার উৎস কী (কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমা)?	ইজমা নেই
৭	উম্মাহ্ বা জামায়াতের অর্থ কী এবং এর ব্যাপ্তি কতটুকু?	ইজমা নেই[৪৮৭]
৮	যে হাদিসটিকে ইজমার ডক্ট্রিনের দলিল হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, সেই হাদিসে ব্যবহৃত শব্দ 'দালালা' অথবা 'খাতা'র অর্থ কী?	ইজমা নেই[৪৮৮]
৯	ইজমার ডক্ট্রিনের সমর্থক প্রমাণ বেশি পাওয়া যায় কিতাবী উৎস না যুক্তিবুদ্ধি থেকে?	ইজমা নেই[৪৮৯]
১০	হযরত আবু বকরের (রা.) খলিফা হিসেবে নির্বাচন কি ইজমা ছিল?	ইজমা নেই[৪৯০]

৪৮৪ Hasan, 2003, Chap. V.
৪৮৫ Hasan, 2003, Chap. VI.
৪৮৬ Hasan, 2003, Chap. VII.
৪৮৭ Hasan, 2003, pp. 58-60; also, Hallaq, p. 442, Kamali, p. 243.
৪৮৮ Hasan, 2003, pp. 60-61; Kamali, p. 242.
৪৮৯ Hasan, 2003, pp. 61-63.
৪৯০ Hasan, 2003, p. 78.

নং	বিষয়	কোনো ইজমা আছে কি?
১১	আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়াদি কি ইজমার আওতায় পড়ে?	ইজমা নেই[৪৯১]
১২	দুনিয়াবি বিষয়াদি কি ইজমার আওতায় পড়ে?	ইজমা নেই[৪৯২]
১৩	ইজমার জন্য ইতিবাচক মতপ্রকাশ আবশ্যক না অন্যদের নীরবতাতেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়?	ইজমা নেই[৪৯৩]
১৪	ইজমা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তা কি পরবর্তীকালে পাওয়া দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা যায়?	ইজমা নেই[৪৯৪]

ঙ: ইজমা প্রসঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিকোণ

মাযহাবগুলোর উদ্ভবের ধারায় সেগুলো পরে মাত্র চারটি ঐতিহ্যবাহী (সুন্নি) ফিকহী গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয় যার মাধ্যমে আইন, বিধিবিধান এবং আকিদা ভাণ্ডারের বিকাশ এবং তার পদ্ধতিগত কাঠামোর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো দিক থেকে চিন্তার বৈচিত্র্য এবং মতভেদের অবকাশ এক ধরনের গতিশীলতার পরিচায়ক। বিভিন্ন বিষয়ে পৌঁছা ঐকমত্য অথবা প্রায়-ঐকমত্য (near consensus) ধীরে ধীরে একেকটি মাযহাবের নিজস্ব গণ্ডিতে ইবাদত ও আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিধিবদ্ধ (স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড) হবে এটাই স্বাভাবিক এবং আকাঙ্ক্ষিত। তবে যা কিছুই অর্জিত হয়েছে তার মানে এই নয় যে, তারাবির নামাজ কি ৮ না ২০ রাকয়াত, জামাতের নামাজে ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শোনার পর 'আমিন' কি উচ্চস্বরে না নীরবে বলা হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আন্তঃমাযহাব পর্যায়ে গত পনর শতাব্দীতেও নিরসন হয়েছে। তাছাড়া যদিও আইন ও বিধিবিধান একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে আসার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রভাব ছিল মাযহাবগুলোর অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায়, তার সমান্তরালে আন্তঃমাযহাব পর্যায়ে রক্ষণশীলতা, এমনকি অসহনশীলতাও

৪৯১ Hasan, 2003, p. 105.
৪৯২ Hasan, 2003, p. 105.
৪৯৩ Hasan, 2003, Chap. VIII.
৪৯৪ Hasan, 2003, Chap. X.

বেড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হানাফী ফিক্‌হ অনুযায়ী একজন হানাফী পুরুষ এবং শাফেয়ী মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তা বৈধ (ভ্যালিড), কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তা বৈধ নয়।[৪৯৫] আর সুন্নিদের নিজেদের মধ্যে এ ধরনের গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতা থাকলে, সহজেই অনুমেয় শিয়া-সুন্নি পর্যায়ে তা কি বিষাক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বা আছে।

উল্লেখযোগ্য যে: আনুষ্ঠানিক ইবাদতসংক্রান্ত বিষয়ে একেকটি মাযহাবের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধতা আনতে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ইসলামী আইন ও বিধি-বিধানের বিকশিত ভান্ডার বহুলাংশে সমসাময়িক সময়ের সাথেই শুধু অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি, বরং ইসলামের যে সমস্ত মূল্যবোধ ও আদর্শ এসব আইনের মাধ্যমে সমুন্নত থাকার কথা সেগুলোর সাথে আইন-ভান্ডার বহুলাংশে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। ড. তারিক রামাদান এ প্রসঙ্গে বলেন:

> মুসলিমরা যে অতীতের কোনো ইজমার সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত এই মত না নতুন আর না আধুনিক। এই নীতির কথা বলেছেন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আবু আল-হুস্‌র আল-বাযদাভী তার 'উসূল আল-ফিকহ' গ্রন্থে। আল-বাযদাভী ছিলেন ৪র্থ-৫ম (হিজরি) শতাব্দীর। তার গ্রন্থটি উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান অবদান। তার অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ইজমা আমাদের জন্য কোনো বোঝা বা প্রতিবন্ধক হতে পারে না। যদি অতীতে কোনো ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে যদি উপযুক্ত (suitable) না হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে [নতুন] বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পুরনো ইজমা পরিবর্তন হতে পারে এবং নতুন ইজমা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।[৪৯৬]

সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে ইজমার ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞা এবং ধারণা প্রায় বেশ ব্যাপকভাবে হয় প্রত্যাখ্যান অথবা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে এসেছে, যাতে করে তত্ত্ব ও সমসাময়িক সময়ের বাস্তবতার মাঝে সাযুজ্য থাকে এবং তা ইসলামের আদর্শ এবং চেতনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সাম্প্রতিক মুসলিম

---

৪৯৫ Raddul Muhtar, vol. 2, p. 351; কিয়াস-সংক্রান্ত পরবর্তী অধ্যায় দেখুন আরো বিস্তারিতের জন্য।

৪৯৬ Ramadan, p. 45.

মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীরা ইজমার ধারণাকে বিসর্জন দিচ্ছেন না, কিন্তু তারা প্রয়াস চালাচ্ছেন এটাকে বাস্তবসম্মত প্রয়োগের জন্য নতুন করে সাজাতে। সাইয়েদ আহমদ খান (মৃঃ ১৮৯৮ খ্রিঃ) 'মনে করতেন যে সামাজিক প্রথা যা সাধারণভাবে জনগণ অনুসরণ করত তার সাথে ইজমাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।'[৪৯৭] তিনি ইজমাকে মানতেন যদি তা প্রাথমিক উৎসগুলো থেকে দলিল দ্বারা সমর্থিত হতো। তবে তিনি এটাও মনে করতেন যে:

> ইজমার ডক্ট্রিন ছিল প্রগতিশীল। সময়ের সাথে তাল রেখেই নতুন কালের নতুন সমস্যার আলোকেই তার অগ্রগতি হওয়া উচিত। তাই তিনি কখনো কখনো সাহাবিদের ইজমাকে এড়িয়ে গেছেন এই যুক্তিতে যে পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন, বিকল্প ইজমার প্রয়োজন।[৪৯৮]

মুহসিন আল-মুল্‌ক (মৃঃ ১৯০৭ খ্রিঃ) এবং উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ১৯৪৩ খ্রিঃ) সেইসব ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ইজমাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (মৃঃ ১৯৩৮ খ্রিঃ) তাদেরই একজন এবং ইজমা সংক্রান্ত আলোচনাকে তিনি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।[৪৯৯]

> মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক অবস্থার আলোকে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারই ছিল ইকবালের মূল লক্ষ্য। তার মতে যারা মনে করে যে ইসলামী আইন অনড় বা অচল ইসলামী আইনের গভীরতর অধ্যয়ন তাদের ভুল প্রমাণ করবে। এজন্য ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী ফিকহের নতুন সমালোচনামূলক মূল্যায়ন (critical appraisal) প্রয়োজন, যদিও তা রক্ষণশীল ধারার বাহকদের হয়ত অসন্তোষের কারণ হবে। ফিকহ শাস্ত্রের মহতী প্রতিষ্ঠাতাগণ কেউই তাদের নিজেদের মতকে চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় গণ্য করেননি। আইনের মৌলিক নীতিমালা সমসাময়িক মুসলিম প্রজন্মের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে ... তার মত অনুযায়ী বর্তমান সময়ে ইজমার প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব শুধুমাত্র যদি ইজতিহাদের কার্যকর দায়িত্ব মুসলিম আইন-প্রণয়নী সংসদ বা সংস্থার (লেজিসলেটিভ

---

৪৯৭ Hasan, 2003, p. 233.

৪৯৮ Hasan, 2003, p. 235.

৪৯৯ Kamali, 2003, pp. 255-257.

> অ্যাসেম্বলি) ওপর অর্পিত হয়। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যাদের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি আছে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান রাখার সুযোগও নিশ্চিত করবে।[৫০০]

অন্যদের মধ্যে যাঁরা সংস্কারপন্থি ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ (মৃঃ ১৯০৫ খ্রিঃ), মিসরের আল-আজহারের সাবেক রেক্টর। তিনি উসূলে ফিকহে ইজমার প্রামাণ্যতার সমর্থনে যে হাদিসটি সচরাচর উদ্ধৃত করা হয় সেই হাদিসটির এই প্রসঙ্গে ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করেন।[৫০১] তিনি ইজমার ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞাকে ভ্রান্ত এবং অবাস্তব গণ্য করেন, এই বলে:

> ইজমা মানে যেকোনো প্রজন্মের সমগ্র মুসলিম কমিউনিটির ঐকমত্য।[৫০২]

তিনি 'উলিল আম্র' (যারা কর্তৃত্বে আছে) তাদের ওপর জোর দেন, এই আঙ্গিক থেকে যে কর্তৃত্বের আসনে যারা থাকবে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির মাঝে থেকেই নির্বাচিত হতে হবে।[৫০৩] আল-সান্হুরীও 'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার'-এর বিকাশে ইজমার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দিয়েছেন।[৫০৪]

সংস্কারবাদীদের পক্ষ থেকে ইজমার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ এবং পুনঃব্যাখ্যা করার তাগিদের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে:

> ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ করতে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর বিভিন্ন হুকুম বা সিদ্ধান্ত যার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো অপরিবর্তনীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। ইজতিহাদকে সীমাবদ্ধ করা হয় শুধু সেসব বিষয়ে যেগুলোর ওপর ইতোমধ্যেই ইজমা হয়নি। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে; পরবর্তী প্রজন্মের মনীষীদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় পূর্ববর্তী প্রজন্মে প্রতিষ্ঠিত ইজমার ওপর টীকা রচনা বা আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এমনিভাবেই ইজতিহাদের দুয়ার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়,

---

৫০০ Hasan, 2003, p. 240.
৫০১ Kamali, 2003, p. 242.
৫০২ Hasan, 2003, pp. 246-248.
৫০৩ Hasan, 2003, p. 248.
৫০৪ Kamali, 2003, p. 257.

> যদিও সব সময়ই কিছু কিছু মনীষী নিজেদের মুজতাহিদ বিবেচনা করেছেন। ইজমার ভিত্তিতে নেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত খ্রিষ্টান চার্চের কাউন্সিলের নেয়া বিধিমালার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইসলামে ইজমা হয়ে দাঁড়ায় পথভ্রষ্টতার কষ্টিপাথর (যার আলোকে কে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলো তা নিরূপণ করা হতে থাকে)।[৫০৫]

জিয়াউদ্দিন সরদার ব্যাখ্যা করেছে কেমন করে অংশগ্রহণভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমুখী (inclusive) ইজমার ধারা লুপ্ত হয় এবং ইজমা পরিণত হয় অসহনশীলতা ও বিভক্তির (exclusivism) হাতিয়ারে।

> ... ইজমার ধারণা, যা ইসলামের সামষ্টিক বলয়ের কেন্দ্রীয় ধারণা, সীমিতসংখ্যক কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যে পর্যবসিত হয়েছে। ইজমা আক্ষরিক অর্থে হচ্ছে জনগণের ঐকমত্য। এই ধারণার মূলে রয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে হযরত মুহম্মাদের (স.) অনুশীলন। তিনি যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চাইতেন, তিনি তখনকার সমগ্র মুসলিম কমিউনিটিকে– যা তখন খুব বড় ছিল না, মসজিদে ডেকে পাঠাতেন। সেখানে আলোচনা হতো; পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পেশ করা হতো। সবশেষে, সমবেত সবাই ঐকমত্যে পৌঁছতেন। এভাবেই গণতান্ত্রিক চেতনা ছিল সেই শুরুর দিকের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ধর্মের কর্ণধাররা সমীকরণ থেকে জনগণকে সরিয়ে দেন এবং ইজমাকে 'ধর্মীয় বিশারদদের ঐকমত্য'-এ সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, একনায়কত্ব, থিওক্র্যাসি এবং স্বৈরাচার মুসলিম বিশ্বে এতটা প্রকট। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় পরিসর যেমন কিছু বিশারদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, যারা দীনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে একচেটিয়া অধিকার দাবি করেন, তাদেরই দৃষ্টান্ত বা মডেলের আলোকে বিকশিত হয়েছে রাজনৈতিক পরিসর। সংস্কারবিরোধী (obscurantist) ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা, ওলামা হওয়ার নামে, মুসলিম সমাজগুলোর ওপর প্রাবল্য বিস্তার করে আছে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোঁড়ামি এবং অদ্ভুত 'রিডাকটিভ' যুক্তিধারায় আচ্ছন্ন করে রাখছে।[৫০৬]

---

৫০৫ Hasan, 2003, p. 254.

৫০৬ Sardar, 2002; 'metier' অর্থ কোনো পেশা।

সরদারের পর্যবেক্ষণে এক ধরনের অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হতে পারে যেন সব দায়দায়িত্ব ধর্মীয় বিশারদদের। বিশেষ করে আলেমদের ব্যাপারে ঢালাওভাবে বলা বা সরলীকরণ করা তাদের ব্যাপারে সুবিচার হয় না। তবে বিশেষ করে গত কয়েক শতাব্দীতে তাদের অনেকেই শাসন-রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে সরে গেছেন, অথবা তাদের অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা শাসক যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক তার আনুগত্য করায় বিশ্বাস করেন (যেমন, মাদখালীরা দাবি বা ধারণ করে থাকে), অথবা এই অঙ্গন থেকে দূরে থাকার কারণে পরোক্ষভাবে যেই শাসক থাকুক তাদের জন্য ময়দান ছেড়ে দেওয়া, এটাই আলেমদের মুখ্য ধারায় পরিণত হয়েছে। আর তাদের মধ্যে বাস্তব অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তি এত প্রকট, এমনকি বিদ্বেষপূর্ণ, যে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইজমার ধারণাটি অনেকটাই অস্বচ্ছ এবং অকার্যকরী হয়ে পড়েছে।

ইজমা এবং উসূলে ফিকহের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংস্কারবাদী প্রবণতা সম্পর্কে যথোপযুক্তভাবে ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান আলোকপাত করেছেন:

> ঐতিহ্যবাদীরা মনে করে যে, ইজমা হচ্ছে সকল মুজতাহিদের ঐকমত্য, যা বর্তমান বিশ্বে দাঁড়ায় সকল গণ্যমান্য 'ওলামা'র ঐকমত্য। এই অবস্থান আর সন্তোষজনক নয়। আলেমরা এখন আর মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তি এবং জনগণের অংশগ্রহণের মূল ধারার প্রতিনিধিত্ব করে না। বর্তমান বিশ্বে যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান আছে আলেমদের শিক্ষা-দীক্ষায় তার প্রতিফলন নেই। তাই প্রায়শই তাদের মতামত পুঞ্জীভূত 'কনফিউশন'কে আরো বাড়িয়ে তোলে।
>
> এটা পরিষ্কার যে ইজমার সহজ, ঐতিহ্যবাদী ধারণা অ-ক্ল্যাসিক্যাল সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে আর উপযোগী নয়। আইন এবং নীতি প্রণয়ন, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব জটিলতা ও সূক্ষ্মতা রয়েছে যে ব্যাপারে ইজমার পুরনো প্রয়োগ কাঠামো প্রায় অচলই।
>
> এটাও পরিষ্কার যে, অনেক ইজমার আওতাভুক্ত বিষয়ে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঐকমত্য প্রয়োজন। ইজমার প্রয়োগ আর

> পেশাজীবী ওলামার একচেটিয়া ময়দান হিসেবে গণ্য করার অবকাশ নেই। তাছাড়া, দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে স্থায়ী (অপরিবর্তনীয়) ইজমার ধারণা, বিশেষ করে (দৃষ্টান্তস্বরূপ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অত্যন্ত পরিবর্তনশীল (fluid) ক্ষেত্রে, না বাস্তব আর না সম্ভব, স্থান-কালের ব্যবধানের কারণে।[৫০৭]

ইজমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ইজমা যেন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীলদের নিয়ে (elitist) না হয় এবং যাদের জীবন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা পলিসি নেয়া হবে সে ব্যাপারে তাদের ইজমার প্রক্রিয়ায় (পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বশীলভাবে হলেও) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইজমার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (র.) অবস্থান– ইজমা হচ্ছে সমগ্র উম্মাহ্‌র ঐকমত্য– সে আলোকে ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান বলেন:

> শুধুমাত্র ফুকাহা বা আহ্‌ল আল-হাল্ল ওয়া আল-আক্ব্‌দের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের নিয়ে ইজমা, যদি কুরআন এবং সুন্নাহ সমর্থিতও হয়, তা মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক নয় এবং তা আইনের মর্যাদা পেতে পারে না যতক্ষণ না তা সমগ্র উম্মাহ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৫০৮]

তার অর্থ এই নয় যে, কি হারাম এবং হালাল তা নিরূপিত হবে উম্মাহর সম্মতিতে বা অনুমোদনে। আসলে যা সুস্পষ্ট এবং অকাট্যভাবে কুরআনে হারাম বা হালাল, তা অন্য কারো অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না এবং এ ব্যাপারে ইজমার প্রাসঙ্গিকতা নেই। ইজমা বা জনপ্রতিনিধিত্বশীলতার প্রাসঙ্গিকতা সেসব বিষয়ে যেখানে ভ্রমপ্রবণ মানুষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যোগ রয়েছে। অবশ্য এটা পরিষ্কার যে, সমগ্র উম্মাহ্‌র অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ঐকমত্য গড়ার প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত হতে পারে না। তাই শূরার নীতি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ইজমা এবং শূরার মধ্যে সংযোগ বিবেচনা করে এই দু'টি প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করতে হবে প্রতিনিধিত্বশীল একটি ব্যবস্থায়, যাতে করে পুরো জিনিসটি কার্যকর এবং গতিশীল হতে পারে।

> ঐতিহ্যবাদীরা (traditionists) মনে করে যে, ইজমা হচ্ছে শুধু বিদ্বান মুজতাহিদদের ঐকমত্য, আর অনেকে মনে করে যে শিশু

---

৫০৭ AbuSulayman, 1987, p. 76.
৫০৮ Mumisa, p. 86.

> এবং মানসিক রোগী বাদ দিয়ে সকল মুসলিমের ঐকমত্যই ইজমা। কিন্তু, আসলে এ দু'টি একটি অপরটির বিকল্প নয়, বরং সম্পূরক। এ দু'টি আইনের বিকাশে দু'টি পর্যায় মাত্র। প্রথমত, বিশেষজ্ঞরা ইজতিহাদের মাধ্যমে তাদের ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করবে এবং তারপর তাদের মতামত যাদের জীবন এসব আইনের দ্বারা প্রভাবিত হবে তাদের সবার সামনে পেশ করবে। যেহেতু তাদের ওপরই এ আইন প্রয়োগ করা হবে, এই ইজতিহাদের ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য তাই আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে একটি আইন মেনে চলতে হয় এবং তার আচার-আচরণ সে আইনের আলোকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে সাধারণভাবে সেই আইনের প্রণয়নে তার অনুমোদন জরুরি। ... ইসলামী আইন ও আইন শাস্ত্রের দুনিয়া জোড়া সব বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরামর্শ হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে যাদের ওপর এ আইন প্রযোজ্য হবে তাদের ইজতিহাদের ওপরই সিদ্ধান্তের ভার ন্যস্ত করতে হবে।[৫০৯]

এ প্রসঙ্গে stakeholder মডেলের ধারণা খুবই প্রাসঙ্গিক।[৫১০] যেকোনো বিষয়ে স্টেকহোল্ডার হচ্ছে সে একটি সিদ্ধান্ত যাদের জীবনে প্রভাব রাখতে পারে অথবা যাদের ভূমিকা ঐ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে আল-কুরআনে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবন থেকে।

নবি হওয়ার পরও অনেক ধরনের পরীক্ষায় সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। এর অন্যতম একটি ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আদেশ পান যে, তিনি যেন তার সবচেয়ে প্রিয় যা তা কুরবানি দেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তান ইসমাঈলই (আ.) তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।[৫১১] এই সিদ্ধান্তের পর তিনি কি নিজে থেকে জোর করে বা তার নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইসমাঈলকে কুরবানির ময়দানে নিয়ে যান? না, তা হয়নি। বরং কুরআনে যেভাবে পেশ করা হয়েছে, হযরত ইব্রাহিম ইসমাঈলকে

---

৫০৯ Laliwala, pp. 26-27.

৫১০ Stakeholder মডেল নিয়ে এই অংশটুকু মূল ইংরেজি বইতে ছিল না। এটা বাংলা অনুবাদ সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

৫১১ সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে হযরত ইব্রাহিম তার প্রথম পুত্র ইসমাঈলকেই কুরবানি দেবার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমতও আছে। তাফসিরে তাবারীতে এই মতান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

জিজ্ঞেস করেন:

> অতঃপর সে (সন্তান) যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহিম বলল: হে আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী? সে বলল: হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।[৫১২]

কেন হযরত ইব্রাহিম তার পুত্র সন্তানকে জিজ্ঞেস করলেন এবং তার সম্মতি সংগ্রহ করলেন? হযরত ইসমাঈলকে কুরবানির মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ্‌র খলিল (বন্ধু) হিসেবে সর্বস্ব ত্যাগের যে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তেমনি এই বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার একটি অন্যতম শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে স্টেকহোল্ডার (stakeholder) মডেল যা এতে একটি মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত হিসেবে মানবতার সামনে পেশ করা হয়েছে। পিতা হয়ে নিজে তার পুত্র সন্তান (বা আর যে কোনো মানুষের) জীবনের ব্যাপারে একা তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সেটা হতো স্বৈরাচারের দৃষ্টান্ত। এই মডেলের শিক্ষা হচ্ছে যে সাধারণভাবে যাদের জীবন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা, পরামর্শ এবং সম্মতি প্রাসঙ্গিক এবং আবশ্যক। দুঃখজনক আল-কুরআনে এত সুন্দর, মহিমান্বিত এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে আমরা যথার্থ শিক্ষা নিতে পারিনি এবং যাদের জীবন নিয়ে 'ইসলামী আইন' রচিত হয় সেই প্রক্রিয়ায় তাঁরা সাধারণত একেবারেই অনুপস্থিত এবং তাঁদের ভূমিকা না স্বীকৃত আর না তার সুযোগ রাখা হয়।

তাই, একটি আইন ইসলামী আইন হয় না নিছক কোনো ইজমার দাবির ভিত্তিতে, বিশেষ করে যেখানে সচরাচর ইজমা আসলে নেই। বরং একটি আইন প্রয়োগযোগ্য (enforceable) ইসলামী আইন হয় তখনই, যখন নিম্নলিখিত সবগুলো শর্ত পূরণ হয়: (১) আইনের রচনা ইসলামের বুনিয়াদি উৎসের ভিত্তিতে হতে হবে; (২) আইনটি ইসলামের মাকাসিদ এবং মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে; এবং (৩) আইনটির প্রণয়ন ও গৃহীত হওয়া সমাজের শূরার মাধ্যমে হতে হবে।

---

৫১২ আল-কুরআন (আস-সাফ্‌ফাত) ৩৭:১০২।

চ. উপসংহার

ঐতিহ্যবাদী উসূলে ফিকহে ইজমাকে দলিল হিসেবে চূড়ান্ত প্রামাণ্যতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, দুঃখজনক, যেমনটি এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, ইজমাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। এই তত্ত্বটির (doctrine) কিতাবী ভিত্তির ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য নেই। যদিও ইজমা বর্তমান সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি, কিন্তু তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক রয়েছে তা নির্ভর করে ইজমা যদি আবার তার গতিশীলতা অর্জন করতে পারে (অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রজন্মের অগ্রাধিকার বা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন ঐকমত্য গড়ার মাধ্যমে) এবং তা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় কি না অংশগ্রহণ- ও শূরাভিত্তিক (consultative-participatory) ভূমিকার আলোকে (যেখানে প্রাসঙ্গিক বিদ্বান ও বিশারদরা, অথবা সমগ্র কমিউনিটি, স্টেকহোল্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোর মাধ্যমে)।[৫১৩] ড. আবদুলহামিদ আবুসুলাইমান বলেন:

> ইজমা নিছক কিছু বিশারদ বা ফকীহদের ঐকমত্যের বিষয় নয়। এর তাৎপর্য ও কার্যক্রম নিরূপণ করতে হবে বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিসরে আইনপ্রণয়নের কাজের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা হতে পারে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ মাত্রার সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে।[৫১৪]

এই গ্রন্থের লক্ষ্য এটা দাবি করা নয় যে, ইসলামের ইতিহাসে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, অথবা ইজমা আর প্রযোজ্য কিংবা প্রাসঙ্গিক নয়। বরং, এই বিস্তারিত পর্যালোচনার উদ্দেশ্য এই যে ইজমার মতো কোনো ধারণার জন্য মুসলিমদের আসমানি অথবা অলঙ্ঘনীয়তার মর্যাদা আরোপ বা দাবি করা না উচিত আর না প্রয়োজন, যেখানে আসলেই ইজমা নিয়ে আসমানিত্ব দাবির না কোনো ভিত্তি আছে আর না এ ব্যাপারে আছে কোনো ঐকমত্য। তাছাড়া, যেমন এখানে দেখানো হয়েছে, সীমিত কিছু মৌলিক বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে ইজমার পর্যায়ের ঐকমত্য নেই বললেই চলে। তাই, যেকোনো বিষয়ে ইজমার

---

৫১৩ Amal, 2004; Masud, 2001.

৫১৪ AbuSulayman, 1987, p. 84.

দাবি করা হলে মুসলিমদের সতর্ক এবং সন্দিহান হওয়া উচিত।

এটাও আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত বিষয়ে ইজমা আস-সাহাবা আছে তা একেবারেই বিরল এবং এ ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ইজমার দাবি অবিসংবাদিত নয়। তবে কোনো বিষয়ে যদি সত্যিই ইজমা আস-সাহাবা থেকে থাকে এবং তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান পাওয়া উচিত। তবে, যথাযথ মর্যাদা দেওয়া মানে এই যে, কোনো আইন বা বিধি-বিধান প্রণয়নে ব্যক্তি পর্যায়ে তাদের অবস্থান অবশ্যই সম্মানসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু তা স্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক নয়, যদি সেখানে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র আলোকে নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে, আলেম, ফকীহ এবং বিশেষজ্ঞদের ইজমাও উচ্চ মাত্রার সম্মানের দাবিদার। যতক্ষণ না ইজমাকে অভ্রান্ত (infallible) হওয়ার আঙ্গিকে বিবেচনা না করা হয়, বরং তা বিবেচনা করা হয় কার্যকারিতার দিক থেকে, ইজমার বিভিন্ন সংজ্ঞার প্রতিটিই কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যদি এ অধ্যায়ে আইন কীভাবে ইসলামী আইন হয় সে ব্যাপারে উল্লিখিত তিনটি শর্ত পূরণ হয়।

এই অধ্যায়ের সীমিত পরিসরে এখানে পর্যালোচনা করা হয়েছে কেমন করে ইজমাকে সমসাময়িক সময়ে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তোলা যায়। যদিও ইজমার ডক্ট্রিনে মারাত্মক সমস্যা আছে, এটা অনস্বীকার্য যে, মুসলিমদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তুলতে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে ইজমার ক্ল্যাসিক্যাল ধারণা বর্তমানে হয়তো নাও চলতে পারে, কিন্তু একটি প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইজমা এখনো প্রাসঙ্গিক, যে ব্যাপারে মুসলিমদের সৃজনশীলভাবে উপায় বের করতে হবে ইজমাকে কার্যকর করে তোলার জন্য। তাই কোনো অনড় ডগ্‌মা অথবা আইনসর্বস্বতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে বিবেকবান মুসলিমদের প্রয়োজন গতিশীলভাবে এবং সমস্যা-সমাধানের মানসিকতা নিয়ে ইসলামী জীবনযাপন করা এবং তাঁর আলোকে সামষ্টিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করা।

পঞ্চম অধ্যায়

কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিধারা) এবং ইসলামী আইনের কিছু সমস্যাপূর্ণ দিক

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র একদিকে রক্ষণশীল ধারা এবং অন্যদিকে আধুনিকতা ও সংস্কারপন্থিদের ধারার মধ্যে রয়েছে এক চলমান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অন্যতমভাবে রয়েছে ইসলামী আইনের ভান্ডার। অনেক বিবেকবান মুসলিমই স্বীকার করেন যে, এই ভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য অংশ একদিকে যেমন ইসলামের চেতনা ও স্বপ্নের (vision) সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, তেমনি অন্যদিকে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতার সাথেও নেই কার্যকর যোগসূত্র। যেসব দেশ ইসলামী আইন চালু করার মাধ্যমে নিজেদের 'ইসলামী' হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে, সেসব দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ গভীরভাবে ইসলামপ্রিয় হলেও আইনসর্বস্ব প্রবণতা এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রভাবে গড়ে ওঠা বিস্তারিত আইনের কাঠামো তাঁদের অনেকের কাছে ইতিবাচকভাবে অথবা উৎসাহের সাথে গৃহীত হচ্ছে না।

সে প্রসঙ্গেই অনেক নারীর ওপর পাকিস্তানের হুদুদ অর্ডিন্যান্সের কুফলের ব্যাপারে এ গ্রন্থে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৫১৫] অন্যদিকে ভারতে মুসলিম নারীরা অল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড, যা প্রায় একচেটিয়াভাবে একটি পুরুষদের সংগঠন, সে ব্যাপারে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন পার্সোনাল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।[৫১৬] আফগান সমাজ চরম রক্ষণশীল তালেবান সরকারের জগদ্দল পাথর থেকে মুক্তির শ্বাস ছাড়ছে, যার অধীনে ইসলামের নামে দুঃস্বপ্নের মতো এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে পুরুষদের জন্য দাড়ি রাখা আইনিভাবে বাধ্যতামূলক ছিল আর নারীদের জন্য বোরকা পরে সারা দেহ আবৃত করে রাখা, ঘরে থাকা ছিল আবশ্যিক এবং শিক্ষা-দীক্ষা অথবা বাইরে কাজ করার সুযোগ থেকে তাদের সাধারণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

---

৫১৫ For pertinent information and analysis of this un-Islamic and inhuman experience, see Farooq, 2006e. Also see Quraishi, 1997.

৫১৬ Hasan, M., 2005.

যদিও ইসলামী আইন ও বিধিবিধানের এ ধরনের প্রান্তিক রূপ উম্মাহ্‌র ক্ল্যাসিক্যাল যুগের মহান ফকীহ ও আলেমদের কাঁধে দায়-দায়িত্ব হিসেবে চাপানো যায় না, তবু এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন মাযহাব এবং ফিকহ গ্রুপ যখন তাদের পরিণত কাঠামো পায় এবং অর্থোডক্সির রূপ নেয়, তখন থেকেই ইসলাম ধীরে ধীরে আইনসর্বস্বতা ও আক্ষরিকতার অতিমাত্রিক প্রভাবের শিকার হতে থাকে।

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, শরিয়া বলতে এখন যা চিহ্নিত করা হয় বা বোঝা হয় এবং যা সাধারণভাবে আসমানিভাবে প্রদত্ত গণ্য করা হয়, তা বহুলাংশে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাময় মানুষের ব্যাখ্যাপ্রসূত। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, এটা কেমন করে সম্ভব হয়েছে, যদিও মানুষের এসব প্রয়াস ইসলামের দু'টি মুখ্য উৎস, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই, যেখানে কুরআন আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নাজিলকৃত প্রত্যক্ষ, বিশুদ্ধ এবং অভ্রান্ত বাণী এবং সুন্নাহ হচ্ছে নবিজির (স.) হাদিসভিত্তিক যা থেকে বিস্তারিত পর্যায়ে আইন ও বিধিবিধান আহরণ করা হয়ে থাকে? এ বিষয়টিকে বুঝতে হলে প্রথমে যা পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হচ্ছে এই যে, যদিও ইসলামের অন্যতম বিশ্বাস যে কুরআন আল্লাহ তায়ালার আসমানি বাণী হিসেবে চূড়ান্ত এবং অভ্রান্ত, সে কুরআন নিয়ে বিস্তারিত পর্যায়ে মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মতামত বা রায় অভ্রান্ত নয়। আর হাদিসের ব্যাপারে যদিও হাদিস বিশারদরা অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রাসঙ্গিক অবদান রেখেছেন হাদিস সংকলিত করা এবং হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য বিশদ পদ্ধতি-কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, তবু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে হাদিস না আসমানি আর না অভ্রান্ত হওয়ার পর্যায়ের। আর তার পরের দু'টি ইসলামী আইনের উৎস, ইজমা এবং কিয়াস, আসমানি হওয়া থেকে অনেক দূরে, কিন্তু আসমানি না হলেও যেন আসমানি এরকম ধারণা (impression) এবং সে কারণে অভ্রান্ত অথবা পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ধারণা বেশ অনড় এবং বহুল প্রচলিত। ইজমা সম্পর্কে বিস্তারিত গত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

> (ক্ল্যাসিক্যাল সময়ে ইসলামী ধর্মশাস্ত্রিক অবস্থান অনুযায়ী) "কুরআনই আইনের মুখ্য উৎস। অন্য তিনটি উৎস সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস আসমানি ছাপ রয়েছে। ... কিয়াস-এর মূল্য যেহেতু নিরুপিত হয় অন্য উৎসগুলোর ভিত্তিতে; তাই তা পরোক্ষভাবে অভ্রান্ত।"[৫১৭]

---

৫১৭ Hasan, A, 2003, p. 21.

> পদ্ধতিগতভাবে আইন আহরণের জন্য মুসলিম আইনশাস্ত্র তার নিজস্ব পদ্ধতি-কাঠামো গড়ে তোলে সবকিছু শরিয়াসম্মত হিসেবে ব্যাখ্যা ও আহরণ করতে, যে কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিয়াস, ইজমা, ইত্যাদি। ... চারটি প্রাথমিক উসূল (উৎস) হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। উসূলের সংখ্যা এবং কোন্গুলোর ওপর কীভাবে গুরুত্বারোপ করা হবে তা নিয়ে বিভিন্ন ফিক্হী স্কুলের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, যদিও সবাই অবিসংবাদিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে কুরআন এবং সুন্নাহ্কে।[৫১৮]

যেগুলো কিয়াসের মাধ্যমে আহরিত হয়েছে সেগুলোসহ ইসলামী আইন ও বিধি-বিধানের অলঙ্ঘনীয়তা প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্যের ব্যাপারে ইজমা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু, বিগত অধ্যায়ে যেমনটি প্রদর্শন করা হয়েছে, ইজমার ডক্ট্রিনের ব্যাপারে এমন কোনো দিক নেই, যা নিয়ে ইজমা (ঐকমত্য) আছে। এই অধ্যায়ের ফোকাস হচ্ছে কিয়াস, ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস।

মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণ করতে, কারণ তাদের বলা ও শেখানো হয় যে এসব আইন ও বিধিবিধানের ভান্ডার তাদের কাছে প্রতিনিধিত্ব করে সঠিক ইসলামী হেদায়েত– সমগ্র জীবনের জন্য। কিন্তু, ইসলাম এবং ইসলামের নামে যেসব আইন-বিধান তাদের সামনে পেশ করা হয় তা অনুসরণ করতে চাইলেও, না তারা জানে যে কেমন করে এসব আইন আহরিত হয়েছে আর না তারা বোঝে যে কেমন করে এ ভাণ্ডারের অনেক আইন সুবিচারপূর্ণ এবং জীবনের সার্বিক পরিসরে তাদের সমস্যার সমাধান জোগায়। অনেক মুসলিমই এখন ঐতিহ্যবাদী ইসলামী আইনের ভাণ্ডারের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত, আর এমন অনেকেই আছে যারা এ ভাণ্ডারের অধিকাংশ আইনের ব্যাপারে বিরূপ। এই সমস্যার অন্যতম সূত্র কিয়াস।

> আইনের ক্ষেত্রে কিয়াসের কাঠামোগত অনড়তা (formalism) এবং অতিমাত্রিক ব্যবহার এই পদ্ধতির প্রতি বিরূপ মানসিকতার উদ্রেক করেছে। রায় বা ফকীহ্র ব্যক্তিগত মত এবং কিয়াসের ব্যবহার, বিশেষ করে ইরাকিদের মাঝে, জন্ম দেয় ফকীহ্দের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য।[৫১৯]

---

৫১৮ AbuSulayman, 1987, p. 2.

৫১৯ Hasan., 1986, p. 424.

অনেক ক্ষেত্রেই যখন ফকীহরা নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, তারা সফল ও কার্যকরভাবে কিয়াস ব্যবহার করেছেন নতুন সমাধানের জন্য। মুসলিম হিসেবে আমরা সবাই তাদের মূল্যবান এবং মহান প্রাসঙ্গিক অবদান থেকে উপকৃত হয়ে থাকি। কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মতোই কিয়াসের গ্রহণযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক ব্যবহারের সমান্তরালে অপপ্রয়োগও রয়েছে। এই অধ্যায়ে ইসলামী আইনের বেশ কয়েকটি দিকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে ইসলামের মাকাসিদ এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিয়াসের আইনসর্বস্ব ও আক্ষরিক প্রয়োগ থেকে যেসব বাড়াবাড়ির সৃষ্টি হয় তার কিছু প্রাসঙ্গিক এবং চক্ষু-উন্মীলনকারী দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

ক. কিয়াসের কিছু প্রাসঙ্গিক মৌলিক দিক

আইন ও বিধিবিধানের ভান্ডার হওয়া থেকে অনেক দূরে, আসলে কুরআনের খুবই সীমিত একটি অংশ কী হালাল আর কী হারাম সে বিষয়ের নির্দেশনাসংক্রান্ত। সেই সীমিতসংখ্যক মৌলিক নীতি, আদর্শ এবং সীমারেখা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার বাইরে, ইসলামী আইনশাস্ত্রের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত একটি অবস্থান এই যে, যা কিছুই আল্লাহ তায়ালা অকাট্যভাবে হারাম করেননি তা অন্য অকাট্য প্রমাণের অভাবে, ধরে নেয়া হবে হালাল। শায়খ ইউসুফ আল-কারাদাভি ব্যাখ্যা করেছেন:

> ইসলামের প্রথম 'আসল' হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে যা কিছু উপকারিতা তা মূলত মানুষের ব্যবহারের জন্য এবং তাই সেগুলো হালাল। কোনো কিছুই হারাম নয়, যদি না তা নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে আল্লাহ তায়ালারই দেওয়া কোনো গ্রহণযোগ্য (sound) অথবা স্পষ্ট 'নাস' (ভাষ্য) থেকে। ... তিনি শুধু সীমিত কিছু বিষয় হারাম করেছেন বিশেষ কারণে। ... ইসলামে হারামের পরিসর খুবই সীমিত, আর তার সমান্তরালে হালালের পরিসর খুবই ব্যাপক। হারামের ব্যাপারে অল্পসংখ্যক কিছু গ্রহণযোগ্য এবং স্পষ্ট 'নাস্' আছে এবং যা কিছুই এ ধরনের 'নাস্' দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে হারাম অথবা হালাল চিহ্নিত করা হয়নি, তা সাধারণ অনুমোদনের অধীনে পড়বে এবং আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের পরিসরে গণ্য হবে।[৫২০]

৫২০ Al-Qaradawi, 1999, pp. 14-15.

নবিজির (স.) জীবন, যেমনটি তার কথা ও কাজের মধ্যে প্রতিফলিত, একটি মডেল। মুসলিমরা (হাদিসের ভিত্তিতে মূল্যায়িত) সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হয় বিস্তারিত হেদায়েতের জন্য। কিন্তু একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনের পরিসরে যে বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয় তা নিয়ে না কুরআনে আর না সুন্নাহ্/হাদিসে পর্যাপ্ত নির্দেশনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই কিয়াস বা তুলনামূলক যুক্তি– যার 'ধাতুগত অর্থ হচ্ছে ... 'পরিমাপ করা', 'সাদৃশ্য', 'সমতা' ইত্যাদি'[৫২১] - প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

> কিয়াস মানে অতীতের প্রথা বা চর্চা, বিশেষ করে নবির দৃষ্টান্ত আর নতুন কোনো অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান।[৫২২]
>
> কিয়াসের কাজ হচ্ছে নাজিলকৃত আইনের অন্তর্নিহিত কারণ বা 'ইল্লা' নিরূপণ করা যাতে তা সদৃশ অবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাদক সেবন স্পষ্ট 'নাস্'-এর ভিত্তিতে হারাম। এই হারাম আহকামের কারণ মাতাল হওয়ার (intoxicating) কুফল; তাই যা কিছুতেই এই মাতাল হওয়ার ফল দেখা যাবে সে ক্ষেত্রেই এই হারামের আহকাম প্রযোজ্য হবে।[৫২৩]
>
> ... কোনো ব্যক্তির পক্ষেই কোনো বিশেষ বিষয়ে মত দেওয়া উচিত নয় এরকম বলে: এটা হারাম অথবা হালাল, যদি না সে আহকাম-সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং সেই নিশ্চিত জ্ঞান অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহ, অথবা ইজমা এবং কিয়াস প্রসূত হতে হবে।[৫২৪]
>
> কিয়াস হচ্ছে 'ইসলামী আইনের অংশ ... যা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বদলে যেতে পারে এবং এটা ইসলামী আইনের সেই অংশ যা আইনের ব্যাপক বিস্তার ও বিকাশের সম্ভাবনা জোগায় এবং প্রত্যেকটি যুগের বিকাশমান সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পুরোপুরি সক্ষম'।[৫২৫]

---

৫২১ Muslehuddin, p. 140.
৫২২ AbuSulayman, 1987, p. 66.
৫২৩ Muslehuddin, p. 135.
৫২৪ Al-Shafi'i, p. 78.
৫২৫ Mawdudi, 1983, p. 60.

ধীরে ধীরে, কিয়াস আরো গুরুত্ব পায় এবং অধিকতর কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

> আইনের বাকি তিনটি উৎসের সাথে কিয়াস স্বীকৃত হয় চতুর্থ উৎস হিসেবে। ক্রমাগতভাবে, কিয়াসের ওপর নির্ভরতা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এসে (প্রায়োগিক) গুরুত্বের দিক থেকে তা কুরআন এবং সুন্নাহকেও ছাড়িয়ে যায়।[৫২৬]

অনেকে বলে আর অনেকে দাবি করে যে, কুরআন এবং সুন্নাহে যেসব ব্যাপারে বিশদ পথনির্দেশনা নেই সেগুলোর জন্য নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অথবা নতুন সমাধান নির্ণয় করায় উসূলে ফিকহের অংশ হিসেবে কিয়াসের যথার্থতা হিসেবে সাহাবিদের মধ্যে ইজমা ছিল।

> সাহাবিদের মধ্যে কিয়াস প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য (অর্থাৎ ইজমা) ছিল।[৫২৭]

তবে যারা একটি ডক্ট্রিন এবং পদ্ধতি হিসেবে ইজমার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত, যেমনটি ৪র্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে, কিয়াসের প্রসঙ্গে সাহাবিদের ইজমার দাবি সঠিক হতে পারে না। কেউ এটা যুক্তি দিতে পারে যে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তারা নতুন, কিন্তু সদৃশ অবস্থায় তাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেছেন এবং সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে, তারা কিয়াস চর্চা করেছেন। কিন্তু নবিজির (স.) সাহাবিরা জানতেন যে এটা কিয়াস, সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন এবং সচেতনভাবে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এরকম দাবি বা ধারণার পেছনে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

বস্তুত যারা কিতাবমুখী (text-oriented) ধারায়, নিছক বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে সব কিছুর যুক্তি-প্রমাণ খোঁজে, সবকিছুর যথার্থতা বিচার করতে চায়, তারা ইসলামী ফিকহের একটি উৎস হিসেবে কিয়াসের সপক্ষে দলিল জোগানোর প্রয়াস পেয়েছেন কুরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে।[৫২৮] কিন্তু কুরআনের এমন কোনো আয়াতের ব্যাপারে আলেমরা ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেননি, যা কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে অকাট্যভাবে পেশ করা যায়। কুরআনের পর সুন্নাহর শরণাপন্ন হয়ে

৫২৬ Hasan, 1986, p. 425, quoting Ibn Qutaybah, Ta'wil Mukhtalif al-Hadith, Cairo, Matba'ah Kurdistan al-Ilmiyyah, 1326 AH, p. 65.

৫২৭ Muslehuddin, p. 136.

৫২৮ Hasan, 1986, Chapter Three.

হাদিস সংগ্রহগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণ খোঁজা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও যদিও বিভিন্ন বিশারদরা কিয়াসের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং বিভিন্ন হাদিসকে কিয়াসের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, কিন্তু কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে হাদিসের দলিলের ব্যাপারে কোনো ব্যাপক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কিছু মুসলিম মনীষী এবং দল, যার মধ্যে রয়েছে যাহিরী মাযহাব এবং তার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে হাজম, কিয়াসকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনে হাজমের যাহিরী ধারা আক্ষরিকতা (literalism) এবং কিতাবি দলিলের বাহ্যিক অর্থভিত্তিক, যার পাশাপাশি তিনি কিয়াসকে এড়িয়ে গেছেন। তবু ইজতিহাদ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কিয়াসের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য বারংবার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যেমন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে যেখানে নবিজি (স.) তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে যদি সে (মুয়াজ) এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে ব্যাপারে কুরআন কিংবা সুন্নাহতে সরাসরি বা স্পষ্ট কোনো পথনির্দেশনা নেই, তাহলে সে কি করবে। তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ 'আমি তাহলে আমার নিজস্ব মত গঠনে উদ্যোগী হব এবং এ ব্যাপারে আমি সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবো।'[৫২৯]

ইবনে হাজমসহ অন্যান্য স্কুলের অনেক মনীষী এই হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

> [ইবনে হাজম] মুয়াজ ইবনে জাবালের এই হাদিসকে সহিহ হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিয়াসের সমর্থনে এই হাদিসটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনি [ইবনে হাজম] মনে করেন যে এই রেওয়ায়েতটি শুধু আবু আওনের মাধ্যমে মুয়াজ থেকে জানা যায় এবং এর রাবী আল-হারীস বিন উমর অপরিচিত (obscrure)। তাই এ হাদিস নির্ভরযোগ্য নয়।[৫৩০]

সতর্ক পাঠকরা হয়তো বিস্মিত হবেন যখন তারা নিছক যেকোনো গ্রন্থ নয়, একেবারে সহিহ আল-বুখারিতে অধ্যায়ের শিরোনাম রয়েছে নিম্নোক্তরূপে: 'কারো নিজস্ব মতামত (অর্থাৎ রায়) অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে হুকুম দেওয়ার

---

৫২৯ Abu Dawud, Vol. 3, Kitab al-aqdiyyah, #3585, https://sunnah.com/abudawud:3592.

৫৩০ Hasan, A. 1986, p. 454, referring to Ibn Hazm' Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas wal-Ra'y, Cairo, Matba'ah Jami'ah Damishq, 1960, p. 14.

বিরুদ্ধে কি বলা হয়েছে' অথবা 'যখনই নবিজিকে (স.) জিজ্ঞেস করা হতো এমন কোনো বিষয়ে যে ব্যাপারে কোনো আয়াত নাজিল হয়নি তিনি হয় বলতেন 'আমি জানি না' অথবা চুপ করে থাকতেন। কিন্তু তিনি কখনো নিজের মত অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে হুকুম দেননি।[৫৩১] বাস্তবে, একপর্যায়ে রায় বা কিয়াসের বিরুদ্ধে সাধারণ মতামত এতোই প্রবল ছিল যে, ঐ অধ্যায়ের শিরোনামগুলো ইমাম আল-বুখারির ফিকহি অবস্থানের প্রতিফলক।[৫৩২]

কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধিতা এবং ভিন্নমত থাকলেও চারটি মূল মাযহাবের উদ্যোগ ও অবদানেই উসূলে ফিকহের অন্যতম এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে কিয়াসের বিকাশ ঘটে।

ইজমা এবং কিয়াসের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ইজতিহাদ যেখানে নিশ্চিত করে যে, ইসলামী আইনশাস্ত্র গতিশীল, আসলে কিয়াসই এই ক্ষেত্রে কাঠামোগত নিয়মানুবর্তিতা এনেছে যেসব বিষয় অন্য তিনটি উৎস দিয়ে নিরূপিত নয় সেসব বিষয়ে ইসলাম অনুযায়ী কী হালাল আর কী নয় তা নিরূপণে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে। কিন্তু কিয়াসের ফসল ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হতে হলে, তা ইজমা দিয়ে সমর্থিত হতে হবে। ইজমার সমর্থনপুষ্ট হলে, মুসলিম মনীষীরা পদ্ধতি হিসেবে কিয়াসের ওপর উচ্চ মূল্য আরোপ করেছেন।

> কিয়াসের পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে যুক্তিবুদ্ধি এবং স্বাধীন বা মূল্য-নিরূপক মতামত (value judgment)-এর অবাধ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।[৫৩৩]
>
> ক্ল্যাসিক্যাল ফকীহদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে সেই সব বিষয়ে ইজমার ব্যাপারে যেগুলো কিয়াস এবং ইজতিহাদভিত্তিক।[৫৩৪]

---

৫৩১ Al-Bukhari, Vol. 9, Book of Holding Fast to the Qur''an and Sunnah, chapter 7 title - Bab ma yudhkaru min dhamm al-ra'y wa takalluf al-qiyas. p. 305, and chapter 8 title - wa lam yaqul bi ra'y wa la bi-qiyas, p. 307.

৫৩২ "এরকম যুক্তি যথাযথভাবেই দেওয়া যেতে পারে যে, সহিহ বুখারিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম ইমাম বুখারির ফিকহ-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার প্রতিফলক।" [Siddiqi, M. Z., p. 57] একটি বিকল্প অভিমত হচ্ছে যে অধ্যায়গুলোর শিরোনাম তার নিজস্ব অবস্থানের প্রতিফলক নয়, বরং তা সমসাময়িক সময়ের ব্যাপকভাবে প্রচলিত মতামতের প্রতিফলক।

৫৩৩ Muslehuddin, p. 137.

৫৩৪ Hasan, 2003, p. 130.

একজন ফকীহর মতামত অথবা একজন কাজীর রায় ঠিক না ভুল তা মূল্যায়নে ইজমার প্রামাণ্য স্থান রয়েছে। কোনো কিয়াস আইনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না ইজমার সত্যায়ন (অথেন্টিকেশন) ছাড়া।[৫৩৫]

খ. কিয়াস নিয়ে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

চারটি মুখ্য সুন্নি মাযহাব কিয়াসকে উসূলে ফিকহের চারটি উৎসের একটি হিসেবে গ্রহণ করে। তবে কিয়াস আসলে কী, তার পরিসর এবং তার বৈধতা মূল্যায়ন (validation)-এর পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় নিয়েই প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে।

> সাহাবিদের পর, কিয়াসের ওপর কতটুকু নির্ভর করা যায় তা নিয়ে ফকীহরা দ্বিমত পোষণ করেন ... কিয়াসের বিষয়টি বিস্তর মতদ্বৈধতার সূচনা করে।[৫৩৬]

ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্রের অন্যান্য দিকের মতোই কিয়াসের বিভিন্ন দিক নিয়েও কোনো ইজমা নেই বললেই চলে। প্রত্যেকটি ফিকহী স্কুলের নিজস্ব পছন্দের সংজ্ঞা আছে, যাতে একেকটি স্কুলের কিছু সূক্ষ্ম গুরুত্ব রয়েছে।

- হানাফীরা সংজ্ঞায়িত করে কিয়াস্‌কে: "মূল ভাষ্য (টেক্সট) থেকে আইনের একটি প্রবর্ধন (extension), যেখানে এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয় বিশেষ বিষয়ে একটি সাধারণ (common) 'ইল্লা'র আলোকে, যা নিছক ভাষ্যের কথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায় না।"[৫৩৭]
- মালিকীদের মত অনুযায়ী, কিয়াস হচ্ছে 'ইল্লা বা আইনের কার্যকর কারণের আলোকে মূল (উৎসের) ভাষ্যের সাথে কোনো আহরিত মতের সাযুজ্য নিরূপণ।'[৫৩৮]
- শাফেয়ীদের জন্য কিয়াস হচ্ছে: "একটি জানা বিষয়ে অন্য আরেকটি বিষয়ের সাথে আইনের কার্যকর কারণের আলোকে সাদৃশ্য নিরূপণ।

৫৩৫ Muslehuddin, p. 148.
৫৩৬ Muslehuddin, p. 137.
৫৩৭ Muslehuddin, p. 140.
৫৩৮ Muslehuddin, p. 140.

> শাফেয়ীর কাছে কিয়াস আর ইজতিহাদ অভিন্ন অর্থবোধক দু'টি পরিভাষা।"[৫৩৯]

প্রাসঙ্গিক এসব বিষয়ে মূল কাজটি হচ্ছে আইনের ইল্লা বা কার্যকর কারণ (ration decidenci) চিহ্নিত করা। "এটা প্রতীয়মান যে 'ইল্লা' (কার্যকর কারণ) পরিভাষাটি ফিকহী পরিসরে ব্যবহৃত হয়নি ইমাম শাফেয়ীর সময় পর্যন্ত। এটা বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভবের প্রাথমিক যুগেও পরিলক্ষিত হয় না। ইমাম শাফেয়ী এ ইল্লার অন্তর্নিহিত ধারণাটিকে কখনো 'মা'না' (ধারণা) এবং অন্য সময় 'আসল্' (ভিত্তি) শব্দ ব্যবহার করেন। 'ইল্লা' পরিভাষাটি নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা হয় শাফেয়ী-উত্তর যুগে।"[৫৪০] কিয়াসের ধারণা নিয়ে সূক্ষ্ম, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে কিয়াস এবং ইজতিহাদ সমার্থক, কিন্তু অন্য মনীষীরা সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।

কিয়াস ইসলামী আইনের একটি সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে যেমন কোনো ইজমা নেই, তেমনি 'ইল্লা' আসলে কী, কেমন করে তা নিরূপণ ও বৈধায়ন (validate) করা হয়, এসব কোনো ব্যাপারেই ইজমা তো দূরে থাক, ব্যাপক কোনো ঐকমত্যও নেই।[৫৪১]

যেমনটি প্রত্যাশিত, সব মুসলিম ফকীহ ইজমার যথার্থতা গ্রহণ করেননি এবং যারা করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও কখন এটা ব্যবহার করা গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে নানান ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে।[৫৪২]

জানা থেকে অজানায়, জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত এবং নতুন অবস্থার মূল্যায়নে অথবা নতুন সমস্যার সমাধানের সন্ধানে কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) মানুষের যুক্তিভিত্তিক হাতিয়ার হিসেবে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত। ডার্টমাউথ ইউনিভার্সিটির কেভিন ডানবার ব্যাখ্যা করেন:

> সাদৃশ্যমূলক যুক্তি (analogy) একটি মৌলিক যুক্তি পদ্ধতি যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদিতে। Analogy ব্যবহার করা যেতে পারে ভবিষ্যদ্বাণী

---

৫৩৯ Muslehuddin, p. 140.

৫৪০ Hasan, A., 1986, p. 12.

৫৪১ Shehaby, pp. 37-39.

৫৪২ Fadel, p. 360.

(prediction) করতে, বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে এবং আমাদের জ্ঞানের পুনর্বিন্যাস (restructure) করতে। Analogy ব্যবহার করা হয় জনমত প্রভাবিত করতে, যুদ্ধ করতে, যুদ্ধে বিজয়ী হতে, সম্পর্কের সূচনা ও অবসান করতে এবং কাপড় ধোয়ার সাবানের বিজ্ঞাপনে (অর্থাৎ, জীবনের ব্যাপক পরিসরে)।[৫৪৩]

Dunbar আধুনিক বিজ্ঞানে Analogy-র প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে, পদ্ধতিটি আদৌ সরল কিছু নয়।

এনালজি নিয়ে বিভিন্ন গবেষকরা বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অধিকাংশ গবেষক এনালজির দু'টি মূল দিককে চিহ্নিত করে: উৎস (source) এবং লক্ষ্য (target)। উৎস হচ্ছে জ্ঞানের সেই অংশটি যেটার সঙ্গে একজন পরিচিত। লক্ষ্যটি জ্ঞানের কম পরিচিত অংশটি। যখন কেউ এনালজি ব্যবহার করে, সে উৎসের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্যের সাথে তুলনা করে দেখে। পৃথিবী-মার্স এনালজির ক্ষেত্রে, পৃথিবী হচ্ছে উৎস এবং মার্স হচ্ছে লক্ষ্য। পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যগুলো মার্সের প্রতি মানচিত্রায়ন (mapping) করে এটা আগে থেকে বলা যেতে পারে যে মার্স-এর কী ধরনের বৈশিষ্ট্য, যেমন পানি ও জীবনের অস্তিত্ব ইত্যাদি রয়েছে। তাই নতুন কিছু আবিষ্কারে এনালজি একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার। উৎস এবং লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে সাদৃশ্যমূলক যুক্তির গবেষকরা কৃত্রিম (superficial) এবং কাঠামোগত (structural) দিকের মধ্যে পার্থক্য করে। কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল গ্রহটি গোলাকার এবং তার এক ধরনের লাল আভা আছে। তাই মঙ্গল গ্রহ এবং রাস্তায় লাল 'স্টপ' ফলক-এর মধ্যে যদি নিছক রঙ লাল এই ভিত্তিতে তুলনা করা হয়, তাহলে তা হবে একটি কৃত্রিম বৈশিষ্ট্য। কাঠামোগত (অথবা সম্পর্কগত - relational) বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (প্রথম মাত্রার সম্পর্ক), অথবা বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাত্রার সম্পর্ক)।

৫৪৩ Dunbar, K. "Analogy," Retrieved on March 11, 2007 from Diplomacy Web site: http://www.diplomacy.edu/Language/Analogies/default.htm (বিকল্প লিংক https://ljhs.wordpress.com/2008/04/24/using-analogies-with-students/).

> মঙ্গলের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হতে পারে গ্রহটির ওপর কালো লাইনের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন এবং খারাপ ধুলার (ডাস্ট ডেভিল-এর) উপস্থিতি। এই বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্কগুলো এই পূর্বকল্প (hypothesis)-এর জন্ম দেয় যে এই ডাস্ট ডেভিল পৃথিবীতে যে রকম পাওয়া যায় তার অনুরূপ এবং পৃথিবীতে যেভাবে ডাস্ট ডেভিলের চিহ্ন (trace) দেখা যায় তেমনটাই হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে। (এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, সাদৃশ্যমূলক যুক্তি জটিল হতে পারে)। সাদৃশ্যমূলক যুক্তির বড় উপযোগিতা হচ্ছে এটা একজন মানুষকে কৃত্রিম পর্যায়ের বাইরে (চিন্তা বা গবেষণার) দিগন্ত প্রসারিত করতে সহায়তা করে।[৫৪৪]

সাদৃশ্যমূলক যুক্তি অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে খুবই সহায়ক ছিল।[৫৪৫] তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আধুনিক শিক্ষায় কিয়াসের ব্যবহার ব্যাপক এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষায় (GRE) একটি নিয়মিত অংশ থাকে সাদৃশ্যমূলক যুক্তির প্রয়োগ-সংক্রান্ত। এ ধরনের পরীক্ষায় সাদৃশ্যমূলক যুক্তির ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতার আলোকে ইসলামে তার ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

> গভীরভাবে দেখতে গেলে, আমরা যা কিছুই করি তার প্রায় সব কিছুতেই এনালজির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এনালজি নিছক দুটো বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবেই ভূমিকা পালন করে না, বরং আমরা এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যত বেশি সম্পর্ক খুঁজি, তাতে আমরা কম-বেশি এনালজি ব্যবহার করি বৃহত্তর ধারণা, বিধিবিধান এবং উচ্চ-মাত্রার মানসিক মানচিত্র আঁকি বা গড়ি। সেজন্যই আশানুরূপভাবেই মনোবিজ্ঞানের বড় মনীষী এবং উদ্ভাবকবৃন্দ তুলনা এবং সাদৃশ্যমূলক যুক্তি প্রয়োগের ধারণার দৃষ্টান্তে উচ্চ পর্যায়ের উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন।[৫৪৬]

---

৫৪৪ Ibid.

৫৪৫ Holst, G. (n.d.). “There is no Aha! in a Brute Force Search: An Argument for Creative Models of Analogy,” an Honours Thesis, Retrieved on March 2, 2007 from Web Site: http://www.sfu.ca/~gholst/HonoursThesis/thesis.html. বিকল্প Krumnack, et al. (2013).

৫৪৬ Mistler, B. (n.d.). “Masters of Analogies: The GRE is to the MAT as Freud is to James,” Retrieved on May 5, 2007 from APA Web Site: http://www.apa.org/apags/edtrain/gre.html.

তাই, কিয়াস নিয়ে এবং কিয়াসের ব্যাপক ব্যবহারে মুসলিম মনীষীদের গভীর আগ্রহ (fascination) সহজেই বোধগম্য এবং একেবারেই স্বাভাবিক। তবে ধর্মীয় পরিসরে মানব যুক্তির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া পবিত্র (sacred) চরিত্র বা মর্যাদা অর্জন করে। তা যাই হোক, এটা মনে রাখতে হবে যে কিয়াস মূলত সংশয়পূর্ণ (speculative, যন্নী)।

> ফকীহদের মধ্যে যারা কিয়াস ব্যবহার করেন তারা এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই মনে করেন যে, শরিয়ার আহকামগুলো কিছু বৃহত্তর লক্ষ্য (মাকাসিদ) অনুসরণ করে, যা মানব যুক্তিবুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তিক (rational) ধারা ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া হেদায়েতের পেছনে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এবং চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন আহকামের মূল্যায়নে মানব যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক। ... যেহেতু আসমানি বিবিধ নির্দেশনার পেছনে কারণ এবং উদ্দেশ্য নিরূপণে কোনো না কোনো মাত্রার ফিক্‌হী স্পেকুলেশন থাকে, তাই কিয়াসের বিরোধিতাকারীরা মৌলিকভাবে পদ্ধতিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, আইন নিশ্চয়তার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যেখানে কিয়াস মূলত স্পেকুলেটিভ এবং বাহুল্যপূর্ণ (superfluous)... কিয়াসের এই অনিশ্চয়তার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সব ফিকহী স্কুলের মনীষীগণই কিয়াসকে আসন দিয়েছেন 'স্পেকুলেটিভ দলিল' হিসেবে।[৫৪৭]

> জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইল্লা'র ভিত্তিতে এনালজির মাধ্যমে পৌঁছানো কোনো হুকুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা তর্কসাপেক্ষ। এই ফলাফল শুধু এ কারণে যে, ইল্লা, যার মাধ্যমে এ হুকুমগুলো আহরিত হয়, কখনোই চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা অথবা সত্য-যথার্থ বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, আর তাই যথাযথ বা গ্রহণযোগ্য ইল্লা কি সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে।[৫৪৮]

---

৫৪৭ Kamali, p. 265-266.

৫৪৮ Shehaby, p. 42.

> ... সব ফকীহই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কিয়াস সম্ভাব্য (আল-যন্ন্ আল-রাজিহ্) ধরনের দলিল। সেসব ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে ইল্লা স্পষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদিতে চিহ্নিত, কিয়াস কখনোই সেই পর্যায়ের দলিল হিসেবে গণ্য হয় না যেমনটি কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য অথবা ইজমা, যা অকাট্য অথবা চূড়ান্ত (কাত্ই) হিসেবে গণ্য। বরং, কিয়াসকে মূল্যায়ন করা হয় প্রামাণ্য গ্রন্থভিত্তিক দলিলের সাথে নৈকট্য এবং সাযুজ্যের আলোকে সম্ভাব্যতার মাত্র্র ভিত্তিতে।[৫৪৯]

> কিয়াস (তামছিল) সম্ভাব্যতাভিত্তিক, যা অর্জিত হয় অনুমান এবং কল্পনার মাধ্যমে।[৫৫০]

ফিক্হের উৎস-পদ্ধতি (source methodology) এবং প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কিয়াসের সমস্যা এই যে 'আস্ল্' (মূল বিষয়) এবং তার ভিত্তিতে কিয়াসভিত্তিক হুকুমের যথার্থতার মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে।

> মূল উৎসের আলোকে হুকুমের যথার্থতা প্রসঙ্গে অনেকগুলো শর্ত ফকীহরা আরোপ করেছেন। এই বিষয়ে শুরুর দিকের সাহিত্যের স্বল্পতার কারণে ক্ল্যাসিক্যাল যুগে এই শর্তগুলোর সূত্র চিহ্নিত করতে আমরা অক্ষম। আল-জাস্সাস (মৃঃ ৯৮০ খ্রিঃ) এসব শর্ত নিয়ে কোনো কিছু বলেননি। তিনি কার্যকর কারণ বা ইল্লা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আবু ইসহাক আল-শিরাজী (মৃঃ ১০৮৩ খ্রিঃ) ছয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। আল-গাজ্জালী (মৃঃ ১১১১ খ্রিঃ) এবং আল-আমিদী (মৃঃ ১২৩৩ খ্রিঃ) দিয়েছেন আটটি শর্ত, ইবনে কুদামা (মৃঃ ১২২৩ খ্রিঃ) মাত্র দু'টি। আল-রাজী (মৃঃ ১২০৯ খ্রিঃ) এবং ইবনে আল-হাজিব (মৃঃ ১২৪৯ খ্রিঃ) বলেছেন ছয়টি শর্তের কথা, এবং আল-বায়যাভী (মৃঃ ১২৮৬ খ্রিঃ) পাঁচটির কথা। সময়ের সাথে সাথে এই শর্তের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো, যার তালিকা দিয়েছেন আল-শাওকানী। প্রতীয়মান যে, ফকীহরা কোনো সুনির্দিষ্টসংখ্যক শর্তের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি, কারণ শর্তের মধ্যে কিছু মৌলিক আর কিছু গৌণ। তাই সংখ্যার তারতম্য পুরো

৫৪৯ Moghul, p. 19.

৫৫০ Hasan, A., 1986, p. 2, referring to Al-Ghazali, Maqasid al-Falasifah, Op.Cit., pp. 39-40.

প্রক্রিয়াতে অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের স্পেকুলেটিভ বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছা সত্যিই কঠিন। আল-রাজীর মত অনুযায়ী ছয়টি শর্ত অবিসংবাদিত আর বাকিগুলো বিতর্কিত।[৫৫১]

বস্তুত, তাহলে, কিয়াস একটি স্পেকুলেটিভ দলিল যা ভুল-ভ্রান্তিময় (fallible) মানব যুক্তিভিত্তিক। কিন্তু, যখন ভুল-ভ্রান্তিময় দুনিয়াবি উৎসের সাথে অভ্রান্ত আসমানি সূত্রের সংযোগ বা সংমিশ্রণ হয় পদ্ধতিগত কাঠামোর অংশ হিসেবে, তখন মানবিক ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে যথার্থ মাত্রার সচেতনতা না থাকলে এবং সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আর এ বিষয়টির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি (disclaimer) না থাকলে, বাড়াবাড়ি সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ অধ্যায়ের বাকি অংশটুকুতে পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যাতে স্পষ্ট হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রখ্যাত এবং সম্মানিত মুসলিম মনীষী এবং ফকীহরা কিয়াসভিত্তিক আক্ষরিক এবং আইনসর্বস্ব প্রবণতার দুঃখজনক স্বাক্ষর রেখেছেন।

কিয়াস প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনার শুরুতেই কেমন করে সাধারণ অনুসিদ্ধান্ত আহরণ করা হয় তার একটি খেলো (frivolous) দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আলাউইয়া ফিলিপাইনের একজন ফকীহ এবং সে দেশের শরিয়া বারের একজন সদস্য। কুরআন থেকে যুক্তি বের করা (ইস্তিদ্‌লাল)-এর একটি পদ্ধতি, 'ইবারা' প্রসঙ্গে তিনি তার গ্রন্থ 'Fundamentals of Islamic Jurisprudence'-এ লিখেছেন:

> 'ইবারা' (বা সরল বাক্য) - দৃষ্টান্ত, 'তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর, মায়েরা শিশুকে দুধ পান করাবে দু' বছর পর্যন্ত, যদি পিতা পুরো সময়টি পূর্ণ করতে চায়, তাহলে (শিশুর) মায়ের ভরণ-পোষণ এবং বস্ত্র প্রদান তার দায়িত্ব, যতটুকু সম্ভব।' (কুরআন: ২/২৩৩) এই আয়াতটি থেকে দুটো বিষয় আরোহিত হয়। প্রথমত, তালাকপ্রাপ্তা হলেও, শিশুদের দুধ খাওয়াতে হলে মায়েদের ভরণ-পোষণের অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে এমন মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শিশুর পিতার। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সন্তানের সম্পর্ক মায়ের চেয়ে পিতার সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ।[৫৫২]

---

৫৫১ Hasan, M., 1986, p. 128. এই উদ্ধৃতিতে তারিখ হিজরি সন অনুযায়ী দেওয়া আছে। তবে সামঞ্জস্যতার জন্য এই বইতে খ্রিষ্টাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৫২ Alauya, p. 37.

দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটির ওপর আরো আলোকপাত করা প্রয়োজন। মাতার ভরণ-পোষণ পিতা দেয় এই ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছা হয় যে, মাতার চেয়ে সন্তান পিতার সাথে ঘনিষ্ঠতর, তাহলে গরিবেরা (মাতা অথবা পিতা হোক) যদি সরকার থেকে ভরণ-পোষণ পায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে সরকার শিশুর সাথে মাতা-পিতার চাইতে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবিদার। যদিও এই যুক্তি আলাইউয়ার দেওয়া যুক্তির ভিত্তিতে, এটা কি আসলে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হলো বা গণ্য হবে?

এই ধরনের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে, এটা ভুলে গেলে চলবে না যে মুসলিম মনীষী এবং ফকীহদের কোনো অসদুদ্দেশ্য ছিল না, বরং বলা বাহুল্য, তারা সাধারণভাবে যেমন ধার্মিক, বিবেকবান এবং মনীষায় প্রোজ্জ্বল ছিলেন, তেমনি তারা ছিলেন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাময়ও। তারা ইসলামী আইনের বিস্তারিত দিকের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন এবং সেসব আইনের ভিত্তি বা উৎস বা উৎকর্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের অনেকেই এতই অতি-আগ্রহী (overzealous) হয়ে পড়েন যে, তাদের দেওয়া যুক্তি-প্রমাণের তাৎপর্য কী দাঁড়ায় বা সময়ের সাথে সাথে তা কোথায় দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে যতটা প্রয়োজন ছিল, ততটা হয়তো ভাবেননি। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সময় অগ্রদূত হিসেবে অবদান রাখেন এবং তাদের পূর্ববর্তী চিন্তাভাবনা ও মতামতের প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন ও সমালোচনায় কখনো পিছ-পা হননি, যার মাধ্যমে ইসলামী আইন শ্রেয়তর হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁরা ইসলামী আইনের উন্নয়নে অথবা সংস্কারে সব সময়ই সফল হয়েছেন।

গ. কিয়াসের প্রয়োগে কিছু সমস্যাজনিত দিক

যেহেতু কিয়াস ইসলামী আইনশাস্ত্রের সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি, যেখানে মনীষীরা এবং ফকীহরা অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন এমন দৃষ্টান্ত তেমন দুর্লভ নয়। তবে এখানে যে কয়টি পেশ করা হয়েছে ইসলামের মূল্যব্যবস্থার ব্যাপারে সেগুলো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

১. কাফা বা কুফু: বিয়েতে সমতা

সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিয়ে এবং ইসলামেও এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নেই। বিপরীত লিঙ্গের দু'জনের মধ্যে বিয়ে যা দুইজন

মানুষকে এক বিশেষ বন্ধনে এক করে, তাই বলা যেতে পারে যে, যেকোনো মানুষের জীবনে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান থেকে আশা করা হয় যে, আজীবন সম্পর্ক গড়ে উঠবে যা আরো গভীরতর হবে সন্তানাদি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কারণে, শুরু থেকেই বিয়ে একটি জটিল ব্যাপার। দুজন মানুষকে একটি সৌহার্দ্যময়, অথবা অন্তত কার্যকর সম্পর্কের সূত্রে বাঁধার জন্য, বিয়ের উভয় অংশীদারের মধ্যে সামঞ্জস্যতা গুরুত্বপূর্ণ। নিখুঁত অথবা নিশ্চিত সামঞ্জস্য বলতে কিছু নেই, কিন্তু অসামঞ্জস্য যত কমানো যায় ততই ভালো। যদিও ব্যতিক্রম সব সময়ই আছে, কিন্তু সাধারণত বয়স, শিক্ষা, সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থান, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান প্রায়শই সৌহার্দ্যপূর্ণ বিবাহিত জীবনের জন্য প্রতিকূল হয়।

বিয়ের সম্ভাব্য বর-কনের মধ্যে পর্যাপ্ত মিল থাকা উচিত, অথবা যতটা সম্ভব মিল থেকেই এরকম আজীবন সম্পর্কের সূচনা হওয়া উচিত, এটা সহজেই বোধগম্য হওয়ার কথা। এ বিষয়টি শুধু পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের বিবেচনার বিষয় নয়, বরং পাত্র-পাত্রীর নিজেদেরও সম্যকভাবে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে আইনের পর্যায়ে তোলা এবং সমতা বা সামঞ্জস্যতার কোনো ব্যতিক্রমকে আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা, যেক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবকরা এবং কাজী (বিচারক) হস্তক্ষেপ করতে পারে– এটা আইনসর্বস্ব প্রবণতার একটি চক্ষু-উন্মীলনকারী দৃষ্টান্ত।

যদিও বিয়ের শর্ত এবং তার আইনি তাৎপর্য (ramification) সব মাযহাবেই এক নয়, হানাফী অবস্থান, যেমনটি বিভিন্ন হানাফী গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা ঐতিহ্যবাদী ইসলামী অবস্থানের চিত্র তুলে ধরে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে হানাফী ফিক্‌হের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ, আল-মারগিনানীর (মৃঃ ১১৯৭ খ্রিঃ) লেখা 'হেদায়া' থেকে।[৫৫৩]

> কাফা', আক্ষরিক অর্থে, বোঝায় সমতা। ফিক্‌হের ভাষায় এটার অর্থ হচ্ছে একজন নারীর সাথে একজন পুরুষের সমতা ... বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা অপরিহার্য, কারণ রাসুলুল্লাহ (স.) এ ব্যাপারে নির্দেশ

৫৫৩ হেদায়া গ্রন্থের যে সংস্করণ থেকে এই নির্যাস নেয়া হয়েছে তা প্রাচীন ইংরেজিতে। আর তাই অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদটা দুর্বল ছিল এবং সহজপাঠ্য নয়। তাছাড়া অনেক নাম এবং পরিভাষার বর্ণান্তকর (transliteration) সহজে চেনার মতো ছিল না। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদে বিকল্প শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যাতে সহজবোধ্য হয়।

> দিয়েছেন: 'তোমরা এ ব্যাপারে নজর রাখবে যেকোনো নারীকে বিয়ে দেওয়া না হয় তাদের যথাযথ অভিভাবক ব্যতীত এবং নারীদের যেন বিয়ে দেওয়া না হয় তাদের সমকক্ষ ব্যতিরেকে'। তাছাড়া বিয়ের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, যেমন বৈবাহিক মিলন, সামাজিকতা ও সৌহার্দ্য, যথাযথভাবে উপভোগ করা যায় না, যদি না স্বামী-স্ত্রী দু'জনে (সামাজিক রীতি অনুযায়ী) একে অপরের সমান না হয়; অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন নারী খুবই অপছন্দ করবে তার থেকে নিচু মর্যাদার কোনো পুরুষের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে। তাই এটা অপরিহার্য যে, স্বামীর ক্ষেত্রে 'কাফা'র শর্ত পূরণ হতে হবে। অর্থাৎ, স্বামীকে স্ত্রীর সমকক্ষ হতে হবে, যদিও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সমকক্ষ হওয়া কোনো শর্ত নয়, কারণ নিচু মর্যাদার নারীর সাথে দৈহিক মিলনে পুরুষের সাধারণত অমর্যাদাবোধ হয় না। এক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিয়ের বৈধতার জন্য তাদের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়; যদি কোনো নারী তার অধঃস্তন মর্যাদার কারো সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তার অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে সে বিয়ে ভেঙে দিতে, যাতে করে তাদের ওপর আসা সম্ভাব্য কোনো অমর্যাদা/অসম্মান তারা এড়াতে পারে।[৫৫৪]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে তার মূল সমস্যা এই যে, যে ব্যাপারে না কুরআনে আর না সুন্নাহতে কোনো কিছু উল্লেখ আছে এমন বিষয়কে বিয়ের আইনি 'শর্ত' বানানো। তাছাড়া, এই শর্তগুলো পূরণ না হলে কাজী বা বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী অথবা বর-কনের অভিভাবকরা আইনের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এই অবস্থানের কোনো মজবুত ভিত্তি নেই।

নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করা হয়ে থাকে ঐ শর্তগুলোর দলিল হিসেবে।

> হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে: 'তোমাদের বিয়ের জন্য সর্বোত্তম নারীদের বেছে নাও, বিয়ে কর তোমাদের সমকক্ষদের [আরবিতে, আকফা'] এবং তাদের বিয়ের প্রস্তাব দাও।'[৫৫৫]

---

৫৫৪ Al-Marghinani, p. 110.

৫৫৫ Ibn Majah, Vol. 3, Kitab an-Nikah, #1968, https://sunnah.com/ibnmajah:1968. লক্ষণীয়, ইবনে মাজার এই হাদিসটি জঈফ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, আর জঈফ হাদিস এড়ানোই শ্রেয়।

এটা লক্ষণীয় যে, নবিজি (স.) থেকে এ ধরনের অনেক পথ-নির্দেশনাই আছে যা সহজেই বোধগম্য এবং প্রজ্ঞাময়, কিন্তু সেগুলোকে আইনের পর্যায়ে নেয়ার কোনো কারণ নেই। খুঁটিনাটি সব কিছুকেই আইনি বিষয়ে পরিণত করাই আইনসর্বস্ব বাড়াবাড়ি, যে ফাঁদে মুসলিম উম্মাহ পড়েছে।

এই হাদিসটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলে জানা যায় যে, এটি কোনো মুতাওয়াতির হাদিস নয়, যা থেকে নবিজি (স.) আসলে কী বলেছেন বা করেছেন সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায়। এ হাদিসটি না 'মুতাওয়াতির বিল লাফ্‌জ্' (মূল, অভিন্ন শব্দে বর্ণিত) আর না 'মুতাওয়াতির বিল মা'না' (অভিন্ন অর্থে বর্ণিত)। হাদিসটি যদি সহিহ শ্রেণির হতো, তাহলেও তা থেকে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া নিশ্চিত নয়। কিন্তু, আরো বড় সমস্যা হচ্ছে যে এ হাদিসটি সহীহ্‌ও নয়। সুনান ইবনে মাজাহ্-তে প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা বিষয়টিকে পরিষ্কার করে।

> আল-যাওয়ায়েদ অনুযায়ী, এ হাদিসের ইসনাদে রয়েছে হারিছ বিন ইমরান আল-মাদীন। আবু হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন: 'সে একজন ভালো বর্ণনাকারী নয় এবং হাদিসটি যা সে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছে তার কোনো ভিত্তি নেই।' দারাকুত্‌নী বলেছেন: 'সে মাত্‌রুক'।[৫৫৬]

হাদিসের ভান্ডার ঘেঁটে দেখলে এই প্রসঙ্গে এ হাদিসটি ছাড়া অন্য কোনো রেওয়ায়েতের সন্ধান মেলে না। আল-বুখারি এবং সুনান আবু দাউদে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধ্যায় আছে যার শিরোনাম 'বিয়েতে কাফা (সমতা)', কিন্তু তার কোনোটিতেই এত স্পষ্ট বর্ণনা নেই যেমনটি রয়েছে এই ইবনে মাজাহ্-এর হাদিসে। আবু দাউদে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

> আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন: আবু হিন্দ নবিজির (স.) মস্তকের মধ্যস্থলে 'কাপ' করলেন। নবিজি (স.) বললেন: 'বনু বায়াদাহ, আবু হিন্দকে (তোমাদের মেয়ের সাথে বিয়ে করাও) এবং তাকে তার মেয়েকে তোমাদের সাথে বিয়ে দিতে বল।' তিনি (আরো) বললেন: 'উপশমের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে 'কাপ' করা।'[৫৫৭]

---

৫৫৬ Ibn Majah, Vol. 3, p. 180 দ্রষ্টব্য: মাতরুক মানে পরিত্যক্ত অথবা প্রত্যাখ্যাত কারণ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ আছে যে মিথ্যাচারিতার দোষে দুষ্ট। বিস্তারিতের জন্য দেখুন, see Awliya'i, n.d..

৫৫৭ Abu Dawud, Vol. 2, Kitab an-Nikah, #2097, https://sunnah.com/abudawud:2102.

এখানে ভাবার সুযোগ রয়েছে যে এই হাদিসগুলোর ভিত্তিতে কেমন করে এই হুকুমের আবিষ্কার সম্ভব হলো যার লঙ্ঘনের জন্য আইনানুগভাবে কেউ ফলাফল বা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। সহিহ আল-বুখারিতে 'সম্পদের সমতা' শিরোনামের অধীনে আরেকটি হাদিস রয়েছে যার ভিত্তিতে এমন গুরুতর আইনের ব্যাপারে অবশ্যই গভীর সংশয়ের কারণ রয়েছে।

> উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেছে: সে হযরত আয়েশাকে 'যদি তোমার ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচারপূর্ণ আচরণ করতে না পারার ব্যাপারে আশংকিত হও' (৪:৩)– এই আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, 'হে আমার ভাতিজা (অথবা ভাগ্নে)! এই আয়াতটি সেই ইয়াতীম মেয়ের ব্যাপারে যে তার অভিভাবকের অধীনে আছে এবং অভিভাবক তার সৌন্দর্য ও সম্পদ পছন্দ করে এবং (বিয়ের মাধ্যমে সেই) অভিভাবক মেয়েটির প্রাপ্য মোহর হ্রাস করতে চায়। এ ধরনের অভিভাবককে ঐ ইয়াতীমদের বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে, যদি না সে সুবিচার করতে পারে তাদের প্রাপ্য মোহর পুরোপুরি আদায় করার মাধ্যমে; আর তা না হলে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে। পরবর্তীকালে জনগণ রাসুলুল্লাহ্‌র রায় চান, যখন আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন: 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে সেই মেয়েদের ব্যাপারে যাদের বিয়ে করার ব্যাপারে তোমরা আগ্রহী' (৪:১২৭)। সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন যে যদি ইয়াতীম মেয়ের সৌন্দর্য ও বিত্ত থাকে এবং (কোনো অভিভাবক) তাকে বিয়ে করতে চায় তার এবং তার পারিবারিক মর্যাদার কারণে, সে তা করতে পারে শুধু যদি তাকে প্রাপ্য বা যোগ্য মোহর পূর্ণভাবে আদায় করে। আর যদি সেরকম মেয়েকে বিয়ে করতে না চায়, সৌন্দর্য বা বিত্তের অভাবের কারণে, তাহলে তাদের পরিবর্তে অন্য নারীদের বিয়ে করা উচিত। তাই, সৌন্দর্য ও বিত্তের অভাবের কারণে যদি সে বিয়ে করতে আগ্রহী না হয়, অথচ সৌন্দর্য ও বিত্তের কারণে হয়, তাহলে সুবিচারের দাবিতে তাদের পূর্ণ মোহর দিয়ে তারা বিয়ে করতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালার বাণী: 'সত্যিই তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ, তারা তোমার আল্লাহর অবাধ্যতার কারণ হতে পারে)' (৬৪:১৪)।[৫৫৮]

---

৫৫৮ Al-Bukhari, Vol. 7, #29, https://sunnah.com/bukhari:5092.

স্পষ্টতই, এ হাদিসের সাথে বিয়েতে সমতার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, যদিও শিরোনাম দেখে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। এক্ষেত্রে নবিজির (স.) মূল্যবান প্রজ্ঞা ও উপদেশ-নির্দেশকে বিধিবিধান বা আইনে পরিণত করা হয়েছে (পূর্বে উল্লিখিত ইবনে মাজাহ্‌র) এমন হাদিসের ভিত্তিতে যা সহিহ, অবিসংবাদিত অথবা সংশয়-দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নয়। তারপরও, এটা কিয়াসের কোনো শ্রেয় দৃষ্টান্ত নয়, কারণ এক্ষেত্রে সহিহ না হোক, কোনো এক শ্রেণির হাদিসের ভিত্তিতে এই সমতা বা সামঞ্জস্যের শর্তের হুকুমে ফকীহরা পৌঁছেছেন। কিন্তু, প্রাসঙ্গিক মনীষীরা তারপর এই কাফা'র বিষয়টিকে টেনে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছেন যে তা কিয়াসের যুক্তিসঙ্গত সীমার বাইরে চলে গেছে, যেখানে তাদের রায় বা অবস্থান কুরআন বা সুন্নাহর সাথে সংযোগ একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে, এমনকি কোথাও কোথাও তা কুরআন এবং সুন্নাহর আদর্শের সাথে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ।

> মুক্ত বা স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে সমতা দীনের ব্যাপারে সমতার শর্তের মতোই সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ অধীনতা বা দাসত্ব আসলে অবিশ্বাসের কুফল এবং তাতে নীচতা ও নৈতিকতাহীনতার (turpitude) চিহ্ন থাকে।[৫৫৯]

উপর্যুক্ত অবস্থানটি যারা মুক্ত এবং যারা বন্দি বা দাস তাদের মধ্যে এক মৌলিক সীমারেখা টানে। ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী ফিকহে দাসত্বকে যেভাবে দেখা হয়েছে তা ইসলামের সুবিচার ও মানব-মর্যাদার মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ, কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র একটি বিষয়[৫৬০] যা এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবে যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে আলোচ্য হাদিসটিতে আসলে কিন্তু সমতার কোনো মানদণ্ড হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। তারপরও কেউ হয়তো যুক্তি দিতে পারে যে মুক্ত বা স্বাধীন হওয়া একটি মৌলিক মানবিক মর্যাদা [দেখুন ৪. ইসলামী মূল্যবোধ, ২য় অধ্যায়ে] এবং এ ব্যাপারে বিয়ের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সমতা থাকাটার প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোধগম্য, যদিও যে বিষয়টিকে আইনের স্তরে উন্নীত করার কোনোই যৌক্তিকতা বা আবশ্যিকতা নেই, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট নারী যদি কোনো দাসকেই পছন্দ করে এবং বিয়ে করতে চায়। তেমনি, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরহেজগারিতা (piety) এবং গুণের (virtue) দিক থেকে কাফা'র শর্তও সমর্থনযোগ্য নয়।

---

৫৫৯ Al-Marghinani, p. 112.

৫৬০ Farooq, 2006c.

> পরহেযগারিতা এবং গুণের দিকটাও বিবেচনা করতে হবে, এটা হানিফা এবং আবু ইউসুফের মত; এটা গৃহীত মত, কারণ শ্রেষ্টত্বের অন্যতম নীতি হচ্ছে গুণ এবং স্বামীর দোষ অথবা কুঅভ্যাস একজন নারীর জন্য অবমাননা ও লজ্জার কারণ হতে পারে ...।[৫৬১]

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাত্র-পাত্রীর কুখ্যাতি বা বদভ্যাস থাকলে বা আছে কি না এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই বিবেচনা করবে। কিন্তু প্রশ্নটি এড়ানোর উপায় নেই যে যেখানে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রী স্বেচ্ছায় একে অপরকে বিয়ে করতে চায়, সেখানে যদি পরহেজগারী এবং গুণের সমতা যদি নাও থাকে, তাতে বিষয়টিকে আইনের পর্যায়ে নেবার যৌক্তিকতা অথবা দলিল কোথায়?

> সমতা প্রযোজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে, যা দিয়ে বুঝতে হবে যে একজন পুরুষের পর্যাপ্ত সম্পদ আছে মোহর ও ভরণ-পোষণের জন্য; ...[৫৬২]

আবারও, মোহর বিয়ের একটি শর্ত এবং এ ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট দলিল রয়েছে। যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য, এমনকি সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রেও, তা থাকা সাধারণ বোধগম্যতার (কমন সেন্স)-এর ব্যাপার। তবে, কোনো দুর্বল অথবা সুবিধাহীন (disadvantaged) ব্যক্তির অধিকারের সংরক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়া, এসব বিষয়কে আহকাম বা আইনে পরিণত করার আসলেই কোনো প্রয়োজন আছে কি?

এগুলো ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মনীষীরা কিয়াস করতে গিয়ে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য অতিরঞ্জনের অঙ্গনে পা দিয়েছেন, যেখানে কাফা' বা সমতার বিষয়কে একেবারেই উল্টে বা গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, যা সুবিচার এবং সাম্যের ব্যাপারে ইসলামের মহান বাণী ও পথনির্দেশনার পরিপন্থি [দেখুন, ৩. মূল্যবোধ, দ্বিতীয় অধ্যায়]।

> আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদের মত অনুযায়ী [বিয়ের ক্ষেত্রে] কাফা'ও বিবেচনা করতে হবে - ... পেশা বিবেচনা না করলেও চলবে, যদি না তা হয় এমনই নিচু শ্রেণির যা মারাত্মক আপত্তির কারণ হতে পারে, যেমন নাপিত, তাঁতি, চামড়া-সংশ্লিষ্ট পেশা এবং আবর্জনাভুক

---

৫৬১ Al-Marghinani, p. 112.
৫৬২ Al-Marghinani, p. 113.

(স্ক্যাভেঞ্জার্স), যারা সমান নয় এমন ব্যবসায়ী, সুগন্ধি-প্রস্তুতকারক/ বিক্রেতা, ওষুধ-বিক্রেতা, অথবা ঋণব্যবসায়ী।[৫৬৩]

এটা বুঝতে কোনো রকেট বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয় না যে উঁচু সামাজিক অবস্থানের পেশার নারীদের অপেক্ষাকৃত নিচু অবস্থানের পেশার কারো সাথে বিয়ে দিলে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কোনো উঁচু সামাজিক অবস্থানের অথবা মর্যাদাপূর্ণ পেশার প্রাপ্তবয়স্ক নারী যদি স্বেচ্ছায় চায় তার অধঃস্তন মর্যাদার কাউকে বিয়ে করতে, তাহলে পেশাগত দিক থেকে যতই তারতম্য থাক, এটা তাদের পারস্পরিক বিষয়। পেশাগত সমতা কঠোর কোনো শর্ত নয়। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি বিশেষ করে অগ্রহণযোগ্য, তা হচ্ছে নাপিত, তাঁতি, ইত্যাদি পেশাজীবীদের হেয়প্রতিপন্ন করা। এমন কোনো দলিল নেই যে, নবিজি (স.) কখনো কোনো পেশাকে এভাবে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। বরং, নবিজির (স.) শিক্ষা যে যেকোনো হালাল পেশাতেই হোক, শ্রম মহান।

কাফা' বিবেচ্য বংশের ক্ষেত্রেও, কারণ বংশীয় সূত্র মানবতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের একটি উৎস। তাই বলা হয়, 'একজন কুরাইশ কুরাইশদের সকল গোত্রের প্রেক্ষাপেটই আরেক কুরাইশের সমান।।' তার মানে, তাদের মধ্যে, হাশেমী আর নিস্‌লী, তায়েমী, আদভী ইত্যাদি কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এবং অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে, 'একজন আরব আরেক আরবের সমান।' এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎস নবিজির (স.) একটি বাণী থেকে। তাই এটা স্পষ্ট যে, কুরাইশদের অভ্যন্তরে কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। এরই আলোকে ইমাম মোহাম্মদ মত দিয়েছেন, 'কুরাইশ গোত্র বা পরিবারের প্রেক্ষাপটে কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, একমাত্র খিলাফতের বিষয় ব্যতিরেকে।' [খিলাফতের ক্ষেত্রে] এই ব্যতিক্রম চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে খিলাফত যেহেতু কুরাইশের বিশেষ সম্মান, সেজন্য খলিফাদের সম্মানের জন্য এবং বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য গোত্র হিসেবে কুরাইশের বিশেষ একটি সম্মান রয়েছে, যদিও তার মানে এই নয় যে, সাধারণভাবে সমতার অস্তিত্ব নেই ...

---

৫৬৩ Al-Marghinani, p. 114.

> যারা কুরাইশও নয়, আরবও নয় (আজম) তারা তাদের মধ্যে সবাই সমান এবং তাদের মধ্যে বংশগত নয়, বরং ইসলামের দিক থেকে অসমতা রয়েছে। - তাই কোনো অনারব যার পরিবার মুসলিম রয়েছে দু-তিন প্রজন্ম ধরে, সে যেকোনো মুসলিম পূর্বসূরী থেকে আসা হিসেবে সমান; কিন্তু যে নিজে ইসলামে নও-মুসলিম হিসেবে এসেছে, অথবা শুধু সে এবং তার পিতা ইসলামে এসেছে, সে সেই অনারব মুসলিমের সমান নয় যার পিতা এবং পিতামহ মুসলিম ছিলেন, কেননা পিতামহের যোগসূত্র ছাড়া কোনো বংশের ধারা গণ্য হয় না– এটাই হানিফা এবং (ইমাম) মোহাম্মদের মত। আবু ইউসুফ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, একজন অনারব যার পিতা মুসলিম, সে কাফা'র শর্ত পূরণ করে সেই নারীর ক্ষেত্রে যার পিতা এবং পিতামহ মুসলিম ছিল।
>
> একজন অনারব যে তার পরিবারের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে, সে এমন নারীর সমান নয় যার পিতা মুসলিম ছিল।[৫৬৪]

আবু ইউসুফের দেওয়া ভিন্ন মত বাদ দিলে, (ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ থেকে) উপর্যুক্ত মত নবিজির (স.) আদর্শ ও বাণীর একেবারে পরিপন্থি। নবিজি (স.) তাঁর বিখ্যাত বিদায়ী খুতবায় এ ধরনের সব বৈষম্যময় এবং অবিচারপূর্ণ ধ্যান-ধারণা বাতিল হিসেবে গণ্য করে উদাত্ত ঘোষণা দেন:

> সমগ্র মানবজাতি আদম এবং হাওয়া থেকে। কোনো অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর কোনো আরবের ওপর অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন কৃষ্ণকায়ের ওপর কোনো শ্বেতকায়ের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর কোনো শ্বেতকায়ের ওপর কৃষ্ণকায়ের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একমাত্র তাকওয়া এবং ভালো আমল ব্যতিরেকে।[৫৬৫]

---

৫৬৪ Al-Marghinani, pp. 111-112.

৫৬৫ "The Last Sermon of the Prophet," Retrieved January 12, 2007, from Islamicity Web site: http://www.islamicity.com/Mosque/lastserm.htm. বিদায় হজের ভাষণের ওপর একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধের জন্য দেখুন, "The Farewell Sermon of the Prophet: An Analytical Review, Islam and Civilizational Renewal, 9(3), pp. 322-342, Retrieved November 10, 2019 from https://ssrn.com/abstract=3068417.

তাই এরকম ধারণা পোষণ করা যে একজন অনারব আরবের সমান নয় (তা বিয়ের ক্ষেত্রেই হোক) একেবারেই ভুল, যা নবিজির (স.) শিক্ষা ও আদর্শের একেবারে পরিপন্থি। আরো দাবি করা যে নও-মুসলিম কেউ মুসলিম পরিবারে জন্ম হওয়া কোনো মুসলিমের সমান নয়, এটা কিয়াসের জলজ্যান্ত অপপ্রয়োগ।

> যদি কোনো নারী নিজেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার যথার্থ মোহরের তুলনায় কম গ্রহণ করতে রাজি হয়ে থাকে, তাহলে তার অভিভাবকদের অধিকার আছে এ বিয়ের বিরোধিতা করার, যতক্ষণ না স্বামী পূর্ণ মোহর আদায় করতে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হয়। এটা হানিফার মত। তার দুই শিষ্য মত দিয়েছেন যে, অভিভাবকদের এমন কোনো অধিকার নেই।[৫৬৬]

ইমাম আবু হানিফার (র.) দুই শিষ্য– ইমাম আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মাদ (র.)– তাদের ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এ ব্যাপারে, সেটা স্বস্তিদায়ক। কিন্তু, পরবর্তীকালে হানাফী ফিকহ এই বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার মতকেই প্রাধান্য দিয়েছে, যদিও দুই সম্মানিত শিষ্যের অভিন্ন মত ছিল যে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়ই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজস্ব এখতিয়ার। এসব ব্যাপারে নারীর অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ভুল, এটাই যথার্থ এবং সবচেয়ে সঠিক ইসলামী অবস্থান।

অতিমাত্রায় কিয়াসের ব্যবহার সব ধরনের সমস্যা ও অবস্থার পরিসরে, যেমনটি দেখা যায় আল-মারগিনানীর 'হেদায়া'তে, তা পরবর্তী পর্যায়ে ফিকহ শাস্ত্রে বজায় থাকে। একই প্রবণতার আরো দৃষ্টান্ত মেলে হাস্‌কাফী (মৃঃ ১৬৭৭ খ্রিঃ)-র 'দুর্‌রুল মুখতার'-এ।

> কোনো ব্যক্তি যে নিজে ইসলাম কবুল করেছে সে যার পিতাও মুসলিম এবং যে ক্রীতদাস হিসেবে মুক্তি পেয়েছে আর তার মা আগে মুক্ত ছিল এমন ব্যক্তির সমান নয়।[৫৬৭]
>
> একজন পুরুষ ক্রীতদাস যার মুক্তিদাতা ছিল নিম্ন সামাজিক স্তরের, সে সমান নয় এমন নারীর যার মুক্তিদাতা সামাজিক দিক থেকে উঁচু স্তরের।[৫৬৮]

---

৫৬৬ Al-Marghinani, p. 114.

৫৬৭ Haskafi, p. 50.

৫৬৮ Ibid.

> একজন অনারব (আজম) পুরুষ কোনো আরব নারীর সমান নয়, যদিও সে অনারব পুরুষ বিদ্বান, এমনকি রাজা-বাদশাহও হয় এবং এটাই সবচেয়ে সঠিক মত।[৫৬৯]
>
> একজন হানাফী পুরুষ কোনো শাফেয়ীর কন্যার সমান নয় এবং আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই মত ঐ (শাফেয়ী) মাযহাব অনুযায়ী সঠিক কিনা, তাহলে আমরা উত্তরে বলব যে, (তা হোক বা না হোক), এটা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী (সঠিক)।[৫৭০]

বিশ্বাস হওয়া কঠিন যে, 'হেদায়া' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধ্যায়টির শুরু এই অবতরণিকামূলক মন্তব্যের মাধ্যমে: 'কাফা', আক্ষরিক অর্থে, বোঝায় সমতা। ফিক্‌হের ভাষায় এর তাৎপর্য হচ্ছে একজন পুরুষের পক্ষে একজন নারীর সমকক্ষ হওয়া ..."[৫৭১] কিন্তু পরবর্তীকালে ফিকহী বিশ্লেষণ এবং যুক্তিধারা এই সমতার ধারণাটাকে ডিগবাজির মতো উল্টিয়ে সমতার বিষয়কে অসমতায় পর্যবসিত করেছে, যা নারী ও তাদের পারিবারিক মর্যাদা ও অধিকারের সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে সূচিত, তা-ই সেই নারীর হীনতা নিশ্চিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত ভাষ্যে: "একজন পুরুষ আরেকজনের 'কুফু', যখন সে অপরজনের সমান। এখানে 'কুফু' বলতে বোঝায় (পাত্রের তুলনায়) পাত্রীর এক বিশেষ ধরনের সমতা বা হীনতা (inferiority)।"[৫৭২]

কেমন করে মনীষীরা সমতাসংক্রান্ত একটি বিষয়কে পাত্রীর অসমতা বা হীনতায় পরিণত করলেন তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যা মেলে কিয়াসের অতিমাত্রিক ব্যবহার, যা অনেক ক্ষেত্রেই অপপ্রয়োগে পরিণত হয়েছে।

বিয়ের জন্য জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে কিছু বিশেষ প্রকার ছাড়া, কুরআনে কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। বরং, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় সামঞ্জস্য, তাকওয়া এবং সুবিচারপূর্ণতার ওপর।

---

৫৬৯ Ibid.

৫৭০ Haskafi, p. 52; পাদটীকায় এটি পরিষ্কার করা হয়েছে: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, একজন হানাফী পুরুষ এবং শাফেয়ী নারীর মধ্যে বৈধ, কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তা বৈধ নয়। - রাদ্দুল মুহ্‌তার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১। রাদ্দুল মুহ্‌তার হচ্ছে হানাফী ফিকাহ্‌র অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হাসকাফির লেখা দুর্‌রুল মুখতার-এর ওপর ইবনে আবিদীনের ব্যাখ্যা।

৫৭১ Al-Marghinani, p. 110.

৫৭২ Haskafi, p. 48.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। এদের ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান করো। তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়লা সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫৭৩]

সুনান আবু দাউদে কাফা'-সংক্রান্ত হাদিসের প্রসঙ্গে অনুবাদক কিছু মন্তব্য যোগ করেছেন যা শিক্ষণীয়।

আবু হিন্দ বনু বায়াদার একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিল। সে সেই গোত্রের সদস্য ছিল না। রাসুলুল্লাহ (স.) বনু বায়াদাকে বললেন তার কন্যাকে আবু হিন্দের সাথে বিয়ে দিতে। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ক্ষেত্রে কাফা' বা সমতার ক্ষেত্রে শুধু দীনই বিবেচনা করা উচিত। এই অবস্থান হচ্ছে মালিক-এর। তার মানে এই যে বিয়ের ক্ষেত্রে বংশ, পেশা, সামাজিক অবস্থান অথবা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমতা জরুরি (বা শর্ত) নয়। বিয়ের জন্য দীনের অভিন্নতাই একমাত্র বিষয়, যা বিবেচ্য। একজন মুসলিম (পুরুষ) যেকোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারে, তার বংশ, মর্যাদা এবং পেশা যাই হোক না কেন। ইবনে উমর, ইবনে মাসুদ, মোহাম্মদ বিন সিরিন, উমর ইবনে আবদুল আজিজের নাম উল্লেখ করা হয় এই মতের সমর্থনে। [কিন্তু] অধিকাংশ মনীষী এই মত পোষণ করেন যে, বিয়ের ব্যাপারে দীন, মর্যাদা, বংশ, পেশা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা

৫৭৩ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:২৪।

> বিবেচনা করতে হবে। বংশগত সমতার ব্যাপারে অধিকাংশ মনীষী একমত। আবু হানিফার মতে, কুরাইশরা (নিজেদের মধ্যে) একে অপরের সমান। আরবরা একে অপরের সমান। অনারবরা আরবের সমান নয়। আল-শাফেয়ীর অবস্থান মাঝামাঝি। তার মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা বিবেচ্য। কিন্তু অসম পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিয়ে অবৈধ নয়। যদি দু'জন বিয়ে করে, কিন্তু তারা একে অপরের সমান নয়, তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়েটি বৈধ। যদি অসম দু'জনের মধ্যে বিয়ে সম্পাদিত হয় তাদের পারস্পরিক সম্মতি ছাড়াই, তাহলে বিয়ে বাতিল করা যেতে পারে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিয়ের ব্যাপারে বংশগত সমতার কোনো গ্রহণযোগ্য হাদিস নেই।[৫৭৪]

হামুদাহ আব্দ আল-আতী, 'ফ্যামিলি স্ট্রাকচার অব ইসলাম' শীর্ষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, ক্ল্যাসিক্যাল মনীষীরা কেন কাফা'কে গুরুত্ব দিতে এত দূর পর্যন্ত গেছেন তার একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।[৫৭৫] তিনি 'বিয়েতে সামাজিক সমতা' এবং 'বিয়েতে ধর্মীয় সমতা'র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আল-আতী এই ঐতিহাসিক সত্যটি দেখিয়েছেন যে প্রাক-মোহাম্মদ[৫৭৬] আরব সমাজ ছিল

---

৫৭৪ Abu Dawud, Vol. 2, pp. 562-563, referring to Awn al-Ma'bud, II, 197.

৫৭৫ Al-Ati, pp. 84-97.

৫৭৬ ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন লেখনীতে, প্রাক-ইসলামী ('pre-Islamic') পরিভাষাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় জাহেলিয়াত বা প্রাক-নবি মুহম্মদ কালের জন্য। এই বইতে পরিভাষাটি এসেছে শুধু অন্য কারো লেখায় উদ্ধৃতি থেকে। যখন এই লেখকেরা 'প্রাক-ইসলামী' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন, তারা আসলে প্রাক-মুহাম্মাদ বা প্রাক-কুরআন বোঝাতে চায়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানবেতিহাসে প্রাক-ইসলামী বলতে কিছু নেই, কেননা ইসলামের শুরু হযরত আদম এবং হাওয়া (আ.) থেকে, যার ধারাবাহিকতা ছিল অসংখ্য নবিদের মাধ্যমে, যার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীন কায়েম করো এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছ তা ওদের কাছে দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। [(আশ-শুরা) ৪২:১৩]

অমুসলিমরা বিশ্বাস করে না যে, মানবেতিহাসের শুরু থেকেই ইসলামের শুরু, আর তাই তাদের বোঝা অনুযায়ী প্রাক-ইসলামী পরিভাষার ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা নিছক তাদের বিভ্রান্তি। কিন্তু মুসলিমদের একই ফাঁদে পড়ার কথা নয়, এরকম ধারণা ইসলাম এবং মুহাম্মদবাদ (Muhammadanism) সমার্থক বানায় যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিভিন্ন মানদণ্ডের আলোকে খুবই উঁচু-নিচুর ভেদাভেদভিত্তিক। সেই সমাজে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে নিজেদের স্তর বা মর্যাদা এবং সমতা (বংশগত, সম্পদগত এবং পেশাগত) বজায় রাখার ওপর মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো। সামাজিক সমতা থেকে গুরুত্ব ধর্মীয় সমতার দিকে সরিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন: "তাই, একজন অমুসলিম পুরুষকে একজন মুসলিম নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ সেই পাত্র ধর্মীয় দিক থেকে পাত্রীর সমান নয়।[৫৭৭] নতুন পথিকৃত কমিউনিটি, নবিজির (স.) পথ-নির্দেশনা এবং নেতৃত্বে, সামাজিক সমতার ক্ষেত্রে শ্রেণি-বিভাজনের প্রবণতা ও কুফলকে অনেকাংশে হ্রাস করেন। দুঃখজনক যে সম্ভবত কয়েক মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম সমাজে বিরাজমান সামাজিক বাস্তবতা এবং সাংস্কৃতিক রীতির আলোকে, ধীরে ধীরে মনীষীরা আবার ধর্মীয় সমতার পরিবর্তে সামাজিক সমতার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

যেভাবেই বিষয়টি দেখা হোক না কেন, এ সত্যটি অনস্বীকার্য যে ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ ও নীতি মারাত্মক এবং মৌলিকভাবে আপোষিত হয়েছে কাফা'-সংক্রান্ত এসব বিধানের মাধ্যমে, যা সম্ভব হয়েছে অগ্রহণযোগ্য বা বিতর্কিত হাদিসের প্রয়োগ অথবা কিয়াসের লাগামহীন ব্যবহারের কারণে।

২. ক্রীতদাসত্ব: 'এক-দ্বিতীয়াংশ' বিধান

স্বাধীনতা এবং ইখতিয়ার ইসলামের প্রাথমিক (first-order) শর্ত।[৫৭৮] মানুষকে একটি নতুন প্রজাতি হিসেবে সৃষ্টি এবং এ দুনিয়াতে তাকে এজন্য স্থাপন করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন এমন এক সৃষ্টি যার থাকবে স্বাধীনতা এবং ইখতিয়ার, ফেরেশতাদের মত নয় যারা তাদের প্রকৃতিগত কারণেই ভালো এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে। এটা ইসলামের একটি মানদণ্ডস্বরূপ অবস্থান। তাই, ক্রীতদাসত্ব বা চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ইসলামের দু'টি মৌলিক মূল্যবোধ (#১ এবং #৩)-এর একেবারে বিরোধী।

দাসত্ব (ক্রীতদাস অর্থে) একটি প্রতিষ্ঠান যার অস্তিত্ব ছিল বংশ-পরম্পরায় এবং রাসুলুল্লাহর (স.) সময়ের আগে থেকেই এর শিকড় ছিল অত্যন্ত গভীর।

৫৭৭ Al-Ati, p. 88.
৫৭৮ Farooq, 2004b.

ইসলাম যখন মানবতাকে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন বাণীর দিকে চূড়ান্তভাবে আহ্বান জানালো সর্বশেষ নবির মাধ্যমে, তখন ইসলাম মানুষের মৌলিক মর্যাদার ঘোষণাসহই সত্যকে সবার সামনে পেশ করে। এটা তর্কসাপেক্ষ যে ইসলাম কি দাসত্বকে হারাম করেছে বা না করে থাকলে কেন করেনি, যেমনটি করেছে মাদকদ্রব্য, ব্যভিচার অথবা শূকরের মাংস। তবে যদিও এটাই ঐতিহ্যবাদী মত, এই গ্রন্থকার মনে করে যে এই মত ভ্রান্ত।[৫৭৯] সে আলোচনায় না গিয়েও এটা অনস্বীকার্য যে, নবিজির (স.) নেতৃত্বে ইসলাম দাসত্বের ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে এবং সমগ্র দাসত্ব-প্রথাকে তিরোহিত করার পথে এগিয়ে দেয়। সেই লক্ষ্যেই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী পদক্ষেপ হিসেবে পাঁচটি বুনিয়াদের একটি জাকাতের অংশ হিসেবে বিশেষ করে নির্দিষ্ট করা হয় ক্রীতদাসদের অথবা যেকোনো ধরনের দাসত্বে আবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য।[৫৮০]

সমসাময়িক সময়ে অন্যান্য জায়গার মতোই, প্রাচীন আরবের দাসদের কোনো স্বীকৃত অধিকার ছিল না। মালিকরা যেমন খুশি তাদের দাসদের সাথে আচরণ করতে পারত। একজন দাস মালিকের হাতে নিগ্রহ, এমনকি হত্যার শিকার হতে পারত, এবং সে সব কিছুই মালিক শ্রেণির 'প্রিভিলেজ' হিসেবে গণ্য হতো। একবার দাস, সব সময়েই দাস বংশ-পরম্পরায়, এটা ছিল প্রবাদসম।

দাসের মালিকানার ব্যাপারে আইন এবং সীমারেখা নির্ধারণের মাধ্যমে কুরআনের হেদায়েত আর তার আলোকে নবিজির (স.) নেতৃত্ব তখনকার আরব সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তার ফলে দাসদের মানবিক মর্যাদা বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব দাসকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ একটি আন্দোলনের রূপ নেয়। যুদ্ধবন্দি ছাড়া, মুক্ত কোনো মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এমনকি যুদ্ধবন্দি ও দাসত্বে আবদ্ধ যারা এমন সবার ব্যাপারে সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রণোদনাসহ কুরআন ও নবিজির (স.) উপদেশ-সতর্কবাণী মিলে সকল দাসের মুক্তিলাভের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাকাত একটি ফরজ হিসেবে তার একটি অংশ চিরস্থায়ীভাবে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য নির্ধারিত হয়, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে।

---

৫৭৯ Farooq, 2006c.
৫৮০ Farooq, 2006c.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"সাদাকা (জাকাত অর্থে) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫৮১]

নবিজি (স.) শিখিয়েছেন যে, মানুষকে মুক্তি উপহার দেওয়া এমন একটি উঁচুদরের গুণ যে তা মুক্তিদানকারীকে আখেরাতে নাজাত অর্জনের নিয়ামক হবে। কিছু যুদ্ধবন্দি (যাদের দাসে পরিণত করা যেত), তাদের মুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যদি তারা মদিনার নতুন কমিউনিটির কয়েকজনকে অক্ষরজ্ঞান দান করে। দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ এমন কাউকে মুক্তি দেওয়াকে নবিজি (স.) মুক্তিদানকারীর পাপের কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য করেন। আর যদি কেউ তার দাসের সাথে অন্যায় আচরণ করে থাকে, বিশেষ করে দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে, তাহলে মালিকের জন্য যথাযথ সমাধান হিসেবে নির্ধারিত করা হয় সেই দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।

আবু মূসা আল-আশ্য়ারী বর্ণনা করেছেন: নবিজি (স.) বলেছেন, 'ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রুগ্নকে দেখতে যাও এবং যারা দাসত্বে আবদ্ধ তাদের মুক্ত করো বা মুক্তি দাও'।[৫৮২]

আসমা বর্ণনা করেছেন: 'নিঃসন্দেহে নবিজি (স.) সূর্যগ্রহণের সময় মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন দাসদের মুক্তি দিতে।'[৫৮৩]

আবদুল্লাহ বিন উমর বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) যখন তায়েফ থেকে ফেরার পথে (মক্কার নিকটবর্তী একটি শহর) জি'রানায় ছিলেন তখন উমর বিন আল-খাত্তাব জিজ্ঞেস করলেন: 'ইয়া

৫৮১ আল-কুরআন (আত-তাওবা) ৯:৬০।

৫৮২ Al-Bukhari, Vol. 7, Kitab al-Jihad wa as-sir, #286, https://sunnah.com/bukhari:3046.

৫৮৩ Al-Bukhari, Vol. 2, Book 18, Kitab al-'itq, #163, https://sunnah.com/bukhari:2519.

রাসুলাল্লাহ! আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জাহেলিয়াতের যুগে যে আমি হারাম শরীফে একদিনের জন্য ই'তিকাফ করব। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি বললেন: 'যাও, একদিনের জন্য ই'তিকাফ করো।' (সেই সাথে) রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে খুমুছ থেকে একজন ক্রীতদাসীকে দিলেন। পরে যখন রাসুলুল্লাহ (স.) যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দিলেন, উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) তাদের বলতে শুনলেন: 'রাসুলুল্লাহ (স.) আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন।' তিনি (হযরত উমর) বললেন: 'এটা কী?' তারা বলল: 'রাসুলুল্লাহ (স.) (কমিউনিটির বিভিন্ন জনের ভাগে পড়া) যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দিয়েছেন।' তা শুনে তিনি (হযরত উমর) বললেন: 'আবদুল্লাহ, যাও সেই ক্রীতদাসীর কাছে এবং তাকে মুক্ত করে দাও।'[৫৮৪]

যাদান বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর তার ক্রীতদাসকে ডাকলেন এবং তার পিঠে প্রহারের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তিনি দাসটিকে বললেন: 'আমি তোমার কষ্টের কারণ হয়েছি।' সে বলল: 'না।' কিন্তু সে (ইবনে উমর) বলল: '(যাও) তুমি মুক্ত।' তারপর সে মাটি থেকে কিছু হাতে নিলেন এবং বললেন: '(আমার হাতে যা) তার সমান পুরস্কারও আমার জন্য রইবে না। আমি রাসুলুল্লাহকে (স.) বলতে শুনেছি: 'যেকোনো যোগ্য অপরাধ ছাড়া দাসকে প্রহার (আঘাত) করবে অথবা তাকে চড় মারবে, তার জন্য কাফ্ফারা এটাই যে সে তাকে মুক্ত করে দেবে।'[৫৮৫]

আবু মাস'উদ বর্ণনা করেছেন যে, সে তার ক্রীতদাসকে প্রহার করছিল এবং দাসটি বলছিল: 'আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই।' কিন্তু সে তাকে প্রহার করেই যাচ্ছিল, যখন (একপর্যায়ে) সে বলল: 'আমি রাসুলুল্লাহর (স.) আশ্রয় চাই'। (এ কথা শুনে) সে দাসটিকে ছেড়ে দিলো। পরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন: 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার প্রাধান্য বা প্রতাপ তার চেয়েও বেশি রয়েছে যতটা রয়েছে তোমার প্রাধান্য (তোমার) দাসের ওপর।' সে

৫৮৪ Muslim, Vol. III, Kitab al-aiman, #4074, https://sunnah.com/muslim:1656c.

৫৮৫ Muslim, Vol. III, #Kitab al-aiman, #4079, https://sunnah.com/muslim:1657b.

(আবু মাস'উদ) বললেন যে, তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই রেওয়ায়েতটি অন্য পরম্পরায় শু'বার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে নিম্নোক্ত কথাগুলোর উল্লেখ নেই: 'আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই, আমি রাসুলুল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।'[৫৮৬]

আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: 'যখন তোমাদের কারো দাস খাবার তৈরি করে থাকে এবং পরিবেশন করে তোমাদের জন্য, তাপ এবং ধোঁয়ার কাছাকাছি বসে কষ্ট করার পর, তাহলে তার উচিত তাকে (দাসকে) পাশে বসানো এবং একসাথে বসে খেতে দেওয়া; আর যদি খাবার কম পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার (অর্থাৎ, মালিকের) ভাগ থেকেই তাকে কিছু ভাগ দেওয়া উচিত' - (অপর বর্ণনাকারী) দাউদ বলেন: তার মানে, এক বা দুই লোকমা (হলেও)।'[৫৮৭]

আল-মা'রুর বর্ণনা করেছেন: আর-রাবাদাতে আমি আবু জারের সাথে দেখা হলো, যিনি একটি জোব্বা পরেছিলেন এবং তার দাস, সেও অনুরূপ একটি জোব্বা পরিধান করেছিল। তাকে আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন: 'আমি একজন ব্যক্তির সাথে অসদাচরণ করেছিলাম তার মাতা সম্পর্কে কটু নাম মুখে এনে।' (এতে) নবিজি (স.) আমাকে বললেন: 'ও আবু যর! তুমি তার মা সম্পর্কে কটু নাম মুখে এনে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছ? তোমার মধ্যে (তো) এখনো জাহেলিয়াতের কিছু লক্ষণ রয়ে গেছে। তোমার দাসরা তোমাদের ভ্রাতা এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন। তাই কারো কর্তৃত্বাধীনে যদি তার কোনো ভাই থাকে, তাহলে সে নিজে যা খায় তা থেকে তাকে খেতে দেওয়া উচিত এবং তাকে পরিধান করতে দেওয়া উচিত যেমনটি সে পরিধান করে। তার ক্ষমতার বাইরে এমন কোনো কিছু করতে তাদের বলবে না, আর যদি বলই, তাহলে তাকে সহায়তা করবে।'[৫৮৮]

---

৫৮৬ Muslim, Vol. III, Kitab al-aiman, #4089, https://sunnah.com/muslim:1659b.
৫৮৭ Muslim, Vol. III, Kitab al-aiman, #4096, https://sunnah.com/muslim:1663.
৫৮৮ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-Iman, # 29, https://sunnah.com/bukhari:30.

> আনাস বর্ণনা করেছেন: নবিজি (স.) বলেছেন, 'তোমাদের কারো ইমান গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য তা-ই আকাঙ্ক্ষা কর যা তোমরা কর নিজেদের জন্য।'[৫৮৯]

লক্ষণীয় যে, নবিজি (স.) দাসদের ইসলামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অংশ হিসেবে দাসদের ভাইয়ের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং যেমনটি পূর্ববর্তী হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি তাদের প্রতি খারাপ অথবা কষ্টদায়ক আচরণ করার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব উদ্যোগের ফলে এমন একটি পরিবেশ ও ধারার সৃষ্টি হয় যেখানে নবিজির (স.) উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম দাসদের মুক্তি দিতে অথবা মুক্ত করতে থাকে ইসলামের আদর্শ ও নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখিয়ে। তাই নবিজির (স.) জীবদ্দশাতেই সাবেক দাসরা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিসরে পূর্ণাঙ্গভাবে গৃহীত হয়, যার মধ্যে নবিজির (স.) মসজিদে সম্মানিত মুয়াজ্জিনের দায়িত্বেও সাবেক একজন দাস, হযরত বেলাল (রা.) নিয়োজিত হয়। এই ধারা চলতে থাকে এবং একপর্যায়ে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাবেক দাসদের সন্তানরা যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন। এমন একটি যুদ্ধে যোগ্যতার ভিত্তিতে সে রকম একজন ক্রীতদাসের অধীনে শীর্ষস্থানীয় এবং সম্ভ্রান্ত অনেক সাহাবি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সাধারণ সৈন্য হিসেবে।[৫৯০]

এ বিষয়টি সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত দাসপ্রথা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু যারা ইতোমধ্যেই দাস ছিল তাদের ব্যাপারে। এটা এজন্য যে স্বাধীন কোনো মানুষকে দাসে পরিণত করা ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়। আল-বুখারি এবং অন্যান্য সংগ্রহে, নিম্নোক্ত হাদিসটির মত বেশ কয়েকটি রয়েছে, যেখানে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিপক্ষ হবেন তাদের বিরুদ্ধে যারা মুক্ত মানুষকে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) দাসত্বে আবদ্ধ করে।

> আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন: নবিজি (স.) বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হাশরের দিনে আমি প্রতিপক্ষ হব তিন (ধরনের) ব্যক্তির বিরুদ্ধে: যে আমার নাম নিয়ে চুক্তি করে, কিন্তু সে ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা দেখায়; যে একজন মুক্ত ব্যক্তিকে (মূল্যের বিনিময়ে)

---

৫৮৯ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-Iman, #12, https://sunnah.com/bukhari:13.

৫৯০ Muslim, Vol. IV, Kitab Al-Fada'il Al-Sahabah, #5958, https://sunnah.com/muslim:2426a.

বিক্রয় করে এবং সেই মূল্য ভোগ করে; এবং যে একজন শ্রমিককে কাজে লাগায় এবং তার কাছে থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করে, কিন্তু তাকে তার (যথাযথ) মজুরি না দেয়।'[৫৯১]

এরকম হাদিসের ভিত্তিতে মনীষীরা, বিশেষ করে ফকীহরা রায় দিয়েছেন যে, মুক্ত মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করা কিংবা বেচা-কেনা হারাম। তাই ইসলামী আইনের দিক থেকে দাসপ্রথার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টতা শুধু তাদের ব্যাপারেই যারা দাসত্বে আগেই আবদ্ধ ছিল আর যারা যুদ্ধবন্দি।

যদিও কুরআনে প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো এখনো আলোচনা করা হয়নি, তবু দাসপ্রথার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে নবিজির (স.) একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশে: 'দাসদের (রাকাবা) মুক্ত করে দাও ...'।[৫৯২]

ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্যবাদী অবস্থানের ভুল যুক্তি হচ্ছে এই যে নবিজি (স.) কখনোই বিশেষ বা নির্দিষ্ট করে দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করেননি। কিন্তু, অবস্থানটি এই ধারণার ভিত্তিতে যে 'হারাম' অথবা অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা ধরনের শব্দ বা নির্দেশনা দাসপ্রথার ব্যাপারে পাওয়া যায় না কুরআনে অথবা হাদিসে। এটা মারাত্মক একটা ভ্রান্তি, কারণ যেসব বিষয়কে 'হারাম' কিংবা 'ফরজ' গণ্য করা হয় সেগুলো আবশ্যিকভাবেই কুরআন-হাদিসে স্পষ্টভাবে এ ধরনের শব্দের উপস্থিতির ভিত্তিতে নয়। বস্তুত মনীষীরা অনেক কিছু হারাম কিংবা আবশ্যিক হিসেবে গণ্য করেছেন দুর্বলতম হাদিস অথবা অগ্রহণযোগ্য কিয়াসের ভিত্তিতে, যে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে 'কাফা' প্রসঙ্গে। কিন্তু দুঃখজনক যে, নবিজির (স.) শুরু করা দাসপ্রথার অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনকে তার আকাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করার পরিবর্তে এ ব্যাপারে ইসলামের যথার্থ চেতনা ও অবস্থানকে একেবারে উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে।

মানুষের মৌলিক মানব মর্যাদা এবং অলঙ্ঘনীয়তার আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং দাসপ্রথার অবসানের আন্দোলনকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর পরিবর্তে, পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম সমাজ এবং ইসলামী আইনের ধারক-বাহকরা দাসপ্রথাকে একটি চলমান বা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। চারটি মূল মাযহাব এবং সংশ্লিষ্ট ফিক্‌হ যখন কাঠামোগত রূপ পায়,

---

৫৯১ Al-Bukhari. Vol. 3, Kitab al-buyu # 430, https://sunnah.com/bukhari:2227.
৫৯২ Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, #18672.

ততক্ষণে দাসপ্রথা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয় এবং কিয়াসের অতিমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে সংবেদনশীলতা থাকার কথা তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। বস্তুত ইসলামী আইনের পরিসরে এমনও পরিলক্ষিত হয় যে কিছু শীর্ষস্থানীয় ফুকাহা দাসপ্রথা নিয়ে আইন-বিধান আলোচনা করেছেন এমনভাবে যেন দাসদাসীরা লেনদেনের নিছক আরেকটি সামগ্রী। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র.) দাসের জীবনের (রক্ত-মূল্য) নির্ধারণের ব্যাপারে নিম্নোক্ত রায় দিয়েছেন:

> ইবনে শিহাব বলেন: অন্যরাও যোগ করেছেন: "[দাসের মূল্য] নিরুপিত হবে একইভাবে যেমন হয়ে থাকে কোনো সামগ্রীর ক্ষেত্রে ... তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'তার প্রমাণ কী?' [শাফেয়ী] জবাব দিলেন: 'এটা মুক্ত-স্বাধীন কোনো ব্যক্তি দিয়ে সংঘটিত কোনো ফৌজদারি অপরাধের আলোকে করা কিয়াসের ভিত্তিতে।' তিনি বললেন: [দাসের মূল্য-দিয়াত] স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত থেকে ভিন্ন, কারণ মুক্ত-ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো এটা ইতোমধ্যেই নির্ধারিত, আর দাসের ক্ষেত্রে তা সমান হবে বিভিন্ন সামগ্রীর যেভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন উট, শস্য (বিন্স), পশু বা অনুরূপ ক্ষেত্রে যেমন হয়।"[৫৯৩]

কিয়াসের মাধ্যমে দাসদের লেন-দেনের সামগ্রীর সমতুল্য বানানোর মতো এই নির্লিপ্ত অমানবীকরণ (dehumanization) একেবারেই দুঃখজনক, কারণ তা কুরআনে এবং নবিজির (স.) আদর্শের আলোকে মানবজীবন ও মর্যাদাকে সমুন্নত ও অলজ্ঘনীয় রাখার নীতি [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত #১ মূল্যবোধ]-এর সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। তার চেয়ে আরো দুঃখজনক পর্যায়ে কিয়াসের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মেলে দাস-সংক্রান্ত আইন-বিধানের ক্ষেত্রে একটি গাণিতিক বিধান প্রয়োগভিত্তিক কিয়াসের ক্ষেত্রে যার পেছনে ব্যবহৃত হয়েছে 'এক-দ্বিতীয়াংশ বিধি'।

এই 'এক-দ্বিতীয়াংশ বিধি'র বিভিন্ন প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত মেলে প্রায় সব ঐতিহ্যবাদী মাযহাব এবং সংশ্লিষ্ট ফিক্‌হে। ইমাম মালিক-এর মত অনুযায়ী:

> মালিক থেকে ইবনে শিহাব থেকে ইয়াহিয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দাসের মাদকদ্রব্য পানের

৫৯৩ Al-Shafi'i, p. 321.

শাস্তি (হদ্দ)-এর ব্যাপারে। তিনি বলেন: 'আমি শুনেছি যে তার জন্য হদ্দ মুক্ত ব্যক্তির মদ্যপানের শাস্তির অর্ধেক। উমর ইবনে আল-খাত্তাব, উসমান ইবনে আফ্‌ফান এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাদের দাসকে মদ্যপানের জন্য চাবুক মেরেছেন মুক্ত ব্যক্তির জন্য হদ্দের অর্ধেক।'[৫৯৪]

আরো বিস্তারিতভাবে হানাফী অবস্থানকে অধ্যয়ন করলে, যেমন 'হেদায়া'-তে বিধৃত হয়েছে, দেখা যায় যে একজন দাস দু'জন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে; মুক্ত মানুষের জন্য সর্বোচ্চ অনুমতি চারজন স্ত্রীর অর্ধেক।

একজন মুক্ত মানুষের পক্ষে বৈধ সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী, সে স্ত্রীরা মুক্ত অথবা দাস হোক; ... একজন ব্যক্তি যে দাস (বা স্বাধীন নয়) তার জন্য দু'জনের বেশি স্ত্রী নেয়া বৈধ নয়; মালিক-এর (ভিন্ন) মত হচ্ছে যে একজন দাসের পক্ষে বৈধ সর্বোচ্চ তত সংখ্যক স্ত্রী নেয়া যতসংখ্যক বৈধ মুক্ত ব্যক্তির জন্য; তার মতে অন্য সব বিষয়ের মতোই বিয়ের ক্ষেত্রেও মুক্ত এবং দাস এমন ব্যক্তিদের মধ্যে (অধিকারের দিক থেকে) কোনো পার্থক্য নেই– এতদূর পর্যন্ত যে (তার মতে) একজন দাসের জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক স্ত্রী নেয়া অনুমোদিত তা দাসের মালিকের সম্মতি ছাড়া হলেও। - এক্ষেত্রে আমাদের (ফিকহের) বিশেষজ্ঞদের যুক্তি এই যে, অধিকার ও সুবিধার ব্যাপারে দাসের ক্ষেত্রে 'এক-দ্বিতীয়াংশ' নিয়ম প্রযোজ্য এবং চার স্ত্রী নেয়ার বৈধতা এই নিয়মের অধীন বলেই দাসের ক্ষেত্রে শুধু সর্বোচ্চ দুইজন স্ত্রী নেয়া বৈধ, যাতে মুক্ত হওয়ার মর্যাদা আলাদাভাবে স্বীকৃত হয়।[৫৯৫]

কিন্তু ঐ নিয়মসংক্রান্ত অবস্থানের ব্যাপারে রয়েছে দাসের পক্ষে তার জীবনসঙ্গী (দাসী) তালাকের সময় ঘোষণার সংখ্যা নিয়ে বিশদ পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর (র.) কিছুটা ভিন্ন মত।

দাসীর ক্ষেত্রে, তার স্বামী দাস হোক বা স্বাধীন হোক, সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রযোজ্য তালাক (ঘোষণা) হচ্ছে দুই বার; এবং একই প্রসঙ্গে স্বাধীন মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে তিন বার। - শাফেয়ী

৫৯৪ Malik, Muwatta, Kitab al-Ashribah, #1542, https://sunnah.com/malik/42.
৫৯৫ Al-Marghinani, p. 88.

> বলেছেন যে, তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থান বিবেচ্য; অর্থাৎ, স্বামী যদি মুক্ত হয়, তাহলে তার স্ত্রী দাসী হলেও সে তিন তালাক দিতে পারে; কিন্তু সে যদি দাস হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তালাকের সংখ্যা হচ্ছে দুই বার, যদিও তার স্ত্রী হয় মুক্ত-স্বাধীন। (এটা এই ভিত্তিতে যে) নবিজি (স.) বলেছেন: 'তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থান বিবেচ্য এবং ইদ্দতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থান।' - দাসীকে তালাক দেবার ক্ষেত্রে সংখ্যা হচ্ছে দুইবার আর ইদ্দতের ক্ষেত্রে দুই বার মাসিক। দ্বিতীয়ত, বৈধতার বিষয়টি নারী-সংশ্লিষ্ট এবং এই বৈধতা নারীর কল্যাণের জন্য। কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (স্বাধীন-মুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) সেসব সুবিধার অর্ধেক। তাই এ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, দাসীর তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তালাকের সংখ্যা দেড় বারের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের ভাগাভাগি অসম্ভব, তার (দাসীর) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংখ্যা হচ্ছে দুই বার। - শাফেয়ী কর্তৃক উদ্ধৃত হাদিসটি 'তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থান বিবেচ্য' এটার অর্থ নিছক এতটুকুই যে তালাকের প্রক্রিয়া শুরু হয় পুরুষ থেকে (যার সাথে তালাক ঘোষণার সংখ্যার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই)।[৫৯৬]

মুক্ত স্বামীদের জন্য প্রক্রিয়া হচ্ছে 'আমি তালাক দিচ্ছি' এরকম তিনবার ঘোষণা দেওয়া; কিন্তু 'এক-দ্বিতীয়াংশ নিয়ম' যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে, (পুরুষ) দাসের ক্ষেত্রে ফর্মুলামাফিক প্রযোজ্য সংখ্যা হবে দেড় বার। স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, এই নিয়মের উৎস ও দলিল কী? নিম্নোক্ত আয়াতটি এই নিয়মের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

> وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا

৫৯৬ Al-Marghinani, p. 212.

أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীন ইমানদার বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমাদের অধিকারভুক্ত ইমানদার দাসী বিয়ে করবে; আল্লাহ্ তোমাদের ইমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের (সমান); সুতরাং তাদের বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদের তাদের মাহ্র ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিনী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিনীও নয়। বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য ভালো; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।"[৫৯৭]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারী দাসীর সাজা মুক্ত এবং বিবাহিতা ব্যভিচারীর সাজার অর্ধেক। কুরআনে উপর্যুক্ত আয়াতে অথবা অন্য কোথাও কিংবা হাদিসে - মুতাওয়াতির অথবা অ-মুতাওয়াতির - কোথায় সে ইঙ্গিত রয়েছে যে এই আয়াতের নির্দেশটি দাস-সংক্রান্ত সব আইনের জন্য একটি সাধারণ নীতি বা নিয়ম হিসেবে প্রযোজ্য হবে? দুঃখজনক যে, নবিজির (স.) ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষিত দিকে দাসপ্রথার অবসানের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে হলেও এগিয়ে যাবার পরিবর্তে, নতুন নতুন বিস্তারিত আইন করা হয় দাসদের নিয়ে যা দাসপ্রথাকে শুধু বাঁচিয়েই নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলমান থাকতে সহায়তা করে। নবিজির (স.) আদর্শিক উত্তরাধিকারকে অবহেলার মাধ্যমে বিভিন্ন আইনের সংকলন, যেমন 'হেদায়া', রচিত হয় নবিজির (স.) ছয় শতাব্দীর পর, যেখানে দাসদের মুক্তি দেওয়া, আবশ্যিক নাই বলা হোক, তা যে কত বড় মহৎ কাজ, অথবা নবিজি (স.) যে সবাইকে দাসত্বের অবসানের পথ দেখিয়েছেন, অথবা দাসপ্রথা যে মৌলিক মানব মর্যাদার একেবারে পরিপন্থি, অথবা দাস সংক্রান্ত নির্দেশনা যা কিছুই নবিজি (স.) থেকে এসেছে

৫৯৭ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:২৫।

তা যে নিছক অবসান না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক (transitional) প্রকৃতির, এ সবের কিছুরই যথাযথ উল্লেখ নেই।[৫৯৮]

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর জন্য হ্রাসকৃত শাস্তি এবং তার ভিত্তিতে দাসসংক্রান্ত লেনদেন এবং দাসদের বিয়ে-তালাক সব কিছুতে নতুন নতুন বিস্তারিত বিধিবিধান রচনা কিয়াসের অপব্যবহারের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক কিয়াসের ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ এবং প্রত্যাখ্যান করেন।

> মালিক এই মত পোষণ করতেন যে, একজন স্বাধীন মানুষ যতজন স্ত্রী নিতে পারে, একজন দাসও তা করতে পারে, এবং তিনি এই সমতার বিষয়টিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন যে বিয়ের যাবতীয় ব্যাপারে দাস এবং স্বাধীন ব্যক্তির জন্য একই অবস্থান, এতদূর পর্যন্ত যে (তার মতে) দাস যদি তার মালিকের সম্মতি ছাড়াও বিয়ে করে, তাহলেও।[৫৯৯]

এক্ষেত্রে ইমাম মালিকের ফিক্হী অবস্থান প্রশংসনীয় যে কুরআনে যা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে তার বাইরে কিয়াসের মাধ্যমে দাস বা দাসপ্রথা সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন বিধান রচনার ভিত্তি নেই। তবে এটাও অনস্বীকার্য, যে মালিকীসহ সব ঐতিহ্যবাদী মাযহাবই দাসপ্রথাকে ইসলামী আইনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন একটি স্বাভাবিক এবং চলমান বিষয় হিসেবে।

উল্লেখযোগ্য যে, যেমনটি কাফা'র ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যবাদী মাযহাবগুলো অনেক দূর গেছে দুর্বল হাদিস হলেও তাদের মতের সমর্থক হাদিস খুজে বের করতে,

---

৫৯৮ হেদায়া-তে একটি পৃথক অধ্যায় আছে ক্রীতদাসদের মুক্তি (ইত্ক)-এর ওপর। লক্ষ্যণীয় যে, তা শুরু হয়েছে এ প্রসঙ্গে নবিজির (স.) একটি হাদিস দিয়ে এবং এই শিরোনামে যে ক্রীতদাসকে মুক্ত করা ইসলামে সুপারিশকৃত। কিন্তু তার পরের অনুচ্ছেদই শুরু হয়েছে ক্রীতদাস মুক্ত করা 'বৈধ' বলে। ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে ইসলাম উৎসাহিত বা সুপারিশ করেছে আর এটা বৈধ, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যটা মৌলিক। বইটিতে মুক্ত করার বিষয়টি আলোচনার সাথে সাথে ক্রীতদাসদের ব্যাপারে বিভিন্ন বিধিবিধানও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পাঠকরা যদি এই বিশেষ অধ্যায়টি আলাদা করে না পড়ত, তাহলে বইয়ের অন্যান্য জায়গায় ক্রীতদাস-ংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান পরিবেশিত হয়েছে তা পড়ে তারা হয়তো জানতও না যে ইসলামে ক্রীতদাসকে মুক্ত করাটাই ইসলামের সুপারিশ এবং বিধানসম।

৫৯৯ Al-Marghinani, p. 88.

এবং যেখানে হাদিসের দুর্বলতম কিছুও মেলেনি সেখানে অগ্রহণযোগ্যভাবে কিয়াস প্রয়োগ করা হয়েছে অতিরঞ্জিত সিদ্ধান্ত কিংবা আইন রচনায়। ৩য় অধ্যায়ে, আমরা বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করেছি হাদিসের ভিত্তিতে এমন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছা হয়েছে যা দলিল বা যুক্তির দিক থেকে হালে পানি পায় না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব দলিলের অপপ্রয়োগ মুসলিম সমাজে নারীর ভূমিকা, মর্যাদা ও অবস্থানকে মারাত্মকভাবে দুর্বল (undermine) করেছে।

দাস সংক্রান্ত বহু এবং বিভিন্ন ধরনের ফিক্হী অবস্থানের বিপরীতে, হাদিসে বিধৃত নবিজির (স.) আদর্শ দাসমুক্তির ব্যাপারে একটি মৌলিক নীতি পেশ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুসনাদে আহমদ-এ একটি হাদিস রয়েছে, যেখানে নবিজি (স.) সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন: "দাসদের (রাকাবা) মুক্ত করে দাও ..."[৬০০]

এর পাশাপাশি কুরআন মু'মিনদের তাগিদ দেয় মানব মর্যাদা ও মুক্তির মহত্ত্বে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে কুরআন ছোট-বড় বিভিন্ন গুনাহের বদলা হিসেবে দাসকে মুক্ত করাকে পেশ করে।

> وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
>
> "কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার

৬০০ #18672.

সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এটা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৬০১]

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"[৬০২]

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এদ্বারা তোমাদের উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।"[৬০৩]

---

৬০১ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:৯২।

৬০২ আল-কুরআন (আল-মায়িদা) ৫:৮৯।

৬০৩ আল-কুরআন (আল-মুজাদিলা) ৫৮:৩।

এই আয়াতগুলো দাসমুক্তির জন্য পর্যাপ্ত এবং সবিশেষ উৎসাহদায়ক হিসেবে গণ্য করা উচিত। কুরআনের একটি আয়াত প্রাসঙ্গিক বাকি সবগুলো থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যেখানে দাসকে মুক্ত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে, এতটাই যে সেখানে দাসকে মুক্ত করার বিষয়টি দু'টি ফরজ ইবাদত, নামাজ এবং জাকাত, তার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে, এবং প্রতিশ্রুতি অথবা চুক্তি করলে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে বা দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে, এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী।"[৬০৪]

আল-কুরআনের সুরা বালাদ স্বাধীনতা এবং দাসত্বের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই হৃদয়গ্রাহী সুরাটির শুরুই হয়েছে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার সজোর ঘোষণা দিয়ে এবং নবিজিকে (স.) সরাসরি উদ্দেশ করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে তিনি নিজে একজন মুক্ত-স্বাধীন মানুষ।

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.

৬০৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৭৭।

"আমি শপথ করছি এই নগরের। আর তুমি এই নগরের অধিবাসী। শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।"[৬০৫]

সুরাটির শীর্ষভাব (climax) প্রতিফলিত হয় নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে, যেখানে এটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা মানবতাকে দু'টি রাজপথ দেখিয়েছেন। এ রাজপথ দু'টি প্রতিনিধিত্ব করে সত্য আর মিথ্যা, ঠিক আর ভুল, ভালো আর মন্দের। তবে একটি পথ হচ্ছে দুরুহ-দুর্গম, আর তাই মানুষের প্রবণতা আছে জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠিন পথের কষ্ট এড়িয়ে সহজ পথের অনুগামী হওয়া।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

আর আমি তাকে দু'টি পথ দেখিয়েছি।

সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি।

তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথ কি?

তা হচ্ছে: দাসমুক্তি।[৬০৬]

দাস মুক্তির উল্লেখের পর, সুরা আল-বালাদসহ অন্য আরো কিছু বিষয় সেই দুর্গম গিরিপথের সাথে জড়িত এবং মানুষ এড়াতে চায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করে।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

৬০৫ আল-কুরআন (আল-বালাদ) ৯০:১-৪।

৬০৬ আল-কুরআন (আল-বালাদ) ৯০:১০-১৩।

অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান।

ইয়াতীম আত্মীয়কে।

অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে।

তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের।

এরাই সৌভাগ্যবান।

আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা।

তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দি থাকবে।[৬০৭]

এখানে কুরআনের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা দু'টি রাজপথ প্রদর্শন করেছেন। একটি হচ্ছে 'আকাবা'– অত্যন্ত দুর্গম, যে পথ হচ্ছে দাসকে মুক্ত করার, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার, তাছাড়া ইয়াতীম, দরিদ্র ও বঞ্চিত (যারা সমাজের ক্ষমতাবিহীন বা দুর্বল গোষ্ঠী) তাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের পাশে দাঁড়ানোর পথ। কুরআনের এই অংশটির সবশেষে রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা: "তাহলে সে ইমানদারদের সাথে হবে ... তারা হবে ডান হাতের গোষ্ঠী (অর্থাৎ যারা শেষ বিচারের দিনে নাজাত পাবে)।" এই আয়াতগুলোতে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা এই 'আকাবা'র পথচারী হবে না, বরং তারা সহজ বা আরামের পথ বেছে নেবে যে পথে কোনো ত্যাগ-তিতিক্ষা বা সংগ্রাম-সাধনার প্রয়োজন নেই।

এটা অবাক হওয়ার মতো যে, জ্ঞানসমৃদ্ধ ওলামা এবং ফুকাহা বিভিন্ন উৎস সন্ধান করে দুর্বলতম হাদিসগুলোর ভিত্তিতে হলেও নিদারুণ সব মাসআলা বা বিধিবিধান বের করেছেন। বিভিন্নভাবে তারা অনিঃশেষ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন ক্রীতদাসত্ব যে সামগ্রিকভাবে অইসলামী নয় তা নিয়ে নানা ধরনের অজুহাত বা যুক্তি বের করতে। আইনসর্বস্বতার এটি আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে ইসলামের উচ্চতর লক্ষ্য এবং অভিপ্রায় (মাকাসিদ) উপেক্ষা করা হয়েছে, আপোষ করা হয়েছে, অথবা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের আইনসর্বস্বতা এবং আইনসর্বস্ব মানসিকতা আমাদের অনেক ওলামা এবং ফুকাহাকে প্রভাবিত করেছে। সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, স্বয়ং

৬০৭ আল-কুরআন (আল-বালাদ) ৯০:১৪-২০।

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন "যে একজন মুক্ত-স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে (ক্রীতদাস হিসেবে) এবং তার মূল্য হজম করে"। এরকম সতর্কবাণীর ভিত্তিতে এই ইজমায় তারা পৌঁছেছেন যে মুক্ত কাউকে দাসত্বে আবদ্ধ করা হারাম (নিষিদ্ধ)। তাই, এখানে মূলনীতি তো এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, ইসলাম মানুষের মৌলিক মর্যাদায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেই প্রেক্ষাপটে দাসত্বের এই প্রথাকে নীতিগতভাবে মূলোৎপাটন করা এবং যা সমাজে তখন প্রচলিত ছিল সেটাকে নিছক সাময়িক এবং অস্থায়ী হিসেবে না দেখে, ওলামা এবং ফুকাহা তাদের আইনসর্বস্বতার শেকলে আটকা পড়ে যান।

এখানে আসল বিষয় এটা নয় যে, কোনো স্পষ্ট এবং অকাট্য দলিল অথবা বর্ণনা (নাস্) আছে কি না যেখানে বলা আছে যে ইসলাম দাসত্বকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যদিও এমন উদাহ্রণ অনেক আছে এবং এই বইতেও পেশ করা হয়েছে যেখানে সব নিষিদ্ধকরণ এবং বিধি-নিষেধের ভিত্তি স্পষ্ট এবং অকাট্য দলিল বা নাস্ নয়। আসল বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের মৌলিক মর্যাদায় বিশ্বাসী এবং তার জীবন, সম্মান এবং সম্পদ সাধারণভাবে অলংঘ্যনীয়, এবং সেই একই ভিত্তিতে মানুষের স্বাধীনতা তার অস্থিত্বের প্রাথমিক শর্ত। আল-কুরআনে বিষয়টি সুস্পষ্ট, যার বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নবিজির (স.) জীবনে পরিলক্ষিত হয়, এমনকি সাহাবাদের যুগে এই প্রথারদের জন্য কাজ করে যাওয়া হয়। এই সংস্কারের ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়ে আইনসর্বস্বতার গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যায়।[৬০৮]

৩. বিবাহ, চুক্তিনামা এবং ক্রয়-বিক্রয়

বিবাহ সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূল অন্তঃসার। কিছু কিছু সমাজে এবং ধর্মে, যেমন খ্রিষ্টবাদে, বিবাহ একটি ধর্ম-সংস্কার (sacrament), অর্থাৎ এই বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং নারীর যৌনমিলনের বৈধ দুয়ার খুলে যায় এবং সাথে সাথে বিয়ের বাইরে সব যৌনমিলনের পথ বন্ধ হয়ে যায় (অন্তত যাওয়ার কথা)।[৬০৯] সেই কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার অনুযায়ী

৬০৮ আরো বিস্তারিতের জন্য দেখুন, Farooq, 2006c.

৬০৯ Al-Ati, p. 56. তবে কুরআনে "তোমাদের মালিকানাস্থ নারী" (মা মালাকাত আইমানুকুম) (আন-নিসা ৪:২৫) এ বিষয়টির কারণে অনেক মতভেদের অবকাশ

তালাক একটি অন্যতম পাপ এবং ধর্মীয় দিক থেকে অননুমোদিত হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। অন্যদিকে, আধুনিক, সেক্যুলার সমাজগুলোতে, বিয়ে নিছকই একটি সামাজিক চুক্তি, আর তাই এটার কোনো স্থায়িত্ব বা পবিত্রতা/অলংঘনীয়তা (sanctity) নেই। সেক্যুলার সমাজে যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাতে দু'টি মানুষের মিলনের জন্য অথবা ঘর-সংসার করার জন্য প্রথামত বিয়েরই কোনো প্রয়োজন নেই। সেখানে বিয়ে ছাড়াই সংসার করা, বিয়ে ছাড়াই সন্তানাদি হওয়া, এমনকি অভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে বিয়ে, সবই এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান পাচ্ছে অথবা আইনিভাবে বৈধতার স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ইসলামে বিবাহ অলজ্ঘনীয় ধর্মসংস্কারও নয়, আবার নিছক একটি চুক্তিনামাও নয়।

> ইসলামে কখনোই পবিত্র (sacred) আর পার্থিব (secular)-এর মধ্যে বিশেষ সীমারেখা টানেনি। প্রতিটি কাজ বা ব্যাপারেরই ধর্মীয় দিক রয়েছে। বৈধ যৌন সম্পর্ক ইসলামে পাপ বা অনিষ্ট হিসেবে দেখা হয় না। নারীরা অন্তত নীতিগত দিক থেকে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, কারণ নারীদের এমন কোনো দোষ বা দুর্বলতা নেই, যা থেকে পুরুষরা মুক্ত অথবা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া ইসলামে বিবাহ কোনো পুরোহিত, ঠাকুর (বা মৌলভী) দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে হবে এমন নয়। একইভাবে অন্য ধর্মে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার অপরিহার্য অংশ হিসেবে ধর্মগুরুর আশীর্বাণীর প্রয়োজন, তা ইসলামে বৈধ বিয়ের জন্য আবশ্যকীয় নয় ... [তাই] ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তি (contract) এবং এটি একটি অঙ্গীকারনামাও (covenant)।[৬১০]

কিন্তু ইসলামে এবং তার বাস্তবায়নে আইনসর্বস্বতার প্রভাবে বিয়ের ব্যাপারে চুক্তির ভিত্তিটাই প্রাধান্য পেয়েছে। মাহর থেকে ভরণ-পোষণ (নাফাকা), বৈবাহিক দায়দায়িত্ব থেকে তালাকের শর্তাবলি এবং তার প্রক্রিয়া, সব কিছুতেই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু (ফোকাস) চুক্তির বিভিন্ন দিকে যা বিয়েকে একটি লৌকিকতার অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত করেছে।

রয়ে গেছে।

৬১০ Al-Ati, p. 59

মাহর (যৌতুক বা dowry)-র ধারণাটা, যেটা বরের পক্ষ থেকে কনের প্রাপ্য, ইসলামেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজ এবং সংস্কৃতিতে তা চলে এসেছে।

> যৌতুকের ধারণার সাথে সেই ধরনের বিয়ের সংযোগ রয়েছে বেচাকেনা ধরনের প্রথার সাথে। এ ধরনের বিয়ে 'সারা দুনিয়া জুড়ে এবং ইতিহাসে প্রচলিত ছিল ... সেমিটিক কূল (race)-এর সব শাখাতেই তা চলে এসেছে ... তবে তার মানে এই নয় ক্রয়ভিত্তিক বিয়ে মানেই যে একটি সম্পত্তি কেনা তা ছিল না।[৬১১]
>
> বিয়ে যে এতকাল ধরে 'কনে-মূল্য' অথবা 'বর-মূল্য' এ ধারণার সাথে জড়িত ছিল সেটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। একজন সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদের মতানুযায়ী 'কনে-মূল্যের ধারণার উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে আগে এমন পরিবার কাঠামো ছিল যেখানে কিশোরী-তরুণীরা পরিবারের জন্য একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হতো। পরিবার থেকে মেয়েটির চলে যাওয়া পরিবারটির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হতো, যেটার প্রতিদান হিসেবে কনে-মূল্য দেওয়া হতো। বরের পরিবারের দিক থেকে বিচার করলে, একজন স্ত্রীকে পাওয়া মানে স্ত্রীর পরিবারকে মূল্য দিয়ে বরের পরিবারের জন্য একজন শ্রমিকের হাত পাওয়া গেল।' এটাই হয়তো এই প্রথার উৎসের ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু এখন যেখানে যৌথ পরিবারের কাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই নেই অথবা যেখানে কনে নিজেই যৌতুক পায় সেক্ষেত্রে ঐ ব্যাখ্যা খুব প্রযোজ্য নয়।[৬১২]

আল-আ'তি যৌতুক প্রথার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য আধুনিক তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করেছেন। তবে, তার বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় যে এই সব তত্ত্বের কোনোটিই এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থানের ব্যাখ্যা হিসেবে বা বুঝতে সহায়ক নয়। ইসলামে যৌতুক (মাহর)-এর মূল দিকগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

> মাহর হচ্ছে তাই যে একজন হবু জামাই তার হবু স্ত্রীকে দেয়। দেবার

---

৬১১ Al-Ati, p. 62.
৬১২ Al-Ati, p. 62-63.

> পর এই মাহর স্ত্রীর নিজস্ব, খাস সম্পত্তি হয়ে যায় এবং সে এটা নিয়ে যা খুশি করতে পারে: নিজে রাখতে পারে, না নিতে পারে, কমাতে পারে, স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারে অথবা যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে। মাহর-এর নির্দেশ কুরআন, হাদিস এবং সামগ্রিক মুসলিমদের ইজমার ভিত্তিতে। এটা অর্থ দিয়ে, সম্পত্তি দিয়ে, অথবা স্ত্রীকে সেবার বিভিন্ন মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন সাহাবি বিশেষ একজন নারীকে বিয়ে করতে চাইলেন, কিন্তু মাহর দেবার মতো তার কিছুই ছিল না। নবিজি (স.) তাকে বললেন কুরআনের কিছু অংশ তার হবু স্ত্রীকে শেখাতে এবং সেটাই তার মাহর হিসেবে গণ্য হয়। জনৈক আবু তালহা এক নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে জবাবে বলে যে 'তোমার অবস্থানের মতো কাউকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কিন্তু তুমি অমুসলিম আর আমি মুসলিম । তুমি যদি ইসলাম কবুল করো, তাহলে সেটাই আমার জন্য মাহর হবে এবং আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না।' একইভাবে যদি কোনো মালিক তার মালিকানাধীন দাসীকে বিয়ে করতে চায় এবং তার দাসত্ব থেকে মুক্তিকে মাহ্‌র হিসেবে গণ্য করতে চায়, তাহলে এই প্রস্তাবনা এবং বিয়ে বৈধ হবে।[৬১৩]

ইসলাম যদিও মাহ্‌রকে আবশ্যক করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে না কোনো সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেছে আর না এর কোনো বিশেষ রূপ নির্দিষ্ট করেছে। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, মাহরের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থানের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তত্ত্বের ব্যর্থতা বুঝতে হলে।

> সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহার মতে ইসলাম যদি মাহরের ব্যাপারে সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ না করে থাকে, তাহলে প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, এটা আবশ্যক করারই কারণ কি। এর আগে আমরা মাহ্‌রের প্রতিষ্ঠায়নে (institutionalization) বেশ কয়েকটি তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করেছি। কিন্তু এর কোনোটিই ইসলামে মাহরের ব্যাপারে ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়।[৬১৪]

৬১৩ Al-Ati, pp. 64-65.

৬১৪ Al-Ati, p. 67.

মাহর পিতা অথবা অভিভাবকের অর্থনৈতিক ক্ষতির বদলা হিসেবে গণ্য করার তত্ত্ব ইসলামের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য, কারণ মাহর এতটাই নগণ্য হতে পারে তা কোনো অভিভাবকের জন্য ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। তাছাড়া, ইসলাম এটা আবশ্যক করেছে যে মাহর স্ত্রীর একচ্ছত্র অধিকার। এটা তার মালিকানা, আর কারো নয়। অন্য কেউ এর ওপর দাবি রাখতে পারে না, অথবা বাগিয়ে নিতে পারে না, এমনকি স্ত্রীর পিতা-মাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরাও নয়।

> অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে মাহরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ের পর নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক অবস্থানকে জোরদার করা। এই ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে, যদি মাহর মূল্যের দিক থেকে অনেক এবং যেখানে বিয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় অর্থনৈতিক সুবিধাটা দৃশ্যমান হয়।[৬১৫]

যৌতুকের আরো অন্যবিধ ব্যাখ্যা আছে। যেমন কনেকে দেওয়া বরের যৌতুক "নগণ্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা পালন করে" অথবা "এটা বহু বিবাহের প্রতিরোধক"।[৬১৬] তবে মুসলিম সমাজে অধিকাংশ বিয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে মাহর এই সব উদ্দেশ্যে গৌণ ভূমিকা পালন করে, এই সব তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়।

তাহলে মুসলিম ওলামা এবং ফুকাহার ব্যাখ্যা কী এ ব্যাপারে?

> পরবর্তীকালের ফুকাহারা এই টেকনিক্যাল অবস্থান নিয়েছেন যে মূলত, অথবা অন্তত সম্ভব, মাহর একটি নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক বৈধায়নের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়। মাহর তার প্রাপ্য, কারণ সে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে এবং নিজেকে স্বামীর জন্য অবারিত করেছে। ফুকাহার প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই দিকটার ওপরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এই ধারণা সঠিক হলে ধরে নিতে হবে নারীদের নিজেদের কোনো যৌনানুভূতি নেই, অথবা তাদের দৈহিক চাহিদা পুরুষদের পারস্পরিক (reciprocal) নয়, অথবা যৌন সম্পর্ক একটি সুলভ বস্তু যা অল্প বা নগণ্য মাহরের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, অথবা বিয়ে আসলে

৬১৫ Al-Ati, pp. 68-69.

৬১৬ Al-Ati, p. 68.

একটি বাণিজ্যিক লেনদেন (commercial transaction) বৈ কিছু নয়। এ রকম আরো অনেক ধারণা (assumption) এবং অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো জৈব-শারীরিক (bio-physical) বাস্তবতা এবং যেভাবে আল-কুরআনে বিয়ের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে তার পরিপন্থি। যেমন ৩০:২১ আয়াতে বিয়েকে তুলে ধরা হয়েছে পরস্পরের জন্য শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় এবং একে অপরের জন্য ভালোবাসা এবং মমতার উৎস হিসেবে।[৬১৭]

আল-কুরআনের কত সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী হেদায়েত:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।[৬১৮]

মুসলিমদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি না যারা বিয়ের ব্যাপারটি অথবা বিয়ের সময় মনে করে যে, এটা একটি ব্যবসায়িক লেনদেন: যেখানে বর মনে করে যে, সে একটি 'ক্রয়' প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করছে, আর কনে মনে করে যে সে একটি 'বিক্রয়' প্রক্রিয়ার অংশ। এ নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক জরিপ করা ছাড়াই এটা আস্থার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, নারীরা সাধারণভাবে– তাদের বিয়ে আসলে বেচা-কেনা– এ রকম ধারণায় তাদের বমনেচ্ছা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। তাছাড়া, অনেক পুরুষও বিয়ে আসলে একটি বাণিজ্যিক লেনদেন এ রকম ধারণা শুধু অরুচিশীলই নয়, বরং এক ধরনের বিকৃতি মনে করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ইসলামের নামে প্রচলিত বিধি-বিধানের আইনসর্বস্ব প্রবণতায় বিয়েকে আসলেই একটি বাণিজ্যিক লেনদেনে পর্যবসিত করা হয়েছে।

৬১৭ Al-Ati, p. 68

৬১৮ আল-কুরআন (আর-রুম) ৩০:২১।

একজন নারী তার স্বামীর সাথে যৌন মিলনে অস্বীকৃতি জানাতে পারে যতক্ষণ না তার মাহর আদায় করা হয়, যাতে করে স্বামীর অধিকারের মতোই স্ত্রীর অধিকারও সংরক্ষিত হয়, যেমনটি হয় বেচা-কেনায়।[৬১৯]

এখানে যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে তা এই ধারণার ভিতিত্তে যে, পুরো মাহর, অথবা তার একটি অংশ, তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা অথবা বাকি রাখা। যদি পুরোটাই বাকি রাখা হয়, তাহলে স্ত্রীর অধিকার নেই বিয়ের কারণে স্বামীর সাথে দৈহিক মিলনে অস্বীকৃতি জানা্তে, কারণ সেটা তার সম্মতিতেই হয়েছে, এটা তেমনই হয় যেমন হয় বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে, যেখানে যদি বিক্রীত কোনো কিছুর মূল্য পরে পরিশোধের চুক্তি বা সমঝোতা হয়, তাহলে সেই বিলম্বের কারণে বিক্রেতা লেনদেনের বস্তুটি সরবরাহ করতে অথবা ব্যবহার করতে ক্রেতাকে বাধা দিতে পারে না।[৬২০]

যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে দৈহিক মিলনে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু এই অস্বীকৃতির কারণে, ইমাম আবু হানিফার মতে, তার খোরপোষের দাবি রহিত হয়ে যায় না। তার দুই শিষ্য এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন যে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোষের দাবি থাকে না।

তবে এই মতপার্থক্য হলো সেই অবস্থায়, যখন মিলন তার সম্মতিক্রমে হবে। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগের মাধ্যমে হলে কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে সকলের মতেই তার নিজেকে বিরত রাখার হক রহিত হবে না। আর অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে তার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে। খোরপোষের হকদার হওয়ার বিষয়টিও এর ওপর নির্ভর করে। সাহেবায়েনের দলিল এই যে, একটি সহবাস কিংবা একেবারে নির্জনে সাক্ষাতের মাধ্যমে চুক্তিকৃত সম্ভোগ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হয়ে গেছে। এ দিয়েই পূর্ণ মাহরের অধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং পরবর্তীকালে তার নিজেকে বাধা প্রদানের অধিকার থাকে না। যেমন বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করে দেয়।[৬২১]

৬১৯ Al-Marghinani, p. 150.
৬২০ Al-Marghinani, p. 150.
৬২১ Al-Marghinani, p. 151.

> যে ব্যক্তি একই আক্‌দে দু'জন নারীকে বিয়ে করল অথচ তন্মধ্যে একজনকে বিয়ে করা তার জন্য হালাল নয়, সেক্ষেত্রে যাকে বিয়ে করা তার জন্য হালাল ছিল তার বিয়ে শুদ্ধ হবে আর অপরজনের বিয়ে বাতিল হবে। কেননা বিয়ে বাতিলকারী বিষয়টি তাদের একজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। একই চুক্তিতে একজন স্বাধীন ও একজন দাসকে বিক্রয় করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর এখানে ক্রীতদাসকে ক্রয় করার ব্যাপারে স্বাধীন ব্যক্তি কবুল করার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।[৬২২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এ গ্রন্থে যেসব দৃষ্টান্তমূলক যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে এবং অন্য ফুকাহা ভিন্ন মতও পোষণ করতে পারে। কিন্তু কোনো একটি মাযহাবেও যদি এ ধরনের ধ্যান-ধারণা থাকে, তাহলেও সেটা উল্লেখযোগ্য এবং তা মূল্যায়নের দাবি রাখে।

যাহোক, তাহলে ফুকাহা কেমন করে বিয়ে এবং 'ক্রয়-বিক্রয়'-এর যোগসূত্র বাঁধলেন? উত্তর, কিয়াস। বিয়ে এক ধরনের চুক্তি, যেমন ক্রয়-বিক্রয় বা বাণিজ্যিক লেনদেনও চুক্তি। তাই স্ত্রীকে বিছানায় নিতে স্বামীর অধিকার প্রয়োগ, বিছানা শেয়ার করতে না চাইলে তার ভরণ-পোষণ না দেওয়া, অথবা সাধারণভাবে বিয়ের বৈধতা-অবৈধতার শর্ত নির্ধারণে ফুকাহা বিয়ে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের চুক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ তুলনামূলক সংযোগ টেনেছেন, এমনকি এভাবেও বলা যেতে পারে যে বাণিজ্যিক লেনদেনের চুক্তি এবং কাঠামোকেই বিয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

> লক্ষণীয় যে, মাহর (পাত্রী-মূল্য), যা বিয়ের ধারণাকে বাণিজ্যিকীকরণ করে, এই পরিভাষাটি কুরআনে আদৌ উল্লিখিত হয়নি। হাদিসেও যে বহুল ব্যবহৃত তা নয়। তাছাড়া যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও 'ফরিদাহ" (আল্লাহ্‌প্রদত্ত অধিকার) অথবা 'সাদাক' (যা এমন শব্দ-মূল থেকে যা বোঝায় বিয়ের উপহার, দাক্ষিণ্য, বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সত্য ইত্যাদি) অর্থে। ফুকাহা এই অর্থগুলোকে বিনিময় (interchangeable) হিসেবে ব্যবহার করেছেন (নারীর জন্য) আল্লাহপ্রদত্ত যৌতুক প্রাপ্তির অধিকার হিসেবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যেসব বিনিময় অর্থে এই পরিভাষাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে

৬২২ Al-Marghinani, p. 92.

> তাতে 'সাদাক', 'ফরিদাহ' ইত্যাদি পরিভাষায় নৈতিক এবং ঔদার্যের যে আভাস রয়েছে তা প্রতিফলিত হয় (বা হয়েছে) কি না। ক্ল্যাসিক্যাল আইনসংক্রান্ত গ্রন্থগুলো ঘাঁটলে দেখা যায় যে, সেখানে মাহর শব্দটা যেখানে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে সাদাক, ফরিদাহ এবং সমতুল্য শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত নৈতিক আঙ্গিকেই দেখা হয়েছে। কিন্তু ফিকহ গ্রন্থগুলোতে আরো পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় ব্যবহার হওয়া শুরু হয় কনে-মূল্যের সমার্থকের কাছাকাছি। এই অর্থগত বিচ্যুতি বা বিকৃতি আইনশাস্ত্রিক সৃজনশীলতা আর নারীর সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদার অধোগতির ধারার সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সাথে বিয়ে সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণার সাথে।[৬২৩]

আসলে সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোর মতো মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদদের ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও ইসলামে মাহর যথার্থভাবে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে সহায়ক নয়। এ ব্যাপারে আরো চিন্তাভাবনা করতে আল-আ'তি কিছু ধারণা পেশ করেছেন, যা প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ।

> যৌতুক সম্ভবত স্বামীর সামগ্রিক সাংসারিক দায়িত্ব নেবার এবং বিয়ের পর যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি থাকার প্রতীক। এটাকে মনে করা যেতে পারে তার পক্ষ থেকে স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং অধিকার সংরক্ষণের অঙ্গীকার (assurance)। সে যে বিয়েকে কোনো শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে না তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। প্রকৃতিগত অথবা সাংস্কৃতিক কারণে সাধারণত নারীদেরই পুরুষদের কাছে থেকে তাদের নিয়ত এবং স্বার্থের দিক থেকে এ ধরনের ভরসা পাওয়ার প্রয়োজন হয়। পুরুষদের এই ভরসা দেওয়া নিছক ভালোবাসা এবং সিরিয়াস হওয়ার জন্য কথার মালা হতে পারে না এবং সেই প্রেক্ষাপটেই মাহর সেই ভালোবাসা এবং নিষ্ঠ সংকল্পের জন্য বাস্তব প্রকাশ। কনের জন্য এটি বরের সাথে মিলনের আগ্রহের নিদর্শক। কনের পরিবারের জন্য, এটি একটি পারস্পরিক বন্ধন এবং ঐক্যের ইঙ্গিতবাহী এবং তাদের কন্যা যে নিরাপদ হবে এবং ভালো হাতে হাত রাখছে তার নিদর্শক। তবে মাহরের তাৎপর্যের আওতা আরো প্রশস্ত হতে পারে, যেমনটি আগে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য,

৬২৩ Al-Ati, p. 69.

> যে বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শের আলোকে পেশ করা হয়েছে যা হয়তো বাস্তবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, বাস্তব এবং আদর্শের মধ্যে সব সময়ই মিল হবে বা হয়েছে।[৬২৪]

প্রসঙ্গত ইসলামী আইনশাস্ত্রে বাণিজ্যিক চুক্তির (commercial contract)-এর বাইরে কোনো চুক্তির কাঠামো নেই। একটি সাধারণ চুক্তি তত্ত্ব বা কাঠামো (genreral theory of contract) থাকলে, তার একটি অংশ হতে পারে বাণিজ্যিক চুক্তি এবং অবাণিজ্যিক চুক্তি। কিন্তু তার অভাবে ফিকহে সব সামাজিক, অবাণিজ্যিক লেনদেনও বাণিজ্যিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনশাস্ত্র (লিগ্যাল থিওরি)-র প্রেক্ষাপটে ফিকহে এরকম সাধারণ চুক্তি কাঠামোর অনুপস্থিতি ফুকাহাদের ঠেলে দিয়েছে বিয়ের মতো সামাজিক/পারিবারিক বিষয়কেও বাণিজ্যিক চুক্তির মতো বেচা-কেনার লেনদেন হিসেবে বিবেচনা করতে।[৬২৫]

৪. বিয়ে, চুক্তি এবং ইজারা

পূর্ববর্তী অংশের ফোকাস ছিল কেমন করে, আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকতার প্রভাবে, কিয়াস প্রয়োগ করতে গিয়ে ফুকাহা যে অনেক সময় অতিরিক্ত পর্যায়ে গেছেন তা প্রদর্শন করা। চুক্তি এবং বিক্রয়ের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক সংযোগ টানা এবং তা বিয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করারই কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু তাদের কিয়াস প্রয়োগ এর চেয়েও অসঙ্গত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা নিয়ে এবার আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইসলামী আইনের কিছু কিছু দিক অবাস্তব আর কিছু আছে যা সুবিচারপূর্ণ নয়। যেমন, ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী একজন স্ত্রীর তার নিজস্ব বাসস্থান বা গৃহের অধিকার রয়েছে। এই গৃহ তার, একান্তই তার।

> এটা একজন স্বামীর ওপর দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে তার স্ত্রীর জন্য গৃহের ব্যবস্থা করা, যেটা হবে একান্তই তার ব্যবহারের জন্য, যেখানে সে না চাইলে তার স্বামীর পক্ষের বা অন্য আর কেউ থাকতে পারবে না, কারণ এটি তার নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য, এবং সে কারণেই তার

---

৬২৪ Al-Ati, p. 70.

৬২৫ Farooq, 2011; Also see, Syahnan, 2013.

> যেমন ভরণ-পোষণ অধিকার আছে, তেমনই। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা দিয়েছেন তার ভরণ-পোষন এবং বাসগৃহের ব্যাপারে। স্বামীর এটি যেমন দায়িত্ব, তেমনি সেই গৃহ অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে সে স্ত্রীকে জোরজবরদস্তি করতে পারে না, এটা তার অধিকারকে খর্ব করবে, তার মালিকানাধীন সম্পত্তিকে ঝুঁকিতে ফেলবে এবং তার সামাজিকতায় বাধা হিসেবে কাজ করবে ...[৬২৬]

> স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এমন একটি একান্ত বাসস্থানের যেখানে স্বামীর পরিবারের কোনো সদস্য থাকে না।[৬২৭]

আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি সব স্বামীর ওপর ধনী হওয়া অথবা অন্তত সম্পদশালী হওয়া ফরজ করেননি, কারণ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পুরো পরিবার নিয়ে, আক্ষরিক অর্থে, এক ছাদের নীচে বাস করে, যেখানে শুধু স্ত্রীর জন্য একটি আলাদা ঘর অথবা গৃহ থাকা তো আকাশের চাঁদের মতো। মজার ব্যাপার হলো যে, নিজস্ব গৃহ পাবার মতো এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সম্পর্কে বেশির ভাগ নারীই জানে না এবং সম্ভবত সুবিধাজনক কারণেই আমাদের ওলামাদের মধ্যে নারীদের এ ব্যাপারে সচেতন করা এবং পুরুষদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে কোনো রকম উদ্যোগ দেখা যায় না। উল্লেখযোগ্য যে, এই অধিকারের ভিত্তি হিসেবে কোনো বিশুদ্ধ অথবা অকাট্য দলিল নেই, যদিও মুসলিম স্ত্রীরা এই অধিকার সম্পর্কে জানতে পারলে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে যারপরনাই আনন্দিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

তবে এত বড় অধিকার সম্পর্কে জানার পর নারীদের আনন্দের জোয়ারে ভাসার কারণ নেই, কারণ যেখানে আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকতার প্রভাব প্রকট সেখানে তাদের জন্য আশ্চর্য হওয়া অথবা আঁৎকে ওঠার মতো অন্য ধরনের দিকও রয়েছে। স্ত্রীর জন্য একান্ত নিজস্ব গৃহ থাকলেও তার মানে এই নয় যে, সেটা তার মালিকানায়। আসলে, সেই গৃহের ওপর স্বামীর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের অবকাশ রয়েছে।

> যেহেতু এই গৃহ স্ত্রীর একান্ত নিজের জন্য, একজন স্বামীর স্বাধীনতা রয়েছে যে তার স্ত্রীর পিতা-মাতা, অন্যান্য আত্মীয়, অথবা পূর্ববর্তী

---

৬২৬ Al-Marghinani, pp. 401-402.
৬২৭ Haskafi, p. 322.

> বিয়ে থেকে সন্তানাদিগকে সেই গৃহে প্রবেশের অনুমতি না দিতে, কারণ সম্পত্তিটি আইনত তার (অর্থাৎ স্বামীর)। তবে তাদের স্ত্রীর সাথে যখনই তারা চায় দেখা করতে বা কথাবার্তা (বা যোগাযোগ)-এর ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে পারে না ... কারো কারো মতে আসলে এসমস্ত ব্যাপারে বাধা দেবার কোনো অবকাশ নেই।[৬২৮]

অনেক নারী যেমন এই একান্ত নিজস্ব গৃহের অধিকার জেনে যেমন ইতিবাচকভাবে আশ্চর্যান্বিত হবে (আর যে সমস্ত পুরুষেরা জানে না তারা বিস্মিত– শক্ড - হবেন), তেমনি নারীদের জন্য নেতিবাচকভাবে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মতো আরো বেশ কিছু দিক রয়েছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী, স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ (নাফকা) পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেটার মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত?

> যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীর তত্ত্বাবধানে (custody) নিজেকে সমর্পণ (surrender) করে, তখন স্বামীর ওপর দায়িত্ব বর্তায় স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান যোগানোর, স্ত্রী মুসলিম অথবা অমুসলিম হোক, কারণ এই বিধানের উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ ...[৬২৯]

> নাফাকা আক্ষরিক অর্থে বোঝায় একজন পুরুষ তার সন্তানাদির ওপর যা খরচ করে; আইনে এটার মধ্যে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান; সাধারণভাবে এটা বোঝায় অন্ন।[৬৩০]

কিন্তু স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়, বিশেষ করে দীর্ঘ মেয়াদে অথবা স্থায়ীভাবে, তাহলে? এ বিষয়ে আইন অত্যন্ত পরিষ্কার; স্ত্রীর আইনসম্মত অধিকার শুধু অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। আসলে স্পষ্টতই কুরআন বা হাদিস থেকে নাফাকা-র এ ধরনের সংকীর্ণ সংজ্ঞার কোনো ভিত্তি নেই। অধিকাংশ মুসলিম নর এবং নারী হয়তো এটা জেনে হতবাক হবে যে ইসলামী আইনে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা বা সেবার কোনো দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তায় না। শুধু তাই নয়, যখন কোনো স্ত্রীর পক্ষে বিয়ের চুক্তির মূল ভিত্তি - স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না, তখন আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভরণ-পোষণ পাওয়ারও অধিকার থাকে না।

---

৬২৮ Al-Marghinani, p. 402.
৬২৯ Al-Marghinani, p. 392.
৬৩০ Haskafi, p. 316

> যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে অসুস্থ হয়, তাহলে তার ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটা ইহসান বা হিতৈষিতা অথবা দয়াশীলতার ভিত্তিতে (অর্থাৎ, আইনের ভিত্তিতে নয়), কারণ কিয়াসের ভিত্তিতে বিধান হচ্ছে যে, সে (স্ত্রী) ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখে না, যদি অসুস্থাবস্থায় সে স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে না পারে, যার মানে হচ্ছে যে আসলে স্বামীর উপভোগের বা ব্যবহারের জন্য তার রক্ষণে (কাস্টডি-তে) নেই।[৬৩১]

এ ধরনের মতামতের বিপরীত মতও আছে, কিন্তু দ্রষ্টব্য যে, এটা নিছক কিয়াসের অপপ্রয়োগই নয়, বরং ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ খর্ব করা। আবারও উল্লেখ্য যে, এগুলো ইসলাম যেমন করে আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকতার ফাঁদে পড়ে গেছে তার স্পষ্ট উদাহরণ। "অসুস্থতার ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ" প্রসঙ্গে আল-আতী আরো বিশদ আলোচনা করেছেন।

> কুরআন এবং সুন্নাহ স্ত্রীর যত্ন নেয়া এবং তার প্রতি দয়াশীলতার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু অসুস্থ স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেই আদর্শ বা নীতির প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের মতামতের জন্ম দিয়েছে। কিছু কিছু ফকীহর মতে, যে স্ত্রী অসুস্থতার কারণে বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব পালনে অক্ষম তার স্বামী থেকে ভরণ-পোষণের অধিকার সেই স্ত্রীর নেই।[৬৩২]
>
> অসুস্থ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বিষয়টি একটি উত্তেজক বিষয় এবং মূলত বাস্তব হওয়ার চাইতে একটি অ্যাকাডেমিক অনুশীলন। এটা সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে, পরবর্তী কোনো সময়ে কিছু কিছু আইন বিশেষজ্ঞ আইনের মূল চেতনা এবং নৈতিক ভিত্তি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কৌতূহলের বিষয় যে, কুরআন অথবা সুন্নাহে এ বিষয়টি নিয়ে এমন কিছু নেই যার সাথে ঐ ফকীহদের উল্লিখিত ধারণা অথবা অবস্থানের কোনো সামঞ্জস্য আছে। তদুপরি এ নিয়ে বিতর্ককারীরা তাদের মতের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিল দিতে পারেনি।[৬৩৩]

---

৬৩১ Al-Marghinani, p. 396.
৬৩২ Al-Ati, p. 181.
৬৩৩ Al-Ati, p. 152.

আল-আ'তীর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, এই প্রবণতা শুধু ভরণ-পোষণের প্রেক্ষাপটেই নয়, বরং অধিকাংশ ফুকাহার মতে অসুস্থ স্ত্রীদের চিকিৎসার খরচ স্বামীদের কাছে থেকে প্রাপ্য নয়। তাহলে কিসের ভিত্তিতে এইসব ফুকাহা, সাধারণভাবে, এরকম মত পোষণ করেন যে, অসুস্থ স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ এবং চিকিৎসার সহায়তা প্রাপ্য নয়? এর উত্তর হচ্ছে: কিয়াস।

> রুগ্ন স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সমস্যার সাথে জড়িত আছে চিকিৎসার খরচের দায়িত্ব। যদিও এটার ওপর ইজমা নেই, কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহার কার্যকর ঐকমত্য হচ্ছে যে রুগ্ন স্ত্রীর ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ (ওষুধ, চিকিৎসকের ফি ইত্যাদি) যোগানোর ব্যাপারে স্বামীর কোনো আইনি দায়িত্ব নেই। কোনো কোনো ফকীহ অবশ্য মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি স্বামীর সঙ্গতি থাকে এবং চিকিৎসার খরচ সামান্য হয়, তাহলে তার দায়িত্ব রয়েছে। অন্যদের মধ্যে এরকম মতও রয়েছে যে, যদিও এই খরচের দায়িত্ব আইনিভাবে স্বামীর ওপর বর্তায় না, তবু মমতা, সৌজন্য অথবা সামাজিক প্রথার দিক বিবেচনা করে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে এটা পালন করা উচিত। যারা এ ব্যাপারে স্বামীকে অব্যাহতি দিতে চান তারা চিকিৎসার বিষয়টা আইনিভাবে আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণের মধ্যে গণ্য করেন না। তারা সাংসারিক কাঠামোতে স্ত্রীত্ব এবং ইজারা দেওয়া সম্পত্তির মধ্যে তুলনা করেন কিয়াসের ভিত্তিতে: যারা ইজারা নেয় তাদের ওপর কোনো সম্পত্তির মেরামত অথবা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায় না। তাদের দায়িত্ব শুধু ভাড়া (রেন্ট) দেওয়া। বাকিটা সম্পত্তির মালিকের দায়িত্ব। তাই যে ভাড়া বা ইজারা নিয়েছে তাদের মতোই একজন স্বামীর দায়িত্ব নয় রুগ্ন স্ত্রীর চিকিৎসার মাধ্যমে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার অথবা অবস্থার উন্নতি অর্জনের ব্যাপারে।[৬৩৪]

এখানে মূল সমস্যাটি স্পষ্টতই কিয়াসের অতিমাত্রিক বা অত্যুৎসাহী ব্যবহার বা প্রয়োগ। কুরআনে নির্দেশনা এসেছে যে জুময়ার দিনে সব কাজ ছেড়ে যেন মুসলিমরা জুময়ার নামাজে যোগ দেয়। কিয়াসের অতিমাত্রিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মেলে যেখানে সেই জুময়ার দিনের নির্দেশনাকে বৈবাহিক জীবনের চুক্তিভিত্তিক কাঠামোর সাথে যোগ করা হয়েছে।

---

৬৩৪ Al-Ati, p. 152.

> শুক্রবার জুময়ার জামাতের সময় বেচা-কেনা বা ব্যবসা-সংক্রান্ত দুনিয়াদারীতে জড়িয়ে পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে কুরআনে নিম্নলিখিত আয়াতে “হে ইমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে জুময়ার নামাজের জন্য আহ্বান জানানো হয় (আজান দেওয়া হয়), তখন যথাশীঘ্র আল্লাহ তায়ালার যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর।” এই নিষেধাজ্ঞার ইল্লা’ (অন্তর্নিহিত কারণ বা ভিত্তি) হচ্ছে বেচা-কেনা যা একজন মানুষকে জুময়ার নামাজের দিকে যেতে অথবা সেদিকে মনোযাগ দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এই একই ইল্লা’-র উপস্থিতি রয়েছে ইজারা, মর্টগেজ এবং নিকাহ-এর (চুক্তিতে)। সেজন্যেই, জুময়ার সময় এই সব লেনদেনের ব্যাপারে বিধান (হুকুমগুলো সাধারণভাবে বেচা-কেনার বিধিবিধানের অনুরূপ ভিত্তিতেই।[৬৩৫]

অনেক মুসলিম নারীই এই ধরনের ‘অর্থোডক্স’ ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে এবং সোচ্চার হচ্ছে, যদিও তারা কুরআন-হাদিসের ইসলামের ওপর আস্থা হারায়নি। অনেক পুরুষ মুসলিমও বিস্তারিত পর্যায়ের এই সব বিধিবিধান্ের সাথে ইসলামের অসামঞ্জ্যতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, বিশেষ করে সেই দিকগুলো যেগুলো কিয়াসের ভিত্তিতে যা মানব যুক্তি-বুদ্ধির ভ্রমপ্রবণ (fallible) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে। সমসাময়িক মুসলিম স্কলাররা, যারা অর্থোডক্স ধারায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ পাননি, তাদের অনেকেও আইনসর্বস্ব এবং আক্ষরিক ইসলামী ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

> একদিকে স্ত্রীর জন্য একজন সেবিকা রাখার দায়িত্ব, যা অধিকাংশ মুসলিমদের জন্য বিলাসবহুলতা, অন্যদিকে চিকিৎসার খরচের দায়িত্ব থেকে স্বামীকে অব্যাহতি দেওয়া– এই সব কাঠামোগত (formalistic) ব্যাখ্যা বা অবস্থানের ব্যাপারে সমসাময়িক মুসলিম স্কলাররা ধৈর্য হারাচ্ছেন। তাদের কাছে এগুলো বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে তামাশা, মশকরার মতো।
>
> তদুপরি, এ ধরনের বিধিবিধানের কাঠামোগত ব্যাখ্যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রামাণ্য ভিত্তি নেই। কুরআন এবং সুন্নাহতে

৬৩৫ Moghul, pp. 15-16.

> আপনজনদের প্রতি দয়া-মায়া, মমতা এবং সুবিবেচনার যে নির্দেশনা রয়েছে তার সাথে এসব বিধিবিধানের কোনো সামঞ্জস্য নেই। প্রশ্ন জাগে: এসব ক্ষেত্রে ফকীহরা কি বাতাসের সাথে যুদ্ধ করছেন না সত্যিকার কোনো সমস্যার সমাধান করছেন বা দিচ্ছেন? তারা কেমন করে কুরআন এবং সুন্নাহর স্পষ্ট এবং সুষম পথ-নির্দেশনার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে, এ ধরনের কাঠামোগত ধারার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন?[৬৩৬]

রুগ্ন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং তার চিকিৎসার দায়িত্ব থেকে স্বামীকে অব্যাহতি কোনোভাবেই কুরআন অথবা সুন্নাহর প্রামাণ্য টেক্সট থেকে বিধৃত হয় না। এ ধরনের ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ আসলে নেই, শুধু তাই নয়, বরং এসব বিধিবিধান যে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের মূল উৎস থেকে বিচ্যুতি হয়েছে তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কিয়াসের অপপ্রয়োগ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় না। অনেক শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ফিকহী কাজগুলো যে ধারায় বিবর্তিত হয়েছে সে ব্যাপারে আল-আ'তী আলোকপাত করেন।

> এটা বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা অথবা কাঠামোগত কূটতর্ক (casuistry)-র সম্ভাবনা ছাড়াও, স্ত্রীর দায়িত্ব-অধিকারের বিশ্লেষণ ইজারা দেওয়া সম্পত্তির তুলনামূলক কাঠামোতে দেখা সম্ভবত বিশেষ সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার প্রতিফলন।...
>
> মুসলিম জনগোষ্ঠীর জনতাত্ত্বিক (demographic) মিশ্রণ ক্রমশই বৈচিত্র্যময় এবং জটিল হচ্ছিল। নতুন মাত্রায় বৃহৎ পর্যায়ের নাগরিক জীবনযাত্রার সাথে তুলনামূলকভাবে পরিচিতিহীনতা (anonymity) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্রমাগতভাবেই প্রচলিত হয়েছে। এরকম পরিবেশে বৈবাহিক বন্ধন আর দুই পরিবার অথবা গোত্রের মধ্যে মৈত্রীর প্রতীক হিসেবে না থেকে তা সেবার আনুষ্ঠানিক বিনিময়ের কাঠামোতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চুক্তির দিকে যায়। নারীরা, প্রথাগতভাবে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিভৃততায় পুরুষদের জগত থেকে চক্ষুর আড়ালে যেতে থাকে। ... মা-দের প্রথাগত ভূমিকা যেভাবে দুর্বল এবং সঙ্গীত্বের ভূমিকাও যেভাবে বিতর্কিত হতে থাকে তাতে গৃহিণীদের যৌনতার

৬৩৬ Al-Ati, p. 155.

> সামগ্রী হওয়া ছাড়া তার তেমন বাকি ছিল না। এমনকি সেই ভূমিকাটাও তার জন্য একান্ত ছিল না (বিবাহ-বহির্ভূত বিভিন্ন বিনোদন অবকাশের কারণে)।[৬৩৭]

সক্রিয় সামাজিক জীবন থেকে ক্রমাগতভাবেই 'নারীদের নিভৃতায়ন' (seclusion)-এর প্রবণতাটাই ইসলামী ফিকহ গ্রন্থাদিতে প্রতিফলিত হয়। যখন বিয়ে হয়, তখন নারী কীভাবে বা বিবেচনা করে যে স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর কব্জাতে (custody) নিজেকে সমর্পণ করছে? অথবা, কোনো নারী কি মনে করে যে বিয়ের মানে হচ্ছে সে মূলত বন্দিদশা অথবা নিভৃত জীবনে পা দিচ্ছে? দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা এই যে, এভাবেই ফুকাহা বিয়ের ব্যাপারটা দেখেছেন এবং তাদের গ্রন্থাদিতে তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

> যখন একজন নারী তার স্বামীর কব্জায় (custodz) সমর্পণ (surrender) করে, তখন স্বামীর ওপর অবশ্যকরণীয় হয়ে যায় স্ত্রীকে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান যোগানো, স্ত্রী মুসলিম অথবা অমুসলিম হোক; এমনটি কুরআনে এবং সুন্নাহতে রয়েছে; তাছাড়া ভরণ-পোষণ বৈবাহিক নিয়ন্ত্রণ (matrimonial restraint)-এর বিনিময় বা প্রতিদান।[৬৩৮]

প্রাসঙ্গিক আরবি শব্দটি হচ্ছে আহ্বাস, যা উদ্ভূত হয়েছে হাবাসা থেকে (অর্থ: বাঁধা, আটক করা, অন্তরীণ বা বন্দি করা)।[৬৩৯] বিয়ে কি আসলে নারীর জন্য বন্দিত্ব? অথচ এ রকম ধারণাই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে হাসকাফী-র দূর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে এসেছে।

> ভরণ-পোষণ নারীর অন্তরীণ (confinement)-এর প্রতিদান।[৬৪০]

নবিজির (স.) সময় যেমন ছিল সেটার বিপরীতে পরবর্তীকালে নারীদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং চক্ষুর আড়ালে পাঠানো এবং রাখার প্রবণতা শুরু হয় এবং আইনশাস্ত্রের আলোকে নারীরা যেমন 'অন্তরীণ' হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলাম আইনশাস্ত্রও ইসলামের মৌলিক চেতনা-ভাবধারা এবং নবিজির (স.) শিক্ষা-আদর্শ থেকে দূরে সরে আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকতায় অন্তরীণ হয়।

---

৬৩৭ Al-Ati, pp. 154-155.
৬৩৮ Al-Marghinani, p. 392
৬৩৯ Cowan, Arabic-English Dictionary, p. 153.
৬৪০ Haskafi, p. 316.

৫. অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি

যদিও অন্যদের সাথে কঠোর আচরণের দোষারোপ ইসলামের ওপর করা হয়, আসলে নীতিগতভাবে ইসলাম শান্তি এবং সুবিচার কামনা করে এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা এটাই যে, নবিজি (স.) কখনো আগ্রাসি সংঘাতমুখী ভূমিকা নেননি বা অভিযান চালাননি।

সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতেই ইসলাম আত্মরক্ষার অনুমতি দেয়। তার মানে এই নয় যে, নবিজি (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের পর ইতিহাসে মুসলিমরা কখনো আগ্রাসি ভূমিকা পালন করেনি। তবে কুরআন সুস্পষ্টভাবে আগ্রাসি ভূমিকা নিষিদ্ধ করেছে এবং তার নিন্দা করে।

> যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম;
>
> أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
>
> তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ– যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৬৪১]

এখানে নিছক মসজিদ সংরক্ষণের বিষয় নয়, বরং এটি ইসলামের সর্বজনীন নীতিমালার অংশ হিসেবে সবার জন্য শান্তি এবং সুবিচারে বিশ্বাস, আর তাই গির্জা, সিনাগগ, মন্দির যাই হোক না কেন। কুরআনে অন্য আয়াতও আছে

---

৬৪১ আল-কুরআন (আল-হাজ্জ্ব) ২২:৩৯-৪০।

যেগুলো সেই অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেখানে মুসলিমদের যুদ্ধে জড়াতে হয় অথবা না জড়িয়ে উপায় থাকে না। যখন তারা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়াবে আগ্রাসি শত্রুর মোকাবেলা করতে, সেখানে তারা বীরত্ব এবং দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েই দাঁড়াবে এবং সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাবে, লড়বে বিজয়ের জন্য। কিন্তু সে রকম অবস্থায়ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ যারা যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় (যেমন শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং অযোদ্ধা) তাদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না, তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা যাবে না ইত্যাদি। স্পষ্টতই আধুনিককালে বাস্তব অনেক বিষয় আছে, যেমন গণ-ধ্বংসী (mass destruction)-র সমরাস্ত্র যা বিবেচনা করতে হবে।[৬৪২] তবে প্রতিপক্ষ থেকে শান্তির আগ্রহের প্রথম আন্তরিক আভাসেই মুসলিমদের ওপর নির্দেশনা রয়েছে শান্তির অনুকূলে ভূমিকা নিতে।

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৬৪৩]

আগ্রাসি ভূমিকা তো দূরে থাক, শান্তি অথবা সন্ধির দিকে ঝোঁকাই শুধু নয়, শান্তিপ্রতিষ্ঠা (peacemaking) (এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায় আলোচিত #১১ মূল্যবোধ) ইসলামে উচ্চতম পর্যায়ের একটি দায়িত্ব।

وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত রইবে- এই শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে তোমরা অজুহাত বানিও না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৬৪৪]

এ ধরনের নীতি এবং আদর্শ শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রাসঙ্গিক নয়, বরং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যও। সাধারণভাবে, মুসলিমদের ওপর এটা অপরিহার্য যে তারা যেন কারো ব্যাপারেই কোনো ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্বেষ (prejudice)

৬৪২ AbuSulayman, 1987, p. 68.
৬৪৩ আল-কুরআন (আল-আনফাল) ৮:৬১।
৬৪৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২২৪।

না রাখে - সে ইহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, কমিউনিস্ট ইত্যাদি যেই হোক– একমাত্র তারা ছাড়া যারা অন্যায়-অবিচার এবং শোষণ-নিপীড়নে জড়িত।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

> "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই খাস হয়ে যায়। যদি তারা বিরত হয় তবে যারা জুলুমকারী তাদের ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করবে না (অথবা কোনো সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না)।"[৬৪৫]

এরকম যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, পরবর্তীকালে নাজিল হওয়া আয়াতের মাধ্যমে এই আয়াত রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে এবং এ ধরনের শান্তিমুখী আদর্শ মুসলিমদের ওপর আর প্রযোজ্য নয় বা তারা আর শান্তিমুখী হতে বাধ্য নয়। যদিও এই গ্রন্থের পরিসরে নাসখ এবং মানসুখ (রহিত হওয়ার তত্ত্ব) বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবু উল্লেখযোগ্য নাস্‌খ ইসলামী আইনশাস্ত্রের আরেকটি ভ্রান্তি আর অপপ্রয়োগে জড়ানো ধারণা। কুরআনের একটি বা যে কোনো আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে– এ রকম ধারণার মানে হচ্ছে যে আয়াতটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে এবং কুরআনের প্রেক্ষাপটে একটি ঐতিহাসিক পাদটীকা সমতুল্য হওয়া ছাড়া ঐ আয়াতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। বস্তুত একই ধারায় এই যুক্তি দেওয়া যায় যে, মুসলিমরা কুরআন থেকে ওই আয়াত বাদ দিলে বা মুছে ফেললেও বাস্তবিকই কিছু আসে যায় না। আসলে কুরআনের কোনো কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয় বা হবে না; কোথাও, কারো জন্য কুরআনের প্রতিটি আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা ছিল এবং থাকবে তাদের জীবনের প্রেক্ষাপটে।

আবু সুলায়মান ব্যাখ্যা করেছেন:

> আজকের মুসলিম শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে যে, নাসখ-এর ঐতিহ্যগত ধারণা আসমানি হিদায়াতের বেশ কিছু মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক, যার মাধ্যমে এর প্রয়োগের পরিসর দ্বিতীয় (বা) মাদানী সময়কালের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে।[৬৪৬]

---

৬৪৫ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৯৩।
৬৪৬ AbuSulayman, 1993, p. 50.

সুরা তাওবার ৫ম আয়াত প্রসঙ্গে ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মানের পর্যবেক্ষণ:

> এখানে আমরা দেখতে পাই যে নাসখের প্রচলিত ব্যাখায় ইসলাম যে সংস্কার আনতে চায়, মানুষের চরিত্র/ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন চায় এবং অবিচার/শোষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে ইসলাম যা চায় তার সাথে ঐ প্রচলিত ধারণা এবং ব্যাখা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং, এই প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেমন দাওয়াত, অন্যদের সাথে সম্পর্কে এবং অমুসলিমদের সাথে যাবতীয় মতবিনিময়ের প্রসঙ্গে, সম্প্রসারিত করা হয়েছে। [নবিজির (স.) যুগের সময় সংঘাত-যুদ্ধবিগ্রহের] প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা (কিয়াস)-এর মাধ্যমে কেমন করে সমান (equals)-দের সাথে চলতে হয়, সৎকর্মকারীদের তাদের যোগ্য প্রাপ্তি দেওয়া এবং ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে যারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, ইসলামের এই সব ইতিবাচক দিকগুলোই হারিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই, একটি স্থায়ী আদর্শ এবং নীতি হওয়ার পরিবর্তে সহিষ্ণুতা একটি শর্তসাপেক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা অবস্থাভেদে প্রযোজ্য হবে, আর ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা খর্ব করাটাই কঠোর নিয়মে পরিণত হয়েছে।[৬৪৭]

বস্তুত নাসখের তত্ত্ব এবং ধারণা মুসলিমদের চিন্তাশক্তি এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সঙ্গতিপুর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নাড়াচাড়া (approach) করতে দুর্বল করেছে এবং নানা ধরনের সংশয়-ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারণ, নাসখতত্ত্ব কুরআনের অনেকগুলো মৌলিক আয়াতকে অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে ফেলেছে। এই গ্রন্থের পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; তবে নাসখ প্রসঙ্গে বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, কুরআনের একটি আয়াতও মানসুখ নয় এ অর্থে যে, ঐ আয়াত স্থায়ীভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। সংঘাত-যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে যারা জুলুমবাজিতে রয়েছে তাদের ছাড়া সবার সাথে শান্তিপূর্ণ-সহিষ্ণুতাভিত্তিক সম্পর্ক প্রসঙ্গের এই বিশেষ আয়াতও রহিত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ, যুক্তি বা প্রমাণ নেই।

যুদ্ধবিগ্রহ এড়াতে মুসলিমরা দীর্ঘমেয়াদি শান্তি-চুক্তি এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ার প্রয়াস চালায়, যেটার স্থায়িত্ব মূলত নির্ভর করে চুক্তি মেনে চলতে বিশ্বস্ততায়।

---

৬৪৭ AbuSulayman, 1993, p. 51

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণে ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি অথবা চুক্তি করলে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে বা দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে, এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী।[৬৪৮]

ইসলাম মুসলিমদের কাছে অনমনীয় দাবি রাখে যে, তারা যেন চুক্তি, সন্ধি এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ করে। একইভাবে, চুক্তি অথবা সন্ধি ভঙ্গ করাটাও ইসলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে নেয়, বিশেষ করে যেখানে এ ধরনের চুক্তি ভঙ্গ হয় আকস্মিক এবং একপেশে যা মুসলিম অথবা চুক্তির অন্য পক্ষ অন্যায়-জুলুমের শিকার হয় বা হতে পারে।

আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ইমান আনে না।

ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবারই তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না;

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

যুদ্ধে ওদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে তাদের পেছনে যারা আছে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে।[৬৪৯]

৬৪৮ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৭৭।

৬৪৯ আল-কুরআন (আল-আনফাল) ৮:৫৭।

গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য যে, ইসলাম যুদ্ধ-সংঘাত চায় না, পছন্দ করে না। বরং মুসলিমদের শান্তি এবং সুবিচারের দিকে থাকতে শেখায়। সে লক্ষ্যেই ইসলাম নির্দেশনা দেয় চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হতে।

কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল এবং ঐতিহ্যগত ফিকহ শাস্ত্রের আলোচনা (discourse)-তে এ বিষয়গুলো এসেছে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন রকমে।

> আল-শাফেয়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনায় মত প্রকাশ করেন যে, মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব মুশরিকদের দেশ/অঞ্চলে যদি একবারের বেশি না হয়, অন্তত বছরে একবার যেন আক্রমণ (সমরাভিযান) চালানো হয় এবং কোনো সন্ধিচুক্তি যেন দশ বছরের বেশি না করা হয় ...[৬৫০]

নবিজির (স.) জীবনে তিনি কখনো দশ বছরের বেশি মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি করেননি, কিন্তু চুক্তি দীর্ঘতর সময়ের জন্য করা যাবে না, এমন কোনো নির্দেশনা বা নিষেধাজ্ঞাও নেই। নবিজি (স.) আমাদের শেখাননি যে, অমুসলিমদের বা তাদের দেশ বা বসতিতে বছরে অন্তত একবার করে হলেও আক্রমণ করা উচিত। এরকম ধারণা অবিশ্বাস্য এবং পীড়াদায়ক (shocking), যার পেছনে যে ধরনের চেতনা কাজ করেছে তা আসলে লাগামহীন ঘোড়ার মত কিয়াসের (অপ)প্রয়োগ। কোনো যুক্তি বা দলিলের ভিত্তিতে এসব মত প্রকাশ করা হয়েছে?

> ... রাসুলুল্লাহ্‌র সুন্নাতের ভিত্তিতে কিয়াস, কারণ নবিজির (স.) জীবদ্দশায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো যুদ্ধ হয়েছে এবং তিনি যে সন্ধিচুক্তি করেছেন সেগুলো দশ বছরের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদের ছিল না।[৬৫১]

লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন গজওয়াতে বা যুদ্ধে নবিজি (স.) যে অংশগ্রহণ করেছেন, সেগুলো গড়ে বছরে একবার ছিল, এটার ভিত্তিতে কিয়াস করে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শ (norm) হিসেবে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

---

৬৫০ AbuSulayman, 1987, p. 68, referring to Al-Shafi'i, Kitab al-Umma, Vol. 1, pp. 90-91 and Ibn Rushd, Bidaya al-Mujtahid, Vol. 1, pp. 313-314.

৬৫১ AbuSulayman, p. 68.

অবশ্য, এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও আছে, যেমন এ ব্যাপারে হানাফী মত শাফেয়ী মতের বিপরীত।[৬৫২] তবে আমাদের সর্বোচ্চ বা সবচেয়ে সম্মানিত জ্ঞানী-গুণীজনদের কেউ এরকম চিন্তা করেছেন বা যুক্তি দিয়েছেন, তা মুসলিম হিসেবে আমাদের আরো ভালোভাবে জানা উচিত। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মতামতের প্রভাব নিছক অতীতের ক্ল্যাসিক্যাল গ্রন্থাদির মধ্যেই সীমিত থাকেনি। বরং এ সমস্ত মতামতের পেছনে যেসব পূর্বকল্প (premise), মনমানসিকতা (attitude) এবং বোধ কাজ করেছে তা এখনো মুসলিম মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান বিলাপ করেছেন:

> ক্ল্যাসিক্যাল ফুকাহা এরকম আক্ষরিক বিশ্লেষণ অথবা ইস্যুর সাথে ইস্যু মিলিয়ে তুলনা অথবা কিয়াস করে এ ধরনের মতামতে পৌঁছেন এবং ধারণ করেন, সেটা না হয় বোঝা গেল (তখনকার প্রেক্ষাপটে), কিন্তু যখন আমাদের সমসাময়িক সময়ের ফুকাহা অতীতের আক্ষরিকতার ধারাবাহিকতার বাহক হন, তা থেকে বোঝা যায় যে সময়ের সাথে সাথে যে কত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে তার যথার্থ অনুধাবন প্রতিফলিত হচ্ছে না।[৬৫৩]

ঘ. উপসংহার

সাদৃশ্যমূলক যুক্তি-বিশ্লেষণ, কিয়াস, জ্ঞানের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। মুসলিম ওলামা এবং ফুকাহাও এটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর এবং ফলপ্রসূভাবে। কিন্তু, তার সমান্তরালে, অনেক ক্ষেত্রেই আইনসর্বস্ব এবং আক্ষরিক হওয়ার প্রবণতায় ভেসে যাওয়া কিয়াস এমন সব সিদ্ধান্ত অথবা বিধানের জন্ম দিয়েছে, যা ইসলামের মৌলিক চেতনা ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার মানে এই নয় যে: মেথডলজি হিসেবে কিয়াস সামগ্রিকভাবে সমস্যাপূর্ণ আর তাই এড়াতে হবে; বরং আইন এবং বিধিবিধান আহরণে এবং প্রণয়নে ফুকাহার হাতিয়ার-সামগ্রী (toolkit)-এর একটি প্রাসঙ্গিক সাধন হলো কিয়াস। তবে উল্লেখযোগ্য যে ফুকাহা এবং বিশেষজ্ঞ যারা কিয়াস প্রয়োগ করেন তাদের সেই বিনয় এবং সতর্কতা থাকা

---

৬৫২ AbuSulayman, p. 17.
৬৫৩ AbuSulayman, p. 68.

উচিত এবং সুস্পষ্টভাবে পাঠক অথবা ব্যবহারকারীদের জানানো উচিত যে তাদের কিয়াসের ফসলটি ভুল-সাপেক্ষ (ভ্রমপ্রবণ; fallible)। তাদের পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত মানব যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগের এই হাতিয়ার ব্যবহার করার সময়। তদুপরি, কিয়াস সম্পর্কে আলোচনা শরিয়া প্রসঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে শরিয়াকে স্বর্গীয় এবং অপরিবর্তনীয় গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে কিয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তঃ কেননা এর কোনো স্বর্গীয়তা বা অপরিবর্তনীয়তা নেই। কারণ, এটি মূলত মানুষের যুক্তিবুদ্ধি-নির্ভর এবং প্রচলিত অর্থের শরিয়ার অনেক দিক এই যুক্তিবুদ্ধি-নির্ভর কিয়াসের ওপর নির্ভরশীল।

ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান বিস্তারিত পর্যায়ে আরো সামগ্রিক (holistic) অথবা সুসংবদ্ধ (systematic) ধারা অথবা প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে কিয়াসের প্রয়োগের ব্যাপারে আলোকপাত করেন।

> কিয়াস খণ্ডিতভাবে (partial) আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায়ের ইস্যু থেকে ইস্যু কাঠামোতে হতে পারে না। এটা হতে হবে, সুসংবদ্ধ, ধারণাসঙ্গত (conceptual), অমূর্ত (abstract) এবং পূর্ণাঙ্গ।[৬৫৪]

কিয়াসের অতিব্যবহার এবং অপব্যবহার, বিশেষ করে 'ইল্লা' বা মূলগত কারণের সন্ধান যা হিকমাহ্ (উদ্দেশ্য বা প্রজ্ঞা) এবং কোনো সিস্টেম্যাটিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সংযুক্ত নয়, মুসলিম বিশ্বে স্থবিরতা, আইনসর্বস্বতা এবং অকার্যকর (dzsfunctional) অবস্থা সৃষ্টিতে মৌলিক ভুমিকা রেখেছে।[৬৫৫] কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক যুক্তি ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত অংশ থাকবে। কিন্তু এই পদ্ধতিকে এবং তার ফসলকে যেভাবে প্রাধান্য এবং প্রামাণ্যতা দেওয়া হয়েছে তা এমন বাস্তবসম্মত পর্যায়ে আনতে হবে যা সমর্থনযোগ্য বা রক্ষণীয় (defensible)।

একটি আইন ইসলামী হয়ে যায় না নিছক কিয়াসের ভিত্তিতে, কারণ কিয়াস হচ্ছে একটি আন্দাজমূলক (speculative) প্রয়োগ যার ফসলটি সুনির্দিষ্ট নয় (non-definitive)। একটি আইন তখনই ইসলামী হবে যখন নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের সবগুলোই পূরণ হবেঃ (১) বিধানটি আহরিত (formulated)

---

৬৫৪ AbuSulayman, p. 84.

৬৫৫ Farooq, 2006a.

হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদি দু'টি সূত্র– কুরআন এবং সুন্নাহ/অবিসংবাদিত হাদিস-এর ভিত্তিতে; (২) বিধানটি আহরিত হয়েছে ইসলামের মাকাসিদ এবং মূল্যবোধগুলোর সুনির্দিষ্ট আলোকে; এবং (৩) বিধানটি গৃহীত এবং প্রচলিত/বাস্তবায়িত হয় শূরা (পরামর্শ)-র ভিত্তিতে।

কামালী, উসূলে ফিকহের একজন সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ, বলেন:

> মূল কারণ (ratio decidendi) নির্ণয় বা নিরূপণে মেকানিক্যাল বা সীমিত/নির্ধারিত কিছু যৌক্তিক নিয়মাবলিই শুধু নয়, বরং প্রজ্ঞা (হিকমত) এবং 'সুবুদ্ধি' (good sense)-এরও প্রয়োজন। ... কিন্তু যে ধরনের অনড়তা (rigidity) এড়ানোর জন্য ফুকাহা শুরুর দিকে চেষ্টা করেছেন তা পরবর্তীকালে কিয়াসের কাঠামোগত গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শ হচ্ছে অতীতের দৃষ্টান্তগুলোকে এমন আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না করা, যেখানে আইন-বিধানের বৃহত্তর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিসর্জিত অথবা উপেক্ষিত হয়।[৬৫৬]

আমাদের সমসাময়িক সময়ের বিদ্বান-আলেমরা অতীতের পদচিহ্নগুলো অনুসরণ করবেন অন্ধভাবে নয়, বরং অতীতের ভুলগুলো অথবা যে বিধানগুলো এখন আর প্রযোজ্য নয় সেগুলো এড়িয়ে এবং তাদের সফল এবং প্রাসঙ্গিক অবদানগুলোর যথার্থ সম্মান দিয়ে এবং মূল্যায়ন করে। প্রকৃতপক্ষে অতীতের প্রজন্ম ইসলামী বিধিবিধানের বিধিবদ্ধকরণ (systematization)-এর ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন। আমাদের স্বর্ণযুগের বিদ্বানরা তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা রেখেই তাদের অবদান রেখেছেন ইসলামী জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একইভাবে, তারা অতীতের কোনো কিছু ভুল ছিল কি না অথবা সমসাময়িক সময়ে অনুরূপ প্রাসঙ্গিকতা আর নেই, এগুলোর প্রতি যথ যথ নজর দিতে দ্বিধা করেননি যদি কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহর আলোকে এবং সেই সাথে যুক্তি এবং বিবেকের বিবেচনায় নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ করে থাকেন।

এখানেও একই ধারা প্রযোজ্য। আমাদের পূর্ব প্রজন্মের উজ্জ্বল এবং মহান

---

৬৫৬ Kamali, 2003, p. 301.

বিদ্বানরা জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার যে বিশাল এবং সমৃদ্ধ ভান্ডার রেখে গেছেন, তার প্রতি সম্মান দেখানো, তা থেকে উপকৃত হতে হবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু ভবিষ্যৎমুখী (forward-looking) চেতনা নিয়ে। নতুন প্রজন্মের বিদ্বানরা তাদের বর্তমান সময়ের অবস্থা বিবেচনা করবেন, জানবেন, গবেষণা করবেন, সেগুলোর প্রাসঙ্গিক জবাব ও সমাধান খুঁজবেন অতীতের প্রজন্মের চশমা দিয়ে নয়, বরং কুরআন এবং নবিজির (স.) আদর্শ-সুন্নাহর আলোকে। এভাবে তারা যেমন অতীত প্রজন্মের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করবেন, তেমনি তার প্রতি সম্মান দেখাবেন। অনুরূপভাবে আমাদের অতীতের মহান বিদ্বানরা অন্ধভাবে অনুসরণ না করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেখানে প্রয়োজন নতুন করে দেখেছেন বা মূল্যায়ন করেছেন, তেমনি ভবিষ্যৎমুখী চেতনা এবং পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদের অবদান রাখবেন, যেখানে বিবেকসম্মতভাবে অতীত থেকে সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা বের করে নেবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী ফিকহ (আইন) এবং তার উপেক্ষিত অভিজ্ঞতাজনিত (Empirical) ভিত্তি

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে ইসলাম এই দুনিয়াবি জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশক। কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে,[৬৫৭] এটা মুসলিমদের প্রত্যয় যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং কার্যকর জীবনযাপনের জন্য জীবনের যাবতীয় সমস্যা অথবা প্রশ্নের জন্য তাদের কাছে রয়েছে চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ আসমানি হেদায়েত। নবিজির (স.) ইন্তেকালের পর হাজার বছর ধরে বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ছিল অগ্রগামী। কিন্তু, ধীরে ধীরে অবক্ষয় এবং পতনের ধারা শুরু হয়। বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং সমাজ মূলত অকার্যকর হয়ে আছে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ (external) কারণে যে প্রেক্ষাপটে এখন মুসলিমরা অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার তো দূরের কথা, নিজেদের সমস্যাগুলোই নিজেরা সমাধান করতে পারছে না।

আজ মুসলিমরা তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্মৃতিই শুধু ধারণ করে আছে। তবে উত্তরাধিকার হিসেবে ইসলামী বিধিবিধানের যে ভান্ডার মুসলিমরা পেয়েছে তার অনেকটুকুই আমাদের সমসাময়িক সময়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যদিও দাবি করা হয় যে, ইসলাম সুবিচারের প্রতি বিশ্বাসে কঠোর, এবং এ দাবি সঠিক, অনেক মুসলিম তাদের মুসলিম সমাজেই আইনসর্বস্বতার বোঝা এবং অসংবেদনশীলতার শিকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুদুদ অর্ডিন্যান্স-এর কারণে অনেক নারী, যাদের সামাজিক অবস্থান তাদের কোনো নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা দেয় না, তাদের জীবন তাৎক্ষণিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তালাক সংক্রান্ত বিধিবিধানের ভিত্তিতে, যার অনেকটুকুই প্রাক-মুহাম্মাদ (স.) কালের।[৬৫৮]

---

৬৫৭ আক্ষরিক অর্থ, সুন্নাহ অর্থ যে পথে মানুষ চলে বা চলা পথ। ইসলামে নবিজির (স.) সুন্নাহ বলতে বোঝায়, "নবিজির দেখানো পথ বা আদর্শ"।

৬৫৮ প্রাক-মুহাম্মাদ আরব সমাজে তালাক দিতে পুরুষদের অপরিমিত, অবাধ এবং একপেশে ক্ষমতা ছিল, যেখানে পুরুষরা ছিল নারীদের মালিক অথবা স্বত্বভোগী। কুরআন সে সবে পরিবর্তন এনে দেয় এবং যখন একটি বিয়েকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, সেখানে তালাকের জন্য পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতি এবং বিধান দিয়েছে যা সুষম এবং কার্যকরী।

মাহর (ইসলামে বর থেকে কনের প্রতি বিবাহের যৌতুক) থাকলেও, তা থেকে স্ত্রীরা বিয়ের এই যৌতুকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের অভিজ্ঞতা বিরল, এক রূঢ় বাস্তবতা যার সম্মুখীন হয় তারা যখন তালাকের বিষয়টি সামনে আসে। অথবা, রিবা-র বিষয়টি বিবেচনা করুন। দাবি করা হয় যে, সুদ নিষিদ্ধ, কারণ রিবা নিষিদ্ধ আর সুদই রিবা, সুতরাং এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা যে ইসলামী অর্থনীতি এবং প্রাসঙ্গিক অর্থ (financial) ব্যবস্থা সুদমুক্ত হবে। তাই যদি হবে তাহলে ইসলামী ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি কেন সুদ (রিবা) ভিত্তিক সূচকের (benchmark) ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে?[৬৫৯]

প্রাসঙ্গিক এরকম অনেক বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, একদিকে ইসলামী আইনের ভান্ডার আর অন্যদিকে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যাদির সমাধান এবং সুবিচার ও ভারসাম্য রক্ষার আদর্শের মধ্যে এতটা ব্যবধান কেন? বস্তুত যেখানে মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদরা দাবি করেন যে, ইসলামী আইন আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়েতের আলোকে সব সময়ের জন্য, তাহলে তা ব্যাখ্যা বা সংস্কারের জন্য প্রায়শই প্রয়োজন (জরুরত)-এর কারণ দেখাতে হয় কেন? কেন অনেক নিষ্ঠ মুসলিম নারী ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, অথবা অনেকে সেক্যুলার আইনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে অথবা সুবিচারের দাবি করে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী এস্টাবলিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করছে, যাতে করে ইসলামের নামে প্রচলিত বিধিবিধানের যথার্থ এবং গতিশীল প্রয়োগ হয়? কেন মুসলিমরা তাদের নিজেদের সমাজেই অধিকতর স্বাধীনতা চাচ্ছে, যেখানে দাবি করা হয় যে, ইসলামই আমদের মুক্তি এবং মর্যাদার যথার্থ সংরক্ষক? কেনই বা মুসলিম সমাজগুলোতে এত দারিদ্য এবং বঞ্চনা, ঘুণেধরা শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা?

দ্রষ্টব্য যে এ সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য সব বা একমাত্র না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে ফিকহ বা ইসলামী আইনের এম্পিরিক্যাল ভিত্তির অভাব। এখানে এম্পিরিক্যাল বলতে গবেষণামূলক, তথ্যভিত্তিক এবং নিরীক্ষামুখী বোঝানো হচ্ছে যার বিশদ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হবে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, এখানে এম্পিরিক্যাল বলতে সঙ্কীর্ণ অর্থে নিছক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোঝানো হচ্ছে না।

---

৬৫৯ Zaman and Movassaghi, 2002.

এক্ষেত্রে, ইসলামী আইনের ভাণ্ডারের ব্যাপারে একটি প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এটি মূলত কিতাবকেন্দ্রিক (text-oriented), গবেষণা-সমৃদ্ধ ধারায় জীবনকেন্দ্রিক নয়। এল-ফাদ্‌ল যদিও এই কিতাবকেন্দ্রিকতা[৬৬০] মৌলবাদ এবং চরমপন্থার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, প্রকৃতপক্ষে এটি সামগ্রিকভাবে ইসলামী আইনের একটি অন্যতম নিদর্শক (hallmark)। এটার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মাহমুদ এল-গামাল, একজন প্রথিতযশা স্কলার এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের গতিশীলতা সংরক্ষিত হয়েছে।

> এটা বুঝতে হবে যে, আমরা যখন দাবি করি ইসলামে যেকোনো সময় যেকোনো প্রেক্ষাপটে যেকোনো সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান রয়েছে তার মানে এই নয় যে, কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহ অথবা ইসলামী স্কলারদের আহরিত বিভিন্ন বিধিবিধানে বিস্তারিত পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আর্থসামাজিক বিষয়ে রেডিমেড সমাধান বা উত্তর রয়েছে। আসলে যা বোঝায় তা হচ্ছে যে কুরআন এবং সুন্নাতে রাসুল যাবতীয় নীতিমালাগুলো দিয়েছে যার ভিত্তিতে বা আলোকে তাদের নিজ নিজ কালের উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে উত্তর খুঁজে নেবেন। সে কারণে নতুন প্রেক্ষাপটে কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজতে শরিয়া বিশারদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রশ্নে কুরআন এবং সুন্নাহ বিধৃত নীতিমালা এবং আদর্শের ভিত্তিতে ফুকাহার বিশ্লেষণের মানদণ্ড উসূলে ফিকহের কিতাবগুলোতে এসেছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইস্তিনবাত বা ইজতিহাদ... ইস্তিনবাতের এই প্রক্রিয়া নতুন ধারণা, চিন্তা-ভাবনা এবং বিধানাবলি উসূলে ফিকহের সুন্নাহর ভাণ্ডারে সংযোগ করতে থাকে...[৬৬১]

তবে, এসব ফিক্‌হী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ (স্কলারলি) গবেষণা-বিশ্লেষণ কুরআনে বিধৃত নীতিমালার আলোকে হবে। কিন্তু কুরআন একটি আসমানি কিতাব হলেও, একটি কিতাব; তেমনি সুন্নাহ, যা বিভিন্ন মান বা শ্রেণির হাদিস সংকলনের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়, সেই সংকলনগুলোও কিতাব এবং অতীতের ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থভাণ্ডার যা ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক

---

৬৬০ El Fadl, p. 10.

৬৬১ El Gamal, p. 7.

মতদ্বৈধতা, সেগুলোও কিতাব। দ্রষ্টব্য যে এখানে প্রশ্নের জবাব আর সমস্যার সমাধান খুঁজতে প্রাসঙ্গিক কিতাবগুলোর পরিসরের বাইরে বাস্তব জীবনভিত্তিক কোনো গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার আভাসও নেই। তাছাড়া, এখানে আরোহী (inductive) পদ্ধতিতে গবেষণা-বিবেচনার কোনো ভূমিকার স্বীকৃতি দূরে থাক, ইশারাও নেই। বরং, প্রায় সব কিছুতেই রয়েছে ইসলামী গ্রন্থাদি, আনুসঙ্গিক গ্রন্থাদি এবং সেখান থেকে অবরোহী (deductive) সিদ্ধান্ত, বিধান বা ব্যাখ্যা, আর সেগুলোও গ্রন্থাদি। পুরোটাই কিতাবের জগত।

এই কিতাবমুখী প্রবণতা আরো শক্তিশালী হয়েছে ইসলামী শিক্ষার সেকেলে মডেল থেকে। তারিক রমাদান পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা নিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন, যেখানে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার অবস্থা আরো শোচনীয়।

ইসলামে আমাদের শিক্ষার ব্যর্থতার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতাকে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করা হয়েছে এবং 'আমরা' বনাম 'ওরা' দ্বৈতবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই প্রবণতার শিকার বানানো হয়েছে স্বয়ং নবিজিকেই (স.), অন্তত যার ক্ষেত্রে এটা হওয়া উচিত ছিল না, যেখানে তার জীবনকে বহুলাংশে সারবস্তুহীন ইতিহাসের কিছু দিনরাশি আর ঘটনাবলিতে পর্যবসিত করা হয়েছে। যেখানে তার জীবনটি তরুণ মনের আদর্শ এবং প্রেরণা (মডেল) হিসেবে স্থান পাওয়ার কথা, সেখানে ধর্মের শিক্ষাবস্তুগুলো মানবতা বিবর্জিত একটা খোলসে পরিণত হয়েছে।

> শিক্ষা পদ্ধতির অবস্থাও উৎকৃষ্টতর নয়। যেখানে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে, তাদের মতামত তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের সংশয় এবং স্বপ্নের কথাগুলো শেয়ার করতে শেখায়, তার বিপরীতে মসজিদ এবং বিবিধ ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে উল্টোটাই সাধারণত চলে। সেখানে (মসজিদ বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানে), সবাইকে চুপ এবং শান্ত হয়ে থাকতে হবে, আলোচনা, মতবিনিময় অথবা বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। সেখানে এক ধরনের সন্দেহপরায়ণতা (schizophrenia) চলে, যেখানে তারা 'অমুসলিম'দের সাথে সব বিষয়ে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ইসলাম বা তাদের মুসলিম

> শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় তারা যেন ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই সবকিছু মেনে নিয়ে, প্রশ্ন না করে তাদের যা বলা হয় তাই মেনে নেয় (বা নেয়ার ভাব করে)। তারা একম একটি শিক্ষাব্যবস্থার শিকার যা আসলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্যের তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষার নামে যা দেওয়া হচ্ছে, যা মূলত অতীতের জ্ঞান বর্তমান প্রজন্মের কাছে দেওয়া এবং নিজেদের কেমন হওয়া উচিত এসব ব্যাপারে, মূলত শিক্ষা প্রদানে আমাদের দৈন্যতার পরিচায়ক। নীতি, বিধিবিধান, আর আহকাম সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এমন শীতল এবং কঠোরতার পরিবেশ হয়েছে, যাতে আমাদের আত্মা বা মানবতার পরশ নেই।[৬৬২]

ইসলামের পথ নির্দেশনা যাতে আবার প্রাসঙ্গিকতা এবং কার্যকারিতা অর্জন করে, সেজন্য আমাদের সমস্যাগুলো গুণগতভাবে আরো ভালো ভাবে মূল্যায়ন এবং অনুধাবন করা প্রয়োজন– জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং এম্পিরিক্যাল গবেষণার ভিত্তিতে। উদাহরণ হিসেবে এই অধ্যায়ে কয়েকটি সমস্যা-সংশ্লিষ্ট দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামী ফিকহের জন্য জীবনমুখী, এম্পিরিক্যাল (গবেষণাভিত্তিক) ধারা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সে প্রেক্ষাপটে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

ক. ইসলামী বিধিবিধান: টেক্সটমুখিতা

যদিও যেকোনো কার্যকর সমাজে আইন, বিধিবিধান অথবা বিভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজনটা খুবই স্বাভাবিক, ইসলাম নিছক একটি আইনের ভান্ডার বা সমাহার নয়। আসলে, যেমনটি ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ইসলামের জীবনাদর্শ এবং নীতিগুলোর বিপরীতে মুসলিম সমাজগুলো আইনসর্বস্বতায় বাঁধা পড়েছে। সেজন্যই যখনই শরিয়া চালু করার স্লোগান বা দাবির কারণে কোনো না কোনো আকারে শরিয়া প্রবর্তিত হয়, যেমনটি বিংশ শতাব্দীতে কিছু কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে শরিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, আসলে সেগুলোর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি স্বৈরাচারী শাসক বা শাসন ব্যবস্থার অধীনে কিছু কঠোর আইন আর শাস্তির বিধান ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। আর ঐ সমাজগুলোতে ইসলামের বৃহত্তর লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং নীতিমালার সাথেও সংযোগ গড়ে ওঠেনি।

---

৬৬২ Ramadan, p. 127-128.

এই টেক্সট বা টেক্সটকেন্দ্রিকতা ইসলাম এবং ইসলামী আইনের গতিশীলতা এবং সৌন্দর্যই শুধু খর্ব করেনি, বরং অমুসলিমদের ইসলাম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং অপব্যাখ্যার ব্যাপকতর অবকাশ সৃষ্টি করেছে।

> ইসলামী আইনকে মূলত টেক্সটভিত্তিক ঐতিহ্যগত কাঠামোতেই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ইসলাম এবং মুসলিমদের অনুধাবনের চেষ্টা করেছে বইয়ের মাধ্যমে, অথচ কীভাবে আইনের অনুশাসনভিত্তিক ব্যবস্থায় পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বা ভূমিকা থাকে সে দিকগুলো উপেক্ষা করেই।[৬৬৩]

ঔপনিবেশিকবাদীরা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারায় বিদ্বেষমুখী মনোভাব পোষণ করলেও, গতানুগতিক ইসলাম আইনসর্বস্বতার কাঠামোতে, স্তরে স্তরে প্রাথমিক (primary), মাধ্যমিক (secondary) এমনকি তৃতীয় পর্যায়ের (tertiary) গ্রন্থাদির মাঝে বাঁধা, যে কাঠামোতে অনেক মুসলিমও বুঝতে পারেন যে ওগুলোর একটি বিরাট অংশ জীবনের বাস্তবতার সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, যদিও কুরআন এবং হাদিস এখনো আমাদের মাঝেই রয়েছে।

ফিকহ বা ইসলামী আইনের ভান্ডার যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তা মূলত টেক্সটমুখী। ফিকহের প্রথম উৎস হচ্ছে আল-কুরআন, যা আল্লাহ থেকে সরাসরি নাজিল, অভ্রান্ত এবং এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে কোনো রকমের দ্বিমত নেই। আসমানি উৎস হিসেবে হেদায়েতের যে কোনো ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশনা বা প্রমাণ অনন্য এবং চূড়ান্ত, যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী উৎস নেই।

ফিকহের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ, যার ভিত্তি হচ্ছে রাসুলুল্লাহর (স.) বাণী এবং কর্মকাণ্ড এবং যা সংরক্ষিত আছে বিভিন্ন হাদিস সংগ্রহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরআন শুধু মৌলিক নীতিমালা এবং নির্দেশনা দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা এবং বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াই। বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা নির্দেশনার জন্য মুসলিম আইনবেত্তারা মুখ্যত হাদিসের শরণাপন্ন হন। উৎস হিসেবে হাদিসের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম স্কলারদের মতে বিশেষ করে সহিহ হাদিসে পাওয়া তথ্য বা নির্দেশনা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে তৃতীয়

---

৬৬৩ Emon, p. 13.

অধ্যায়ে, মুসলিম আইনজ্ঞরা নিজেরাও স্বীকার করেন যে, হাদিস সহিহ বা অসহিহ হোক, তা থেকে অকাট্য বা নিশ্চিত জ্ঞানের পরিবর্তে সম্ভাবনামূলক বা কল্পনামূলক (speculative) জ্ঞান পাওয়া যায়। কয়েকটি হাদিস সংগ্রহকে সাধারণভাবে সহিহ বা তুলনামূলকভাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয়। এরকম ছয়টি সংগ্রহ সিহাহ সিত্তা নামে পরিচিত। এই ছয়টি এবং অন্যান্য হাদিস সংগ্রহের ভিত্তিতে মুসলিম মনীষী এবং ফকীহরা নিরূপণ করেন কী বাধ্যতামূলক, কী অনুমোদিত, কী অপছন্দনীয়, কী নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

ইসলামী ফিকহের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা (পূর্ণাঙ্গ ঐকমত্য)। মূলত এটি একটি একাঙ্গীকরণের (integrative) উৎস; যদি কোনো বিষয়ে ইজমা থাকে তাহলে তা অর্থোডক্স ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রামাণ্য, বাধ্যতামূলক এবং তর্কাতীত। কিন্তু দুঃখজনক, যেমনটি চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, ইজমাকে প্রায় নিয়মিতভাবেই অতিব্যবহার এবং অপব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আসলে ইজমার সংজ্ঞা বা পরিধি তার কোনো বিষয়েই কোনো ইজমা নেই। বস্তুত, কিছু মৌলিক নীতিমালা, বিশ্বাস এবং প্রাথমিক ইবাদত-উপাসনার বাইরে, এমন বিষয় খুবই কম যেটাতে ইজমা রয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইজমার প্রয়োগ নিয়ে সমস্যা রয়েছে, কারণ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থে যথাযথ ইজমা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, ইজমার সংজ্ঞা যাই হোক, ইজমার যথার্থতা নিরূপণে ফুকাহা কিতাবি (textual) উৎস– কুরআন এবং সুন্নাহ-এরই শরণাপন্ন হয়, আর তাই ইজমা প্রতিষ্ঠাও একটি টেক্সটমুখী উৎস।

ইসলামী ফিকহের সর্বশেষ উৎস হচ্ছে কিয়াস– সাদৃশ্যমূলক বিশ্লেষণ বা যুক্তি। কিয়াস হচ্ছে একটি জানা বিষয়কে প্রাসঙ্গিক অজানা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। "কিয়াসের কাজ হচ্ছে কোনো আসমানি আইনের পেছনে কার্যকর কারণ বা 'ইল্লা' আবিষ্কার করা এবং তা সমতুল্য নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। যেমন, মদ্যপান করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার 'ইল্লা' হচ্ছে মাতলামি বা মাতাল হওয়া। তাই যা কিছুতেই মাতলামি জাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হবে তা এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।"[৬৬৪] যেহেতু কোনো বিশেষ কিয়াসের গ্রহণযোগ্যতাও টেক্সটুয়াল উৎসের ওপর নির্ভর করে, তাই দেখা যাচ্ছে যে ইসলামী ফিকহ প্রায় সামগ্রিকভাবে টেক্সটমুখী পদ্ধতির ওপর

৬৬৪ Muslehuddin, p. 135.

নির্ভরশীল। ইজতিহাদ, ইসলামী ফিকহের একটি মৌলিক দিক, যাতে মূলত ফুকাহার কিয়াসভিত্তিক প্রয়োগ হয় এবং নতুন নতুন প্রেক্ষাপটে যেখানে পুনঃব্যাখ্যা বা খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়; এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও ফুকাহা এবং উলামা টেক্সটের জগতেই বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখেন।

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ফিকহের একটি অন্যতম ন্যূনতা বা অসম্পূর্ণতা হচ্ছে এই যে যদিও ইসলামের হেদায়েত এই দুনিয়াতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নির্ণয় করার জন্যও, এক্ষেত্রে গবেষণা বা বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রকৃতি ও পরিধি জানা এবং অনুধাবনের জন্য প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে যথাযথ সচেতনতা নেই। সামগ্রিকভাবে এম্পিরিক্যাল গবেষণা ফুকাহা এবং উলামাদের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অংশ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন রচনা এবং প্রণয়নের আগে সমস্যা জানা এবং বোঝার জন্য গবেষণা অথবা এম্পিরিক্যাল কাজ এই প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে অনুপস্থিত, তেমনি বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল নিরূপণের আগে সেগুলোর সম্ভাব্য ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা বা এম্পিরিক্যাল কাজও অনুপস্থিত।

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক অধ্যয়ন অথবা সমাজবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকাণ্ড এসব প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামের অংশ নয়। এমনকি আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমরাও যারা ইসলামের ব্যাপারে সিরিয়াস তারাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এম্পিরিক্যাল সামাজিক গবেষণার ব্যাপারে অসচেতন এবং উদাসীন। তাই, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ইসলামী আইন, মসলা-মাসায়েল পবিত্র সব গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত, কিন্তু জীবনের বাস্তবতার সাথে অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন। নীচের অংশে বিশ্লেষণভিত্তিক কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, যা থেকে অনুধাবন করা যাবে যে, কেমন করে ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী আইন ইসলামের সঞ্জীবনী মূল্যবোধ এবং সুবিচার আর ভারসাম্যতার নীতির ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

১. যিনা (ধর্ষণ/হুদুদ আইন): পাকিস্তান

১৯৭৯ সালে পরলোকগত জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের অধীনে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান সরকার শরিয়া প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। দুঃখজনক, তাদের উদ্যোগটা ছিল শরিয়া নিয়ে বহুলাংশে ভুল বোঝা এবং

ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, এবং ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় আংশিক এবং অপপ্রয়োগ। আইন-প্রণেতাদের মূল ফোকাস ছিল শরিয়ার হুদুদ দিকগুলো চালু করা - হুদুদ (হদ্দের বহুবচন), যা মূলত আসমানিভাবে নির্দিষ্ট করা বৈধ এবং অবৈধের সীমারেখার ভিত্তিতে, যা লংঘন করলে রয়েছে শাস্তি। হদ্দ-সংশ্লিষ্ট শাস্তিগুলো বিবিধ অপরাধ অথবা সীমালঙ্ঘনের জন্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একটি বিস্তৃত হুদুদ অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করা হয়, যার অংশ ছিল যিনা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স (৭, ১৯৭৯), যেখানে যিনা কুরআনের আলোকে নিষিদ্ধ এবং তাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্ডিন্যান্স #৭-এ দেওয়া যিনার সংজ্ঞা ছিল অনেক ব্যাপকতর, যেখানে বোঝানো হয় যে যিনা বলতে এমন দৈহিক সম্পর্ক যাতে অবিবাহিতেরা জড়িত, অথবা অন্তত একজন বিবাহিত জড়িত, অথবা বেশ্যাবৃত্তি, অথবা ধর্ষণ– এগুলো সবই অন্তর্ভুক্ত। তাই, ধর্ষণও সংজ্ঞায়িত হলো এক ধরনের যিনা, যা অর্ডিন্যান্সের ভাষায় যিনা বিল জাবর, যার মানে দাঁড়ায় “স্বেচ্ছায় জোরজবরদস্তির ব্যভিচার”।

স্বেচ্ছা আর জোরজবরদস্তিকে এক করে ধর্ষণকে “যিনা বিল জাবর” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে যিনা এবং ধর্ষণের পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, যার পরিণতিতে দেশটির অনেক নারীর জন্য এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অবস্থা সৃষ্টি হয়। হাজারেরও বেশিসংখ্যক নারী যারা দাবি করে যে, তারা ধর্ষিত হয়েছে, তারা যিনার হদ্দের আইনের ফাঁদে বাঁধা পড়ে। এই সব হদ্দ আইন প্রণীত হয় সরাসরি এবং শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থাদির ভিত্তিতে, যেজন্য প্রস্তাবিত আইনের সম্ভাব্য কী ফলাফল হতে পারে আইনগুলো বাস্তবায়নের আগে এবং পরে সে ব্যাপারে কোনো প্রাসঙ্গিক গবেষণা ছাড়াই। এ ধরনের আইনের কারণে অনেক নারীর জন্য যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা নিয়ে অনেক বিবেকবান মানুষ প্রতিবাদ করেন, যাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা সুবিচারমুখী ইসলামী নীতি এবং আদর্শকে মৌলিকভাবে মূল্য দেন। আইনটি বাস্তবায়নের পর ধর্মীয় অথরিটি, প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আইনের প্রভাব নিয়ে কোনো অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম নেয়নি। বস্তুত অর্থোডক্স ধর্মীয় গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানগুলো এই দুঃসহ অবস্থা নিয়ে কোনো অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না, কারণ তারা এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাদের এই আইনগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত কাজ হচ্ছে। সমস্যার প্রকৃতি এবং প্রসার অনুধাবনে এবং সেই সাথে নতুন আইনের ফলাফল কি তা পর্যবেক্ষণ এবং নিরূপণে সে

ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিতেই তারা ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং যারা সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে অথবা যারা ব্যাপক জুলুম বা অবিচার নিয়ে এই বিষয়ে দুই যুগ ধরে সামাজিক গবেষণা করেছে এবং সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে তার প্রতি তারা কোনো কর্ণপাত করেনি। প্রায় ২৫ বছর লেগেছে পাকিস্তানের ওলামার স্বীকার করতে যে দেশটির হুদুদ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে।[৬৬৫]

নমুনা মামলা: মোসা.[৬৬৬] সুখান

"মোসা. সুখানের পিতা একটি অভিযোগ দাখিল করেন যে, তার কন্যাকে তিন ব্যক্তি অপহরণ করেছে। বিচারে তিনজন ব্যক্তিই অপহরণ কেসে ছাড়া পান। মোসা. সুখানকে যিনাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শুরুতে সরকারি পক্ষ (প্রসিকিউশন) সুখানকে অপহৃত হওয়ার কারণে বাদীপক্ষের একজন সাক্ষী হিসেবে দেখে। তদন্ত চলাকালে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের নির্দেশে তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৭-১২-৮১ তারিখে সুখানকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখিয়ে গ্রেফতার করে। রাসায়নিক পরীক্ষক অপহৃতের বস্ত্রে রক্ত এবং বীর্যের আলামত পায়। বিচার বিভাগ যুক্তি দেয় যে, যেহেতু সুখান তিন মাস ধরে অপহৃত ছিল এবং তার স্বামীর সাহচর্যে ছিল না, তাই রক্ত আর বীর্য তার দোষের প্রমাণ। তবে অপহৃত সুখান অভিযোগ করে যে, সে ধর্ষিত হয়েছে পুলিশের কব্জায় থাকা অবস্থায়। আপিলের পর ফেডারেল শরিয়া আদালত সুখানকে অব্যাহতি দেয়।[৬৬৭]

যাহোক মোসা. সুখানের পরিণতি শেষ পর্যন্ত অনুকূল হয় এবং সে অব্যাহতি পায়। কিন্তু কথা রয়েই যায় যে, সে তো আসলে অপরাধের শিকার তাকে কেন ফৌজদারি মামলায় অপরাধী হিসেবে জড়ানো হবে? তাছাড়া, এই হুদুদ আইনের অধীনে আনা সব মামলার পরিণতি সুখানের মতো ইতিবাচক হয়নি বা হয় না। অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া এক পর্যায়ের সুবিচার,

৬৬৫ Usmani, 2006, Lau, 2007.

৬৬৬ এখানে মূল লেখকরা মোসা. শব্দটি ব্যবহার করেছে হয়তো ধরে নিয়ে যে পাঠকরা এর সাথে পরিচিত। পুরোপুরি পরিষ্কার না হলেও, মনে হচ্ছে শব্দটি মোসাম্মাৎ, যা বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বিবাহিত মুসলিম নারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬৬৭ Jahangir and Jilani, p. 90.

কিন্তু যথেষ্ট সুবিচার নয় যখন বিবেচনায় নেয়া হয় কয়েক বছরের কারাবাস, সামাজিক মর্যাদার সর্বনাশ, এমনকি নিরপরাধের পরিবার তাকে পারিবারিকভাবে বয়কট করা। কে এর দায়িত্ব নেবে? এসব ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা কোথায়?

> ল'ইয়ার্স ফর হিউম্যান রাইট্স অ্যান্ড লিগ্যাল এইড অনুযায়ী, সারা দেশজুড়ে বিচারের অপেক্ষায় হাজতবাসী ৭,০০০ মহিলার মধ্যে শতকরা ৮৮ জন এই হুদুদ আইনের অধীনে অভিযুক্ত। শতকরা ৯০ ভাগের পক্ষে নিযুক্ত কোনো আইনজীবী নেই, এবং শতকরা ৫০ ভাগের এটুকু ধারণা নেই যে, তাদের অধিকার রয়েছে কাউকে যোগাযোগের ব্যাপারে। হুদুদ লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত অধিকাংশ নারীই শেষে অব্যাহতি পায়, কিন্তু গড়ে তাদের জীবনের পাঁচটি বছর কাটে কারাবন্দি হয়ে আর সেই সাথে তারা হারায় তাদের ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা।[৬৬৮]

যে ধরনের কাজ ওলামা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো করতে প্রয়াসী হতে পারে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পর্যাপ্ত গবেষণার ভিত্তিতে জাহাঙ্গীর এবং জিলানীর (১৯৯০) কাজ। যদি ওলামারা এ ধরনের কাজ করতে অক্ষম বা অসমর্থ হয় তাহলে অন্তত এতটুকু আশা করা যেতে পারে যে, তারা ইসলামী বিধিবিধান প্রণয়নের আগে এবং পরে প্রাসঙ্গিক গবেষণার সাথে তারা পরিচিত হবেন এবং থাকবেন এবং তা থেকে উপকৃত হবেন।

এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য অন্তর্নিহিত দিক থেকে শরিয়াকে দোষ দেওয়ার অবকাশ নেই, আর এজন্যই পাকিস্তানের ভেতরের এবং বাইরের অনেক ওলামাই এই বিধানকে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র পরিপন্থি হিসেবে মূল্যায়ন করে নিন্দা করেছেন। তদুপরি এই আলোচনা বা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, শরিয়াকে বিসর্জন দেওয়া অথবা ইসলামী জীবনে শরিয়ার গুরুত্বকে অস্বীকার করা, যেমন অনেক সেকুলারপন্থীই করতে চান। বরং এখানে লক্ষ্য হলো ইসলামী আইনের বিস্তারিতের পর্যায়ে, যা প্রমাদপ্রবণ (fallible) মানুষের ব্যাখ্যায় প্রণীত হয়, সেরকম ক্ষেত্রে মানবিক সংবেদনশীলতা থাকার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।। তা নিছক টেক্সটমুখী না হয়ে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র আলোকে সামগ্রিক বিবেচনাপ্রসূত হতে হবে।

---

৬৬৮ Baldauf, 2005.

সেই সাথে জনকল্যাণ এবং সমাজে সুবিচার, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নিছক আইনি দিক থেকে না দেখে নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। সামগ্রিক অথবা জীবন ঘনিষ্ঠ বিবেচনার অনুপস্থিতিতে নিছক টেক্সটনির্ভর ধারা বা পদ্ধতি আইন বা বিধিবিধানের ভুল অথবা অপপ্রয়োগের দুয়ার খুলে দেয়।

২. একসাথে তিন তালাক

যদিও কুরআনের নির্দেশনা এবং নবিজির (স.) সুন্নাহর সুস্পষ্ট পরিপন্থি, ক্ল্যাসিক্যাল ফিকহে একসাথে তিন তালাক দেওয়াকে বৈধ এবং কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। যুক্তিটা এরকম: এটা বৈধ কারণ দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) এই বিধানকে প্রয়োগ করেছেন এবং যেহেতু সেই সময়ে অন্য সাহাবিরা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি, এটি একটি ইজমায় পরিণত হয়েছে যার ফলে এটার কার্যকারিতা আমাদের জন্য বৈধ এবং বাধ্যতামূলক।[৬৬৯]

প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ের ওপর কোনো ইজমা নেই এবং সে রকম ইজমা থাকার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে, কারণ যেমনটি ইজমা সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কাদের মতের ভিত্তিতে ইজমা হবে এ বিষয়েই কোনো ইজমা নেই। কোনো বিষয়কে নিছক ইজমার আলোকে দেখা বা বিবেচনা করাটা নিরেট টেক্সটমুখী ধারার প্রতিফলন। সম্পূরক জীবনমুখী ধারার জন্য প্রয়োজন নারীদের ওপর একসাথে তিন তালাকের কী প্রভাব বা এর ফলাফল তা গবেষণা করা।

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অত্যন্ত প্রশ্নবোধকভাবে ট্রেডিশনাল ইসলামী আইন তালাকের অধিকার প্রায় একচেটিয়াভাবে পুরুষ বা স্বামীকে দিয়েছে। তারই ভিত্তিতে অনেক স্বামী এটা নিয়ে বেশ সৃজনশীল প্রয়োগ করছে এবং কিছু আলেম তা বৈধায়নও করছে। একজন স্বামী যেকোনো সময়, যেকোনোভাবে (মৌখিক, লিখিত, ইমেইল, মেসেজ ইত্যাদি), যেকোনো অবস্থায় (রাগান্বিত, মাতাল অথবা জোরজবরদস্তিতে) তালাক দিতে পারে এবং এটার জন্য কারো

---

৬৬৯ সমসাময়িক অনেক আলেম, যেমন সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (মৃঃ ১৯৫৩ খ্রিঃ), এই বিধানের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। "অনেক অর্থোডক্স আলেম যারা দাবি করেন যে হযরত ওমরের রায়ের ব্যাপারে জীবিত সব সাহাবা একমত ছিলেন, এ ব্যাপারে নদভী দ্বিমত পোষণ করেন।" (সিকান্দ, ২০০৪)।

কাছে কোনো ব্যাখ্যা, অজুহাত বা দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকেই। এমনকি কোনো সাক্ষীরও প্রয়োজন নেই।[৬৭০] তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষীর দরকার নেই, ইসলামী বিধানের এ বিষয়টি, কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদের রেখে দেবে, না হয় তাদের যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; আর তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেবেন।[৬৭১]

প্রচলিত ইসলামী বিধানে তালাকের ব্যাপারে নারীদের সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে আইন-আদালতের মাধ্যমে, অনেক শর্তাবলি এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে যা সাধারণত নারীদের জন্য খুবই জটিল বা কঠিন। আক্ষরিক বা আইনসর্বস্ব ধারার চিন্তাভাবনা নারীদের ব্যাপারে মৌলিকভাবে অসংবেদনশীল, যেমনটি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলো প্রতিফলিত করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অনেক মুসলিম নারীর জন্য তালাক পাওয়াটা ছিল একটি জটিল বিষয়। বস্তুত কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায় মুরতাদ হয়ে যাওয়া, যেক্ষেত্রে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী বিয়ে এমনিতেই বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি খ্রিষ্টান মিশনারিদের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়, যেখানে তারা ধর্মান্তরণের মাধ্যমে তাদের বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ সৃষ্টি করে। শুরুতে সে সময় হানাফী ফিকহের অন্যতম আলেম ও ফকীহ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী নারীদের এসব সমস্যা নিয়ে কোনো সংবেদনশীলতা দেখাননি, বরং মুরতাদ হলে বিয়ে বাতিল

---

৬৭০ বিস্তারিতের জন্য যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ফিক্‌হের সংকলন, যেমন আল-মারগিনানী-র আল-হেদায়া-এ তালাক অধ্যায় দেখুন।

৬৭১ আল-কুরআন (আল-তালাক্ব) ৬৫:২।

হয়ে যায় এই ফতোয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বস্তুত তাঁর প্রাসঙ্গিক ফতোয়া সেই সব তালাকপ্রার্থী নারীদের জন্য মুরতাদ হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়, এটা তাদের মতো উঁচু দরের ফকীহরা বুঝতে পারেননি বা কেয়ার করেননি তা ভাবতেও অবাক লাগে, বিশেষ করে যেখানে কুরআনে আসলে তালাকের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতুল্য অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

> وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
>
> "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের জন্য বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হক্দার; নারীদেরও অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের (একটু) মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬৭২]

তবে ক্রমাগতভাবে যখন মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে তালাক পাওয়ার চেষ্টার হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে লাগল, তখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথাগত তালাকের বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত অবিচারের ব্যাপারে কিছু করল না। বরং তারা তালফিক (একাধিক মাযহাবের বিধিবিধানের সংমিশ্রণ)-এর আশ্রয় নিলো, এবং ফতোয়া জারি করলো যে, মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে বিয়ে বাতিল হয়ে যায় না আর এর মাধ্যমে বিরাট সংখ্যায় তালাকের প্রয়োজনে মুরতাদ হওয়ার পথ বন্ধ করে দিলো।[৬৭৩] কিন্তু যে কারণে এই মুসলিম নারীরা ইরতিদাদের পথ ধরেছিল, নিছক তালাকের জন্য, সে সমস্যার কোনো সমাধান হলো না।

---

৬৭২ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২২৮।

৬৭৩ এ বিষয়ে একটি চক্ষু উন্মীলনকারী গবেষণামূলক কাজের জন্য দেখুন, মাসুদ, ১৯৯৬। তালফিকের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Krawietz, 2002.

নিম্নে প্রদত্ত মামলটি উদাহরণস্বরূপ যা আমাদের সমসাময়িক সময়ে বিরল নয়।

নমুনা কেসঃ আমিনা

> “আমিনা, দিল্লিতে একজন তরুণী বয়সের টেলিফোন অপারেটর, এক সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখতে পেল যে, তার স্বামী আরেকটি নারীর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছে। আমিনা পুরো বিষয়টি মাথায় নেবার আগেই স্বামী তার ওপর চড়াও হলো এবং তিন তালাক ঘোষণা করে বসলো। আর তার সাথে আমিনার ছয় বছরের বিয়ের সমাপ্তি ঘটলো। আরো দুঃখজনক, সে ইদ্দত (মাসিক-এর তিন চক্র)-র পর আমিনার ভরণ-পোষণ দিতে অস্বীকার করল। এখন, দু’বছর পর, ১৯৮৬ সালের মুসলিম নারীদের তালাকসংক্রান্ত নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পরও, আমিনা তার স্বামী থেকে পাওনার জন্য অপেক্ষা করছে।”[৬৭৪]

ট্র্যাডিশনাল ইসলামী আইন অনুযায়ী একসঙ্গে তিন তালাক ঘোষণা করলে (অন্তত কিছু মাযহাবের বিধান মতে) তা অপরিবর্তনীয় হয়ে যায় এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ঠিকানা হয়ে যায় তার গৃহের বাইরে। লক্ষণীয়, যদিও ইসলামে তালাক বৈধ, এটাকে খুবই অনাকাঙ্খিত মনে করা হয়, আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং তাই এটা বৈধ হলেও এটাকে সহজ করা হয়নি। তবে ইসলামী আইনে পুরুষদের অধিকার এবং সুবিধার দিক থেকে ভাবলে এটা যে কঠিন হওয়ার কথা তা প্রতীয়মান হয় না। ইসলামী আইনবেত্তারা এবং আলেমরা তালাককে পছন্দ না করলেও তালাকের কী কী নিয়ামক আছে যা বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে কাজ করে এবং কোন্ কোন্ নিয়ামক বৈবাহিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে তা নিয়ে তারা গবেষণা করেন বা করেছেন তাঁর কোনো নজির নেই।

যদি কুরআন এবং সুন্নাহ/হাদিসের আলোকে একসাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম (নিষিদ্ধ) বিবেচিত হওয়া উচিত এবং মুসলিমদের নিজেদের উদ্যোগে আইনিভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। দুঃখজনক যে, ফুকাহা এবং ওলামা সাধারণত কোনো গবেষণা করেন না যে, এ ধরনের একসাথে তিন তালাকের কী ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, তাদের পরিবার এবং সন্তানাদির

৬৭৪ Khan, S. Y, 2000.

ওপর। আর এ সংক্রান্ত ফতোয়া এবং মসলা-মাসায়েলের যেহেতু অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical) গবেষণা হয় না, শুধু ওলামাই নয় অধিকাংশ মুসলিম বুদ্ধিজীবীও এ বিষয়ে বাদানুবাদী (polemical) লেখনীর বাইরে যেতে পারেনি। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ গবেষণা রয়েছে পাশ্চাত্যের গবেষকদের দিয়ে অথবা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সেক্যুলার অথবা ধর্মবিমুখদের মাধ্যমে। তবে নারীবাদী মুসলিম গবেষকদের নতুন এক প্রজন্ম আর তার সাথে পাশ্চাত্যের প্রশিক্ষিত মুসলিম গবেষকরা এগিয়ে আসছেন এই বিষয়ে শূন্যতা পূরণ করতে। অথচ প্রয়োজন ছিল আমাদের ওলামা-ফুকাহারই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন। কিন্ত এর বিপরীতে, উচ্চশিক্ষার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যবাহী কায়দায় তাদের ধারাকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং এখনো গবেষণা এবং সামাজিক স্টাডিকে তাদের কারিকুলামের অংশ এবং ভিত্তি করার প্রয়োজনীয়তা বুঝে উঠতে পারেনি।

৩. উত্তরাধিকারে নারীর অংশ

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারের বিষয়টি নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। শরিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, জীবিত পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং আত্মীয়-স্বজনের ভাগ রয়েছে, যা শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক কিতাবাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত। সমসাময়িক সময় এই সব বিধানের ফলাফল বা প্রভাবের ওপর সচরাচর কোনো গবেষণা নেই, বিশেষ করে নারীদের ওপর প্রভাব প্রসঙ্গে, যদিও তারাই অধিকারের দিক থেকে সমাজের নাজুক বা দুর্বল অংশের মধ্যে পড়ে। প্রায়শই দেখা যায় যে, পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়দায়িত্ব থেকে পুরুষেরা সহজেই নিজেদের দায়মুক্ত করতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে নারীদের জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও ধর্মীয় আলোচনায় অনেক ইতিবাচক দাবি করা হয়, আসলে তালাকের পর স্ত্রীর যদি সঞ্চিত সম্পদ না থাকে তার জন্য অন্য কারো ওপর নির্ভর করার অবকাশ থাকে না।

উল্লেখ্য, ইসলামে উত্তরাধিকার আইন নিয়ে একটি মৌলিক বিতর্ক হচ্ছে যারা কুরআনে বিধৃত উত্তরাধিকার বিধান নিয়ে অনড়ভাবে বোঝেন এবং ব্যাখ্যা করেন এবং যারা বলেন যে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন নারী-পুরুষ নিয়ে বৈষম্য করেছে। এ দুটো অবস্থানই সঠিক বা যুক্তিযুক্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃতের সম্পদের অংশে একজন

কন্যার চেয়ে একজন পুত্র দুই গুণ বেশি পাবে। এখানে বুঝতে হবে যে, এই বিধান শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর। যেকোনো ব্যক্তিরই ইসলামে অধিকার রয়েছে এবং দায়িত্বও আছে যে পারিবারিক উত্তরাধিকারীদের জন্য মৃত্যুর আগেই এমনভাবে বণ্টন করা যা সুবিচারপূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর আগে সে যেভাবে চায় তার সম্পদ বণ্টন এবং হস্তান্তর করতে পারে। উত্তরাধিকারীদের প্রতি মৃত্যুর পর যে বণ্টন নিয়ম আছে, সেটার জন্য অপেক্ষা না করে একজন মুসলিম তার সম্পদ সুবিচারের বিবেচনায় যথাযথভাবে বণ্টন ও হস্তান্তর করে যেতে পারেন, যেখানে বৈষম্যের পরিবর্তে সুবিচারপূর্ণ বণ্টন হয়। এরকম ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সব পুত্র-কন্যাকে সমানভাবে সম্পদ বন্টন করতে পারেন, এমনকি যদি সুবিচারের বিবেচনায় সঠিক মনে হয়, একজন কন্যাকে পুত্রের চেয়ে দ্বিগুণ দিতে পারেন। দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে মৃত্যুর আগে একজন ব্যক্তির যে ইখতিয়ার রয়েছে সে ব্যাপারে সচেতনতাও নেই আর প্রাসঙ্গিক আলোচনাও হয় না।

আরো গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামের প্রচলিত বিধানে বা ব্যবস্থায় নারীদের সম্পদের দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর না গুরুত্ব দেওয়া হয় আর না তার স্বীকৃতি আছে। এটা ধরেই নেয়া হয় যে, সে স্বামী, পিতা, ভাই, সমাজ, সরকার ইত্যাদি কারো না কারো ওপর নির্ভর করতে পারবে। উত্তরাধিকার আইনের অনড়তার (rigidity) কি এবং কতটা ফলাফল বা প্রভাব সে সম্পর্কে কোনো এম্পিরিক্যাল গবেষণা ছাড়া নারীদের, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের, দুর্দশা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করা মুশকিল।

ফুকাহা এবং ওলামাদের ভূমিকা নিছক কিতাবের জগতের ভিত্তিতে বিধানাদি নির্ণয় এবং প্রণয়ন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। যেসব সমস্যা বা বিষয়াদি নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করেন এবং সে প্রসঙ্গে যেসব বিধানাদি তারা প্রণয়ন করেন, সেক্ষেত্রে ঐ সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ পরিচিতি এবং গবেষণা থাকা উচিত। নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী এবং মালিক হতে পারে, বিয়ের সময় তাদের মাহর পাওয়ার অধিকার রয়েছে, অথবা তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের সম্পদ এবং আয় তদারক করতে পারবে, এগুলো শুধু মাসয়ালা আকারে কিতাবের জগতে থাকলে হবে না। বরঞ্চ, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন করে গবেষণা করতে হবে সেই সব নিয়ামক চিহ্নিত করতে যেগুলোর কারণে বাস্তবতা আর ফিকহ বা ইসলামী বিধানের মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে কুরআন এবং হাদিসে যা সুস্পষ্টভাবে এসেছে তাঁর পরিবর্তনের কথা হচ্ছে না। বরং, কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাগুলো আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, কতটুকু হচ্ছে, তা দিয়ে নারীদের অধিকার এবং মর্যাদা সংরক্ষিত হচ্ছে কি না এবং প্রয়োজনে সম্পূরক কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা নিয়ে তো অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মুর্স (১৯৯৫) ফিলিস্তিনে নারীদের জীবনে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার বণ্টন নিয়ে ব্যাপক (comprehensive) গবেষণার ভিত্তিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক এম্পিরিক্যাল কাজ করেছেন, যা থেকে ওলামা এবং ধর্মীয় শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারেন ঐ ধরনের কাজ করার মাধ্যমে অথবা এই ধরনের কাজ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করানোর মতো অবকাঠামো এবং সক্ষমতা গড়ার মাধ্যমে।[৬৭৫]

৪. অপ্রাপ্তবয়স্কদের (নাবালিগদের) বিয়ে (স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয়)

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী বিধানে নাবালগদের, এমনকি শিশুদের বিয়ের অনুমতি আছে। তবে এই প্রথা নবিজির (স.) সময়ের আগে থেকেই আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। মুসলিম সমাজে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালেগ হওয়াই বিবাহের যোগ্য বয়স হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে নাবালগের বিয়ে একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক, যেখানে সেই ব্যক্তির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে খর্ব করা হয়। নাবালগের বিয়ে জায়েয (যে ব্যাপারে একজন মুসলিম এবং মানুষ হিসেবে মেনে নেয়া মুশকিল, এটা) ধরে নিলেও দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ফুকাহা এবং ওলামা এই ধরনের ব্যক্তি এবং পারিবারিক পর্যায়ে এ ধরনের বিয়ের প্রভাব এবং ফলাফল নিয়ে কোনো গবেষণা নেই, বিশেষ করে নাবালেগ বালিকার শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে।

এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একটি পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সেখানে তাদের ষোল বছরের কম বয়সের কন্যাকে তারা বিয়ে দিয়ে দেয়। তার নবজাতক

৬৭৫ Moors, 1995.

শিশুর যত্ন নিতে কন্যাটি শুধু অসক্ষমই ছিল না, বরং সে তার নিজের এবং পরিবারের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তার অবস্থার কারণে। ধীরে ধীরে সে স্কিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তার জীবনটা এক রকম অচল হয়ে গেল। এটি একটি বাস্তব ঘটনা হলেও অনেকের কাছে কাহিনির মত মনে হতে পারে, আসলে এরকম ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। অনেক অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়া নারীর জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেহেতু মুসলিম সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতিটাই এমন যে একজন নারীকে বিয়ের পর স্বামীর পরিবারের অংশ হিসেবে মানিয়ে নিতে হয়, এসব ক্ষেত্রে অপরিণত বয়সের স্ত্রীকে বিভিন্ন রকমের আবেগ-অনুভূতি এবং মানসিক অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ইরানে উপজাতীয় নারীদের নিয়ে একটি এম্পিরিক্যাল গবেষণায় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্ত্রীরোগজনিত (gynecological) সমস্যা। গবেষণায় চিহ্নিত হয় যে, অপরিণত বয়সে বিয়ে এবং সন্তানধারণ এই সব রোগ বা অসুস্থতার পেছনে ভূমিকা পালন করেছে।

> সন্তান ধারণসংক্রান্ত বিভিন্ন স্ত্রীরোগজনিত সমস্যাগুলো নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় কাশকাই বেদুঈন গোত্রের বিবাহিত নারীদের নিয়ে। সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে: সিস্টোসেলি (৫৬.০%), ইউটেরাইন প্রোল্যাপ্স (৫৩.৬%), এবং রেকটোসেলি (৪০.৪%)। অন্য সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে সার্ভিক্স-এর ক্ষয় এবং প্রদাহ, প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং ডিস্‌প্যারেউনিয়া: ২৪%-৪০%। অল্প বয়সে বিবাহ এবং গর্ভধারণ, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এসব মেডিক্যাল সমস্যার উচ্চ হারের কারণ। তবে ঐ কমিউনিটির জীবনধারার ধরনও এর একটি নিয়ামক হতে পারে।[৬৭৬]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এসব গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং তার পেছনে কোনো আদর্শগত পক্ষপাতদুষ্টতা কাজ করছে কি না। এটা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু এসব গবেষণার অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্যও পক্ষপাতমুক্ত কোনো এম্পিরিক্যাল গবেষণা তো ইসলামী আইনবিশেষজ্ঞদের নেই।

অপর একটি এম্পিরিক্যাল গবেষণায় বাংলাদেশে গতানুগতিক মুসলিম সমাজে

---

৬৭৬ Sadeghi-Hassanabadi, et al.,1998.

তালাকের নিয়ামক প্রসঙ্গে পাওয়া যায়:

> বর এবং কনের নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার অভাব (নিরক্ষরতা) এবং অল্প বয়সে বিয়ে তালাকের সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে।[৬৭৭]

অবশ্য, এ ধরনের এম্পিরিক্যাল কাজের বিপরীতে বিকল্প কাজও থাকতে পারে, যার উপসংহার হয়তো ভিন্ন হতে পারে, বিশেষ করে যদি কোনো গবেষণা কাজ করা হয় পূর্বনির্ধারিত উপসংহারের ভিত্তিতে অথবা একটি পুর্বনির্ধারিত উপসংহারে পৌছানোর লক্ষ্যে। হ্যাঁ, ইসলামী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের এম্পিরিক্যাল গবেষণার সংস্কৃতি এবং অবকাঠামো গড়তে সময় লাগবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আসলে বাস্তব জীবনে কী সমস্যা, তার ধরণ এবং ব্যাপ্তি, এগুলো নিরূপণ করার দায়িত্ব যারা ইসলামী আইনচর্চা করেন প্রাথমিকভাবে তাদের। বর্তমানে যদিও তাদের মধ্যে টেক্সটমুখিতা আছে, তাদের শিক্ষায় সমাজ গবেষণার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে, তারা ধীরে ধীরে বিষয়টাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারবেন এবং আরো জীবন-ঘনিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারবে।

৫. জন্মনিয়ন্ত্রণ

মুসলিম বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে এটা জানা কথা। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রয়েছে, তাদের বৃহৎ জনসংখ্যা রয়েছে যার উল্লেখযোগ্য মানুষ দারিদ্যসীমার নীচে। এ কারণে দরিদ্র মানুষের বিশাল সংখ্যা আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলকভাবে উচ্চ হার দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এদের বড় একটি অংশের জীবনের মান অত্যন্ত নীচের দিকে রয়েছে, এমনকি নাজুক অবস্থায়ও। ধর্মীয় গোষ্ঠী (establishment) সাধারণত জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে যেহেতু জীবন-মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস ইসলামের গতানুগতিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। আর তাই প্রজননের

---

৬৭৭ Alam, et al.

প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের মানব হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামের নামে আমাদের মধ্যে ইনসাফ এবং মানবতাবোধের যত দাবি করা হয়, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ইসলামী বিধিবিধানে কী জায়েজ আর কী নাজায়েজ তা নিরুপিত হয় একচেটিয়াভাবে ধর্মীয় গ্রন্থের ভিত্তিতে; মানবজীবনে তার কী প্রভাব পড়ে অথবা তার ফলাফল কী সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয় না। এটা ধরে নেয়া হয় যে, এসব গ্রন্থাদিতে যা বিধৃত আছে তাতে ইনসাফের ব্যত্যয় হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। বাস্তবে আসলে তা নয়। মুসলিম ফুকাহা, যারা মোটামুটি একচেটিয়াভাবেই পুরুষ, তাদের পক্ষে একজন নারী গর্ভবতী অবস্থায় কি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তার সাথে বাহ্যিকভাবে পরিচিত হলেও, তাদের ভেতরের অভিজ্ঞটা এবং অনুভূতির সাথে পরিচিত নন। এই নারীরাই বছর বছর সন্তান ধারণ এবং প্রসব করায় তাদের শরীর এবং মনের ওপর কি প্রভাব পড়তে পারে, এ ব্যাপারে আমাদের ফুকাহা (পুরুষ)-দের সচেতনতা বা সহমর্মিতা নেই। ঘন ঘন সন্তান হলে মায়ের পক্ষে সন্তানদের শারীরিক এবং মানসিক চাহিদা বা প্রয়োজনে যথার্থ ভূমিকা অনেক সময়ই পালন করতে পারে না। প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো আরো প্রকট হয়েছে পুরুষকেন্দ্রিক মুসলিম সংস্কৃতিতে, যেখানে সন্তান ধারণ তো নারীরাই করে, কিন্তু সন্তান-পালনও সামগ্রিকভাবে নারীদের কাঁধেই থাকে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট বেশিরভাগ পরিবারের ভাগ্য এমনটিই, কারণ পরিবারের আকার অনেক বড় এবং এর সাথে জড়িত সাংস্কৃতিক দিকগুলোর কারণে। ফুকাহা এসব সমস্যা যে জানেন না তা নয়, কিন্তু এগুলো সমাধানের চেষ্টা হয় না, কারণ তারা সাধারণত এই জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামান না।

ইসলামী আইনশাস্ত্রে কিছু নীতিমালা আছে যার ভিত্তিতে পবিত্র গ্রন্থগুলোতে কিছু থাকলেও, অবস্থার ভিত্তিতে কিছু অভিযোজন (adjustment) করা যেতে পারে, যেমন: মাস্‌লাহা (জন-স্বার্থ), ইসতিহ্‌সান (ফকীহ্‌র পছন্দভিত্তিক অগ্রাধিকার), জরুরত (প্রয়োজন)।[৬৭৮] এই ফিক্‌হী নীতিগুলো ইসলামী আইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের (secondary) পদ্ধতি হিসেবে গণ্য যা ইজতিহাদী

৬৭৮ AbuSulayman, 1993. pp. 38, 42-43. হানাফী এবং মালিকী উভয় মাযহাবই ইসতিহ্‌সানের বৈধতা মানে। তবে তার ধারণা এবং ব্যাপ্তি নিয়ে মতভেদ আছে। মালিকী অবস্থানের জন্য দেখুন, Abu Zahrah.

গতিশীলতার জন্য সহায়ক। এই সব সম্পূরক পদ্ধতি থাকলেও, ইসলামী আইনশাস্ত্র মূলত রয়ে গেছে ক্ষুদ্র-বিচারিক (micro-juristic), ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সীমিত এবং কোনো এম্পিরিক্যাল গবেষণার ভিত্তি ছাড়াই।[৬৭৯] তদুপরি, যদিও ইসলামকে জীবনের পূর্ণ পরিসরের জন্য গণ্য করা হয়, সমসাময়িক সময়ের বিভিন্ন ইস্যু বা সমস্যা নিয়ে কার্যকর সমাধান দিতে যে গতিশীলতা প্রয়োজন ফিকহের সরঞ্জাম হিসেবে এই পদ্ধতিগুলো অপ্রতুলতার ইঙ্গিত দেয়।

ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান যথার্থভাবেই তুলে ধরেছেন:

> ইসলামী চিন্তাধারার মেথডোলজি যেহেতু এর প্রায়োগিক পরিসরে পূর্ণাঙ্গতার বৈশিষ্ট্যের দাবিদার, সেটা অর্জনের জন্য সরঞ্জামের পূর্ণাঙ্গতার বৈশিষ্ট্যটাও থাকতে হবে। মুসলিমদের জন্য সমগ্র জীবনটাই ইসলামের প্রয়োগের ক্ষেত্র। এর জন্য তাদের দায়িত্ব রয়েছে বোঝার, জ্ঞানান্বেষণের এবং যাকিছু আছে সব দিয়ে তাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়াস চালানো। এজন্য যাকিছু প্রয়োজন এর কোনোটাই বাদ দেওয়া বা উপেক্ষা করার অবকাশ নেই, যার মধ্যে রয়েছে: পার্থিব (material), শব্দার্থগত (semantic), বৈজ্ঞানিক (scientific), অভিজ্ঞতাজনিত/ প্রায়োগিক (empirical), যুক্তিসংক্রান্ত (rational), পরিমাণাত্মক (quantitative), গুণগত (qualitative), তাত্ত্বিক (theoretical) অথবা বিশ্লেষণাত্মক (analytical)।[৬৮০]

জীবনের বাস্তবতার ভিত্তিতে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞটা এবং তথ্য ছাড়া, আইনি অনুশাসন– যা করার এবং যা থেকে বিরত থাকার - পুরো জিনিসটাই একটি কিতাবের জগতের চর্চার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে, যেখানে অনেক যুক্তি এবং অবস্থান শুধু বাস্তবতার সাথেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনের সাথেও সাংঘর্ষিক। যেমন, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে পুরুষদের বিয়ে করা উচিত নয় যদি তাদের পরিবার চালানোর সামর্থ্য না থাকে। এরকম ক্ষেত্রে তাদের যৌনতার ব্যাপারে নিজেদের পবিত্র রাখা উচিত

৬৭৯ Krawietz, 2002.

৬৮০ AbuSulayman, 1993, pp. 98-99.

যতদিন না আল্লাহ তায়ালার রহমতে তারা সামর্থ্য অর্জন করেন:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

"যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন...।"[৬৮১]

পরিবারের মাপ থেকে পরিবারের সামর্থ্যের বিষয়টি এমনভাবে আলাদা করে দেখা হয় যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রজ্ঞা, কমনসেন্স অথবা বিবেকের ওপর কোনো দায়িত্ব দেননি, আর তাই আমরা কোনো রকমের হিসাব বিবেচনা না করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবারের সাইজ বৃদ্ধি করে যেতে পারি। এই প্রচলিত ধারণা কুরআনের আন-নূর (২৪:৩৩)-এর অসঙ্গতিপূর্ণ। যেন আমাদের সন্তানদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্যের ব্যাপারে আমাদের না কোনো দায়িত্ব আছে আর না সেভাবে ভাববার প্রয়োজন আছে।

তদুপরি, কুরআন নির্ধারণ করেছে যে মায়েরা তাদের শিশুকে (সম্ভব হলে) পূর্ণ দুই বছর স্তন্যদান করবে।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ....

"যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাবে..."[৬৮২]

শিশুদের স্তন্যপানের দৈহিক এবং মানসিক উপকার সর্বজনবিদিত এবং প্রমাণিত। কিন্তু এটাকে যদি নমুনা হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে যে মা পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাবে, তার জন্য গর্ভবতী হওয়া ন্যূনতম দুই বছরের ব্যবধান হওয়া প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে মুসলিমদের সচেতন করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, উপরে যা আলোচিত হলো নিছক টেক্সটভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ। অথচ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, মা অনেক ক্ষেত্রে প্রতি বছরই গর্ভবতী হচ্ছে বা গর্ভবতী হওয়ার মাঝে পর্যাপ্ত ব্যবধান থাকছে না, কিন্তু এ ব্যাপারে আলেম-ওলামারা সচেতনতা বৃদ্ধি বা কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার

৬৮১ আল-কুরআন (আন-নূর) ২৪:৩৩।
৬৮২ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:২৩৩।

ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারছে না বা দিচ্ছে না। এর মূল কারণ হয়তো তারা দুশ্চিন্তায় পড়েন যে, এই আয়াতের অন্তর্নিহিত ধারণা মানতে গেলে কোনো না কোনোভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট দম্পতিদের। বস্তুত যেহেতু এসব ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সমাধানের দায়দায়িত্ব ওলামা-ফুকাহার কাঁধে নেই, তারা নিছক কিতাবের জগতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে প্রাসঙ্গিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সহজেই এড়াতে পারেন।

> ঐতিহাসিকভাবে, আসমানি বিভিন্ন প্রসঙ্গে গায়েব, ধর্মশাস্ত্র এবং দার্শনিক কূটতর্ক (sophistry) নিয়ে মুসলিমরা তাদের উদ্যম এবং কর্মশক্তি (energy) অনেকটুকু অপচয় করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামী কর্মপদ্ধতি নিয়ে এই আলোচনায় ইসলামী জ্ঞানের উৎসগুলো - ওহি, যুক্তি এবং বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম– আর এগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করার উপায়সমগ্র গুলিয়ে না ফেলা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেরই নিজস্ব পদ্ধতি থাকতে পারে, যা সেই ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী। স্পষ্টতই ইসলামী বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে অধ্যয়ন-গবেষণার ভিত্তি হতে হবে ওহি, যুক্তি এবং সেই সব নিয়ম-রীতি যা আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিজগতের ওপর আরোপ করেছেন। এরকম ভিত্তির ওপর হলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ইসলামী শাখাগুলো তাদের সমগ্রতা এবং মানবকল্যাণের জন্য কল্যাণকর জ্ঞান উৎপাদনে বিভিন্ন উপায়ের ব্যাপারে খোলা মন নিয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে।[৬৮৩]

বিভিন্ন বিষয়ে এম্পিরিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতা এবং সমস্যাদি নিয়ে ইসলামী বিধিবিধান-সংক্রান্ত গবেষণার ফোকাস এবং মনোযোগের নতুন বিন্যাস প্রয়োজন তা পরিষ্কার, কিন্তু একই সাথে বৃহত্তর (macro) এবং ক্ষুদ্রতর (micro) পরিসরে প্রভাব বা ফলাফল নিরূপণের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে একপর্যায়ে নারীদের স্বাস্থ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির প্রতি ওলামা-ফুকাহাদের আরো মানবিক সংবেদনশীলতা থাকা প্রয়োজন। আরেক পর্যায়ে জনসংখ্যার বিস্ফোরণমুখী প্রবৃদ্ধির হার এবং অর্থনীতি ও সমাজের ওপর তার ফল, বিশেষ করে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে

---

৬৮৩ AbuSulayman, 1983, Chapter Three.

প্রতিযোগিতামূলক অথবা দ্বন্দ্বমুখী পরিবেশে, বিশেষ করে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

৬ . ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্স সংক্রান্ত বাদানুবাদ (polemics)

সমসাময়িক সময়ে ইসলাম-সংশ্লিষ্ট বিশেষ যে একটি ক্ষেত্রে এম্পিরিক্যাল ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্স। তবে তা অর্থনীতির চেয়ে ফাইন্যান্সের দিকটাতেই আনুপাতিকভাবে অধিকতর প্রভাব ফেলেছে।[৬৮৪] ইসলামী ফাইন্যান্স আন্দোলন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের মূল ধারার ফাইন্যান্সের অংশ হিসেবেও স্থান করে নিয়েছে। এই আন্দোলনের মূল নিয়ামক ছিল এই ধারণা যে, আধুনিক অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সিয়াল ব্যবস্থা সুদভিত্তিক এবং সুদ যেহেতু রিবা যা ইসলামে অকাট্যভাবে হারাম করা হয়েছে, তাই এই সুদভিত্তিক ব্যবস্থাই হারাম অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য অগ্রহণযোগ্য। তাই ইসলামী রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের স্বপ্ন যারা দেখেন এমন মুসলিমরা সঙ্গত কারণেই একটি রিবামুক্ত অর্থনীতি কামনা করেন এবং তাদের ইমানের দাবি হিসেবে মনে করেন।

ধর্মীয় এবং সেক্যুলার শিক্ষার মধ্যে দ্বিবিভাজন (dichotomy)-এর কারণে ওলামা এবং ফুকাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আছেন যারা আধুনিক অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক এবং ফাইন্যান্সের বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করতে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দেখা যায় না। তবে প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা করতে অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের অ্যাকাডেমিক এবং পেশাজীবী নতুন এক প্রজন্ম রয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট ওলামা-ফুকাহাদের আধুনিক সময়ের বাস্তবতা এবং জটিল বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি বুঝতে সহায়তা করে থাকে। এই পারদর্শী প্রজন্ম প্রাসঙ্গিক এম্পিরিক্যাল কাজও করে থাকে। তবে প্রশ্ন থাকে, নতুন প্রজন্মের সাথে এই সমঝোতাভিত্তিক ব্যবস্থা ওলামা-ফুকাহাদের অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্স অনুধাবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে? এ প্রসঙ্গে তিনটি দৃষ্টান্ত নীচে পেশ করা হলো।

(ক) ইউসুফ আল-কারদাভী সমসাময়িক সময়ের একজন অন্যতম আলেম

৬৮৪ Farooq, 2020a.

এবং ফকীহ হিসেবে সুপরিচিত। তার চিন্তাভাবনা এবং মতামতের মধ্যে সমসাময়িক আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপট অনুধাবন এবং তার আলোকে ইসলামের দিক থেকে বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের আঙ্গিক দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে তার ধারায় ইসলামের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ এবং গভীর শ্রদ্ধাবোধ যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার অবস্থানে সাধারণত মধ্যপন্থা অবলম্বনের ধারা দেখা যায় এবং সে কারণেই বর্তমান প্রজন্মের কাছে তা বড় মাপের সম্মান এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার ফতোয়া এবং মতামত বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে চাওয়া হয়, যার মধ্যে ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সও রয়েছে। তিনি কাতারে শরিয়া এবং শিক্ষা অনুষদের ডিন এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[৬৮৫] "ইসলামে হালাল-হারামের বিধান" শীর্ষক তার বই সমসাময়িকতার ভাবধারার কারণে মুসলিম বিশ্বে বহুল পরিচিত এবং আদৃত।

সেই বইটিতে তিনি সুদ (ইন্টারেস্ট) হারাম হওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা সম্পর্কে লিখেছেন:

> ইসলামে সুদ হারাম করা হয়েছে মানুষের নৈতিক, সামাজিক এবং কল্যাণের ব্যাপারে গভীর উদ্বিগ্নতা থেকে। মুসলিম স্কলাররা সেই হারামকরণের পেছনের প্রজ্ঞার ব্যাপারে বিজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন এবং তাদের মতামত সাম্প্রতিক গবেষণাবলিতে নিশ্চিত হয়েছে। এসব গবেষণা তাদের যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।[৬৮৬]

তবে মজার ব্যাপার, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়, যে "তাদের মতামত সাম্প্রতিক গবেষণাবলিতে নিশ্চিত হয়েছে" এই পর্যবেক্ষণের সমর্থনে একটি রেফারেন্সও আল-কারাদাভী দেননি। মনে হচ্ছে তিনি ধরে নিয়েছেন যে যেহেতু তার মতো একজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলেছেন বলে মানুষ নিছক বিশ্বাস করে নেবে। যাহোক, গবেষণার মাধ্যমে এরকম একটি মত 'নিশ্চিত' হয়েছে এরকম দাবি পদ্ধতিগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে অতিরঞ্জিত।

কুরআন-হাদিসে রিবা হারাম তা অকাট্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তার আলোচনায়

৬৮৫ শায়খ ইউসুফ আল-কারাদাভী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সালে মহান রব্বের ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে গেছেন। তিনি তার প্রজন্মের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ফকীহ এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম।

৬৮৬ Al-Qaradawi, 1999, p. 265.

একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে তিনি 'ইন্টারেস্ট' বলতে কী বুঝিয়েছেন এবং তা হারাম হওয়ার পেছনে কী মানদণ্ড (criteria) ব্যবহার করেছেন তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি।

এ ধরনের মতামত, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ (corroboration) ছাড়াই ইসলামী লেখনীতে/আলোচনায় প্রায়শই করা হয়। যেমন, অন্যতম হাদিস সংকলন সহিহ মুসলিম-এর অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় অনুবাদক, যার অর্থনীতি বা ফাইন্যান্সের কোনো পারদর্শিতা ছিল বলে জানা নেই, লিখেছেন:

> অর্থনীতিবিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সুদই দায়ী। সুদের হার বেড়ে যাওয়ায়, মুনাফার পরিসর (margin) কমে যায় এবং বিনিয়োগকারীরা ব্যবসায়ে মূলধন খাটানো এবং ঝুঁকি নেয়ার পরিবর্তে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ায় অগ্রাধিকার দেয়। ...সুদভিত্তিক অর্থনীতিই যেভাবে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হচ্ছে তা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান (factor of production) যারা সরবরাহ করে তাদের বিরুদ্ধে স্বার্থপর এবং হৃদয়হীন পুঁজির মালিক বা বিত্তশালীদেরে এক ধরনের ষড়যন্ত্র।[৬৮৭]

একইভাবে সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপারে একটি ঢালাও পর্যবেক্ষণ এখানে পেশ করা হয়েছে কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই। প্রমাণের মূল্যায়ন একটি ভিন্ন পর্যায়ের বিষয়। কিন্তু কোনো কিছু 'প্রমাণিত হয়েছে' অথচ কোনো রেফারেন্স না দিয়ে এরকম দাবি করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ দুনিয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে জুলুম-শোষণে সুদের চেয়ে মুনাফা আরো বেশি অথবা অন্তত সমান ভূমিকা পালন করছে, সেদিকে তাঁদের না কোনো দৃষ্টি আছে আর তাই না কোনো স্বীকৃতি।[৬৮৮]

ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের প্রবক্তাদের এম্পিরিক্যাল গবেষণাদি রয়েছে এবং গত কয়েক যুগে তা ব্যাপকতর হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক ওলামা-ফুকাহার মানসিকতা নিয়ে দু'টি বড় সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, তারা তাদের অবস্থানগুলোকে এমন চূড়ান্ত এবং প্রামাণ্য হিসেবে পেশ করেন যে, সেখানে

---

৬৮৭ Muslim, Vol. III, pp. 832, #2021.

৬৮৮ Farooq, 2012.

বিকল্প কোনো চিন্তাভাবনা বা মতামতের অবকাশ প্রায় থাকেই না। ইসলামী আইনের তিনটি উৎস টেক্সটভিত্তিক অবস্থানের বিপরীতে যেসব এম্পিরিক্যাল কাজ রয়েছে সেগুলোর অস্তিত্বেরও স্বীকৃতি দেন না, সেগুলো যথাযথভাবে আলোচনা করে গবেষণার ভিত্তিতে খণ্ডন করার প্রয়াস তো দূরের কথা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানের একজন নামকরা অর্থনীতিবিদ সাইয়িদ নাওয়াব হায়দার নকভী (বিশ্ববিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট; পরিচালক, পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স, ১৯৭৯-১৯৯৫; Ethics and Economics: An Islamic Synthesis গন্থের লেখক)-এর প্রসঙ্গ টানছি। পাকিস্তানের পরিসংখ্যান এবং ডাটার ভিত্তিতে এম্পিরিক্যাল গবেষণার যে ফলাফল তিনি একটি গবেষণা প্রবন্ধে (Islamic Banking: An Evaluation) পেশ করেছেন তা চক্ষু উন্মীলনকারী।

> মুসলিম অর্থনীতিবিদরা অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার মূলগত কারণ (ইল্লাত আল-হুকুম) রিবা পরিমাপের নিছক কোনো গাণিতিক সূত্র নয়; বরং এটার মূল্যায়নের যথার্থ মাপকাঠি হচ্ছে আয় এবং সম্পদের বণ্টনে নেতিবাচক ফলাফল। এটাই সঠিক অবস্থান, কারণ ... নির্দিষ্ট পলিসির সঠিকতা বা অসঠিকতা নিরূপণে ইসলাম গুরুত্ব দেয় নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও। তবে এ ধরনের অবস্থান শুধু তাত্ত্বিক হলেই হবে না, তা তত্ত্ব এবং এম্পিরিক্যাল উভয় আঙ্গিকেই পরীক্ষা করতে হবে।
>
> এখানে পাকিস্তানি ডাটার ভিত্তিতে এই যুক্তিটি পরীক্ষা করবো, অনুরূপভাবে অন্য মুসলিম (সংখ্যাগরিষ্ঠ) দেশগুলোর ক্ষেত্রেও গবেষণা করা যেতে পারে। এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, এখানে প্রদত্ত তথ্য উপরোল্লিখিত প্রকল্প (hypothesis) অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না। বরং এটা দেখায় যে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল হচ্ছে যে মুনাফা থেকে এবং সুদি আয়– দুটোই মধ্যম আয়ের এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের লোকজনদের চেয়ে ধনীদের কাছেই বেশি যায়। আর নিম্ন আয়ের লোকেরা সুদি আয় থেকে কিছুই পায় না এবং মুনাফার আয় থেকে কিছু পায় না বললেই চলে। এর মূল কারণ হচ্ছে

> যে, শুরু থেকেই সম্পদ বণ্টনের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে সুতরাং যাদের আগে থেকেই অনেক আছে তারাই মূলত সিংহভাগটি পায়। টেবিলটি এটাও পরিষ্কার করে, তুলনামূলকভাবে নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যম-বিত্তের লোকদের জন্য মুনাফাভিত্তিক আয়ের চেয়ে সুদি আয় আরো গুরুত্বপূর্ণ (রুপি ১০০১ থেকে ৪০০০ পর্যন্ত) আর বিপরীতটা প্রযোজ্য উচ্চ আয়ের লোকদের জন্য (৪০০০ রুপি এবং তদূর্ধ্ব)।[৬৮৯]

এই উপসংহারগুলো যদিও শুধু একটি মাত্র দেশের ডাটার ভিত্তিতে, নকভীর গবেষণা প্রচলিত ধারণা ও উপলব্ধি (perception)-এর বিপরীত। যদি মুনাফা এবং সুদ দুটোই ধনীদেরই হস্তগত হয়, যেমনটি শেখ কারাদাভী শুধু সুদের ব্যাপারে দাবি করেছে, তাহলে শুধু সুদ-এর ওপর আলোকপাত করাটা সঠিক নয়। তাছাড়া সুদ যদি নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং উচ্চ আয়ের লোকদের জন্য (সুদ নয়, বরং) মুনাফা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের প্রবক্তাদের দাবি ও যুক্তিগুলোকে আরো ভালোভাবে খতিয়ে দেখা এবং মূল্যায়ন করা উচিত।

একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এম্পিরিক্যাল কাজের সাথে ভালোভাবে পরিচিত না হওয়া এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থভাবে ওয়াকিবহাল না হওয়ার কারণে, ওলামা-ফুকাহারা এমন অসমর্থিত দাবির প্রবণতার শিকার হন, যেখানে নির্দিষ্ট এম্পিরিক্যাল প্রমাণ নেই বা থাকে না।

(খ) সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (১৯০৩-১৯৭৮) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় জন্ম জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর এবং পাকিস্তান জামায়েতের আমীর ছিলেন। গত শতাব্দীতে বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার বিরাট প্রভাব ছিল। মূল উর্দুতে লেখা গ্রন্থ, সুদ (অর্থাৎ, ইন্টারেস্ট)-এ কেন সুদ ইসলামে হারাম তা নিয়ে মৌলিক এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। নীচে সেই বইয়ের বাংলা অনুবাদ “সুদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং” থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। জাতীয় পর্যায়ে সরকারের

---

৬৮৯ Naqvi, S. N. H., 2000.

মুনাফাহীন আয়ের ব্যাপারে তার অবস্থান নিম্নরূপ:

> ঋণের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতটি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। সরকারকে সাময়িক দুর্ঘটনার জন্য কখনো অমুনাফাজনক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আবার কখনো যুদ্ধের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় এসব উদ্দেশ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রে ঋণ এবং তাও আবার সুদি ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এর সম্পূর্ণ উল্টোটাই সম্ভব হবে। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সাথে সাথেই দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অর্থ ও সম্পদরাজি চাঁদাস্বরূপ এনে সরকারের তহবিলে জমা করে দেবে। কারণ সুদ রহিত করে জাকাত পদ্ধতির প্রচলনের কারণে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এত বেশি সমৃদ্ধ ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে যে, নিজেদের উদ্বৃত্তের একটি অংশ সরকারকে দান করার ব্যাপারে তারা মোটেই ইতস্তত করবে না। এরপরও প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ না পাওয়া গেলে সরকার ঋণ চাইবে এবং লোকেরা ব্যাপক হারে সরকারকে সুদমুক্ত ঋণ দেবে। কিন্তু এতেও যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে নিজের কাজ সমাধা করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে
>
> এক. জাকাত ও খুমুসের (যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত মালে গণীমতের পঞ্চমাংশ) অর্থ ব্যবহার করবে।
>
> দুই. সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত ব্যাংক থেকে তাদের আমানতলব্ধ অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবে জবরদস্তি ঋণ গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যই সরকারের আছে, যেমন প্রয়োজনের সময় সরকার জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করার (conscriptions) এবং তাদের বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোরপূর্বক জব্দ করার (requisition) অধিকার রাখে।
>
> তিন. সর্বশেষ উপায় হিসেবে নিজের প্রয়োজন অনুপাতে নোট ছাপিয়েও সরকার কাজ চালাতে পারে। এটি আসলে জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণেরই নামান্তর হবে। তবে এটি হবে অবশ্যই সর্বশেষ

উপায়। সমস্ত উপায় ও পথ বন্ধ হয়ে গেলে অগত্যা এ পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ এ পথে ক্ষতির ফিরিস্তি দীর্ঘতর।[৬৯০]

স্পষ্টতই অর্থনৈতিক ইতিহাস সঞ্জাত শিক্ষা সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী হয় অল্পই পড়াশোনা করেছেন আর বুঝেছেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত একেবারেই কাল্পনিক/অবাস্তব (utopian)। সমসাময়িক মুসলিম বিশেষজ্ঞরা খুম্‌স বা গণীমতের মাল জাতীয় সম্পত্তি সঞ্চয় অথবা সংগ্রহের একটি মাধ্যম হিসেবে মনে করেন না। যখনই সরকার চাইবেন বিশ্বাসী জনগণ তাদের সিন্দুক বা মানিব্যাগ খুলে দেবে এরকম আশা করা অবাস্তব। সেই সাথে জাতীয় প্রয়োজনে জাকাতের ওপর ভরসা করা, যেখানে বর্তমানের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর ইসলামের সাথে সম্পর্কটা দুর্বল অথবা বৈরী, খুবই সরলমনা প্রস্তাবনা। আর সরকারকে বিনা মুনাফায় ঋণ দিতে ব্যাংককে বাধ্য করার ধারণায় এখনকার ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানও উপহাস করবে, প্রতিবাদ করবে, এমনকি এ ধরনের প্রস্তাব যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তাহলেও সঞ্চয়কারীরা এ রকম সম্ভাবনায় ব্যাংক থেকে তাদের সঞ্চয় পাইকারিভাবে প্রত্যাহার করতে পারে। আর সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে যদি প্রয়োজন হয় সরকারিভাবে মুদ্রা মুদ্রণ নিছক লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির মতো দুর্যোগকে আমন্ত্রণ জানানো, যেমনটি বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় জার্মানিতে হয়েছিল। একই ধরনের অভিজ্ঞতায় জিম্বাবুইয়ের মতো দেশগুলো দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। সর্বশেষ বিকল্প হিসেবেও এই বিকল্প বিবেচনা করা উচিত নয়।

এসব ধারণার পেছনে অর্থনৈতিক মানুষ (homo economicus, যুক্তিবাদী-স্বার্থবাদী ব্যক্তিত্ব)কে অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে, যে ব্যক্তিত্ব আধুনিক অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু যদি মাওলানা মওদুদীর ধারণায় ইসলামী মানুষ homo islamicus-এর প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে, তাহলে এটা আরেকটা সমস্যার প্রতিফলক। কারণ, এম্পিরিক্যাল দিক থেকে ‘ইসলামী মানুষ’-এর ব্যাপারে ডাটাভিত্তিক তেমন সমর্থন নেই। একইভাবে, এটাও উল্লেখ্য যে স্বার্থপর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র কুরআন পছন্দ না করলেও, স্বার্থবাদী বা স্বার্থ-সচেতন (self-interested) আচরণ অস্বীকার করে না।

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ

৬৯০ Mawdudi, 1987, pp. 134-135.

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য..."[৬৯১]

وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য"[৬৯২]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"যে সৎকর্ম করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সেই ভোগ করবে..."[৬৯৩]

তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি মৌলিক সমস্যা হচ্ছে যে তারা তাদের কল্পিত homo islamicus আচরণের দিক থেকে homo economicus-এর অনুকরণ করছে।[৬৯৪] এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সসংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে মুদারাবা এবং মুশারাকা– মুনাফা বা ক্ষতি আর ঝুঁকি ভাগের ভিত্তিতে– এ দু'টিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সঠিক কাঠামো হিসেবে গণ্য করা হলেও কেন এ দু'টির উপস্থিতি ইসলামী ব্যাংকগুলোর পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে কম তা বুঝতে সহজ হয়।[৬৯৫]

(গ) মুহম্মদ তক্বী উসমানি বিশ্বের ইসলামী সংস্থাপনার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একটি নাম। ইসলামী আইনশাস্ত্র, হাদিস এবং তাসাউওফে তিনি একজন বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ। অনেকে তাকে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একজন বিশেষজ্ঞ গণ্য করেন।[৬৯৬] কয়েক বছর আগে পর্যন্তও তিনি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের

---

৬৯১ আল-কুরআন (আল-ইসরা') ১৭:১৫।
৬৯২ আল-কুরআন (আল-ফাতির) ৩৫:১৮।
৬৯৩ আল-কুরআন (আল-জাসিয়া) ৪৫:১৫।
৬৯৪ Useem, 2002.
৬৯৫ Farooq, 2006f.
৬৯৬ Retrieved May 30, 2007, from Al-Balagh Website: http://www.albalagh.net/taqi.shtml.

শরিয়া আপিল বেঞ্চের বিচারক ছিলেন। ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপদেষ্টা হিসেবে তার চাহিদা ছিল প্রথম কাতারের কয়েক জনের মধ্যে। তিনি অর্গ্যানাইজেশন অব ইসলামীক কো-অপারেশন (OIC)-র সংশ্লিষ্ট জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী ফিক্‌হ কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর মতে, ইসলামে সময়ের সাথে অর্থের মূল্য বদলায় না:

> শরিয়ায়, সময়ের ভিত্তিতে অর্থের মূল্য (time value of money) নিয়ে কোনো ধারণা নেই[৬৯৭]

অনেক মুসলিম অর্থনীতিবিদই তার সাথে মৌলিকভাবে দ্বিমত পোষণ করে। কারো কারো মতে, ইসলাম অর্থের সময়ভিত্তিক মূল্য স্বীকার করে, কিন্তু শুধু যখন অ-আর্থিক (non-monetary) সম্পদ নিয়ে লেনদেন হয়। তাই, ঋণের ক্ষেত্রে অর্থের সময়মূল্য প্রযোজ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়।[৬৯৮] অন্যরা, যেমন এল-গামাল, যিনি যুক্তরাষ্টের একটি সুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের অধ্যাপক, বলেন: "ইসলামে সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো সময়মূল্য নেই এরকম ধারণা ভ্রান্ত। অর্থ (money) বন্ধ্যা (sterile) অর্থাৎ তার নিজে থেকে কোনো প্রবৃদ্ধি নেই এবং তাই এর কোনো সময়মূল্য নেই, এরকম ধারণা আসলে ক্যাথলিক গির্জার প্রচলিত বিশ্বাস এবং ইসলামের সাথে এর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।"[৬৯৯]

উসমানি আরো দাবি করেন:

> সুদের একটি স্থায়ী প্রবণতা আছে ধনীর পক্ষে এবং সাধারণ মানুষের বিপক্ষে ভূমিকা রাখার।[৭০০]

অন্য আরো অনেক ওলামা-ফুকাহার মতো উসমানিও তার অবস্থান প্রামাণিক (authoritative) ভাবে পেশ করেন, অথচ প্রাসঙ্গিক কোনো প্রমাণ ছাড়াই। যেমনটি একটু আগেই আলোচিত হয়েছে, নক্‌ভীর পাকিস্তানের ডাটাভিত্তিক

৬৯৭ Usmani, 2000, p. xvi.

৬৯৮ "ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের অর্থমূল্য অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে যে ঋণ এবং বেচা-কেনায় সময়কে ভিন্নভাবে দেখা হয়" Saadallah, 1994.

৬৯৯ El Gamal, 2000b, p. 12, n#3.

৭০০ El Gamal, 2000b, p. 113.

এম্পিরিক্যাল গবেষণা উসমানির এ ধরনের একপেশে বা চূড়ান্তভাবে পেশ করা অবস্থানের বিপরীত।

বস্তুত অনেক ফুকাহাই অসমর্থিতভাবে তাঁদের লেখা লিখে থাকেন শুধু তাদের ক্ষেত্র, ইসলামী ফিকহেই নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন অর্থনীতিসংক্রান্ত বিষয়ে যে ব্যাপারে তাদের প্রমাণিত কোনো বিশেষজ্ঞতা বা পারদর্শিতা নেই। একই গ্রন্থে, "পুঁজিবাদ এবং ইসলামের মৌলিক পার্থক্য" শীর্ষক অধ্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:

> সুদ, জুয়া এবং ফটকামূলক (speculative) লেনদেনে সাধারণত কতিপয়ের হাতে সম্পদ ঘনীভূত হয়।[৭০১]

যদিও এ কথা ঠিক যে, উন্নত পুজিবাদী দেশগুলোতে সম্পদ কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত, অনুন্নত বিশ্বে একই সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে আরো প্রকট। বস্তুত উসমানি যেমনটি দাবি করেছেন সুদ, জুয়া অথবা ফটকামূলক লেনদেন সম্পদের পুঞ্জীভবনের আসল বা মূল কারণ নয়।[৭০২]

উসমানি আরো মনে করেন যে, ইসলামী ফাইন্যান্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদ-সমর্থিত (asset-backed) হওয়া।[৭০৩] তিনি আরো সুনির্দিষ্ট করে বলেন: "...ইসলামী ফাইন্যান্সে প্রতিটি লেনদেন সত্যিকার সম্পদ (real asset) তৈরি করে।[৭০৪] এর পরিবর্তে তিনি যদি বলতেন: "ইসলামী ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনেই কোনো সত্যিকার সম্পদ জড়িত থাকে", তাহলে বিষয়টা আরো সমর্থনযোগ্য হতো। কিন্তু যদি তাঁর মন্তব্যটিও সঠিক হতো, তাহলেও বিনিময় (trade) ফাইন্যান্সের অবকাশ এতটা থাকত না, কারণ এসব লেনদেন থেকে কোনো নতুন সত্যিকার সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এটি একটি দুঃখজনক বাস্তবতা যে, ইসলামী ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো আনুপাতিকভাবে অতিমাত্রায় ট্রেড ফাইন্যান্সে জড়িত, অ-আর্থিক (real) সেক্টরে নয় যেখানে ফাইন্যান্সিং উৎপাদন এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

উসমানির মতে, মুশারাকা এবং মুদারাবাই হচ্ছে প্রকৃত শরিয়াভিত্তিক

---

৭০১ El Gamal, 2000b, p. xiv.
৭০২ Farooq, 2012.
৭০৩ El Gamal, 2000b, p. xiv.
৭০৪ El Gamal, 2000b, p. xvi.

ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি।[৭০৫] কিন্তু এই দু'টি লাভ-লোকসান ভাগাভাগিভিত্তিক এই দু'টি পদ্ধতি ইসলামী ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেকটা বিরল। বরং ওই দুটোর পরিবর্তে cost-plus ফাইন্যান্সিং বা মুরাবাহা যা মূলত ঋণ-তুল্য, এটাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। "ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিপাদন (performance) - একটি বাস্তববাদী মূল্যায়ন" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে বিলাপ করেন:

> এই (অর্থাৎ, ইসলামী) ভাবধারা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয় যদি না ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকার ব্যবহার আরো ব্যাপকভাবে বাড়ায়। এটা ঠিক যে, ফাইন্যান্সিং মাধ্যম হিসেবে মুশারাকা ব্যবহারে বাস্তব সীমাবদ্ধতা আছে, বিশেষ করে বর্তমান পরিবেশে যেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো অনেক সীমাবদ্ধতা এবং বাধানিষেধের মধ্যে নিজেদের চালায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতা ছাড়াই। তারপরও এটা মানা প্রয়োজন যে, ধীরে ধীরে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকার প্রসারে আরো অগ্রসর হতে পারত। দুঃখজনকভাবে, ইসলামী ব্যাংকগুলো এই মৌলিক আবশ্যকতার বিষয় উপেক্ষা করেছে আর এ ব্যাপারে ধীরে ধীরে হলেও অগ্রসর হওয়ার মতো কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ...ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল ভাবধারা যেন পুরোপুরিই উপেক্ষিত হচ্ছে।[৭০৬]

উসমানি হয়তো মনে করেন এই মুশারাকা-মুদারাবা উপেক্ষা করাটা আসমানি হেদায়েতের ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট নিষ্ঠার অভাবের পরিচায়ক যেখানে ব্যাংকাররা সুবিধাবাদ-তাড়িত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যেটাকে homo islamicus মনে করি তা আসলে homo economicus-এর অনুকরণ করছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, homo islamicus সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণাতেই সমস্যা আছে।

মোহাম্মদ হাশিম কামালি, সমসাময়িক সময়ের শীর্ষস্থানীয় একজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, মন্তব্য করেন যে ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো যে উৎপাদনমুখী অর্থায়নের চেয়ে স্বল্পমেয়াদের ট্রেড অর্থায়নের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তা ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের ঘোষিত লক্ষ্য এবং প্রস্তাবনার সাথে

---

৭০৫ El Gamal, 2000b, p. xv.
৭০৬ Usmani, 2000, p. 113.

সাংঘর্ষিক:

> স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন মূলত যেসব দ্রব্যাদি আগেই উৎপাদিত হয়েছে সেগুলোর সাথে জড়িত, উৎপাদন প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় পুঁজি অথবা কারখানা, অবকাঠামো ইত্যাদির প্রবৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ কারখানা, অবকাঠামো, পুঁজি দ্রব্যাদি (capital goods) উৎপাদনে বিনিয়োগই আসল অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে। তাই স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের দিকে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রাধিকার দেওয়া ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অথবা তাদের সামাজিক কল্যাণের এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৭০৭]

উসমানিও এ বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেন:

> সুদভিত্তিক অর্থায়ন কোনো আসল সম্পদ সৃষ্টি করে না, তাই ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো যে অর্থ যোগান দেয় তা সমাজে উৎপাদিত আসল দ্রব্যাদি এবং সেবা (goods and services)-র সাথে মেলে না, কেননা ঋণ অনেক সময়ই কৃত্রিমভাবে অর্থ যোগানকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে, প্রকৃত সম্পদ বাড়ানো ছাড়াই। মুদ্রা যোগান এবং প্রকৃত সম্পদের সৃষ্টিতে এই ব্যবধান থেকে উদ্ভব হয় মুদ্রাস্ফীতি অথবা তা আরো প্রকট হয়।[৭০৮]

এই ব্যাখ্যায় যা অনুপস্থিত রয়েছে, হয়তে সঠিকভাবে না প্রকাশ করতে পারার কারণে, তা এই যে মুদ্রাস্ফীতি শুধু অর্থ যোগানের দিক থেকেই হয় না, বরং তা বিভিন্ন যোগান দিকের (supply-side) এবং চাহিদা দিকের (demand-side) আঘাত থেকেও হতে পারে।

আবারও, উপর্যুক্ত আলোচনাগুলোতে কোনো স্বীকৃতি নেই যে এই সব প্রস্তাবনা (proposition) এম্পিরিক্যালি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের পরীক্ষা করাই প্রত্যাশিত। আর তাই ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানি জনগণের প্রাথমিক জযবা এবং নিষ্ঠায় ভাটা না পড়লেও, ইরান সরকারের উপলব্ধিতে সময় লাগেনি যে সরকারের জন্য জনগণ অর্থ সাদাকা অথবা সুদহীন ঋণ হিসেবে উজাড় করে দেবে এরকম ধারণা অবাস্তব। বরং, ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র নির্দিষ্ট হারের মুনাফায় পাবলিক বন্ড ইস্যু করাকে ধর্মীয়ভাবে

৭০৭ Kamali. 2003, p. 104.
৭০৮ Usmani, 2000, p. xvi.

বৈধ করে নিলো এই যুক্তিতে যে, এ ধরনের ঋণ হারাম রিবার আওতাভুক্ত নয়: "নির্দিষ্ট মুনাফার হারে সরকারি ঋণ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক খাতে সুদ হিসেবে গণ্য হবে না, আর তাই তা বৈধ।"[৭০৯]

তার মানে এই নয় যে, সুদের কোনো সমস্যা নেই। উচ্চ হারের সুদ, সুদের হারের অস্থির ওঠানামা, পরিবর্তনীয় সুদের হারভিত্তিক লেনদেন, ঋণ-নির্ভর জীবনধারা ইত্যাদির দীর্ঘমেয়াদি কুফল খুবই স্বাভাবিক। তবে অর্থনীতির দিক থেকে এ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সরাসরি সুদের উপরে দায় চাপানো হয় না। কারণ, সুদমুক্ত সমাজেও যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দেশ ঋণের বিশাল বোঝা নিজের কাঁধে নেয় তা দীর্ঘমেয়াদে সমস্যার কারণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যাটা নিছক সুদ নয়, বরং অতিমাত্রায় ঋণের বোঝাটাও সমস্যা, যেটা সুদবিহীন অবস্থাতেও হতে পারে।[৭১০]

খ. কিছু সমসাময়িক চিন্তাভাবনা এবং প্রতিফলন

টেক্সটমুখী ধারার সাথে জীবনমুখী ধারার সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন সামাজিক বাস্তবতা, প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তন নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান, অনুধাবন এবং মূল্যায়ন করার অর্থবহ প্রয়াস। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল তার প্রজনক (seminal) গ্রন্থ ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন-এ খুবই প্রাসঙ্গিক একটি পর্যবেক্ষণ রেখেছেন:

> নিঃসন্দেহে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনার আশু উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা জাগিয়ে দেওয়া, যাতে প্রকৃতি তার কাছে প্রতীক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এম্পিরিক্যাল মনোভাবই হচ্ছে কুরআনের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মনোভাবই কুরআন অনুসারীদের মনে বাস্তবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছিল। আর তার ফলেই তারা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। সেও এমন যুগে যখন মানুষ স্রষ্টার অনুসন্ধান করতে পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে মূল্যহীন মনে করে বর্জন করেছিল।[৭১১]

এখানে ইকবাল এম্পিরিক্যাল মানসিকতার ওপর জোর দেন বিজ্ঞানের

---

৭০৯ Ariff, 1988.
৭১০ Farooq, 2015.
৭১১ Iqbal, p. 14.

প্রেক্ষাপটে। তিনি "সাধারণভাবে এম্পিরিক্যাল মানসিকতা"র কথাও বলেন, যদিও তিনি মনে করতেন উচ্চতর সত্য জানার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে আসমানি হেদায়েত (অর্থাৎ, যা স্রষ্টা নিজে মানবকুলকে জানাতে চান)। এক্ষেত্রে স্রষ্টাকে জানার জন্য তার সৃষ্টি জগতে তার আয়াত (চিহ্ন)-র মাধ্যমে মানুষের প্রয়াসকে স্বীকার করেছেন এবং সাথে সাথে স্রষ্টার আসমানি বাণীকেও। উল্লেখ্য, ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গির একটি রহস্যময় বা নিগূঢ় (mystic) দিক রয়েছে:

> ইতিহাসে দেখা যায়, দিব্যজ্ঞানের উৎস হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতারই ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সবার আগে ব্যবহার হয়েছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার। এম্পিরিক্যাল মনোভাবকে কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি অপরিহার্য স্তর হিসেবে স্বীকার করেছে এবং পরমসত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞানের পথ হিসেবে মানুষের সব রকম অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ, পরম সত্তা কেবল ভেতরের প্রতীকে নয়, বাইরের প্রতীকেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে।[৭১২]

যদিও এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি মূলত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়ে থাকে, ইকবাল সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা এবং অবদানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি বা ধারা মুসলিমদের কাছে অজানা বা অপরিচিত ছিল না; বরং এটির বিকাশে তারা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

> ইবনে হাজম তার "ন্যায়শাস্ত্রের সীমা' নামক গ্রন্থে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর জোর দিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়া তার "ন্যায়দর্শনের প্রতিবাদ" নামীয় গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য বিচারের (argument) একমাত্র পন্থা হচ্ছে আরোহমান বিচার (induction)। এভাবেই নিরীক্ষা আর পরীক্ষার পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। এ কেবল সিদ্ধান্তমূলক বা তাত্ত্বিক (theoretical) ব্যাপার ছিল না। মনস্তত্ত্বে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলবেরুনীর আবিষ্কার, যাকে আমরা বলি প্রতিক্রিয়া সময় (reaction time) এবং আল-কিন্দি-র এই আবিষ্কার ইন্দ্রিয় সংবেদনা (sensation) প্রণোদক

---

৭১২ Iqbal, p.15. আরো দেখুন আল-কুরআন (আল-ফুসসিলাত) ৪১:৩৫; (যারিয়াত) ৫১:২০-২১।

উপাদানের (stimulus) সমপরিমাণ।[৭১৩]

তার সময়োচিত এবং মৌলিক একটি গ্রন্থ The Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought-এ ড. আবদুলহামিদ আবুসুলায়মান এই এম্পিরিক্যাল ভিত্তির অভাবের কারণে বিবিধ সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেন:

> উসূলের সূচনালগ্ন হতেই আমরা দেখতে পাই, মুসলিম জুরীবৃন্দ কুরআন এবং হাদিসকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ মৌলিক উৎসের ওপর ভিত্তি করেই তারা নীতি প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ করেছেন। শরিয়াহ মোতাবেক সামাজিক পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে গিয়ে তাঁরা কুরআন এবং হাদিসকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসম্পর্ক বিষয়াদির সমাধানের জন্য এগুলোর ওপরই তারা নির্ভর করেছেন। এই প্রক্রিয়াকে তারা নাম দিয়েছেন উসুল ইসতিনবাতুল ফিকহ (আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য নীতি)। মেডিসিন, গণিত এবং ভূগোলের ন্যায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে অবশ্য মুসলিমগণ টেক্সট এবং যুক্তি উভয়ের ওপরই নির্ভর করেছেন। তারা বাস্তববাদী এবং পরীক্ষা-নির্ভর দুটোই ছিলেন। প্রয়োগও করেছেন আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজ মনোবিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞান বলতে মূলত কিছু ছিল না। কারণ এসব বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, মানুষ নিজের এবং বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষণা করার মতো সুশৃংখল প্রক্রিয়া ছিল না। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন ৮ম হিজরির পণ্ডিত ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি:), তিনিই আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃত যাত্রার সূচনা করেন।
>
> মুসলিমদের এই অসম ক্ল্যাসিক্যাল বিকাশের দু'টি প্রধান কারণ প্রণিধানযোগ্য। এর প্রথমটি ছিল– পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে– নবি করিম (স.) প্রবর্তিত এবং ধর্মীয় গ্রন্থাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ বিদ্যমান সামাজিক পদ্ধতি নিয়ে সাধারণ সন্তুষ্টি। দ্বিতীয় কারণটি মুতাজিলা

---

৭১৩ Iqbal, p. 129.

আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে নিহিত বলে মনে হয়। আন্দোলনটির লক্ষ্য ছিল যুক্তিবাদ এবং ওহির বিষয়াবলিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। কিন্তু তারা ইসলামে যৌক্তিক দর্শন বিকশিত করার জন্য একটি স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি।

নবম এবং দশম শতাব্দীতে গ্রিক দর্শন এবং যুক্তিবাদ ও ওহির মধ্যস্থিত সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী উদার অবস্থানের বিরুদ্ধে সাধারণ একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বিরাজমান ছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে মুতাজিলাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে। এর সাথে মৃত্যু ঘটে ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার। ইমাম গাজ্জালী (৪৫০-৫০৫ হি:) রচিত তাহাফুতুল ফালাসিফা (দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডন) নামক গ্রন্থ ৫ম হিজরিতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের একটি সীমানা স্তম্ভ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে গোঁড়া সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয়েছে পুঁথিগত বিদ্যার ওপর। আইন এবং সামাজিক গঠন প্রকৃতিসংক্রান্ত পদ্ধতিগত জ্ঞান বিকাশের জন্য তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেখানে মানবিক উপলব্ধির (শাহাদাহ) কথা বলা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে বিধৃত এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সহজেই ঐ সমস্ত লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে যারা সমাজের প্রধান স্রোতধারা থেকে বাস্তবক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন করেছেন। এ গোষ্ঠী সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথেও কোনো প্রকার সংযোগ রক্ষা করেনি। এ শ্রেণির মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা ছিলেন স্বভাবগতভাবেই সাহিত্যিক অথবা ছিলেন স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার ব্যাপারে আগ্রহী। এর অনিবার্য পরিণতি এ দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিম সামাজিক গবেষণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সঠিক অবদান থেকে করেছে বঞ্চিত। এমনকি সুসংগঠিত সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো ধারণাও বিকশিত হতে পারেনি। এই সমস্ত কারণে 'সিয়ার' নিছক একটি গৎবাঁধা গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবেই চলে এসেছে। এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইসলামীক গতিশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষানির্ভর

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে রুপ লাভ করতে পারেনি।

এটা সত্যি নয় যে, ইসলামী গ্রন্থাবলির পর্যালোচনাকালে জুরীগণ কেবল আসমানি নির্দেশনার দ্বারাই পরিচালিত হন। এ প্রক্রিয়ায় তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং উপলব্ধিকেও কাজে লাগাতে হয়। একেবারে নিরপেক্ষ মন নিয়ে কেউই ঐরূপ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। আরোহ এবং অবরোহ উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের অভাবে মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ, আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রভাব বলয়ের আওতায় থেকেই প্রধানত মুসলমানগণ তড়িঘড়ি করে নতুন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাদের গ্রন্থাবলির পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। তবুও আইন, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু, সমন্বিত এবং পদ্ধতিগত গবেষণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। বর্তমানে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় এ লক্ষ্যে আজও মৌলিকত্বের অভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ শিক্ষাব্যবস্থা আজও এক প্রতিকূল শিক্ষা ব্যবস্থারই নিছক করুণ অনুকরণ।[৭১৪]

মুসলিম সামাজিক চিন্তনের জন্য ইসলামী দেশগুলোর প্রয়োজন একটি নতুন কাঠামো, এরুপ কাঠামো যেটি প্রতিষ্ঠিত হবে মানবজীবনের সামাজিক দিকের সুশৃংখল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক ধারার ওপর। তারপরই সম্ভব একটি কর্মোপযোগী আধুনিক দার্শনিক এবং নৈতিক ইসলামী মূল্যবোধের পদ্ধতি অর্জন। এ প্রয়োজন পূরণ করার সাথে অবরোহ এবং আরোহ পদ্ধতিগুলো অবশ্যই মুসলিম সামাজিক গবেষণায় প্রয়োগ করতে হবে কঠোরভাবে। হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে (একাদশ খ্রি:) ইজতিহাদের ধারা থামিয়ে দেওয়া হয়। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ তথ্যসূত্র ছিল একই এবং আরোহ পদ্ধতিও ছিল অনুরূপ। তাছাড়া কোনো নতুন এবং চলমান বৈজ্ঞানিক গবেষণারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি আইনবিজ্ঞান এবং সামাজিক

৭১৪ AbuSulayman, 1987, pp. 76-78

> বিজ্ঞানের অধ্যয়নে (studies)। ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগে ব্যত্যয় ঘটলে সকল উদ্দেশ্যের জন্য পরিচালিত ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে এবং মুসলিম চিন্তন প্রক্রিয়ায়ও গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হবে।[৭১৫]

এম্পিরিক্যাল কাজের ব্যাপারে, বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানে, মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে।

> জ্ঞানচর্চার জগতে যে দিকটাতে মুসলিমরা গভীরভাবে উপেক্ষা করেছে তা হলো সামাজিক বিজ্ঞানগুলো। একমাত্র জ্ঞানের ইসলামীকরণ (Islamization of Knowledge) প্রকল্প এবং American Journal of Islamic Social Sciences ছাড়া, যে দুটোরই শুরু যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০-র দশকে, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি আত্মস্থ করার ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে লক্ষণীয় কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। জ্ঞানের ইসলামী ক্ষেত্রগুলো মূলত মান-নির্ণায়ক (normative) পারাডাইমের প্রতিফলক, আর সে তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মূলত এম্পিরিক্যাল দিকে জোর দেয়। সামাজিক বিজ্ঞানের আগ্রহ, এই দুনিয়া এবং বাস্তবতা কেমন হওয়া উচিতের পরিবর্তে, এই দুনিয়া বা বাস্তবতা কী এবং কেমন করে হয় তা বোঝা এবং নিরূপণের জন্য। এর কোন্‌টা তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সে আলোচনায় না গিয়ে, আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রাক-আধুনিক (মধ্যযুগীয়) ইসলামী ক্ষেত্র আমাদের হাজার বছর আগে কেমন হওয়া উচিত ছিল তার চিত্র তুলে ধরে, কিন্তু তা সেই দুনিয়াটা এবং তার বাস্তবতা কেন এমন ছিল তা বুঝতে আমাদের ওলামা-ফুকাহাদের প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ এবং হাতিয়ার দেয় না। তাই দুনিয়াটা কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে ওলামাদের জ্ঞানচর্চা হয়ে পড়েছে অনেকটাই অর্থহীন আর অকার্যকর, কারণ সমসাময়িক বাস্তবতার ভিত্তির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়।

---

৭১৫ AbuSulayman, 1987, p. 81.

> সহজভাবে বলতে গেলে, তুমি যদি না বোঝ তুমি কোথায় আছ, তুমি কোথায় যাবে তা জানা থাকলেও, তোমার আসলে কোথাও যাওয়া হবে না।[৭১৬]

উল্লেখযোগ্য যে, এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক হাতিয়ার হলেও তার অপব্যবহার হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে অতিরঞ্জিত কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত থাকতে পারে অথবা দাবিও করা হতে পারে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিজাবেথ কে. ডলার্ড আইন অধ্যাপক ড্যান কাহান এম্পিরিসিজম-এর আন-এম্পিরিক্যাল দাবি প্রসঙ্গে লেখেন:

> এম্পিরিক্যাল সামাজিক বিজ্ঞানের অপেক্ষিত (anticipated) রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করতে গেলে, যারা এসব কাজের গুণগান গান তাঁরা প্রায়শই এম্পিরিসিজমকে বাতাসে ছুড়ে মারেন। যেমন, বিবেচনা করা যেতে পারে জন ম্যাকগিনিস-এর সাম্প্রতিক ইন্টারেস্টিং প্রবন্ধ "এম্পিরিক্যালের কাল" যা প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে পলিসি রিভিউ-তে, যেটা সম্পর্কে আমি জানতে পারি অত্যন্ত উপকারি এম্পিরিক্যাল লিগ্যাল স্টাডিজ ব্লগের মাধ্যমে। ম্যাকগিনিস লেখেন: "অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে ঐকমত্য (consensus) প্রতিষ্ঠার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমরা সামাজিক বিজ্ঞানের এম্পিরিসিজম-এর স্বর্ণযুগের উত্তুঙ্গে রয়েছি যা পাবলিক পলিসিতে বৃহত্তর ঐক্যে প্রভাব রাখতে সহায়ক হবে।' এই দাবি সামাজিক মনোবিজ্ঞানে বিস্তর গবেষণা সম্ভারকে উপেক্ষা করে, যেখানে দেখা যায় যে সামাজিক বিজ্ঞানের ডাটা মূল্যায়নে একজন ব্যক্তি বিতর্কিত পলিসি-সংক্রান্ত বিষয়ে সচরাচর তাদের নৈতিক ধারণার ভিত্তিতে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস দিয়ে তাড়িত হয় (যেমন) সুষ্ঠু এম্পিরিক্যাল তথ্যও, তার নিজস্ব ভিত্তিতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা (global warming), বন্দুক নিয়ন্ত্রণ, মৃত্যুদণ্ড, ড্রাগ বণ্টন ইত্যাদির ফলাফলের ব্যাপারে বাস্তবতথ্যমূলক (factual) ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, এম্পিরিক্যাল সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো উপযোগিতা নেই অথবা তার ভিত্তিতে ঐকমত্য

৭১৬ Khan, M., 2003.

প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই সম্ভব নয়।[৭১৭]

ইসলামী আইনশাস্ত্রের সম্পূরক হিসেবে অভিজ্ঞতামুখী (এম্পিরিক্যাল) পদ্ধতিও ব্যবহার করা উচিত সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। একই সাথে, এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করা মানে এম্পিরিসিজম মতবাদের ফাঁদে পড়লে চলবে না, যেখানে এম্পিরিসিজমে ধরে নেয়া হয় সব জ্ঞানের উৎসই ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা (sense experience)-এর ভিত্তিতে।[৭১৮] যেহেতু মতবাদ হিসেবে এম্পিরিসিজম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এম্পিরিক্যাল পদ্ধতির ব্যবহার বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার সাথে যোগ থাকতে হবে এবং একইসাথে স্বীকৃত ইসলামী উৎসের সম্পূরক ভূমিকা পালন করবে।

গ. সুন্নাতুল্লাহ-কে অনুধাবন এবং আরোহী/এম্পিরিক্যাল গবেষণার গুরুত্ব

এম্পিরিক্যাল পদ্ধতির উপযোগিতা উপলব্ধির ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে একটি অন্তরায় হচ্ছে এম্পিরিসিজম সম্পর্কে পশ্চিমা ধারণা (ইন্দ্রিয় অথবা বস্তুগত পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ওপর একপেশে নির্ভরতা)। রক্ষণশীল ইসলামী সংস্থাপনা (establishment)-এর এক ধরনের সন্দেহ রয়েছে যে যদি এম্পিরিসজম আসমানি বার্তা এবং তার ভিত্তিতে আইনকানুনের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করে? যেমন, হদ্দ শাস্তির ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিষয়টি আলাদা বিবেচনার নয়, কারণ কিছু কিছু অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত আছে। একই সাথে কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন যে অপরাধ করেনি সেজন্য শাস্তি না পায় এটার ওপরও ইসলাম মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেয়। এখানে বুঝতে হবে যে হদ্দ সংক্রান্ত বিচার এবং রায় নির্ধারণ কোনো আসমানি প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি মানবিক প্রক্রিয়া। কিছু কিছু দেশের অভিজ্ঞতায়, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও আছে, দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দণ্ডাজ্ঞাই ছিল ভুল, যেখানে আসলে নিরপরাধ হলেও তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের রায়ও হয়েছে। DNA-এ ভিত্তিক বিশ্লেষণের উদ্ভাবনে এবং forensic বিজ্ঞানের প্রয়োগে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি যারা দীর্ঘদিন রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়ার অপেক্ষারত ছিল, এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর মুক্তি পেয়েছে। এসব ঘটনা আমাদের এম্পিরিক্যাল

৭১৭ Kahan, 2006.

৭১৮ The Skeptic's Dictionary, http://skepdic.com/empiricism.html.

পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে, কারণ মানবিক পর্যায়ে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার যাতে করে কোনো নিরপরাধ মানুষ সাজাপ্রাপ্ত না হয়। তাই ইসলামী আইন কীভাবে কার্যকর করা হয় তার এম্পিরিক্যাল গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। পাকিস্তানে হুদুদ আইন প্রয়োগে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমাদের সতর্ক করে যে, বিস্তারিত পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান, যা প্রমাদপ্রবণ (fallible) মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রণীত হয়, তা অসতর্ক প্রয়োগের কারণে সুবিচার সংক্রান্ত ইসলামের কিছু মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন সমস্যার প্রকৃতি এবং ব্যাপকতাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করা, যার জন্য প্রয়োজন আরোহী গবেষণা এবং নিরীক্ষণ। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের শুধু সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সম্পর্কে সুষ্ঠু বোধ থাকলেই হবে না, সেই সাথে প্রয়োজন সুন্নাতুল্লাহ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও উপলব্ধি: কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতি এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এমন কিছু নিয়ম কার্যকর রেখেছেন যা বদলায় না।[৭১৯]

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً

"আমার রাসুলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম ছিল এবং তুমি আমার নিয়ম (সুন্নাতিনা)-এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন পাবে না।"[৭২০]

সুন্নাতুল্লাহকে বুঝতে হলে ইসলাম নিয়ে নিছক টেক্সটমুখী ধারা বা পদ্ধতির সম্পূরক হিসেবে বাস্তব জীবনমুখী ধারাও যোগ হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি অপরিহার্য। যেমন, কয়েক শতাব্দী ধরে গবেষণার ভিত্তিতে অর্থনীতিতে পাওয়া যায় কিছু অর্থনৈতিক নীতি বা নিয়ম (Laws of economics)। আরোহী এবং অবরোহী উভয় পদ্ধতির সমন্বয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের সমান্তরালে সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক আইন (ন্যাচারাল ল') সন্ধান করতে গিয়েই তা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প (hypothesis) দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে এম্পিরিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে

---

৭১৯ Farooq, 1993.

৭২০ আল-কুরআন (আল-ইসরা') ১৭:৭৭।

হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মধ্যে যেগুলো সময়োত্তীর্ণ সেগুলোই স্বীকৃতি পেয়েছে আধুনিক অর্থশাস্ত্রে। এসব অর্থশাস্ত্রীয় নিয়ম মানব প্রকৃতির নিখুঁত এবং অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (predictor) নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। তারপরও, এগুলোর সীমাবদ্ধতা থাকলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও সমাধানে ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য, অনেক সমাধানেরই যেমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, এই অর্থশাস্ত্রীয় নিয়মাবলিও তার ব্যতিক্রম নয় এবং প্রচলিত অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা এবং তত্ত্বগত দিক থেকে মৌলিক ভ্রান্তি যা এই শাস্ত্রকে জীবন-বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা অর্থনীতিকে রীতিমতো আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[৭২১] ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে অর্থনীতিকে জনকল্যাণমুখী ধারায় গড়ে তুলতে মুসলিমদের অনেক অবদানের সুযোগ এবং প্রয়োজন রয়েছে, যার জন্য অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতিগুলোকে যথার্থভাবে অধ্যয়ন করা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর চাইতেও শ্রেয়তর সমাধান মানবতার সামনে মডেল হিসেবে পেশ করা।

একইভাবে, বিভিন্ন যে সমস্যা বা অবস্থার আমরা সম্মুখীন হই তা অনুধাবনের জন্য সুন্নাতুল্লাহ মুসলিমদের আরো ভালো নির্দেশনা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আইনসর্বস্বতা এবং আক্ষরিকভাবে যারা সাধারণভাবে সবকিছু বিবেচনা করেন তারা রিবা-সুদ সমীকরণে (অর্থাৎ, রিবা-সুদ বা এ দু'টি পুরোপুরি সমার্থক)-এ বিশ্বাস করে করেন।[৭২২] যেহেতু রিবা কুরআনে অকাট্যভাবে হারাম করা হয়েছে, ঐ সমীকরণে রিবার সমার্থক হিসেবে সুদও হারাম। তবে এই নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, সুদ শোষণমূলক এবং অন্যায়, যেমন মুনাফা নয়। অথচ আরো গভীরে গিয়ে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, সুদ আর রিবাকে পুরোপুরি সমার্থক বানানো এম্পিরিক্যাল দিক থেকে প্রশ্নের অবকাশ রাখে।

পাকিস্তানের ডাটাভিত্তিক নকভীর এম্পিরিক্যাল গবেষণা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যা বহুল প্রচারিত দাবি– ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় এবং সম্পদ বণ্টনে উন্নতির ব্যাপারে ভিন্ন মূল্যায়ন পেশ করে। তার গবেষণা সীমিত

---

৭২১ Skousen, Mark (1991). Economics on Trial: Lies, Myths and Realities (Homewood, IL: Irwin); Wheelan, Charles (2010). Naked Economics: Undressing the Dismal Science (New York, NY: Norton).

৭২২ Farooq, 2008.

পরিসরের এবং এর অনুসিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বা অকাট্য নয় এ ব্যাপারে সতর্ক করার পর তিনি আরো এম্পিরিক্যাল কাজের অপরিহার্যতার ওপর গুরুত্ব দেন।

> আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের মৌলিক ইসলামী দর্শনের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তার দিকে অগ্রসর হতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে পদক্ষেপ নেয়া, যদিও এ নিয়ে আমাদের পরিষ্কার করা দরকার যে, আমাদের উত্তর নিছক অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিই বিবেচনা করতে হবে। ...আমাদের গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, যখন বা যেমন প্রয়োজন (ad hoc) এমন ধারার পরিবর্তে আমাদের এমন 'বস্তুনিষ্ঠ' নীতিমালা নিরূপণ করা যা ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা (propositions) দিতে পারে। এই বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত বিকাশের জন্য মৌলিক প্রকল্প (hypothesis)গুলো নির্বস্তুক তত্ত্বীকরণ (abstract theorizing) এবং এম্পিরিক্যাল প্রতিপাদন (verification)-এর মধ্যে দ্বিমুখী সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া (two-way interaction) আবশ্যক হবে।[৭২৩]

তার স্বভাবজাত সতর্ক সুরে রিবা-সুদ সমীকরণ এবং মুনাফা-ক্ষতি ভাগাভাগি (profit-loss sharing)-র ধারণাকে ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের প্রবক্তাদের 'পরম সত্য' (absolute truth) হিসেবে দেখার প্রবণতার ব্যাপারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব দু'টি পরস্পরসংযুক্ত যৌক্তিক বিবৃতি (logical statements)-র মধ্যে অবস্থিত: (১) রিবা আধুনিক সময়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদসহ যাবতীয় সুদভিত্তিক লেনদেনের সমার্থক; (২) মুনাফাভিত্তিক ব্যাংকিং - আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, সর্বজনীনভাবে মুনাফা-ক্ষতির ভাগাভাগির নীতির ভিত্তিতে যেখানে ব্যাংক ডিপোজিট অথবা ব্যাংক থেকে অর্থায়ন গ্যারান্টিসহ নয়– এরকম ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এর চেয়ে উত্তম। যদিও অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাবিদ এই দুই দাবিকেই স্থান-কালের ঊর্ধ্বে পরম সত্য বলে গণ্য করেন, আসলে এ দু'টি দাবি এমন কিছু তাত্ত্বিক

৭২৩ Naqvi, 1981, p. 158.

এবং এম্পিরিক্যাল প্রশ্নাদির উদ্রেক করে যার কোনো সহজ উত্তর নেই।[৭২৪]

নকভী "তাত্ত্বিক এবং এম্পিরিক্যাল প্রশ্নাদি"র কথা উঠিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইসলামী অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্স অনেকটা একপেশেভাবে আদর্শিক দিকগুলোর ওপর জোর দেয়, মানুষের বাস্তব অর্থনৈতিক আচরণ অনুধাবনের জন্য প্রাসঙ্গিক পজিটিভ ভিত্তি গড়ার দিকে মনোযোগ না দিয়েই। খুব সহজেই আধুনিক অর্থশাস্ত্রের নির্মিত homo economicus-কে অগ্রাহ্য করা হয় একটি নতুন নির্মাণ homo islamicus-এর পক্ষে। তবে প্রথমটি মানুষের আচরণ অনুধাবনের লক্ষ্যে ইতিবাচক (positive) তত্ত্ব ও গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর দ্বিতীয়টি আদর্শবাদী (normative) premise-এর ভিত্তিতে। আমরা যেমনটি আদর্শ হিসেবে প্রত্যাশা করি সেটা নিছক অবরোহী পদ্ধতিতে নিরূপণ করার চেয়ে সুন্নাতুল্লাহের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক মানব আচরণ, যেমনটি কুরআনের মাধ্যমে এবং বাস্তব দুনিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সেগুলো আরো ভালো করে বোঝার জন্য তাত্ত্বিক এবং এম্পিরিক্যাল গবেষণাও অত্যাবশ্যক।[৭২৫]

সৌভাগ্যবশত, যদিও মুসলিমরা নিজেরাই দীর্ঘদিন ধরে ভুলে গেছে, এই তাত্ত্বিক এবং এম্পিরিক্যাল ধারা ইসলামের ইতিহাসে নতুন নয়। অন্তত আংশিকভাবে হলেও, মুসলিমরা এই ধারার পথিকৃৎ; এ কারণেই এবং এ প্রেক্ষাপটেই আধুনিক পাশ্চাত্যে সমাজবিজ্ঞান (sociology) এবং ইতিহাসবিজ্ঞান (science of history)-এর পিতা হিসেবে স্বীকৃত ইবনে খালদুন। দুঃখজনক যে, মুসলিমরা ধীরে ধীরে ধর্মশাস্ত্র আর আইনের দিকে একচেটিয়াভাবে ঝুঁকে পড়ে, আর ইবনে খালদুনের ঐতিহ্যকে অনেকটা বিসর্জন দেয়। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির বিবেচনায়:

> 'সর্বজনীন ইতিহাস'-এর উপক্রমণিকা (মুকাদ্দিমা)-তে সে (ইবনে খালদুন) অভূতপূর্ব এক ইতিহাস দর্শনের সূচনা করেছেন যা নিঃসন্দেহে এ ধরনের কাজের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য, যা কোথাও কখনো কোনো সৃজনশীল মন করেনি। ...বেদুঈনরা মরক্কো অঞ্চলে যে ধ্বংস আনে তা নিয়ে তার মধ্যে আশংকা জাগে সেখান থেকে তার যে

৭২৪ Naqvi, 2000.

৭২৫ Farooq, 2006f; Kuran, 2004; Mossaad, 2005.

ধারণার শুরু তা সেখানেই বন্ধ হয়ে থাকেনি। তার ধারণার কাঠামোতে তিনি বেদুঈন এবং নগর জীবনযাত্রার পার্থক্য সম্পর্কে ভাবেন এবং উভয়েরই বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন; তিনি ভাবেন গোত্রানুভূতি (আসাবিয়্যাহ) নিয়ে যার উৎস মরু জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মানসিকতা ও চেতনা; একদিকে এই গোত্রানুভূতি এবং সাম্রাজ্য নির্মাণের মধ্যে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্য নির্মাণ এবং ধর্মীয় প্রচারণার মধ্যে কার্যকরণের সম্পর্ক নিয়ে তিনি ভাবেন; এই বিশ্লেষণের কাঠামোকে পরিপূর্ণতা দিতে তিনি তা নতুন এক উতুঙ্গে নিয়ে যান বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, তার সূচনা এবং অবনতি, এমনকি সভ্যতার অবক্ষয় অনুধাবন করতে।[৭২৬]

ইবনে খালদুনের যে অবদান এবং ঐতিহ্য পজিটিভ ধারায় ঠিক এরকম প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন সুন্নাতুল্লাহকে বুঝতে হলে। তিনি নিজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কেমন করে তিনি ইসলাম থেকে এ প্রসঙ্গে পথ-নির্দেশনা পেয়েছেন সে ব্যাপারে।

পাঠক! আপনি যখন বর্তমান গ্রন্থের রাষ্ট্রশক্তি ও সাম্রাজ্য অধ্যায়ে আমাদের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এবং যথাযোগ্য বিবেচনার সাথে অনুধাবনের চেষ্টা করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে আমরা এই বাক্যগুলোর ব্যাখ্যাই সেখানে তুলে ধরেছি। এখানে যা সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই আমরা পরিপূর্ণ বিশদ বর্ণনা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করেছি। এরিস্টটলের শিক্ষা ও মোবেজানের উপদেশ ছাড়াই আল্লাহ্ আমাদের এটা দান করেছিলেন।[৭২৭]

আমরা এক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তার অশেষ জ্ঞানের দয়ায় আলোচ্য বিষয়ের সত্যতা উদ্ঘাটন করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যদি তার সমস্যাগুলো পূর্ণতা দান করে থাকতে পারি, যদি অন্যান্য শিল্পবিদ্যা থেকে তার পার্থক্যকে বিশদাকারে পরিস্ফুট করে থাকতে পারি, তাহলে তা আল্লাহ্র দান ও তার পথনির্দেশ। কিন্তু যদি তা না হয়ে আমার বিচ্যুতি ঘটে থাকে,

---

৭২৬ Toynbee, pp. 321-328.

৭২৭ Ibn Khaldun, p. 41. Mobedhan is a Zoroastrian source.

> যদি তার সমস্যাগুলো বর্ণনায় শৈথিল্য ও অন্যায্যতা কিছু এসে থাকে, তবে বিচক্ষণ সমালোচকের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন তা পরিশুদ্ধ করেন। অবশ্য তবুও প্রথম অভিযাত্রীর গৌরব আমারই থাকবে, কেননা আমিই এর পথিকৃৎ। বস্তুত "আল্লাহ্ তার আলোর দ্বারা যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করে থাকেন।" [আল-কুরআন ১৬:৬৮][৭২৮]

আরেকজন স্বনামধন্য ইসলামী স্কলার এবং ইবনে খালদুনের সমসাময়িক যিনি ইবনে খালদুনের কয়েক বছরের অগ্রজ ছিলেন, তিনি আল-শাতেবী। তিনিও সেই কতিপয় মনীষীদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি অবরোহী পদ্ধতিভিত্তিক সনাতন ইসলামী জ্ঞানচর্চার সাথে আরোহী পদ্ধতিকে সম্পূরক হিসেবে নেবার জন্য সুস্পষ্ট তাগিদ দিয়েছেন। তিনি তার জ্ঞানচর্চায়ও আরোহী পদ্ধতিকে মিশ্রিত করেন।

> আবু ইসহাক আল-শাতিবী তার গ্রন্থ আল-মুয়াফাকাত ফি উসূল আল-শরিয়া (শরিয়ার নীতিমালার সংশ্লেষণ)-এ শরিয়ার উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আল-শারীয়া)-র একটি দার্শনিক/তাত্ত্বিক কাঠামো পেশ করেন। তার আগে যেমন অবরোহী পদ্ধতি যা মূলত কিয়াসভিত্তিক ছিল, তার পরিবর্তে তিনি আরোহী পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কিছু নির্বাচিত আয়াত থেকে বিধিবিধান নিরূপণের চেয়ে তিনি কুরআনের আয়াতসমূহের আরোহী বিশ্লেষণ থেকে সর্বজনীন নীতিমালা আহরিত করার ওপর জোর দেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, শরিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মাস্‌লাহা বা মানুষের স্বার্থ বা কল্যাণের সংরক্ষণ, যা পাঁচটি বিষয়ের ভিত্তিতে অর্জিত হতে পারেঃ জীবন, যুক্তিবুদ্ধি, দীন, পরিবার-প্রজন্ম এবং সম্পত্তি।[৭২৯]

দুঃখজনক, ইসলামী জ্ঞানচর্চায় (discourse) পদ্ধতিগত হাতিয়ার হিসেবে এবং মাকাসিদ আল-শরিয়া অথবা শরিয়া দর্শনের প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের অংশ হিসেবে আরোহী পদ্ধতির ব্যবহার বা সংমিশ্রণ সনাতন ইসলামী স্কলারদের মাঝে উপেক্ষিত রয়ে যায়। আল-শাতেবী এবং ইবনে খালদুনের

---

৭২৮ Ibn Khaldun, p. 42.

৭২৯ Masud, 2005, pp. 63-64. For more details of Shatibi's thoughts, see Masud, 1997; Al-Raysuni, 2005.

ঐতিহ্য যদি যথাযথভাবে বিকশিত এবং ধারণ করা হতো এবং তা সুন্নাতুল্লাহ অনুধাবনের প্রয়াসে আরো অগ্রসর হতো তাহলে মুসলিম সমাজেরই নয়, বরং মানবতার ইতিহাসও হয়তো ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হতো।

তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাব নিছক তাদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে মাথা গুঁজে অথবা শুধু অবরোহী পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে হয়নি। বরং আরোহী পদ্ধতিকে পূর্ণতর করে বিকশিত এবং ব্যবহার করে, শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক আইনের আলোকে বোঝার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। অবশ্য, ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ আসে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কাঠামোর টেক্সটমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে, যার ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই নয়, বরং ধর্মও সাধারণভাবে সেখানে প্রান্তিকায়িত (marginalized) হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতাটা কিছুটা ভিন্ন। ইবনে খালদুন এবং শাতেবীর আরোহী-এম্পিরিক্যাল ধারার উন্মেষ ঘটে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নয়, বরং ইসলামের মাকাসিদের অর্থ, তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের শ্রেয়তর প্রয়াস থেকে।

আসলে ইসলামী বিধিবিধান কায়েমে এম্পিরিক্যাল ধারার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কি? এ পর্যন্ত এই বইতে ইসলামী বিধিবিধানের তিনটি অপরিহার্য শর্ত চিহ্নিত করা হয়েছে: (১) যেকোনো বিধানের মূল উৎস হতে হবে ইসলামের মূল দু'টি উৎস: কুরআন এবং অবিসংবাদিত সুন্নাহ/হাদিস; (২) এসব বিধিবিধান আহরণে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে; (৩) সামাজিক পর্যায়ে বিধিবিধান গ্রহণ (adoption) এবং বিধিবদ্ধকরণ ও প্রয়োগ (enactment) কাঠামো প্রণীত হবে শূরার মাধ্যমে।

সেই সাথে এই অধ্যায়ের আলোচনার আলোকে এই শর্তগুলো সূক্ষ্মতর বিবেচনায় নিতে হবে নিম্নলিখিতভাবে: একটি আইন তখনই ইসলামী 'আইন' হিসেবে গণ্য হবে যখন তিনটি শর্ত পূরণ হবে: (১) ইসলামী আইন প্রণয়নের উৎস হতে হবে ইসলামের মূল (foundational) দু'টি সূত্র: কুরআন এবং অবিসংবাদিত সুন্নাহ/হাদিস, যার সম্পূরক থাকবে জীবনমুখী, এম্পিরিক্যাল অধ্যবসায় (due diligence); (২) এসব আইন প্রণীত হবে ইসলামের মাকাসিদ এবং মূল্যবোধের প্রতি সুনির্দিষ্ট মনোযোগ সহকারে; (৩) সমাজ

আইনের গ্রহণ এবং প্রয়োগ করবে শূরা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে।

ঘ. উপসংহার

ইসলামী আইনের সুষমতা এবং কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনতে যা কিছু দরকার তার অন্যতম হচ্ছে (১) এই অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতি এবং (২) সুষমতা, অর্থাৎ টেক্সটমুখিতা আর জীবনমুখিতার প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থ সমন্বয় সাধন, এই অর্থে। এই প্রেক্ষাপটেই ছয়টি উদ্যোগের প্রয়োজন।

১। অনেক সামাজিক সমস্যার মানবিক পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক সংবেদনশীলতা থাকা প্রয়োজন। যারা বিধিবিধান নির্ণয় এবং প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবেন– যেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত দিকের বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন– মানুষসংক্রান্ত বিষয়াদিতে তাদের মধ্যে সংবেদনশীলতা জাগানোর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সমস্যাকে ভালোভাবে এবং নিয়মানুগভাবে (systematically) অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করতে হবে।

২। ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে (curriculum)-এর অংশ থাকবে জীবনমুখী অভিজ্ঞতানির্ভর গবেষণা যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের যেসমস্ত বিষয়াদিতে তারা ধর্মের নির্দেশনা নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন সেসব সমস্যার প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা অধ্যয়ন করতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতিতেই সমস্যা-সমাধানমুখী ধারা (problem-solving approach) এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে। গবেষণা এবং অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা গড়তে হবে। প্রত্যেক স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি অর্জনের শর্ত হিসেবে যেকোনো একটি সমাজসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন করা এবং তার রিপোর্ট পেশ করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন, মীরাস বা উত্তরাধিকার আইন প্রসঙ্গে নারীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে ডাটা সংগ্রহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার (interview) এবং সমীক্ষা (survey) পরিচালনার প্রকল্প নিতে পারে। অথবা একজন নারী যার তিন বা ততধিক সন্তান আছে এমন কারো দিন কেমন যায় তা এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করা (role shadowing) এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার রিপোর্ট শেয়ার করা।

৩। যেকোনো বিধিবিধান নিরূপণ এবং প্রণয়নের আগে (ex-ante),

আইনবিদ এবং স্কলাররা সমস্যা সম্পর্কে নিয়মানুগভাবে অনুধাবনের জন্য তারা নিজেরাই অথবা প্রয়োজনে দক্ষ গবেষকদের সহায়তা নেবেন।

৪। যেহেতু মানুষ মাত্রই প্রমাদপ্রবণ (fallible), সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহতে যেসব বিষয় সুনির্দিষ্ট এবং অকাট্যভাবে আছে সেগুলো ব্যতিরেকে বাকি সব আইন এবং বিধিবিধান প্রথমে নিছক প্রাথমিক বা সম্ভাব্য (tentative) হিসেবে গণ্য করা উচিত, কারণ মানুষের জ্ঞান মূলত সম্ভাব্য (probabilistic)।

৫। একটি আইন বা বিধান নিরূপণ এবং প্রণয়নের পর (ex-post) তার প্রভাব বা ফলাফল অধ্যয়নের প্রক্রিয়া থাকতে হবে, যার মাধ্যমে জানা যাবে যে, কোনো সংশোধন, পরিমার্জনার প্রয়োজন আছে কি না।

৬। যেমনটি হযরত আয়েশার (রা.)-এর জীবন থেকে আমরা জানতে পারি, জ্ঞানচর্চা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের সব পর্যায়ে, এমনকি ইজতিহাদের পর্যায়েও, নারীদের অংশগ্রহণ থাকা এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সুযোগ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ।[৭৩০]

ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে ফিতরা বা আল্লাহপ্রদত্ত মানবপ্রকৃতি। "মানুষমাত্রেরই জন্ম ফিতরার ওপর"।[৭৩১] তাই মানবজীবনের জন্য সমাধান খুঁজতে এবং পথ নির্দেশনা দিতে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক এবং শ্রেয়তর ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রকৃতি সম্পর্কে জানার প্রয়াস নিছক অবরোহী হতে পারে না আর আমাদের জানা-বোঝার সীমিত কিছু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ হতে পারে না। সম্পূরক হিসেবে আরোহী পদ্ধতির সমন্বয়ে জীবনধর্মী গবেষণা এবং অভিজ্ঞতানির্ভর কাজ অপরিহার্য। যেকোনো যুগের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইসলামী পথনির্দেশনা যাতে কার্যকর এবং গতিশীল হতে পারে সেজন্য এই ধারা গুরুত্বপূর্ণ। আর তা ইসলামের মাকাসিদ (মাকাসিদ আল-ইসলাম: উচ্চতর লক্ষ্য) এবং প্রণীত আইনসম্ভার যার অনেক কিছুই অকার্যকর অথবা স্পষ্ট মাকাসিদের সাথে সাংঘর্ষিক তার মধ্যে ব্যবধান কমাতে বা দূর করতে সহায়ক হবে।

---

৭৩০ Farooq, 2003b.

৭৩১ Al-Bukhari, Vol. 2, Kitab al-janain, #441, https://sunnah.com/bukhari:1359.

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার: আমাদের সংস্কারের পথে

ভুল ধারণা এড়ানোর জন্য আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে যে সংস্কারের কথা আলোচিত হচ্ছে, তা আল্লাহ তায়ালা যে ইসলাম আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং যার মডেল নবিজি (স.) দেখিয়ে গেছেন, সে ইসলামের নয়, বরং এটা আমাদের সংস্কার, আমাদের জানা-বোঝা এবং চর্চার সংস্কার।

দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম বিশ্বের মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অস্থিতিশীলতায় ভুগছে, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক কারণে। দোষ যারই হোক, যেমন সুদানে, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর তেল নিয়ে খেলায় দারফুর-এর মানুষ গণহত্যার সম্মুখীন ছিল (পরবর্তীকালে দেশটি খণ্ডিত হয়)। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে বৈরী শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ অথবা দখলদারিত্ব চলছেই। যদিও অনুন্নত বিশ্বেও আছে, কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে নিরক্ষরতা, শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্য অনেক ব্যাপক। পাকিস্তানে পুরো দেশটাই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত। দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে যৌতুকসংক্রান্ত বিবাদে, সহিংসতা অনেক ব্যাপক। অনেক জায়গায় নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়, যার না আছে যথাযথ সুবিচার আর না আছে এগুলো প্রতিরোধের পর্যাপ্ত উদ্যোগ। নারীদের 'সম্মান-খুন' (honor killing), যদিও মুসলিমদের মধ্যেই সীমিত নয়, মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় চলে আসছে, যা ঘটে থাকে ভুল ধারণার ভিত্তিতে যে পুরুষ, অভিভাবক বা পরিবারের অধিকার আছে এই ধরনের শাস্তি নিজেদের হাতে নেয়ার। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র সৌদি আরবে যেখানে দু'টি পবিত্রতম স্থাপনা অবস্থিত, তার একটি মক্কা প্রকৃতপক্ষে একক এক নারীর ত্যাগ এবং সাধনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,[৭৩২] অথচ জনগণের অর্ধেক অংশ, নারীরা

---

৭৩২ Farooq, 2004a.

(দৃষ্টান্তস্বরূপ) ইসলামের অজুহাতে গাড়ি চালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে এ ব্যাপারে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে, কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, এতদিন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত কেন ছিল।

এমনকি অপেক্ষাকৃত 'প্রগতিশীল' মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মালয়েশিয়াতে একজন মুসলিম স্বামী মোবাইল ফোনে sms-এর মাধ্যমে বৈধভাবে একসাথে তিন তালাক দিতে পারে[৭৩৩] এবং একজন নারী যে ইসলাম থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার নাম বদলাতে পারে না কারণ সনাতন ইসলামী বিধিবিধানে ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিকতার (reciprocity) অবকাশ নেই।[৭৩৪] যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও এমন মসজিদ আছে যেখানে মসজিদে নারীরা স্বাগত নয় অথবা পুরুষ-শাসিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের অবকাশ নেই। আরো গভীরভাবে দেখলে, ইরাক, একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি এবং সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে আগ্রাসনের শিকার হয়ে বৈদেশিক শক্তির হাতে দখল হলো, অথচ মুসলিম বিশ্ব হয় ক্রীড়নকের ভূমিকায় ছিল অথবা একেবারে অথর্ব হিসেবে শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই যেন করতে পারল না। এখনো পর্যন্ত নব্য-ঔপনিবেশিক শক্তির অবস্থান রয়েছে সেখানে।

একদিকে এ ধরনের অনেক ব্যাপারেই আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে সংযোগ আছে। কিন্তু, এটাও সত্য যে মুসলিম মন এবং প্রচলিত সংস্কৃতি বর্তমান অকার্যকর এবং স্থবির অবস্থার মধ্যে বাধা পড়ে আছে এবং সেজন্যই মুসলিমরা সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করতে কার্যকর হচ্ছে না, যার পেছনে মৌলিকভাবে কাজ করছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ধর্মীয় ধারণা ও বোধ, যা তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনেক মুসলিম পুরুষ মনে করেন যে, নারীদের অংশগ্রহণ বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে না। হয়তো তারা সরল মনেই

৭৩৩ CNN, "Fury over 'rude' SMS divorces," July 29, 2003, Retrieved on September 28, 2007 from CNN website, http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/southeast/07/29/malaysia.divorce/.

৭৩৪ Asia Sentinel, "Once a Muslim, Always a Muslim in Malaysia," May 30, 2007, Retrieved October 21, 2007 from Asia Sentinel website, https://www.asiasentinel.com/p/once-a-muslim-always-a-muslim-in-malaysia.

এরকম ভাবেন, আর তাই গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-র উক্তি ব্যবহার করেন যেখানে নবিজি (সা.) বলেছেন যে, নারীরা মসজিদে কী করে তা জানলে তিনি তাদের মসজিদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতেন না।[৭৩৫] যেমনটি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যদিও এটি হাদিস নয়, বরং এটি একটি আছার (সাহাবির নিজস্ব ভাষ্য বা মত, এবং এই মন্তব্যের পেছনে একেবারেই কোনো প্রমাণ নেই), তবু প্রায় একচ্ছত্রভাবে পুরুষ ফকীহদের দ্বারা বিকশিত ফিকহ সাধারণ মুসলিমদের মনে এমন অনপনেয় প্রভাব ফেলেছে যেন নারীদের মসজিদ থেকে দূরে রাখা অথবা তাদের নিরুৎসাহিত করাই স্বর্গীয় দায়িত্বের মতো।

এমনিভাবে তাদের মধ্য থেকে কেউ অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে অথবা ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হলে অনেক মুসলিম অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কারণ ইসলামী আইনের সনাতন ধারায় তারা শুধু শাস্তি পাওয়ার যোগ্যই নয়, বরং মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য। দুঃখজনক যে, প্রথিতযশা এবং প্রভাবশালী ইসলামী ব্যক্তিরা যাদের মধ্যে মওদুদী এবং কারাদাভীও[৭৩৬] রয়েছেন তাদের এই কঠিন অবস্থান সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। এটা এ কারণে যে, তাদের ধারণা যে ইসলামে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নির্ধারিত, অন্তত কোনো না কোনো রকমের শাস্তি তো হতেই হবে যে ব্যাপারে ইজমা রয়েছে বলে দাবি করা হয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে,

---

৭৩৫ Al-Bukhari, Vol. 1, Kitab al-adhan, #828, https://sunnah.com/bukhari:869.

৭৩৬ Al-Qaradawi (2006).শায়খ আল-কারাদাভীর অবস্থান কিছুটা হলেও ভিন্নতর। অতীতের বেশ কিছু ফুকাহার অবস্থানের আলোকে তিনি ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)-কে বড় এবং ছোট দুই ভাগে দেখেন। তিনি হদ্দের শাস্তি শুধু বড় ইরতিদাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন, যারা ইসলাম ত্যাগ করলে তা চুপিসারে করে এবং সারা জীবন চুপচাপ থাকে ও ইসলামের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে মুখ না খোলে। এতে ইসলাম পরিত্যাগের অনুমোদন আছে, কিন্তু পরিত্যাগ করে তাদের কোনো বাকস্বাধীনতা থাকবে না এটা কি সুবিচারপূর্ণ? এটা তো এরকম দাবি করা যে, কেউ চাইলে অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসতে পারবে, কিন্তু এরকম ধর্মান্তরিত মুসলিম কখনো যে ধর্ম ছেড়ে এসেছে তার ব্যাপারে নেতিবাচকভাবে কখনো মুখ খুলবে না। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি তাদের ধর্ম ত্যাগকারীদের ব্যাপারে এমন দাবি করে, তা কি মুসলিমরা মেনে নেবে? উল্লেখ্য যে, বড় অথবা ছোট ইরতিদাদ, আল-কারাদাভীর মত অনুযায়ী দুটোর ক্ষেত্রেই শাস্তি আছে, তবে ছোট ইরতিদাদের ক্ষেত্রে তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়ার পর মেনে না নিলে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

নিছক ধর্মান্তরিত হওয়া যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় তাহলে আমাদের পরিষ্কার করা উচিত যে, ইসলাম আসলে নিজেদের ইচ্ছেমতো ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার মৌলিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় এবং জোরজবরদস্তি করে হলেও মুরতাদকে ইসলামের ছায়াতলে রাখতে হবে। বস্তুত এটা পারস্পরিকতার (reciprocity) ভিত্তিতে যে সুবিচার তার সুস্পষ্ট পরিপন্থি। মুসলিমরা সারা দুনিয়ার মানুষকে তাদের ধর্ম ছেড়ে আসার দাওয়াত দেবার অধিকার রাখে এবং তাদের ছেড়ে আসা ধর্মানুসারীদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা অথবা প্রতিহিংসার বিরোধী, কিন্তু যদি কেউ ইসলাম ছেড়ে যেতে চায় তার কোনো অধিকার এই দুনিয়াতে নেই। অর্থাৎ ইসলাম মানুষ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ছাড়ার উপায় নেই। ইসলাম যেন একটি একমুখী (one-way) রাস্তা। অথচ স্বয়ং স্রষ্টা মানুষকে তার বিশ্বাসের অধিকার দিয়েছেন এবং তা না নবিজি (স.) কেড়েছেন আর না কারো অধিকার আছে সেই মৌলিক অধিকার হরণ করার। যারা এরকম বিশ্বাস করেন, তারা যখন দাওয়াতি কাজ করেন এটা তাদের মৌলিক দায়িত্ব যে, কেউ ইসলামে ঢুকতে হলে স্বাগতম, কিন্তু এ থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই– এই সতর্কবাণী জানিয়ে দেওয়া যে, বের হতে চাইলে তাদের মাথাটা মুসলিমদের পায়ের কাছে ফেলে যেতে হবে। বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা আমরা নিজেরাই পেশ করছি, অথচ এবং ইসলামেরই আলোকে এ সমস্ত ধারণা এবং অবস্থান খণ্ডন এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

নারীদের প্রসঙ্গে প্রায়শই উচ্চস্বরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ইসলাম নারীদেরকে সুবিচার ও মর্যাদার চোখে দেখে এবং ইসলাম আসলেই দেখে - কিন্তু স্বয়ং মুসলিম নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম কি দিয়েছে তা ধার্মিক বুলি হিসেবে নয়, বরং তার বাস্তব রূপায়ণ দেখতে চায়। তারা যতটা শিক্ষিত হচ্ছে এবং ইসলাম সম্পর্কে নিজেরাই জানছে, ততই সামাজিক পরিসরে তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের যোগ্যতা বাড়ছে এবং তাদের দাবি বা প্রত্যাশা জোরদার হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীরা ইসলাম সম্পর্কে জেনেছে পুরুষ ওলামা-ফুকাহা যেমন করে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছে বা তুলে ধরেছে তেমনি করে। আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো মূলত পুরুষরাই পড়েছে এবং পুরুষ ওলামা, ফুকাহা এবং ইমামরাই এবং তাদের মাধ্যমেই আমাদের নারীরা ইসলাম জেনে এসেছে এবং কাজী, ফকীহ এবং অন্যরা যেসব পুরুষের সিদ্ধান্ত দেবার এবং

নেবার ক্ষমতা রাখেন তাদের হাতেই এসব বিধিবিধান প্রণীত এবং প্রয়োগকৃত হয়েছে। ক্রমাগতভাবেই, মুসলিম নারীরা তাদের এবং তাদের প্রাণপ্রিয় ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভাবধারার সাথে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে: নবিজির (স.) কিছু সময় পর থেকেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নারী হিসেবে তাদের সমাজে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে না হলেও অন্তত হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস সংরক্ষণে এবং প্রচার-প্রসারে পুরুষদের চেয়ে নারীদের অবদান কম ছিল না।[৭৩৭] কতই না দুঃখজনক যে, পরে হাদিসের নামে, হাদিসের দোহাই দিয়েই সমাজে নারীদের কার্যকরভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে।

মুসলিম নারীরা জানছে যে, নবিজি মোহাম্মদ (স.)-এর নবুয়তি মিশনের শুরু থেকেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পন্দনশীল (vibrant) ভূমিকা পালন করে এসেছে। তারা নবিজির (স.) অধীনে পুরুষ সাহাবিদের পাশে থেকেই সংগ্রাম করেছেন, এমনকি লড়েছেন মদিনাতে একটি ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তনের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে এবং মানবতার সেবার লক্ষ্যে তাঁরা ইসলামের স্বপ্ন এবং মূল্যবোধ বাস্তবায়নে অবদান রেখেছেন। আল-কুরআন কমিউনিটির এই অর্ধেক অংশীদারদের দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে পার্শ্ববর্তী হিসেবে নয়, বরং একেবারে পাশাপাশি, তাদের পুরুষ সহপথিক সাহাবিদের সমান্তরালে।

> فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
>
> অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই

৭৩৭ Farooq, 2003b.

> দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট।[৭৩৮]

তাদের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সাথে তারা কুরআন এবং নবিজির (স.) অবিসংবাদিত সুন্নাহ ও হাদিসের সাথে সরাসরি সেতুবন্ধন গড়ছে এবং তার মাধ্যমে তারা আবিষ্কার করছে যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সূত্রগুলোতে এমন কিছুই নেই যার কারণে তাদের এভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে এবং তাদের বৈষম্য আর অবমূল্যায়নের শিকার বানানো হয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে রয়েছে শরিয়া-অনুবর্তিতা (Shariah-compliance) এবং যেখানে যেখানে প্রযোজ্য শরিয়া-স্কলাররা তাদের অনুমোদনের সিল প্রদান করেন। তবে এখানে প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, এই সব ফাইন্যান্সিয়্যাল লেনদেনের প্রেক্ষাপটে শরিয়া-অনুবর্তিতার পরিবর্তে কেন ইসলাম-অনুবর্তিতা (Islam-compliance) পরিভাষা ব্যবহার করা হয় না।[৭৩৯] সমসাময়িক ফতোয়ার আলোকে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোতে বিনিয়োগ শরিয়া-অনুবর্তী হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে যে, তাদের সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে সুদি আয় যেন শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি না হয়। এ ধরনের প্রবণতাকেই এল-গামাল অভিহিত করেছেন "সারবস্তুর ওপর কাঠামোর" (form over substance) বিজয়।[৭৪০] অথচ যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে এই শরিয়া-বিশেষজ্ঞরাই হাদিস থেকে আমাদের শেখান "যা বড় পরিমাণে মাতাল করে, তা অল্প পরিমাণেও হারাম",[৭৪১] আর তার ভিত্তিতে এই অনুসিদ্ধান্ত পেশ করেন যে, সুদ শুধু উচ্চ বা শোষণমূলক হারেই হারাম নয়, বরং সামান্য হারেও হারাম।[৭৪২] যদি কোনো কিছু বড় পরিমাণে হারাম হলে ছোট পরিমাণেও হারাম, তাহলে এই শতকরা অনূর্ধ্ব ৩৩ ভাগের এই হালালায়ন (halalization) কোত্থেকে এলো? যাহোক, যখন ইসলামের মাকাসিদ থেকে বিচ্যুত থাকা অবস্থায়, জীবনের অর্থনৈতিক এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে, ইসলামী ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু মানবসমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

---

৭৩৮ আল-কুরআন (আলে-ইমরান) ৩:১৯৫।

৭৩৯ Farooq, 2022.

৭৪০ El Gamal, 2006, p. 2.

৭৪১ Sunan an-Nasai, Baab al-Ashriba, #5607.

৭৪২ Usmani, M. I. 2002, p. 12, 45.

(যেমন দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি) বিষয়ে বহুলাংশে প্রত্যাশিত ইতিবাচক ফলাফল ছাড়াই।

অনুরূপভাবে ইসলামের নামে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু অংশ প্রায় সবার বিরুদ্ধেই 'জিহাদ'-এ অবতীর্ণ হয়েছে। আসলেই মুসলিমদের শত্রু বা প্রতিপক্ষ কি না অথবা তাদের নিশানার মধ্যে পাশ্চাত্যের নির্দোষ সাধারণ মানুষেরা আছে কি না (যেমন সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সালে হয়েছিল), অথবা তারা নির্দোষ মুসলিমরাই কি না (যেমন ইরাক অথবা পাকিস্তানে) এগুলো বাছবিচার ব্যতিরেকেই। একথা সত্যি যে, মুসলিমদের অনেক গভীর ক্ষোভ এবং অভিযোগের তালিকা রয়েছে এবং তার অনেকগুলোর আশু সমাধান কাম্য, কিন্তু ইসলামের আলোকে কোনো অবকাশ নেই, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, নির্দোষ সাধারণ মানুষকে আক্রমণের লক্ষ্য বা শিকার বানানো। মুসলিমদের মধ্যে সামান্য কিছু চরমপন্থিদের দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং নৈরাজ্যবাদী সহিংসতায় সমস্যা ইতোমধ্যেই জটিল হয়ে উঠেছে। দুঃখজনক যে, সামগ্রিকভাবে পরিচিত এবং দায়িত্বশীল স্কলার, যেমন আল-কারাদাভীর, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পছন্দমাফিক (selective) প্রবণতা চরমপন্থিদের চিন্তাভাবনার জন্য এক রকমের সমর্থন যোগাচ্ছে।[৭৪৩] যদিও বৃহত্তর পর্যায়ে মুসলিমরা এসব

---

৭৪৩ ৯/১১-র পর প্রশংসনীয়ভাবে আল-কারদাভী আক্রমণের নিন্দা জ্ঞাপন করেন: "শত শত নিরপরাধ বেসামরিক লোকজন যাদের সাথে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ার সাথে কোনো সংযোগ নেই এবং যারা নিছক তাদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনে লিপ্ত, আমেরিকায় এই ধ্বংসকরী ঘটনার শিকার হলো, (এটা) ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্য অপরাধ। ...আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাই কোনো মুসলিমের এরকম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে। নিরপরাধ এবং অসহায় মানুষকে ইসলাম কখনোই হত্যার অনুমতি দেয় না।" তবে তিনি যখন ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ছাড় দেন, সে ব্যাপারে বলেন: "আমাকে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে এবং পাবলিক বক্তৃতার সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে আত্মঘাতী আক্রমণের বিষয়ে, এবং সব সময়ই বলে এসেছি যে আমি তাদের সাথে একমত যারা এরকম আত্মঘাতী আক্রমণ ফিলিস্তিনী অঞ্চলের বাইরে করার অনুমতি দেন না।" Retrieved February 11, 2007 from Islam Online Website: https://www.beliefnet.com/faiths/islam/2002/08/sheikh-yusuf-al-qaradawi-condemns-attacks-against-civilians.aspx.

আল-কারাদাভী নারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, এমনকি তা যুদ্ধে হলেও, অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। "এমনকি যুদ্ধের সময়ও, একমাত্র আক্রমণকারী বা আগ্রাসি ছাড়া কাউকে হত্যা করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। তাদের জন্য বৈধ নয় নারী, বৃদ্ধ, শিশু অথবা সমাজবিরাগী সন্যাসীদের কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়।" [উপরোক্ত উৎস]। তবে তিনি ইসরাইলি নারীদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম করেছেন। বেসামরিক ইসরাইলিদের টার্গেট করে আত্মঘাতী বোমাবাজির পক্ষে শেখ কারদাভী বিবিসি অনুষ্ঠান নিউজনাইট-কে বলেন: ইসরাইলি নারীরা অন্য অনেক দেশের নারীদের মতো নয়, কারণ তাদের প্রত্যেকেই এক একজন সেনা।"

চরমপন্থী সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অপরাপর মুসলিম, যারা মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর মূল ধারার অংশ, তাদের সামনে আছে তাত্ত্বিক বা ধর্মশাস্ত্রীয় কাঠামো যা এসব সহিংসতাকে পরোক্ষভাবে হলেও এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা (credence) দেয়, যদিও তা মূল্যবোধমুখী চিন্তাভাবনার ধারা ও কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমসাময়িক সময়ের অনেক চরমপন্থি জঙ্গিবাদী তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দাবি করে মিসরের সাইয়েদ কুতুবকে। মিসরভিত্তিক কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের একজন তাত্ত্বিক গুরু হিসেবে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ '*মা'আলিমু ফি ত্বারিক* (মাইলস্টোন)' গভীর প্রভাব ফেলেছে।[৭৪৪] কুতুব যেভাবে ইসলামকে আক্রমণাত্মকভাবে পেশ করেছেন তার সমালোচকরা সে দিকটা তুলে ধরেন। যদিও কুতুবকে এভাবে মূল্যায়নটা বেশ কঠোর, তিনি নিজেই তার লেখনীগুলো কীভাবে অন্যদের, বিশেষ করে চরমপন্থিদের, প্রভাবিত করতে পারে তা হয়তো ভালোভাবে চিন্তা করেননি। এরকম চিন্তার অবকাশ এজন্য রয়েছে যে, তার অন্যান্য বই, যেমন "ইসলাম এবং সর্বজনীন শান্তি"তে মাইলস্টোনের মতো ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় না।[৭৪৫]

তা যাই হোক, মিসরের কট্টর জাতীয়তাবাদী নাসেরী সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলায়। তার ভাই, মুহম্মদ কুতুব, নিপীড়নের আশংকায় সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। মুহম্মদ কুতুব, তার গ্রন্থ "ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম" মধ্যমপন্থি মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। কিন্তু সৌদি আরবে আশ্রয় নেয়া বিষয়টি লক্ষণীয় কেননা দেশটি নবিজি (স.) এবং তার উত্তরসূরী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর সাথে পুরোপুরি

Magdi Abdelhadi, 'Controversial preacher with 'star status',' BBC News, July 7, 2004, Retrieved on February 12, 2007 from BBC News Web Site: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3874893.stm.

যদিও এই লেখক শেখ ইউসুফ আল-কারাদাভীকে অত্যন্ত সম্মানের সংগে দেখে এবং তাকে সমসাময়িক সময়ে ইসলামী বিবেক এবং আলোকিত ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের একজন হিসেবে গণ্য করে, তবু মুরতাদের শাস্তি এবং নিরপরাধ বেসামরিক ব্যক্তিদের নিশানা করে আক্রমণ করার ব্যাপারে ক্ষেত্রবিশেষে তার বাছাই করা (selective) অনুমতির ব্যাপারে এই লেখক সুস্পষ্টভাবে দ্বিমত পোষণ করে।

৭৪৪ Qutb, S. (2006). Milestones, Islamic Book Services, India.

৭৪৫ Qutb, S. (1993). Islam and Universal Peace, American Trust Publications, USA.

সাংঘর্ষিক এবং এমন একটি দেশ যেটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ফাঁদে পড়ে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশ মুহম্মদ কুতুবের ওপর অনিবার্যভাবেই প্রভাব ফেলেছে।

বস্তুত সহিংসতার ভাবধারা সৌদি আরবের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যেন আকিদার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার প্রমাণ মেলে মুহম্মদ কুতুবের তত্ত্বাবধানে করা থিসিসে।

> নমুনাস্বরূপ, আলী বিন নাফে আল-উলায়নি ১৯৮৪ সালে মক্কা আল-মুকাররামায় অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ কুতুবের তত্ত্বাবধানে জিহাদ প্রসঙ্গে ডক্টরেট থিসিস লেখেন। আল-উলায়নি জিহাদের সংজ্ঞা দেন: "আল্লাহর বাণীর প্রাধান্য অর্জনে এবং সেই লক্ষ্যে কাফিরদের হত্যা করা"। [জিহাদ] শব্দটির তাৎপর্যই হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাফিরদের হত্যা করা এবং এটাকে অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই যদি না তার পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকে।[৭৪৬]

এটা কি বিচ্ছিন্ন কোনো নমুনা আর তাই নিছক একটি স্খলন (aberration)? এটা বিচ্ছিন্ন নমুনা হলেই স্বস্তিকর হতো। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

> আল-উলায়নি একা নয়। সে সৌদি আরব, জর্ডান এবং উপসাগরীয় এলাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স এবং ডক্টরেট পর্যায়ের বেশ কয়েকটি থিসিসের সূত্র দেয় 'জিহাদ' সম্পর্কে একই ধরনের ধারণা/যুক্তি দিয়ে। উপরন্তু সে বেশ কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ সূত্রের উল্লেখ করেছে যেখানে জিহাদকে প্রতিরক্ষামূলক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাকে বিদ'য়াত স্বরূপ আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭৪৭]

এটা কি কোনো সমসাময়িক ব্যাধি? দুঃখজনক যে তাও নয়। ইতঃপূর্বে এই বইয়ে ইমাম শাফেয়ীর (র.) মত - মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব মুশরিকদের এলাকা বছরে অন্তত একবার আক্রমণ করা উচিত– উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৪৮]

---

৭৪৬ Masud, M. K. (2005b), p. 176, quoting al-Ulayni, Ahmmiyyat al-Jihad fi Nashr al-Da'wah al-Islamiyyah wa 'l-Radd 'ala al-Tawa'if al-Dallah fish (Riyadh: Dar Tayyibah li 'l-Nashr wa'l-Tawzi, 1985), 116-117.

৭৪৭ Masud, 2005b, p. 178.

৭৪৮ Chapter Five, n#649.

আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, তার বই আল-রিসালায় যেখানে তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কুরআন এবং হাদিসে যে ব্যাপকতর অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিপরীতে তিনি একপেশেভাবে জিহাদকে যুদ্ধ-বিগ্রহের অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও ইসলামের ব্যাপারে শাফেয়ী (র.) অথবা সে পর্যায়ের কেউই চূড়ান্ত প্রামাণ্য পণ্ডিত (authority) নন, কিন্তু তিনিই যেহেতু উসূলে ফিকহের পিতা হিসেবে গণ্য এবং চারটি সুন্নি মাযহাবের অন্যতম একটির প্রতিষ্ঠাতা, আইনশাস্ত্রের দিক থেকে তাঁর মতামতের ব্যাপক প্রভাব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এটা সত্য যে, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে কুরআনের সুনির্দিষ্ট পরিভাষা আছে, যেমন কিতাল বা হার্‌ব এবং হাদিসেও জিহাদ প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে যার প্রতিফলন আমরা নবিজির (স.) জীবনে দেখি, তবু জিহাদের ব্যাপকতর অর্থ থেকে ধীরে ধীরে আইনসর্বস্ব ধারায় জিহাদকে যুদ্ধ-বিগ্রহের সংকীর্ণ অর্থের দিকে ভ্রান্ত এবং অগ্রহণযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়তেই সমর্থন এবং প্রমাণের জন্য হাদিস শাস্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিপূর্ণভাবে হাদিসের অপপ্রয়োগ হয়েছে তা এই বইয়ের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো তুলে ধরা এই বইয়ের লক্ষ্য ছিল তার সারাংশ পেশ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, আসমানিত্ব (divinity), পবিত্রতা (sacredness) এবং অপরিবর্তনীয়তা (immutability), এরকম কয়েকটি বিষয়ে যে সমস্ত গুণাবলির সূত্রে 'শরিয়া' পরিভাষাটি সাধারণত যেভাবে ব্যবহৃত হয় তা বিভ্রান্তিকর। শরিয়াকে নিছক ইসলামী আইন বা বিধিবিধানের সমার্থক বানানোর কারণে সমাজ আইনসর্বস্বতার শিকার হয়েছে। অন্তর্নিহিত ভাবধারা, লক্ষ্য (মাকাসিদ) অথবা ইসলামের আদর্শবাদী (normative) নীতিমালা থেকে বিচ্ছিন্ন বা দূরবর্তী হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজের গতিশীলতাই শুধু খর্ব হয়নি, বরং আক্ষরিক এবং নির্বিকল্প (absolutist) ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের জন্য জগদ্দল পাথরের মতো বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা নিয়ে আপামর মুসলিমদের মধ্যে অস্থিরতাও লক্ষণীয়। যদিও বিশদ পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান প্রমাদপ্রবণ (fallible) মানুষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এগুলো এক ধরনের আসমানি সূত্রাবদ্ধ হিসেবে পেশ এবং প্রয়োগ করা হয় এমন রকমের আসমানি বাহ্যাবরণে (veneer) অথবা তাকে প্রদর্শন করা

হয় 'পবিত্র আইন' (sacred law)-এর খোলসে, ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ আসমানিত্ব, অভ্রান্ততা এবং পবিত্রতা শুধুমাত্র কুরআনের জন্য প্রযোজ্য এবং সেটাও নাজিল হওয়া কুরআনের জন্য, কুরআন নিয়ে মানুষের ব্যাখ্যার জন্য নয়। কুরআন নিয়ে আমাদের যা বোঝা বা অনুধাবন এবং তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষক, যেহেতু মানুষ হিসেবে আমরা ভুলের উর্ধ্বে নই, তাই সেসব না চূড়ান্ত আর না আসমানি। অথচ এটা এমন একটা সত্য (fact) যে ব্যাপারটি ওলামা, ফুকাহা এবং শিক্ষকদের স্বীকার করা এবং তা প্রকাশ করে মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

> মানুষের অহমিকার শেষ নেই। আল্লাহর সদা-অভ্রান্ততা (infallibility), কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র নামে, নিজের মাথায়ই অভ্রান্ততার মুকুট বসিয়ে নিয়েছে।[৭৪৯]

এই ভ্রান্তি অপনোদন হলে, মুসলিমরা যা আসমানি নয় তাতে আসমানিত্ব আরোপন থেকে মুক্ত হবে এবং তখন তারা যা আসলেই আসমানি এবং যা কিছু সেই আসমানি উৎস থেকে আহরিত তা ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক জীবনে পথ নির্দেশনার জন্য এবং দুনিয়াবি জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য আরো কার্যকর এবং গতিশীলভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, মানবেতিহাসে সব আসমানিভাবে নাজিল হওয়া গ্রন্থের সর্বশেষ হচ্ছে কুরআন। ইসলামে এর অবস্থান কেন্দ্রীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি নবিজি (স.) নিজেও কুরআনের বিপরীত কোনো অবস্থা নিতে পারতেন না। তাই কোনো মন্ত্র, আইন বা বিধিবিধানের সমর্থনে কুরআনের বিরুদ্ধে বা বিপরীতে অন্য কোনো উৎসই গ্রহণযোগ্য নয়, এ বিষয়টি সাধারণভাবে সব মুসলিমই স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে অন্য উৎসগুলোকে সেগুলোর যথাযথ স্থানের আরো উপরে ওঠানোর প্রয়াস এবং প্রবণতা বেশ ব্যাপক। বাস্তবে, এমন বেশ দৃষ্টান্ত আছে যেখানে হাদিস এবং কুরআনের মধ্যে বৈপরীত্য পাওয়া গেছে সেখানে হয় নাস্‌খ-তত্ত্বের ভিত্তিতে অথবা কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতো খাপ খাইয়ে হাদিসের ভাষ্যকেই মানিয়ে নেয়া (accommodation), বৈধায়ন (validation) এবং প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা উল্টে দিতে হাদিসেরও প্রয়োজন হয়নি; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তালাকের ক্ষেত্রে কুরআনের

---

৭৪৯ Laliwala, p. 29.

সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার শর্তকে বাদ দেওয়া বা উপেক্ষা করা।[৭৫০] তাই কিছু কিছু মাযহাবে তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী থাকার কুরআনি নির্দেশনা শিথিল বা উপেক্ষা করার কারণে অনেক নারী অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছে। সে কারণে সব মৌলিক নীতিমালা, তত্ত্ব এবং মূল্যবোধ এবং তা থেকে আহরিত বিধিবিধান যা মানুষের জীবন, সম্পদ এবং সম্মানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তা সরাসরি কুরআন থেকে এবং কুরআনের বিপরীতে না গিয়ে আহরণ করা উচিত।

তৃতীয়ত, নবিজির (স.) সুন্নাহ মুসলিমদের ইসলামী জীবনধারার জন্য অপরিহার্য। কুরআনে নবিকে শ্রেষ্ঠ অনুকরণীয় মডেল (উসওয়াতুন হাসানা)[৭৫১] হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আমাদের রব (সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং বিবর্তক) ইবাদতে যেমন করে নবিজিকে (স.) দেখিয়েছেন তেমনি করেই মিল্লাতে ইব্রাহীমের ধারাবাহিকতায় মুসলিমদের অনুসরণ করা উচিত নবিজিকে। এই অনুসরণের আওতায় সব বিশ্বাসগত ব্যাখ্যা, আচরণের মানদণ্ড এবং কুরআনে বিধৃত মূল্যবোধ এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে নবিজি (স.) যেহেতু সর্বশেষ রাসুল যাকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন সমগ্র মানবতা, এমনকি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হিসেবে, যাতে করে তিনি নাজাত, চিরন্তন শান্তির পরজীবন, সুখ এবং প্রাচুর্য, মানুষের অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা প্রসঙ্গে সুসংবাদ দেওয়া এবং পাশাপাশি চিরতরে ধ্বংস হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। যেহেতু নবিজির (স.) জীবন মুসলিমদের জন্য মডেল, তাই সেই আদর্শ নমুনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানার্জন এবং অনুধাবনের জন্য হাদিসসম্ভার জরুরি। সে কারণেই কারো কারো সাধারণভাবে হাদিসকে অস্বীকার করার প্রবণতা একটি সুস্পষ্ট এবং মারাত্মক ভ্রান্তি।

তবে, যেমনটি দেখানো হয়েছে ৩য় অধ্যায়ে, হাদিস-সংক্রান্ত প্রচলিত মত বা অবস্থান উৎস হিসেবে হাদিসের অবস্থানকে অতিরঞ্জিত করে কার্যত হাদিসকে

---

৭৫০ আল-কুরআন (আল-তালাক) ৬৫:২।

৭৫১ যারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (আল-আহ্যাব ৩৩:২১)। কুরআনে ইব্রাহিম (আ.)-কেও উসওয়াতুল হাসানা হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং নবিজিকে (স.) ইব্রাহীমের (আ.) অনুবর্তী হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [আন-নাহল ১৬:১২৩; আল-মুমতাহানা ৬০:৪]

কুরআনের সমান পর্যায়ে উঠিয়েছে, যেখানে হাদিসের ক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে আসমানিত্বের দাবি করা হয় অথবা বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়। কুরআন যেহেতু কোনো বিষয়ে বিস্তারিত দেয় না, তাই বিস্তারিত বর্ণনা এবং নির্দেশনার জন্য মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই হাদিসের শরণাপন্ন হয়। যেহেতু হাদিস থেকে আহরিত জ্ঞান নিশ্চিতকরণে যথেষ্ট সমস্যা আছে, তাই আসমানি কাঠামোতে কোনো কঠিন আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নে আরো সতর্কতা প্রয়োজন। মাত্র কিছু সংখ্যক হাদিস ছাড়া (কোনো কোনো অভিমত অনুযায়ী এক ডজনেরও কম) সংখ্যক হাদিস মুতাওয়াতির আর যা মুতাওয়াতির নয় তা বাকি সবই আহাদ। আহাদ হাদিস সহিহ হলেও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না এবং তাই তার ভিত্তিতে আহরিত বিধিবিধানকে প্রশ্নাতীতভাবে বাধ্যতামূলক অথবা অবশ্য-প্রযোজ্য হিসেবে গণ্য করা যায় না, বিশেষ করে যখন কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনা কুরআনের মূল্যবোধ এবং আদর্শ (norm)-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়। আহাদ হাদিসের ক্ষেত্রে যেহেতু নিশ্চিত জ্ঞান আহরিত হয় না, তাই নিছক কোনো বিষয় হাদিসে আছে বলেই তার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আইন প্রণয়ন অটোমেটিক্যালি করা যেতে পারে না। বরং, যদিও সম্মানিত ওলামা, ফুকাহা এবং বিশেষজ্ঞরা নিজেদের নিবেদিত করেছেন তাদের সাধ্যানুযায়ী হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এবং বিশ্লেষণে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে কার্যকর আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ হওয়া উচিত শূরাভিত্তিক, প্রতিনিধিত্বমূলক দায়বদ্ধতার কাঠামোতে। এক্ষেত্রে কুরআনরকন্দ্রিকতা ও কুরআনসর্বস্বতার পার্থক্য ও তাৎপর্য বুঝতে হবে যা পরবর্তী একটি লেখনীতে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

চতুর্থত, যেমনটি ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, ইজমা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অতিরঞ্জিত এবং অসমর্থনীয়। ইজমার সংজ্ঞার ব্যাপারেই কোনো ইজমা নেই, সমস্যাটা শুধু তাই নয় বরং যে সমস্ত ব্যাপারে দাবি করা হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসলে ইজমা নেই। যদিও বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব এবং তার বিন্যাসে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, পরে অনেক ক্ষেত্রেই ইজমার ব্যবহার অতিসম্প্রসারিত হয়েছে, এমনকি অপব্যবহৃতও হয়েছে। সেই সাথে, ইজমার ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞা আসলে প্রযোজ্য নয় এবং ধীরে ধীরে তার প্রয়োগ অকার্যকর হয়ে গেছে, মুসলিমদের প্রয়োজন ইজমার ধারণার পুনর্মূল্যায়ন করা এবং শূরাভিত্তিক, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা।

প্রত্যেক গোষ্ঠীই, যার মধ্যে জাতি বা রাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত, বিভিন্ন ধরনের ঐকমত্যের প্রয়োজন, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে ইজমা। কিন্তু যেমনটি প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, ইজমার আসমানিত্ব অথবা অভ্রান্ততার আসলে কোনো ভিত্তি নেই এবং তাই যেভাবে কৃত্রিমভাবে এর ব্যবহার চলে এসেছে ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং আইন সম্ভার ইজমার এই অকার্যকর ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রায়শই যেভাবে ইজমার দাবি করা হয় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক বা প্রযোজ্য নয়, আর তাই ইসলামের নামেই তা চ্যালেঞ্জ করা উচিত। অনেক বিষয়ে ইজমা আছে এ রকম দাবি বা ধারণার পরিবর্তে, যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে মুসলিমদের প্রয়োজন নতুন করে বিন্যাস, যা হবে অনভিজাত (non-elitist), ব্যাপকতর অংশগ্রহণভিত্তিক শূরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

তাছাড়া, অনেক বিধিবিধান বা ফতোয়া যেগুলোর পক্ষে ইজমা দাবি করা হয়, তার অনেক কিছুই নবিজি (স.) এবং সাহাবাদের সময় থেকে শুরু করে বিশেষ স্থান-কাল এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিস্তারিত পর্যায়ে এগুলোর প্রয়োগ স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সর্বজনীন নাও হতে পারে। যেমন, ইসলামের মিরাসী আইন, যে সম্পর্কে মুসলিমদের যথেষ্ট গৌরবের দাবি আছে, তা মূলত গোত্রভিত্তিক সমাজ এবং পরিবেশে বৃহত্তর পরিবারের ধারণা এবং কাঠামোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সামাজিক-পারিবারিক ভিত্তি যেখানে গোত্রীয় নয়, বরং এখন একক (nuclear) পরিবারের কাঠামোই সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পরিবার চালানোর জন্য আয় করেন, সেখানে সনাতন মিরাসী আইন অকার্যকর হতে পারে, এমনকি সুবিচারের দৃষ্টি থেকে যার ফলাফল বিপরীতও হতে পারে। তাই মিরাসী আইনের সাথে (মিরাসী আইনকে পরিবর্তন না করেও) আর কি সম্পূরক সমাধান আনা যায় তা বিবেচনা করা উচিত। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে মৃত্যুর আগেই উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বণ্টনে সুবিচারের বিবেচনায় যেরকম প্রয়োজন সেভাবে বণ্টন ও হস্তান্তরের অধিকার। পরিবারের জীবনমুখী অভিজ্ঞতানির্ভর গবেষণা এ প্রসঙ্গে সমস্যাগুলো উদ্ভাসিত করে। কিছু কিছু আইনের ক্ষেত্রে ইজমার অজুহাতে অনমনীয়তার (rigidity) কারণে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে বা হয়, তার জন্য কুরআন থেকে বিধৃত মাকাসিদ এবং নবিজির (স.) হাদিসের গতিশীল দিকগুলো থেকে আমাদের শেখার আছে।

পঞ্চমত, কিয়াস একটি বৈধ এবং উপযোগী পদ্ধতিগত হাতিয়ার, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমনটি পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, ইসলামী আইনশাস্ত্রে কিয়াসও অনেক ক্ষেত্রে আরেকটি অপব্যবহৃত পদ্ধতি। ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে স্বাধীন মানুষদের তুলনায় অর্ধেক-এর নিয়ম দাসপ্রথার প্রচলন থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যদিও এ ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য ছিল দাসপ্রথার অবসান। দাসপ্রথা মানুষের মৌলিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ লঙ্ঘন এবং এটাকে মানিয়ে নেয়া বা নিছক উন্নতিসাধনের পরিবর্তে ইসলাম চায় এর অবসান। অনুরূপভাবে, বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে কিয়াসকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে নারীদের অবমূল্যায়ন হয়েছে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি পণ্যের মতো বিবেচনা করে। আরো শোচনীয় যে এসব ব্যাখ্যা এবং চর্চা রীতিমতো পেশ করা হয়েছে, সাফাই গাওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে ইসলামেরই নামে, যেন এগুলো আসমানি বিধিবিধান বা নির্দেশনার আলোকে প্রণীত বা রচিত এবং মুসলিমরা তা গ্রহণ করবে বিশ্বাসীর মতো এবং প্রশ্নাতীতভাবে। বাস্তবতা আসলে এ ধরনের দাবি এবং অবস্থান থেকে বহু দূরে।

জ্ঞানের জগত সম্প্রসারণে এবং তার চর্চায় কিয়াস সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি, যেখানে যা জানা তা থেকে অজানা বিষয়ে প্রয়োগ। তবে এই পদ্ধতিতে আহরিত কোনো বিধিবিধান আসমানিত্ব দাবি করতে পারে না যেখানে মুসলিমরা এগুলো প্রশ্নাতীতভাবে দেখবে। আবারও, মানব জ্ঞানের সম্প্রসারণে ওলামা, ফুকাহা এবং বিশেষজ্ঞরা সব গ্রহণযোগ্য এবং উপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার ব্যবহার করবেন, কিন্তু তারপর বিধিবিধান নিরূপণে শূরাভিত্তিক কাঠামোর প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, ইসলামী বিধিবিধানের যে সমৃদ্ধ সম্ভার আমাদের কাছে জমেছে, দুঃখজনক যে মৌলিকভাবে তার কোনো অভিজ্ঞতানির্ভর ভিত্তি নেই যেখানে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো বিধান নিরূপণের আগে (ex-ante) এবং পরে (ex-post) যথাযথভাবে গবেষণা করা হয় বা হয়েছে। পাকিস্তানের হুদুদ অর্ডিন্যান্স, যা ইসলামী আইনের নামে প্রণীত হয় (তবে আইনসর্বস্বতা এবং পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে), দৃষ্টান্ত পেশ করে যে কেমন করে বিকৃতি হয় এবং মুসলিমদের জন্য, বিশেষ করে অনেক নারীর জন্য দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অবস্থার পরিবর্তনে, ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যক্রমে সিস্টেম্যাটিক

গবেষণার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ ধরনের পাঠ্যক্রমে অভিজ্ঞতানির্ভর ধারায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত তথ্য-উপাত্তের আলোকে নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে সমাধান সন্ধান করা প্রয়োজন। টেক্সটমুখিতার পরিবর্তে, ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র জীবনমুখী হওয়া দরকার। সিস্টেম্যাটিক কোনো অভিজ্ঞতানির্ভর ফাউন্ডেশন না থাকায়, আমাদের সম্মানিত ওলামা এবং ফুকাহা অনেক ক্ষেত্রে ছিদ্রপথ (loophole) অথবা আইনি কৌশলের সমাধান দিতে পারেন, যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি ইস্তিহ্সান, মাসলাহা, জরুরত ইত্যাদি। এই সব কৌশল এক দিক থেকে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক সংবেদনশীলতার পরিচায়ক এবং ইসলামের এক ধরনের সম্পূরক কাঠামোতে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। কিন্তু সিস্টেম্যাটিক অভিজ্ঞতানির্ভর ভিত্তি না থাকায় এগুলো নিছক অপরিকল্পিত (ad hoc) সমাধান যার স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। সমস্যা সমাধানে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলাম হুদা (পথ নির্দেশনা) এবং শিফা (সমাধান/নিরাময়)। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, মুসলিমদের ইসলাম পালন শ্রেয়তর হতে পারে যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ অধিকতর উপযোগী হয়ে মানবতার (লিন্নাস) সেবা করতে পারে, যেমনটি কুরআন এবং নবিজির (স.) হাদিসের দাবি, যদি সামগ্রিকভাবে বিশদ পর্যায়ে ইসলামী আইনের আসমানিত্বের ছাপ এড়ানো হয় বা দাবি করা না হয়।

এ বইতে যেমন আলোচিত হয়েছে তার আলোকে একটি আইন তখনই আইন বলে গণ্য হবে যখন নিম্নলিখিত তিনটি শর্তই পূরণ হবে।

ক) ইসলামী আইন আহরণ ইসলামের মূল উৎস দু'টির ভিত্তিতে হবে, যেখানে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সম্পূরকভাবে জীবনমুখী, অভিজ্ঞতানির্ভর ধারায় প্রয়োজনীয় গবেষণা করা হয়েছে।

খ) ইসলামী আইন আহরিত হয় ইসলামের মাকাসিদ এবং মূল্যবোধগুলো নিয়মানুগভাবে বিবেচনায় নিয়ে; এবং

গ) সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক শূরার মাধ্যমে এসব আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা।

মুসলিম উম্মাহ যদি প্রতিটি সমসাময়িক প্রজন্ম যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলোর কার্যকরী মোকাবেলা করতে চায়, তাহলে তাদেরকে কুরআনের

সাথে নতুন করে সেতুবন্ধন গড়তে হবে যেখানে তাদের জ্ঞান এবং নিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে কুরআন, কুরআনকেন্দ্রিক কিন্তু কুরআনিক নয়। কুরআনে আইন বা আহকাম সংক্রান্ত বিষয়াদি খুব বেশি সংখ্যক নয়। কিন্তু কুরআনের হেদায়েতের মধ্যে মূল্যবোধ এবং নীতিমালা রয়েছে যেগুলো সামগ্রিকভাবে সর্বজনীন প্রকৃতির। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব মূল্যবোধের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের মাকাসিদ অর্জনে এই মূল্যবোধমুখী আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক পর্যায়ে অনুশীলনে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে কিছুটা সংকীর্ণ মাকাসিদ আল-শরিয়ার পরিবর্তে মাকাসিদ আল-ইসলাম পরিভাষা বিবেচনার প্রয়োজন আছে। এই বইতে টেক্সটমুখিতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে তার সম্পূরক হিসেবে জীবনমুখিতার যোগ হলে তা মুসলিম জীবনে স্থবিরতার পরিবর্তে গতিশীলতা এবং কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনতে মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে।

হাদিস অস্বীকার, উপেক্ষা অথবা প্রত্যাখ্যান করা, যেমন কিছু মুসলিম করার চেষ্টা করে, তার পরিবর্তে হাদিসকে নবিজির (স.) সুন্নাতের সারমূলক (essential) বা সর্বজনীন দিকগুলো বুঝতে অপরিহার্যভাবেই উৎস হিসেবে হাদিস ধারণ করা প্রয়োজন। তবে সেটা করতে গিয়ে কুরআনের মতো হাদিসকে যেন ঢালাওভাবে আসমানি বা অভ্রান্ত হিসেবে অসমর্থনীয় স্তরে না নিয়ে যাওয়া হয়। সমস্যা সমাধানের ধারা (problem-solving approach)-র আলোকে কোনো পদ্ধতিই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতন এবং উজ্জীবিত হয়ে মানবতার সেবায় আল্লাহ্প্রদত্ত সব প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার এবং পদ্ধতির অবকাশ রয়েছে।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের (মা'রুফ)-এর নির্দেশ দাও, অসৎকাজে (মুনকার) নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করো।[৭৫২]

---

৭৫২ আল-কুরআন (আলে-ইমরান) ৩:১১০।

> তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।[৭৫৩]
>
> وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
>
> এমনিভাবে তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি (উম্মাত আল-ওয়াসাত) হিসেবে প্রতিষ্ঠিতি করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।[৭৫৪]

যাদের "মানবতার জন্য সৃষ্টি" করা হয়েছে, যাতে করে তারা বিশ্ববাসীর ওপর সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যাদের একটি মধ্যপন্থি বা ভারসাম্যমুখী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের প্রচলিত ইসলামী আইনের ভান্ডারকে প্রশ্নাতীতভাবে না নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই জীবনঘনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে হবে। বর্তমান অশ্মীভূত বা স্থবির চিন্তা এবং ঘুণে ধরা মনমানসিকতার নতুন বিন্যাস দরকার, যা ইসলামের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কুরআন ও নবিজির (স.) আদর্শের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত। আমাদের সেই অভীষ্ট ভবিষ্যৎ অর্জন করা সম্ভব নয়, যদি আমাদের মনমানসিকতা হয় যেমনটি এসেছে নিম্নলিখিত ভাষ্যে।

> মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের বিজ্ঞ ফুকাহা বিভিন্ন সময়ে অবস্থার আলোকে পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং নারীদের ব্যাপারে পূর্ণ সুবিচার করেছেন এবং কিয়াসের ভিত্তিতে তাদের প্রতি সদাসয়তা দেখিয়েছেন, যেটা ইসলামেরই লক্ষ্য। তাই ভারত এবং অন্যান্য দেশে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তনের কথাটা কৃত্রিম বা ভুয়া।[৭৫৫]

প্রচলিত ইসলামী আইনের আলোকে এরকম অনড়তা (rigidity) এবং অসংবেদনশীলতার কারণেই শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ভারতের মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে তাদের আলাদা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বোর্ড প্রতিষ্ঠা হলো।

---

৭৫৩ আল-কুরআন (আলে-ইমরান) ৩:১০৪।

৭৫৪ আল-কুরআন (আল-বাকারা) ২:১৪৩।

৭৫৫ Laliwala, p. 25.

মুসলিমদের আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার (ইসলাহ)-এর জন্য জীবনমুখী ধারায় কুরআন এবং নবিজির (স.) সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র নিয়ে নতুন চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। মূল্যবোধভিত্তিক ধারায়, যখন জীবনমুখী অভিজ্ঞতানির্ভর ভিত্তিতে, ইসলামী আইন এবং আইনশাস্ত্র পুনর্বিন্যাস হবে, ইনশাআল্লাহ ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক পর্যায়ে মুসলিমরা এই দুনিয়ায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং মানবতার সেবার মাধ্যমে নাজাত অর্জনের পথ সুগম হবে। আইনসর্বস্বতার অবসান সব সমস্যা সমাধানের একটি অপরিহার্য অংশ।

সামগ্রিক, গঠনমূলক পরিবর্তনের (transformation) পথে চলা একটি গতিশীল এবং উদ্দীপক চ্যালেঞ্জ, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে তাক্ওয়া (আল্লাহ সচেতনতা), জ্ঞানসাধনা এবং প্রাসঙ্গিক জীবনমুখী গবেষণা, আর তার সাথে মানবমুখী, কল্যাণময় বিভিন্ন পর্যায়ের সামাজিক (এমনকি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে) প্রতিষ্ঠান যার ভিত্তি হবে এবং যাতে প্রতিফলিত হবে সুশাসন, সুবিচার এবং মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে সংবেদনশীলতা।

এই দুনিয়ায় সাফল্য এবং পরকালে নাজাতের সাধনা আমাদের আহ্বান জানায় সদাসর্বদা ইতিবাচক পরিবর্তন কামনায় যা সর্ব পর্যায়ে একজন ব্যক্তির উন্নয়নে সহায়ক, আর একই সাথে অন্যদের জীবনে এবং সামষ্টিক পরিসরে ইতিবাচক পরশ লাগাতে। নিঃসন্দেহে, পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং হতে হবে, নিজে থেকে, নিজের ঘর থেকে, নিজের সংগঠন থেকে, নিজের কমিউনিটি থেকে। যারা ইতিবাচক পরিবর্তনের মর্ম উপলব্ধি করে এবং তার জন্য সাধনা করে সক্রিয়ভাবে (proactively), প্রতিক্রিয়াশীলভাবে (reactively) নয়, যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে, তাহলে তাদের নিজের জীবনেই শুধু ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে না, বরং তাদের সেই পরিবর্তনের পরশ অন্যদেরও না ছুঁয়ে থাকতে পারে না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

> নিশ্চয় আল্লায় তায়ালা মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যদি না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে (অথবা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনে)।[৭৫৬]

৭৫৬ আল-কুরআন (আর-রা'দ) ১৩:১১।

মমতা এবং ভালোবাসা (রহমত) যা আল্লাহ্ তায়ালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান গুণ (সিফাত)[৭৫৭] এবং নবিজির (স.) দৃষ্টান্তমূলক জীবন ও সুন্নাহ; যে কারণে কুরআন তাকে "উসওয়াতুন হাসানা"[৭৫৮] হিসেবে পেশ করেছে এবং যাকে সমগ্র মানবতা এবং বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ তায়ালা রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন, এ দু'টি বিষয়ই যেন মু'মিনদের বিশ্বাস এবং চিন্তাধারাকে আলোকিত করে এবং তাঁদের জীবনে প্রতিফলিত হয়, যার মাধ্যমে তাঁদের জীবন এবং সমাজের ইতিবাচক রূপান্তর (transformation) হয় এবং তারই মাধ্যমে তাঁরা যেন সারা দুনিয়ার ইসলাহ[৭৫৯] (উভয়-জগতের উন্নতি, তরক্কী, কল্যাণ)-এর নিয়ামক হয়, এটা মুসলিম হিসেবে আমাদের সবার কাম্য এবং এই গ্রন্থকারের আন্তরিক দোয়া।

৭৫৭ "আমার রহমত সর্বব্যাপ্ত" আল-কুরআন (আল-আ'রাফ) ৭:১৫৬।
"আল্লাহ যখন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন তখন থেকেই তিনি তার কিতাবে লেখার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন: "আমার ক্রোধের ওপর আমার রহমত পরাক্রান্ত" (ইমাম নাবাবীর "চল্লিশ হাদিস, #১)।

৭৫৮ আল-কুরআন (আন-নিসা) ৪:৭৯; (আল-আম্বিয়া) ২১:১০৭।

৭৫৯ আল-কুরআন (হুদ) ১১:৮৮।

গ্রন্থপঞ্জি

Bibliography

1. Abu Dawud (1990). Sunan Abu Dawud, trans. By Ahmad Hasan, Vol. I-III (Kitab Bhaban, New Delhi, India).
2. AbuSulayman, A. (1987). The Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islamic Methodology and Thought (International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA).
3. AbuSulayman, A. (1983). Crisis of the Muslim Mind (International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA).
4. Abu-Nimer, M. (2001). "A Framework for Non-Violence and Peacebuilding in Islam," Journal of Law and Religion, 15(1/2), pp. 217-265.
5. Abu Zahrah, M. (n.d.). "The Fundamental Principles of Imam Malik's Fiqh," Retrieved May 31, 2007, from IIU Law Database Website: http://www.iiu.edu.my/deed/ lawbase/ maliki_fiqh/ usul8.html.
6. Ahmad, A. A. (2006). Structural Interrelations of Theory And Practice in Islamic Law: A Studz of Six Works of Medieval Islamic Jurisprudence (Brill Academic Publishers).
7. Ahmad, K. (1998). "Implementation of Shariah," translated from Urdu original in Tarjumanul Qur'an Isharat, Retrieved November 14, 2006, from Jamaat Web site: http://www.jamaat.org/Isharat/ 1998/1098.html.
8. Al-Amidi, S. (n.d.). Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, 4 Vols. (Cairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiya, 1914).
9. Al-Ati, H. A. (1977). The Family Structure in Islam (American Trust Publications, Indianapolis, IN).

10. Al-Azmeh, A. (1989). “Islamic Legal Theory and the Appropriation of Reality,” in al-Azmeh, Aziz. (ed.), Islamic Law: Social and Historical Contexts (Routledge, New York), pp. 250-265.

11. Al-Bukhari, M. (1997). Sahih al-Bukhari (trans. M. Muhsin Khan), Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam.

12. Al-Hazimi, Abu Bakr Muhammad b. Musa. (n.d.). Shurut al-A’immah al-Khamsah. Ed. by M.Z. al-Kawthari, (bound with al-Qaysarani, Shurut al-Aimmah al-Sitta), Cairo.

13. Al-Jawzi, Ibn al-Qayyim (1987). I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘alamin (Al-Maktabah al-Asriyyah, Beirut, Lebanon).

14. Al-Marghinani, B. (1989). Al-Hedaya, translated by Charles Hamilton, 2nd ed. (Karachi, Pakistan).

15. Al-Marghinani, B. (2006). Al-Hidāya, Vol. I, translated by Nyazee, Imran Ahsan Khan (Amal Press, Briston, England).

16. Al-Misri, I. (1994). Reliance of the Traveller, Trans & Ed. by Keller, N. H. M. (Amana Publications, Beltsville, Maryland, USA).

17. Al-Nabhani, T. (2002). The System of Islam (Nidham ul-Islam). Eng trans., Retrieved June 21, 2007, from Hizb-ut-Tahrir Web site: http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/EN/en_books_ pdf/system_of_islam.pdf.

18. Al-Qaradawi, Y. (1999.). The Lawful and the Prohibited in Islam (American Trust Publications, Plainfield, Indiana, USA).

19. Al-Qaradawi, Y. (1981). Islamic Awakening Between Rejection and Extremism (International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia).

20. Al-Qaradawi, Y. (2006). “Apostasy: Major and Minor,” Retrieved August 31, 2007, from Islamonline Web site: http://www.islamonline.net/English/contemporary/2006/04/article01c.shtml.

21. Al-Qayrawani, A. A. (n.d.). The Risala: A Treatise on Maliki Fiqh, trans. by Alhaj Bello Mohammad Daura, Retrieved on July 15, 2006, from MASMN Web Site: http://www.masmn.org/ documents/Books/Abdullah_Al_Qayrawani/The_Risala/index.htm.

22. Al-Raysuni, A. (2005). Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law (The International Institute of Islamic Thought, Washington, DC).

23. Al-Sarakhsi, A. M. (1993). Kitab al-Mabsut (Dar al-Ma'rifa, Beirut, Lebanon).

24. Al-Shafi'i. (1987). Al-Shafi'i's Risala: Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence (translated by Majid Khadduri, 2nd ed. (The Islamic Texts Society, Cambridge, England).

25. Alam, N., S. K. Saha, and J. K. van Ginneken. (2000). "Determinants of Divorce in a Traditional Muslim Community in Bangladesh," Demographic Research, 3(4).

26. Ali, A. Yusuf. (1988). The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, 2nd U.S. ed. (Tahrike Tarsile Qur'an, New York).

27. Alauya, S. (1999). Fundamentals of Islamic Jurisprudence (Rex Book Store, Manila, Philippines).

28. Amal, T. A. (2004). "Observing the Contemporary Model of Ijma,'" Retrieved February 23, 2007, from Liberal Islam Network Web site: http://islamlib.com/en/page.php?page=article&id=595.

29. Amanullah, M. (2018). "Juristic Differences over the Implementation of Qisas against a Muslim Who Kills a Non-Muslim," Arab Law Quarterly, 32(2), 185-203.

30. Ariff, M. (1988). "Islamic Banking," Asian-Pacific Economic Literature, 2(2), pp. 46-62.

31. Asad, M. (2008). The Message of the Qurán, Book Foundation, London, UK.

32. As-Sarakhsi, A. B. (1993). Kitab al-Mabsut, Dar al-Ma'rifa, Beirut, Lebanon.

33. Awliya'i, M. (n.d.). "Outlines of the Development of the Science of Hadith," Retrieved April 17, 2007, from al-Islam Website: http://al-islam.org/al-tawhid/hadith-science/3.htm.

34. Ayoob, M. (October 1, 2006). "Muslims could benefit from banishing the word 'jihad'," Daily Times.

35. Azami, M. M. (1977). Studies in Hadith Methodology and Literature (American Trust Publications, Indianapolis).

36. Badenas, R. (1985). Christ the End of the Law: Romans 10.4 in Pauline Perspective (Sheffield Academic Press, Sheffield, England).

37. Baldauf, S. (2005). "Pakistani religious law challenged," Christian Science Monitor, March 2.

38. Berryman, P. (2014). Liberation Theology: The Essential Facts About the Revolutionary Movement in Latin America and Beyond (Pantheon Books, New York, NY).

39. Choudhury, M. A. (2007). "Development of Islamic economic and social thought," in Hassan, K. and Lewis, M. (eds.), Handbook of Islamic Banking (Edward Elgar, Cheltonham, England), pp. 21-37.

40. Cowan, J. (ed.) (1976). Arabic-English Dictionary: Hans-Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (Spoken Language Services, Inc., Ithaca, New York).

41. Deccan Herald (2005). "Muslim women form their own personal law board," February 3.

42. Dunn, J. (1990). Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark and Galatians (Westminster John Knox Press, England).

43. El Fadl, K. A. (1994). "Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the Second/Eighth to the Eleventh/Seventeenth Centuries," Islamic Law and Society, 1(2), pp. 141-186.

44. El Fadl, K. A. (2001). The God Knows the Soldiers: The Authorities and Authoritarian in Islamic Discourse, University Press of America, New York, USA.

45. El Fadl, K. A. (2002). Place of Tolerance in Islam (Beacon Pres, Boston, MA).

46. El Fadl, K. A. (2004). The Great Theft (Harper, San Francisco, CA).

47. El-Gamal, M. (2000a). "An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical Islamic Jurisprudence," in Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance (Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, Cambridge, MA), 31-44.

48. El-Gamal, M. (2000b). A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance (Islamic Society of North America, Plainfield, Indiana).

49. El-Gamal, M. (2006). Islamic Finance: Law, Economics and Practice (Cambridge University Press, New York).

50. El Shamsy, A. (2015). The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History (Cambridge University Press, Cambridge, UK).

51. Emerick, Y. (n.d.). "The Fight for the Soul of Islam in America," Retrieved August 2, 2006, from Islamfortoday Web site: http://www.islamfortoday.com/emerick12.htm.

52. Emon, A. (2006). "Islamic Law and the Canadian Mosaic Politics, Jurisprudence, and Multicultural Accommodation" Singapore Journal of Legal Studies; online draft version Retrieved May 15, 2007, from Web site: at this http://www.er.uqam.ca/nobel/cridaq/spip/IMG/pdf/Emon-PaperFeb14-EmailVers_03feb06.pdf.

53. Engineer, A. (2008). “Qu’ran, Hadith and Women,” Islam and Modern Age, February, World Muslim Congress web site, retrieved on February 3, 2007, http://worldmuslimcongress. blogspot.com/2008/02/quraan-hadith-and-women.html.

54. Esposito. J. (2005). Islam: The Straight Path (Oxford University Press).

55. Fadel, M. (1997). “Rules, Judicial Discretion, and the Rule of Law in Nasrid Granada: An Analysis of al-Hadiqa al-mustaqillah al-nadra fi al-fatawa al-sadira ‘an ‘ulama al-hadra,” in Gleave, R. and Kermeli, E. (eds.). Islamic Law: Theory and Practice (I. B. Tauris, London, England), pp. 49-86.

56. Fadel, M. (2000-2001). Book Review of Analytical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Studz of Juridical Principle of Qiyas by Ahmad Hasan, The Journal of Law and Religion, 15(1/2), pp. 359-362.

57. Farooq, M. O. (1993). “Development Demystified: An Islamic Perspective,” paper presented at the First Conference of NAAMPS, April 9-11, Chicago, Illinois.

58. Farooq, M. O. (1996). “A Cyber-discussion on Gender Equality,” Monthly Minaret, 18(1), January, pp. 39-40.

59. Farooq, M. O. (1999). “Being born as a Muslim: Is there such as thing?” comments posted at NABIC-L, an internet forum, Retrieved July 27, 2006, http://www.mofarooq.net/oldsite/writings/islamic/born_muslim.html.

60. Farooq, M. O. (2000). “Mind Building: A Neglected Dimension of Islam,” Message International, June 2000, pp. 35-36, 42.

61. Farooq, M. O. (2002a). “Islam and Democracy: Perceptions and Misperceptions,” Message International, April-May, 27(4/5), pp. 17-19.

62. Farooq, M. O. (2002b). "Toward Understanding Muhammad: Some Issues in Peace and Violence," Message International, Aug.-Sept., 27(8/9), pp. 15-19.

63. Farooq, M. O. (2003a). "O Allah! You are My Servant and I am Your Lord: The Language of Love" Retrieved June 21, 2007, from Islamicity Web site: http://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=IC0305-1978.

64. Farooq, M. O. (2003b). "Women Scholars of Islam: They Must Bloom Again," Message International, Aug.-Sept., 28(8/9), pp. 27-33.

65. Farooq, M. O., (2004a). "Hajj and the neglected legacy of a great woman," Message International, Feb.-Mar. 26(2/3), pp. 27-28.

66. Farooq, M. O. (2004b). "Freedom and Choice: The First-Order Condition of Islam, "Message International, Apr.-May, 30(4/5), pp. 19-21.

67. Farooq. M. O. (2006a). "Riba, Interest and Six Hadiths: Do we have a Definition or a Conundrum?" Retrieved June 21, 2007, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/Riba.

68. Farooq, M. O. (2006b). "The Riba-Interest Equivalence: Is There Any Ijma (Consensus)?" Retrieved June 21, 2007, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/Riba.

69. Farooq, M. O. (2006c). "Fundamental Human Dignity and The Mathematics of Slavery," Retrieved June 21, 2007, https://ssrn.com/abstract=2131265.

70. Farooq, M. O. (2006d). "The Spirit of Global Belonging: Perspectives from Some Humanity-Oriented Icons," Retrieved June 21, 2007, from Nazrul Web site: Error! Hyperlink reference not valid..

71. Farooq, M. O. (2006e). "Rape and Hudood Ordinance: Perversions of Justice in the Name of Islam," Retrieved June 21, 2007, from Islamicity Web site: http://www.islamicity.com/ articles/Articles.asp?ref=IC0612-3179.

72. Farooq, M. O. (2006f). "Self-Interest, Homo Islamicus and Some Behavioral Assumptions in Islamic Economics and Finance," unpublished essay.

73. Farooq, M. O. (2006g). "Religious denunciations and Takfir: Isn't there enough to go around?" Retrieved June 21, 2007, from Argosyfinance Web site: http://www.argosyfinance.co.nz/images/Dr%20Mohammad%20Omar%20Farooq%20paper%20on%20Riba,%20Interest%20and%20the%20six%20Hadiths.pdf.

74. Farooq, M. O. (2007a). "Exploitation, Profit and The Riba-Interest Reductionism," paper presented at the Annual Conference of Eastern Economic Association, New York, February, 23-25.

75. Farooq, M. O. (2007b). "Apostasy, Freedom and Da'wah: Full Disclosure in a Business-like Manner," Retrieved June 21, 2007, from American Muslim Web site: http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/apostasy_freedom_and_dawah_full_disclosure_in_a_business_like_manner/.

76. Farooq, M. O. (2007c). "Stipulation of Excess in Understanding and Misunderstanding Riba: Al-Jassas Link," Arab Law Quarterly, 21(4), pp. 285-316.

77. Farooq, M. O. (2008). "The Riba-Interest Equation and Islam: Reexamination of Some Traditional Arguments," Global Journal of Finance and Economics, Vol. 6, No. 2, September 2009, pp. 99-111.

78. Farooq, M. O. (2011). "Analogical Reasoning (Qiyās) and the Commodification of Women: Applying Commercial Concepts to the Marital Relationship in Islamic Law," Islam and Civilisational Renewal, Vol. 3, No. 1, pp. 155-180

79. Farooq, M. O. (2012). "Exploitation, Profit and Riba-Interest Reductionism," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2012, Vol. 5, No. 4, pp. 292-320.

80. Farooq, M. O. (2015). “Islamic Finance and Debt Culture: Treading the Conventional Path?” International Journal of Social Economics, Vol. 42, No. 12, 2015, pp. 1168-1195.

81. Farooq, M. O. and El-Ghattis, N. (2018). “In Search of the Shari’ah,” Arab Law Quarterly, (2018), Vol. 32, No. 4, pp. 315-354.

82. Farooq, M. O. (2020a). “Islamic finance eclipsing Islamic economics: Causes and Consequences,” History of Economic Ideas, History of Economic Ideas, Vol. 20, No. 1, pp. 53-85.

83. Farooq, M. (2020b). “Muhammad Ibn Abdul-Wahhab’s Kitab at-Tawhid: Nature, Scope and Impact,” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3614819.

84. Farooq, M. (2020c). “An Appraisal of Ibn Khaldun’s Defense of Mu’awiyah: The Dznamics of Asabiyyah, Mulk and the Counter-Revolution in Al-Muqaddimah,” Journal of Islamic and Muslim Studies (2019), Vol. 4, No. 1, pp. 87-106.

85. Farooq, M. (2022). “Islam-compliance, beyond Shariah-compliance: Toward a broader socioeconomic transformation,” Arab Law Quarterly, https://doi.org/10.1163/15730255-bja10121.

86. Friedman, Y. (2003). Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relationships (Cambridge University Press, Cambridge, MA).

87. Gidley, R. (2005). “Oil discovery adds new twist to Darfur tragedz,” Reuters, June 15.

88. Ghamidi, Javed (2010). Islam: A Comprehensive Introduction (Al Mawrid: Lahore, Pakistan).

89. Gleave, R. and E. Kermeli (eds., 2001). Islamic Law: Theory and Practice (I. B. Tauris, London, England).

90. Guraya, M. Y. (1993). Islamic Jurisprudence in the Modern World (Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan).

91. Haddad, G. F. (2005). “Abu Bakrah and the Feminists” webs site, retrieved on 5/21/07, http://www.abc.se/~m9783/o/abfm_e.html.

92. Hakim, K. A. (n.d.). “Law and Islam,” Retrieved August 29, 2006, from Muslim-Canada Web site: http://muslim-canada.org/ch20hakim.html.

93. Hakimi, O. (2019). “No going back to Taliban repression, Afghan Businesswomen say,” Reuters, https://www.euronews.com/2019/08/07/no-going-back-to-taliban-repression-afghan-businesswomen-say.

94. Hallaq, W. (1999). “The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-problem,” Studia Islamica (89), 75-90.

95. Hallaq, W. (2004). “Can the Shari’a be Restored?” in Y. Haddad and B. Stowasser (eds.), Islamic Law and the Challenges of Modernity (Altamira Press, Walnut Creek, CA), 21-53.

96. Hanbal, A. Ibn (1993). Musnad Ahmad (Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon)

97. Hasan, A. (1986). Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Studz of the Juridical Principle of Qiyas (Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan).

98. Hasan, A. (1993). The Principles of Islamic Jurisprudence (Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan).

99. Hasan, A. (2003). The Doctrine of Ijma: A Studz of the Juridical Principle of Consensus (Kitab Bhaban, New Delhi, India).

100. Hasan, M. (2005). “Women’s personal law board,” The Milli Gazette, February 16-28.

101. Hasan, S. (1994). An Introduction To The Science Of Hadith (Al-Qur’an Society, London, England).

102. Hasan, Zulkifle Bin (2016). “From Legalism to Value-oriented Islamic Finance,” Humanomics, 32(4), 437-458.

103. Haskafi, M. A. (1992). Durr-ul-Mukhtar, trans. by B. M. Dayal (Kitab Bhavan, New Delhi, India).

104. Hathout, H. (1995). Reading the Muslim Mind (American Trust Publication, Indianapolis, IN).

105. Ibn Khaldun (1970). Muqaddimah (Princeton University Press, NJ).

106. Ibn Majah (2000). Sunan Ibn Majah, trans. by Muhammad Tufail Ansari (Kitab Bhaban, New Delhi, India).

107. Iqbal, M. (2000). The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Kitab Bhavan, New Delhi, India).

108. Ibrahim, A. (2013). Keynote address at the Symposium on "Reform of Higher Education in Muslim Societies," organized by the International Institute of Islamic Thought (IIIT) on December 9-10, 2013 at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, Retrieved June 20, 2019, from https://www.academia.edu/5713722/The_reform_of_Muslim_education_and_the_quest_for_inttelectual_renewal_-_Anwar_Ibrahim.

109. Islamic Fiqh Academy. (2000). Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy 1985-2000 (Jeddah, Saudi Arabia), Retrieved September 23, 2006, from IRFIPMS Web site: http://www.irtipms.org/ PubDetE.asp?pub=73&search=&mode=allwords.

110. Jackson, S. (Abdul Hakim). "Fiction and Formalism: Toward a Functional Analysis of Usul al-Fiqh," in Weiss, B. (ed.), Studies in Islamic Legal Theory (Brill, Boston), pp. 177-201.

111. Jackson, S. (Abdul Hakim). (n.d.). "Sources of Islamic Law," Retrieved August 29, 2006, from AALS Web site: http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/islamicmaterials.pdf#search=%22sharia%20%22islamic%20law%22%2.

112. Jahangir, Khandekar Abdullah (2007. কুর্আন-সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামী আকিদা (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্সঃ ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ)।

113. Jahangir, A. and H, Jilani. (1990). The Hudood Ordinance (Rhotus Books, Lahore, Pakistan).

114. Johnston, D. (2013). "Mohammad Farooq on Reforming Islamic Law," Review of Toward Our Reformation: From Legalism to Value-oriented Islamic law and Jurisprudence (IIIT, Herndon, Virginia), Retrieved July 13, 2019 from http://www.humantrustees.org/component/k2/item/88-farooq-reformation.

115. Jokisch, B. (2001). "Ijtihad in Ibn Taymiyya's fatawa," in Gleave, R. and Kermeli, E. (eds.). Islamic Law: Theory and Practice (I. B. Tauris, London, England), pp. 119-137.

116. Kahan, D. (2006). "Unempirical Claims About Empiricism," comment at the Blog of Yale University Cultural Cognition Project, Retrieved March 15, 2007, from Blog Web site: http://research.yale.edu/culturalcognition/blog/2006/06/unempirical-claims-about-empiricism.html.

117. Kahoe, R. (2000). "Taking a Look at Legalism," Mainstream Messenger, 3(2), April.

118. Kamali, M. H. (1997). Freedom of Expression in Islam (Islamic Texts Society, London, England).

119. Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. 3rd ed. (Islamic Texts Society, London, England).

120. Kazi, M. (1992). A Treasury of Ahadith (Abul-Qasim Publishing House, Jeddah, Saudi Arabia).

121. Khan, M. (2014). "The Priority of Politics," Boston Review, April/May, Retrieved July 3, 2014, from Boston Review Web site: https://bostonreview.net/forum_response/ma-muqtedar-khan-priority-politics/.

122. Khan, M. (2003). "The Role of Social Scientists in Muslim Societies," Islamic Horizon, May, Retrieved July 16, 2007, from Ijtihad Web site: http://www.ijtihad.org/IslamicSocialSciences.htm.

123. Khan, M. A. (1975). Mostafa Charit (originally in Bangla; Biography of the Honored One), 4th ed. (Jhinuk Pustika, Dhaka, Bangladesh).

124. Khan, S. Y. (2000). “Divorced from Reality - Amending the Triple Talaq Law,” The Times of India, October 5.

125. Krawietz, B. (2002). “Cut and Paste in Legal Rules: Designing Islamic Norms with Talfiq,” Die Welt des Islams, 42(1), April, 3-40.

126. Krumnack U., Kühnberger KU., Schwering A., Besold T.R. (2013) Analogies and Analogical Reasoning in Invention. In: Carayannis E.G. (eds). Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, New York, NY.

127. Kuran. T. (2004). “Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation,” Journal of Economic Perspectives, 18, Summer, pp. 71-90.

128. Laldin, M. A. (2006). Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence (Cert Publications Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia).

129. Laliwala, J. I. (1983). The Islamic Jurisprudence (The Indian Institute of Islamic Studies, New Delhi, India).

130. Lang, J. (1994). Struggling to Surrender (Amana Publications, Beltsville, MD).

131. Lau, M. (2007). “Twenty-Five Years of Hudood Ordinances—A Review,” Washington and Lee Law Review, 64(4), 1291-1314

132. Lorthrop Stoddard, A. M. (1921). The New World of Islam (Charles Scribner’s Sons, New York).

133. Luni, A. K. (2006). “Islam in the eyes of western media,” Pak Tribune, September 22.

134. Malik Ibn Anas (1985). Muwatta Imam Malik, trans. By M. Rahimuddin (Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan).

135. Murad, Khurram (2007). Shari'ah: The Way to God (Islamic Foundation: Leicestershire, UK).

136. Muslim al-Nishapuri (1982). Sahih Muslim, trans. Abdul Hamid Siddiqi, Vols. I-IV (Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan).

137. Masud, M. K. (1996). "Apostasy and Judicial Separation in British India," in Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas (Harvard University Press, Cambridge, MA) Chapter Sixteen, 193-203.

138. Masud, M. K. (1997). Shatibi's Philosophy of Islamic Law (Kitab Bhavan, New Delhi, India).

139. Masud, M. K. (2001). "Muslim Jurists' Quests for the Normative Basis of Shariah," Inaugural lecture at the International Institute for the Studz of Islam in the Modern World, Netherlands.

140. Masud, M. K. (2005a). "Communicative Action and the Social Construction of Shari'a in Pakistan," in A. Salvatore and M. Le Vine (eds.). Religion, Social Practice, and Contested hegemonies: Reconstructing the Public Sphere in Muslim Majority Societies (Palgrave-Macmillan, New York), pp. 155-179.

141. Masud, M. K. (2005b). "Teaching of Islamic Law & Shari'ah: A Critical Evaluation of the Present & Prospects for the Future," Islamic Studies, 44(2): Summer, pp. 165-190.

142. Mawdudi, S. A. A. (1983). Islamic Law and Constitution, 8th ed. (Islamic Publications, Lahore, Pakistan).

143. Mawdudi, S. A. A. (1987). Sood o Adhunik Banking (Adhunik Prokashoni, Dhaka, Bangladesh).

144. Mawdudi, S. A. A. (1994). The Punishment of the Apostate According to Islamic Law, trans. by Syed Silas Husain and Ernest Hahn, Retrieved May 27, 2007, from Answering Islam Web site: http://answering-islam.org/ Hahn/Mawdudi/ index.htm.

145. Mernissi, F. (1987). The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam (Perseus Books, Reading, MA).

146. Moghul, U (1999). "Approximating Certainty in Ratiocination: How to Ascertain the 'Illah (Effective Cause) in the Islamic Legal System and How to Determine the Ratio Decidendi in the Anglo-American Common Law," Journal of Islamic Law, 4 (Fall/Winter), 125-200.

147. Moors, A. (1995). Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990 (Cambridge University Press, Cambridge, MA).

148. Mossaad, N. (2005). "The Impact of Islam on Economic Growth: Evidence From Cross Country Regressions," paper presented at the Association for the Studz of Religion, Economics, and Culture, November 4, Rochester, New York.

149. Mumisa, M. (2002). Islamic Law: Theory & Interpretation (Amana Publications, Beltsville, MD).

150. Munir, L. Z. (n.d.). "General Introduction to Islamic Law," Retrieved August 16, 2006, from LFIP Web site: http://www.lfip.org/laws718/docs/lily-pdf/Introduction_to_Islamic_Law.pdf.

151. Musa, M. and Haque, M. (eds.). Bidhibadhdha Islami Ain (Codified Islamic Law), 2nd ed. (Islamic Foundation, Dhaka, Bangladesh).

152. Muslehuddin, M. (1986). Philosophy of Islamic Law and the Orientalists (Taj Company, New Delhi, India).

153. Naqvi, S. N. H. (1981). Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (The Islamic Foundation, Leicester, England).

154. Naqvi, S. N. H. (2000). "Islamic Banking: An Evaluation," IIUM Journal of Economics and Management, 8(1), 41-70.

155. Nyazee, I. A. K. (2000). Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh) (Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan).

156. Qadri, A. A. (1963). Islamic Jurisprudence in the Modern World (N. M. Tripathi Publishers, Bombay, India).

157. Quraishi, A. (1997). "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective," Michigan Journal of International Law, 18, 287-320.

158. Rahman, F. (1965). Islamic Methodology in History (Central Institute of Islamic Research, Karachi, Pakistan).

159. Rahman, S. A. (1996). Punishment of Apostasy in Islam (Kitab Bhaban, New Delhi, India).

160. Ramadan, T. (2004). Western Muslims and the Future of Islam (Oxford University Press, London, England).

161. Reinhard, A. K. (1983). "Islamic Law as Islamic Ethics," Journal of Religious Ethics, Vol, 2, pp, 186-203.

162. Saad, H. (2015). The Basic Concepts of Shariah (Pena Hijrah Resources. Malaysia).

163. Saadallah, R. (1994). "Concept of Time in Islamic Economics," Islamic Economic Studies, 2(1), pp. 81-102.

164. Sachedina, A. (1999). "The Ideal and Real in Islamic Law," in Khare, R. S. (ed.), Perspectives on Islamic Law, Justice, and Society (Rowman & Littlefield, Latham, Maryland), pp. 15-22.

165. Sadeghi-Hassanabadi, A., H. Keshavarz, E. Setoudeh-Maram and Z. Sarraf. (1998). "Prevalence of reproductive morbidity among women of the Qashqa'i tribe, Islamic Republic of Iran," Eastern Mediterranean Health Journal, 4(2), 312-318.

166. Saeed, A. (1994). "A Fresh Look at the Freedom of Belief in Islam," in Kingsbury, D. and Barton, G. (eds.). Difference and Tolerance: Human Rights Issues in Southeast Asia (Deakin University Press, Australia), pp. 27-37.

167. Saeed, A. and H. Saeed (2004). Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Ashgate Publications, London, England)

168. Salahi, A. (2006). "Does Islamic Law Need Modification?" Arab News, May 22.

169. Sardar, Z. (2002). "Rethinking Islam," Islam for Today, June.

170. Sarker, M. A. A. (1999). "Islamic Banking in Bangladesh: Performance, Problems & Prospects," International Journal of Islamic Financial Services, 1(3), October-December, 12-28.

171. Shafaat, A. (2007). "The Punishment of Apostasy in Islam (Part II): An Examination of the Hadiths on the Subject," Retrieved October 29, 2006, from Islamic Perspectives Web site: http://islamicperspectives.com/PunishmentOfApostasy_Part2.html.

172. Shaheed, F. (1994). "Controlled or Autonomous: Identity and the Experience of the Network Women Living Under Muslim Laws," Occasional Paper, Retrieved June 21, 2007, from WLUML Web site: http://www.wluml.org/english/pubs/rtf/ occpaper/OCP-05.rtf.

173. Sharifi, A. (2004). "Tajikistan: Women Challenge Mosque Ban," October 6, 2004, Retrieved March 27, 2007, from IWPR Web site: http://www.iwpr.net/?p=rca&s=f&o=162810&apc_state=henirca2004.

174. Shehaby, N. (1982). "Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory," Journal of American Oriental Society, 102(1), Jan-Mar, pp. 27-46.

175. Shourie, Arun (1995). The World of Fatwas or the Shariah in Action (ASA Publication, New Delhi, India).

176. Siddiqi, M. N. (2005). "Relevance And Need For Understanding The Essence Of Religious Traditions In The Contemporary World," Paper presented at the International Seminar on Inter-Civilizational Dialogue in a Globalizing World, Institute of Objective Studies, New Delhi, 8-10 April 2005, Retrieved May 8, 2006, from Siddiqi Web site: http://www.siddiqi.com/mns/Relevance_April2005_Delhi.htm.

177. Siddiqi, M. Z. (1993). Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features (Islamic Texts Society, Cambridge, England).

178. Siddique, K. (1983). The Struggle of Muslim Women (Thinkers Library, Singapore).

179. Siddique, Muhammad Zahid and Iqbal, Mazhar (2016). "Theory of Islamic Banking: From Genesis to Degeneration," History of Economic Ideas, Vol. 24, No. 2, pp. 75-110.

180. Siddiqui, S. H. (1994). Islamic Banking: Genesis & Rationale, Evaluation & Review, Prospects & Challenges (Royal Book Company, Karachi, Pakistan).

181. Sikand, Y. (2004). "Triple talaq: counter-perspective," Sabrang web site, retrieved on Jun 21, 2007, http://www.sabrang.com/ cc/archive/2004/july04/cover10.html.

182. Sisters in Islam (n.d.). "Women as judges," SIS Working Paper Series, SIS web site, retrieved on July 21, 2007, http://www.sistersinislam.org.my/womenjudgescPart1.doc.

183. Subhani, M. E. A. (2004). Apostasy in Islam (Global Media Publications, New Delhi, India).

184. Suhail, I. A. K. (1999). What is Riba? (Pharos, New Delhi, India).

185. Syahnan, Mhd (2013). "Force Majeure in Islamic Law of Transaction: A Comparative Studz of the Civil Codes of Islamic Countries, Tsaqafah: Jurnal Perabadan Islam, 9(1), 1-14.

186. Thanwi, A. (2005). Heavenly Ornaments (Bahishti Zewar) (Karachi, Pakistan, Zam Zam Publishers).

187. Thomas, A. (ed.) (2006). Interest in Islamic Economics: Understanding Riba (Routledge, London, England).

188. Toynbee, A. (1962). A Studz of History (Vol. 3): The Growths of Civilizations (Oxford University Press, New York).

189. Useem, J. (2002). “Banking On Allah: Devout Muslims don’t pay or receive interest. So how can their financial system work?” Fortune, June 10.

190. Usmani, M. T. (2000). An Introduction to Islamic Finance (Kluwer Law International, The Hague, Netherlands).

191. Usmani, M. I. (2002). Meezan Bank’s Guide to Islamic Banking, Retrieved April 24, 2021 from Islamic Bankers web site, https://islamicbankers.files.wordpress.com/2007/06/meezan-banks-guide-to-islamic-banking.pdf.

192. Usmani, M. T. (2006). “The Islamization of Laws in Pakistan: The Case of Hudud Ordinances,” Muslim World, 96(2), April, 287-304.

193. Al-Uthaymin, Muhammad bin Sahil (2012). The Ruling on Abandoning the Prayer (trans. Abu Salih Eesa Gibbs), (London, UK: Pillars Publications), Retrieved July 11, 2020, from maktabahassunnahblog Web site: https://maktabahassunnahblog.files.wordpress.com/2015/12/the-ruling-on-abandoning-the-prayer.pdf..

194. Vogel, F. and S. Hayes III. (1998). Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return (Kluwer Law, The Hague, Netherlands).

195. Weiss, B. G. (1992). The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi (University of Utah Press, Salt Lake City, Utah).

196. Wani, G. Q. (2016). Review of the book Toward Our Reformation: From Legalism To Value-Oriented Islamic Law And Jurisprudence by M. O. Farooq in Islam and Civilizational Renewal, 7(4), 563-568.

197. (Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2011), pp. xxi+323. by

198. Weiss, B. G. (2006). The Spirit of Islamic Law (University of Georgia Press)

199. Zahraa, M. (2000). “Characteristic Features of Islamic Law: Perceptions and Misconceptions,” Arab Law Quarterly, 15(2), pp. 168-196.

200. Zaman, R. and H. Movassaghi. (2002). “Interest-free Islamic Banking: Ideals and Reality,” The International Journal of Finance, 14(4), pp. 2428-2443.

201. Zomeno, A. (2001). “Kafa’a in the Maliki School: A fatwa from Fifteenth-Century Fez,” in Gleave, R. and Kermeli, E. (eds.). Islamic Law: Theory and Practice (I. B. Tauris, London, England), pp. 87-106.

গ্রন্থ পরিচিতি

এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সংস্কার (reformation)। তবে ইসলামের সংস্কার নয়, কারণ ইসলামের সংস্কার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মুসলিমদের প্রচলিত ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, আচার-আচরণের সংস্কার। মুসলিম উম্মাহর বিপর্যস্ত অবস্থার মূলে রয়েছে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক অজ্ঞতা এবং অবহেলা। আর তাই এই বইটি জুড়েই তুলে ধরা হয়েছে মূল্যবোধমুখী ধারা। সময়ের ধারাবাহিকতায় আমরা যা শরিয়া বলে জানি ও মানি তা মূলত আসমানি নয়, বরং ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাময় স্কলারদের ধারণা ও অবদানে সমৃদ্ধ একটি জটিল ভান্ডার, যাতে ইসলামের সঞ্জীবনী পথনির্দেশনা আর জীবনের বাস্তবতার মধ্যে বড় রকমের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের ইসলামী ও মানবিক ধারায় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে কার্যকরী হচ্ছে না। নিছক জাল হাদিস নয়, বরং দুর্বল হাদিসের ওপর নির্ভর করা একটি বড় সমস্যা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুদুদ আইনের বিভ্রান্তিকর প্রয়োগ কুরআন এবং নবিজীর বাণীর সাথেই সাংঘর্ষিক নয়, বরং এক ধরনের অকার্যকারী ও বেইনসাফী প্রয়োগ। এর অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে শরিয়া প্রবর্তন অথবা বাস্তবায়নের নামে মুসলিম সমাজের বিবিধ দুর্বলতম গোষ্ঠীর প্রতি জুলুম এবং ইসলামের অপব্যবহার। এই বিভ্রান্তি ও অপপ্রয়োগ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও বিশ্লেষণসহ সমগ্র বইটি জুড়েই আলোচিত হয়েছে।

এই বইটিতে মূলত পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথমে পরিচিতিমূলক অধ্যায়ের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফোকাস হচ্ছে শরিয়া এবং এর শাব্দিক, পারিভাষিক এবং প্রায়োগিক দিকগুলোর পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ, বিশেষ করে যেখানে শরিয়া অনেক ক্ষেত্রেই আইনসর্বস্বতায় (legalism) পর্যবসিত হয়েছে ও হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের ফোকাস হচ্ছে হাদিস, যেখানে হাদিসশাস্ত্র এবং এর চর্চা, আর ইসলামী বিধিবিধান নিরূপণ অথবা আহরণে অনেক ক্ষেত্রে হাদিসের অপপ্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) নিয়ে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, যেসব বিষয়ে ইজমার দাবি করা হয় তার অধিকাংশই সঠিক নয়, বিশেষ করে উসুলে ফিকহের অন্যতম অংশ হিসেবে ইজমার সংজ্ঞাসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে কোনো ইজমা নেই। পঞ্চম অধ্যায় কিয়াস বা তুলনামূলক যুক্তি নিয়ে, যেখানে ইসলামী বিধিবিধান আহরণ ও প্রণয়নে ধারণাগত এবং প্রায়োগিক বিবিধ বিষয়ে বড় রকমের সমস্যার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রচলিত ইসলামী আইন সম্ভারের পেছনে এম্পিরিক্যাল ভিত্তি নিয়ে অবহেলা এবং তার ফলাফলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এম্পিরিক্যাল ভিত্তির ব্যাপারে অবহেলার কারণে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধিবিধানের ক্ষেত্রে জীবনঘনিষ্ঠ গবেষণাভিত্তিক ধারার পরিবর্তে যে আক্ষরিক এবং কিতাবসর্বস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে তার কুফল হিসেবে ইসলামী আইনী ধারায় যে ভারসাম্যের হ্রাস হয়েছে, কিভাবে তা থেকে উতরানো যায় সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন যে, মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে না, যতক্ষণ না ইসলামের বুনিয়াদি উৎসগুলো নিয়ে কুরআন এবং নবিজীর ঐতিহ্যের আলোকেই মুসলিম চিন্তা ও বুঝের যথাযথ মূল্যায়ন হয় এবং সংস্কার আসে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

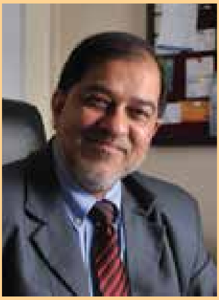

ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেনেসী, নক্সভিল থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করার পর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলি-তে পোস্ট-ডক্টরেট করেন এবং দুই দশক ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরের দেড় দশক তিনি বাহরাইনে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সেন্টার ফর ইসলামিক ফাইন্যান্স (বাহরাইন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স)-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষণার যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অবদান রয়েছে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স, ইসলামী আইন ও উসূলে ফিক্‌হ, ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী পলিটিক্যাল ইকোনমি। তার কিছু কিছু লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যেমন ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, ডাচ, উর্দু, তুর্কি, বসনিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান এবং জর্জিয়ান।

APL
Academia Publishing House Ltd.

978-984-35-4747-7